আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৩

অনুবাদ
মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
চিন্তাশীল আলেম, অনুবাদক ও প্রকাশক

সম্পাদনায়
হাফেয মাওলানা আবু নায়ীম
সম্পাদক, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এম এম তাশফি

© সংরক্ষিত

৫ম মুদ্রণ
মার্চ ২০১৯

চতুর্থ মুদ্রণ
জানুয়ারী ২০১৭

তৃতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0029-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by S M Aminul Islam
Published by : M M Tashfi. BhoiGhor : 43 Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : December 2011 © by the pablisher

Price : 500 Taka only

অ র্প ণ

সৃষ্টিজগতের রহমত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) পর্যন্ত আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসারে যাঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ– আখেরাতে তাঁদের দরওয়াজা বুলন্দীর লক্ষ্যে নিবেদিত হোক অনূদিত খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম ৩য় খণ্ড প্রকাশনার সবটুকু পরিশ্রম ও কুরবানী। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক আমাদের দান করুন। আমীন!

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

দুটি কথা

প্রিয় বন্ধু আবু সাকী মাহবুবের সাথে আমাদের প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন অনাচার, সংকট এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়ে থাকে। তবে আলোচনা পর্যন্তই। কেননা এ শিল্প (যদিও আমাদের দেশে এখনও প্রকাশনা পূর্ণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত নয়) এমনই এক জটিল জালে আটকে আছে, তা থেকে বের করে আনা আমাদের মতো চুনোপুঁটির কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা যাদের সামর্থ দিয়েছেন তাদের সাধ দেননি; আর আমাদের মতো কাউকে হয়তো সাধ দিয়েছেন তবে সামর্থ দেননি। আর প্রকাশনা শিল্পের এ দুরবস্থার কারণেই সবচে' বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত লেখালেখিকে আমাদের দেশে এখনও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একই কারণে আল্লাহমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা দুনিয়া-প্রত্যাশীদের নানা রকম বাহারী সজ্জার আবরণে আরও বেশি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পেশা গ্রহণ করতে হচ্ছে একটা; আর বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিশীল চর্চা করা লাগছে বিবেক ও আবেগের তাড়নায় অবসরে। এ থেকে বেরিয়ে আসার আশু কোনো উপায় আমাদের জানা নেই।

আবু সাকী মাহবুবকে বার বার তাকাদা দিচ্ছিলাম খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-এর সবগুলো খণ্ড যত দ্রুত সম্ভব পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। কারণ পাঠকদের তাকাদা তো সব আমাদেরকেই শুনতে হয়। কিন্তু চাইলেই কতটা দ্রুত তিনি তা করতে পারবেন? সংসারের নানা ঝামেলা, মাদরাসার খেদমত– এসবের পরই না কেবল অবসরটুকু এ কাজে ব্যয় করতে পারছেন। ফলে

পরামর্শ করেই তিন ও চার নম্বর খণ্ডটির ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। লেখক, প্রকাশক ও অনুবাদক স্নেহভাজন আমিনুল ইসলাম এ দুটি খণ্ডের কাজ প্রবীণ সম্পাদক, অনুবাদক হাফেজ মাওলানা আবু নায়ীম সাহেবের মাধ্যমে সম্পাদনা করিয়ে আমার হাতে তুলে দেন। দক্ষ হাতের সম্পাদনার ফলে আশা করি অনুবাদকর্মের দুর্বলতাগুলোও ঢাকা পড়ে গেছে অনেকাংশে। তবুও যে কেউ আমাদের ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেয়া হবে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদ আবু সাকী মাহবুব ভাই যত দ্রুত আমাদের হাতে দেবেন তত দ্রুতই পাঠকদের হাতে তুলে দেবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দিন।

বিনীত–

পরিচালক (সার্বিক)

বইঘর

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানীং ভিন্ন ভাষার মনীষীদের অনূদিত বক্তৃতা প্রকাশের প্রবল জোয়ার বইছে। বাংলা ভাষাভাষীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন যথেষ্ট। সেই তুলনায় উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. অনেকটা উপেক্ষিতই রয়েছেন বলা চলে। অথচ উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে লেখনি ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি ও মেধা এবং বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ নসীহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সুললিত বক্তৃতা ও আলোচনা শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলীগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশও করা হয়। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায়– নিখিল ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি পৌঁছায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানতাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো এখনো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে অনুপস্থিত। আমরা সীমিত সাধ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্বপ্ন দেখার তাওফিক যিনি দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডারে তো কমতি নেই। সেই ভরসা আর দীন প্রসারের অদম্য বাসনাকে পুঁজি করে এই মনীষীর সেরা সংকলন হিসেবে বিবেচিত 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিও বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। প্রাজ্ঞ আলেম আবু সাকী মাহবুব অনূদিত প্রথম খণ্ডটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার পাশাপাশি পরবর্তী খণ্ডগুলোর জন্য আমরা পাঠকদের অনবরত তাকিদ পাচ্ছি। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলোও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো। আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ :
১ ডিসেম্বর ২০১১ ঈ.

দুআর মুহ্তাজ
এম এম তাশফি

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে তিনটি ঐতিহাসিক মন্তব্য

এক.

তাসাউফ ও সুলুকের ইতিহাসে যে স্বাতন্ত্র্য মহা সৌভাগ্য কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ.-কে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন তা এই যে, তাঁর মুরশিদ শায়খুল আলম হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত, তখন তাঁকে দেখার জন্য হযরত কারী সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হলে হযরত থানভী রহ. তাঁর হাতকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুমু খেলেন এবং স্বীয় বক্ষ মোবারকের উপর রেখে বললেন– এ হাত দ্বারা আমি আমার অন্তরে আশ্চর্যজনক এক প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছি। তারপর হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী, আমলী ও রূহানী ফয়েজ এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও জীবনে বরকতের জন্য মাকবুল দোয়া করে বিদায় দিলেন।

দুই.

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে বলেন– মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়ব আমার স্নেহভাজন, স্বীয় বুযুর্গগণের ইলমী বৈশিষ্ট্যাবলী এবং রূহানী নেসবতসমূহ আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে একত্র করে দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক ফয়েয ও বরকতময় করে তুলেছেন।

তিন.

খতীবে আযম, আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ভারত বিভাগের পূর্বে মুলতানের খায়রুল মাদারিস-এর বার্ষিক সভায় হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেবের আন্তরিক দাওয়াতে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর এ সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন বয়ান এ জলসার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আমীরে শরীয়ত হযরত শাহ সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে নিজের গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা এবং তাঁর ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলতেন– আমি এ জলসায় শুধু তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি। তিনি আরো বলতেন– তাঁর এক তাকরিরে আমার সারা বছরের অসংখ্য তাকরিরের বিষয়াদি তৈরি হয়ে যায়।

رحمهم الله رحمة واسعة

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত সম্পর্কে তাঁর খলিফাগণের মন্তব্য

এক

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত ও বক্তৃতার ফয়েযের প্রকাশ 'দারুল উলুম দেওবন্দ'। যিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক দীনি কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরতের কামালাত ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে ঐসব খলিফার দ্বারা যারা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি ব্যক্তির নিকট হযরতের ফয়েয ও বরকত পৌছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ ঐ সকল খলিফা যাঁরা ধর্মনীতি, চরিত্র নীতি, ইবাদত, ইলম ও আমল অনুযায়ী হযরতের বক্তৃতা ও তারবিয়াত অনুসারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একমাত্র দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী, দেওবন্দ

দুই

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর বক্তৃতার ইলমী আমলী ও তারবিয়াতী ফয়েজ ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এসবের কারণে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-কে দেওবন্দী জামায়াতের মধ্যে অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন বলা অতিরঞ্জন হবে না এবং বাস্তবতা পরিপন্থীও হবে না।

–হযরত আল্লামা রফিক আহমাদ, মুজাফফরনগর

তিন

এ বাস্তবতার মধ্যে কোন অতিরঞ্জনতার সম্ভাবনাই নেই যে, কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর একটিমাত্র বয়ান নাস্তিকতার নিকটবর্তী সীমায় অবস্থানকারী দ্বিধা-সংশয়ের মরিচা ধরা আত্মাগুলোর সকল সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেয়। এ এক অসীম আমলে সালেহ।

–হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ ইসলাম, মিরাঠ

চার

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী মাহাত্ম্য কোন পরিচয় দানের মুখাপেক্ষি নয়। তাঁর ওয়াজ ও বাণীগুলো রূহানী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য মহান পুঁজির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং তাঁর অবর্তমানে এগুলো তাঁর সাহচর্য ও সঙ্গলাভের স্থলাভিষিক্ত।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ, জালন্ধর, মুলতান

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

প্রসঙ্গ : আল্লাহর যিকির / ২১

আমলই শরীয়তের প্রাণ / ২৪

সব কিছু আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রাণবন্ত / ২৬

কৃষি ও ব্যবসা নয়– পৃথিবী টিকে আছে ঈমানদারীর জন্য / ২৭

রাজ্যের শৃঙ্খলা দিয়ানত দ্বারা হয়, শাসন দ্বারা নয় / ৩০

দেহের রাজত্ব করেন দুনিয়ার বাদশাহগণ আর কলবের উপর
রাজত্ব করেন আল্লাহওয়ালাগণ / ৩৬

আল্লাহওয়ালাগণ না থাকলেও তাঁদের রাজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে / ৩৭

আল্লাহওয়ালাদের দুনিয়াকে পদাঘাত করার কারণ / ৪০

আল্লাহওয়ালাদের রাজত্বের বিশালতা / ৪৩

আল্লাহর নাম ছাড়া বিশাল থেকে বিশাল সৃষ্টিরও কোন মূল্য নেই / ৪৫

কলবে মুহাম্মদী (সা.) : আল্লাহর যিকরের ভাণ্ডার / ৪৭

আল্লাহর মুবারক নামের ওজন / ৪৭

হুযুরে কল্‌ব যিকরে ওজন বাড়ায় / ৪৯

কল্‌বের আবেগানুভূতিতে উচ্চারিত শব্দে তাসীর পয়দা হয় / ৫১

আল্লাহর যিকির কলবে জারি হলে বান্দা আরশের অধিবাসী হয়ে যায় / ৫৪

যিকরুল্লাহর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশস্থল / ৫৫

আত্মা না থাকলেও বাহ্যিক আমল ছাড়তে নেই / ৫৮

বেশি বেশি যিকির ও যিকিরের স্বাদ হাসিল করার উপায় / ৬০

বয়ান : ২

প্রসঙ্গ : আল্লাহর মারেফাত / ৬৩

অভিনন্দনের জবাবে / ৬৬

দারুল উলুমের উন্নতি অদৃশ্য শক্তির দান / ৬৬

আল্লাহ্‌র মারেফত বা পরিচয় লাভই দারুল উলুমের প্রাণ / ৬৮

দলিল দিয়ে নয়, মানুষ আল্লাহকে স্বীকার করে স্বভাবজাতভাবে / ৬৮

আকল ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া গেলে তো দার্শনিকরা
আরেফ ও কামেল হয়ে যেতেন / ৭৫

কুরআন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে / ৭৬

অন্তরে আল্লাহ আসেন, ধারণায় নয় / ৭৯
আত্মার মতো আল্লাহ আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র / ৮০
অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি থাকে রূহের প্রতি, দেহের প্রতি নয় / ৮২
চেহারা-সুরত নয়; স্বভাব-চরিত্রের কারণে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত / ৮৬
চরিত্রবানরাই ইতিহাসে স্মরণীয় / ৮৯
আদর্শবানরাই আল্লাহর খেলাফতের হকদার / ৯০
মানুষের মূল পদার্থ এক : শ্রেষ্ঠত্ব স্বভাব চরিত্রে / ৯১
আল্লাহর দরবারে মকবুল হন বিনয়ীরা / ৯৩
কেবল আল্লাহর অনুগ্রহই নাজাতের উপায় / ৯৫
আমল অনুগ্রহের আলামত / ৯৯
জান্নাত ঈমানের প্রতিদান, আমলের নয় / ৯৯
কুদরতের দলিল-প্রমাণ / ১০১

বয়ান : ৩

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি / ১০৭
অন্তিমকালের সম্বোধন / ১১০
মৃত্যুর ফেরেশতা মুমিনকে উৎসাহ দিয়ে পরকালে
যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন / ১১২
মৃত্যুর স্বয়ং আল্লাহ মুমিনের সাথে কথা বলেন / ১১৪
মুমিনের জন্য সন্তুষ্টির সুসংবাদ ঘোষিত হবে / ১১৭
কেবল আল্লাহর যাত নয়, কাজের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকবে হবে / ১২১
কখন মানুষ সাহেবে নিসবত হয় / ১২৪
সাহেবে নিসবতের মর্যাদা / ১২৬
আল্লাহর সকল কাজে সন্তুষ্ট থাকার জাগতিক পুরস্কার / ১২৯
আন্তরিক সন্তুষ্টির সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য, অপারগতার নয় / ১৩১
পরকালীন চিরন্তন দান ও নেয়ামতসমূহ আল্লাহর
সন্তুষ্টির ওপরই নির্ভরশীল / ১৩২
সমর্পণেই শান্তি, বিচার-বিশ্লেষণে নয় / ১৩২
দুনিয়াতেও প্রতিদানের বিধান কার্যকর রয়েছে / ১৩৪
আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানার কষ্টিপাথর / ১৩৫
আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে মুমিনকে কাফেরকে নয় / ১৩৮
কেন এই ফিরে যাওয়া / ১৩৯
বান্দা হতে না চাইলে আল্লাহও বান্দা বানান না / ১৪০

বয়ান : ৪
সংশোধনের নিয়ম-কানুন / ১৪৩
দুনিয়ার সাধারণ অবস্থা / ১৪৫
মানব-প্রকৃতিতে মন্দ বিদ্যমান রয়েছে / ১৪৭
মানুষের চরম উৎকর্ষ আল্লাহ প্রদত্ত / ১৫৪
গুণবানরাই পূর্ণমাত্রায় নম্র ও বিনয়ী / ১৫৬
রিসালাত এবং বাশারিয়াত / ১৫৯
ইলম-আখলাক অর্জনের প্রথম পথ সোহবত বা সাহচর্য / ১৬৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বতের মুজেযা / ১৬৭
জ্ঞান বুদ্ধিহীন বস্তুসমূহের সাহচর্য / ১৭০
আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে প্রকৃত দীন অর্জিত হয় / ১৭২
ইলম ও আখলাক লাভের দ্বিতীয় পথ : আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন / ১৭৬
ইলম ও আখলাক লাভের তৃতীয় পথ : অন্যের উপদেশ গ্রহণ / ১৭৯
ইলম ও আখলাক লাভের চতুর্থ পথ : মুহাসাবায়ে নফস / ১৮০
দৃঢ়-সংকল্প ছাড়া সংশোধন সম্ভব নয় / ১৮৩
দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণু উপদেশদানকারী / ১৮৭
শয়তানের প্রবঞ্চনা / ১৯১
আমলের প্রকৃত সময় যৌবনকাল / ১৯২
নেক কাজের জন্য পরামর্শের দরকার নেই / ১৯৪

বয়ান : ৫
আহলে হক বা সত্য দলের পরিচয় / ১৯৭
আহলে হকের পরিচয়ের মাপকাঠি / ২০০
দীন জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত এবং আবিষ্কৃত নয় / ২০৩
দীন হলো গায়েবী হাকীকত : বুদ্ধিমত্তা এর আবিষ্কারক নয় / ২০৪
জ্ঞান-বুদ্ধি অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর অনুসরণ করবে / ২০৬
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে
আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন / ২০৭
দিয়ানত ও আমানতদারী অসমাপ্তকারীর বর্ণনা
অস্বীকার করা যায় না / ২১৫
হেফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা / ২১৮
আল্লাহর উদ্দেশ্য আকল দিয়ে বিচার করা যাবে না / ২২০
দীনি মাসআলায় সনদ দাবী করা এ উম্মতের বিশেষত্ব / ২২৭
সঠিক সনদে প্রমাণিত হলে অনুসরণ করা ফরয / ২২৮

দীনের মূলভিত্তি হলো সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ / ২৩১
আদবের জন্য নিয়মের বাইরে আমল কোন আইন নয় / ২৩৫
তরীকতের মাশায়েখের অবস্থাসমূহকে সাধারণ নিয়ম বানানো ঠিক নয় / ২৩৭
মুহাক্কিকগণই শরীয়ত ও তরীকত একসঙ্গে চালাতে পারেন / ২৩৯
সোহবত ও তরবিয়ত ব্যতীত মুহাক্কিক হওয়া যায় না / ২৪২
হৃদয়ের বাদশাহ / ২৪৩
দুনিয়া মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে করতে
আল্লাহওয়ালাদের পায়ে এসে পড়ে / ২৪৪
আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়াবিমুখ / ২৪৬
আদব ও আজমতের বাহকগণ আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত ওয়ারিস / ২৪৮

বয়ান : ৬
তিনটি ফিত্‌রী সওয়াল বা স্বভাবজাত জিজ্ঞাসা / ২৫৩
মাযহাবের উদ্দেশের বুনিয়াদ তিন জিনিস / ২৫৬
মানুষের মাব্‌দ / ২৫৬
দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের চালচলন / ২৫৭
দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের কথাবার্তা / ২৬১
সালামের আদব ও বরকত / ২৬২
দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের নির্জনতা / ২৬৫
দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের মৌখিক ইবাদত / ২৬৯
অর্থ-সম্পদ প্রসঙ্গে আল্লাহর বান্দাদের শান / ২৭১
মহান আল্লাহর বান্দাদের কল্‌বী ইবাদত / ২৭৪
হক্কুল ইবাদ-এর ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের কর্মধারা / ২৮১
তাওবাকারীদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার ব্যবহার / ২৮৪
দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের সাআদ বা পরকাল / ২৮৮

বয়ান : ৭
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের আদব / ২৯১
গায়ের ইখতেয়ারী কামালতের আদব / ২৯৬
নিসবত বা সম্পর্কের আদব / ২৯৮
হযরত নানুতবী (রহ.)-এর একটি স্মরণীয় ঘটনা / ২৯৯
আদবের মধ্যে সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখা / ৩০৪
আদবের পরাকাষ্ঠা হযরত গংগুহী (রহ.) / ৩০৫
ইখতেলাফী রায় বা মতপার্থক্য / ৩০৬
গোস্তাখী হচ্ছে মূর্খতার পরিচায়ক / ৩০৮

মাওলানা থানবী (রহ.) এবং মাওলানা আহমদ রেযা খান / ৩০৯
কাফের ফতোয়াদানকারীর সঙ্গে নানুতবী (রহ.)-এর আচরণ / ৩১০
বেয়াদবের ইলমী ফয়েয লাভ হয় না / ৩১২
আদব সম্পর্কে মাওলানা নানুতবী (রহ.)-এর অন্য একটি ঘটনা / ৩১২
আদবের প্রতি উদাসীনতার ভয়ানক পরিমাণ / ৩১২
গোস্তাখির মাধ্যমসমূহ বন্ধকরণ এবং তার উদাহরণ / ৩১৩
ইবাদতের উপায় উপকরণ ও ইবাদত / ৩১৫
আল্লাহওয়ালাদের নেকীর আকাঙ্ক্ষা / ৩১৬
হযরত ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর ঘটনা / ৩১৬
আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের পারস্পরিক আচরণ / ৩১৮
মাসায়েল ও প্রবৃত্তিগত আবেগ / ৩১৮
মুসলমানদের মতপার্থক্য এবং খৃষ্টান জজের বিদ্রূপ / ৩১৯
ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সঠিক পথ / ৩২০
শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মূল্যবান উপদেশ / ৩২১
ফাসাদ নাকি সংশোধন / ৩২১
তাবলীগী ও প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য / ৩২২

বয়ান : ৮

আর্থিক অধিকারসমূহ / ৩২৩

আত্মা এবং আত্মার প্রয়োজনীয় উপকরণের স্রষ্টা / ৩২৭
আত্মা শরীরকে পবিত্র করে মালিকের কাছে সমর্পণ করে / ৩২৯
মালিকের বন্দেগী না করে দেহ ও আত্মার উপায় নেই / ৩৩০
স্বেচ্ছায় সব ইবাদত করা হলো বান্দার কাজ / ৩৩১
আব্রু-সম্ভ্রমের মাধ্যমে ইবাদত / ৩৩৩
অর্থনৈতিক ইবাদত / ৩৩৪
আর্থিক ইবাদতের লক্ষ্য ধনী-গরীবের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা / ৩৩৭
গরীবের সেবায় ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) / ৩৪১
ব্যবসায় ইমাম আযমের তাকওয়া / ৩৪২
ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি বণ্টনের ওপর, সঞ্চয়ের ওপর নয় / ৩৪৩
দানশীলতায় প্রথম যুগের মুসলমানদের উদ্দীপনা / ৩৪৫
দান-দক্ষিণা মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য / ৩৪৭
সম্পদ বণ্টনে ইসলাম ও কমিউনিজমের পার্থক্য / ৩৫০
গরীবদের প্রতি ধনীদের দয়ালু বানিয়েছে ইসলাম / ৩৫১
ইসলাম ব্যয়ের খাত ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে / ৩৫৩
হারাম অবৈধ মাল হারাম খাতেই ব্যয় হয় / ৩৫৪

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রথম শর্ত হালাল খাবার / ৩৫৫
হালাল উপার্জনেই রয়েছে বরকত ও নূর / ৩৫৬
আল্লাহর পথে ব্যয়ে উৎসাহিত করার কুরআনী পদ্ধতি / ৩৫৯
ঈমান ও আত্মার সান্ত্বনা কোটি কোটি রাজ্যের চেয়েও মূল্যবান / ৩৬১
পার্থিব সম্পদ লাভ হয় খেদমতের বিনিময়ে, অধিকার হিসেবে নয় / ৩৬৩
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক কেবলই দাসত্বের / ৩৬৫
সম্মিলিতভাবে গরীবদের সেবা করা উচিত / ৩৭০

বয়ান : ৯
পবিত্র খুতবা / ৩৭৩
আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা / ৩৭৬
দীনি ইলম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন / ৩৭৭
১. মানুষ : বহুমুখী এক বাস্তব সত্তার সৃষ্টি / ৩৭৮
২. অঙ্গসমূহের দায়িত্ব এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিধান / ৩৭৯
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য / ৩৮০
দেহের বাদশাহ আত্মার আমল / ৩৮২
৩. কলবের ইলমের উসিলা হলো গবেষণা ও অনুধ্যান / ৩৮৩
৪. শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গই সংবেদনশীল / ৩৮৫
শারীরিক অঙ্গসমূহের অনুভূতির তিনটি শক্তি / ৩৮৫
কুরআন থেকে অনুভূতির মাধ্যমসমূহ নিরূপণ / ৩৮৭
অনুভূতিশীল অঙ্গগুলোর পার্থক্যের স্তর / ৩৮৯
৫. অনুভূতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞানের পারস্পরিক পার্থক্য / ৩৯০
৬. আস্বাদন শক্তি / ৩৯৩
৭. কুওতে শাম্মা বা ঘ্রাণশক্তি / ৩৯৬
৮. শুঁকা ও ঘ্রাণশক্তির আংশিক ইলমের কুরআনী প্রমাণ / ৩৯৭
স্পর্শ ও আস্বাদনশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তির ইলম যথেষ্ট নয় / ৩৯৮
যথেষ্ট ইলম একমাত্র নাক, কান ও আত্মার / ৩৯৯
চোখ, কান ও কল্‌ব-এর দান / ৪০০
চোখ, কান ও কল্‌ব-এর সুন্দর বর্ণনা / ৪০০
চোখ কান ও কলব মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী / ৪০১
তিন অঙ্গকে জবাবদিহি করতে হবে / ৪০১
অঙ্গ তিনটির অপব্যবহারই জাহান্নামের কারণ / ৪০১
তিন অঙ্গের অর্জিত ইলমের ওপর দুনিয়া ও আখেরাত নির্ভরশীল / ৪০২
৯. অধিক শর্তারোপ ইলমের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক / ৪০৩
চোখের ইলমী চৌহদ্দি সবচে' সংকীর্ণ / ৪০৩

বিবেকপূজারীদের চোখের ওপর ভ্রান্ত নির্ভরশীলতা / ৪০৫
কান ও কলবের জ্ঞানের চৌহদ্দি চোখের তুলনায় বেশি / ৪০৬
কান ও কলবের অতীত ঘটনাবলী অনুধাবনের দলীল / ৪০৭
কানের বোধশক্তির সীমা কল্‌বের তুলনায় সংকীর্ণ / ৪০৯
অনুভব-ক্ষমতা কল্‌বেরই বিশেষত্ব / ৪১০
ইন্দ্রিয়ানুভূতি কার্যত হৃদয়ানুভূতির ফসল / ৪১১
অন্তর ঘুমের সময় যেমন তেমনি মৃত্যুর পরও অনুভূতিশীল থাকে / ৪১৩
অনুভূতির মাধ্যমে আত্মা প্রভাবিত হয়, অঙ্গ-ইন্দ্রিয় নয় / ৪১৪
অনুভূতি শক্তি দ্বারা অনুভূত জিনিসের আবিষ্কারকও আত্মা / ৪১৫
সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলোর বিপরীতে কলবের মর্যাদা / ৪১৫
ইন্দ্রিয়ের ইলমের মতো মস্তিষ্কের ইলমও আত্মারই দান / ৪১৭
অনুধ্যান ও অনুধাবন কার্যত আত্মারই গুণ / ৪১৮
আত্মারই বিশেষ গুণ হচ্ছে অনুধাবন করা / ৪১৮
আত্মার অনুভূতির দু'টি দিক / ৪১৯
নবীন-প্রবীণ চিন্তাবিদদের চিন্তার প্রান্তসীমা / ৪২০
আকল সম্পর্কে বুযুর্গদের দৃষ্টিভঙ্গি / ৪২১
আকল-এর প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা / ৪২১
আকল পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয় এবং অনুধাবনও পূর্ণাঙ্গ নয় / ৪২৩
ইলম মানুষের নয়, আল্লাহর সিফত / ৪২৫
মাখলুক গায়ের মাখলুকের কর্তা হতে পারে না / ৪২৬
আত্মা আকলের উৎসস্থল / ৪২৭
বস্তুসমূহের মৌলিক প্রকৃতি পর্যন্ত আকলও পৌঁছতে পারে না / ৪২৭
প্রকৃত ইলম ও অনুভূতি শুধুই আত্মার বিশেষত্ব / ৪২৯
ইন্দ্রিয় ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞানের সীমা সুন্দর উপাদান তৈরি :
উন্নত স্বভাবের মানব গঠন নয় / ৪৩০
জড়বাদী জ্ঞানের অশুভ পরিণতি / ৪৩২
আত্মার জ্ঞানার্জন ও অনুভূতির দু'টি দিক / ৪৩৫
আত্মার দৈহিক ও আত্মিক অনুভূতিতে মিল আছে / ৪৩৬
ইলম ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য / ৪৩৮
ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলম এবং ইলহামী ইলমের উৎস / ৪৩৯
বস্তুগত ও ইলহামী ইলমের আলাদা কাজ এবং ফলাফল / ৪৪০
রব্বানী ইলমের সঙ্গে নফসের ইলমও জরুরী / ৪৪১
ইলমের মৌলিক প্রকার দুটি : ইলমে নফস ও ইলমে রব / ৪৪৩
ইলমে রব-এর আমলী ব্যাখ্যা ফিক্‌হ এবং
ইলমে নফ্‌স-এর তাসাওউফ / ৪৪৪

নবীগণ ইলমে-রব পৌছানোর জন্যই আবির্ভূত হন / ৪৪৫
পার্থিব ইলমের মত রব্বানী ইলমের স্থানও আত্মা / ৪৪৬
রব্বানী ও হিস্‌সী ইলমের উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য / ৪৪৮
ইলমে নাফে বা উপকারী ইলম-এর হাকীকত / ৪৪৯
পার্থিব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ পরিবর্তন দরকার / ৪৫১
দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য / ৪৫৩
ব্যাধিগ্রস্ত বর্তমান বিশ্বের একমাত্র চিকিৎসা / ৪৫৪
একটি ভুলের অবসান / ৪৫৪
উন্নতির জন্য ইলমেদীন আর প্রয়োজনের জন্য
পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান / ৪৫৫
রাসূল (সা.)-এর আগমনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য / ৪৫৬
আগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য / ৪৫৭
আগমনের তৃতীয় উদ্দেশ্য / ৪৫৭
ইলম ও আমলের মধ্যে সম্পর্ক / ৪৫৮
মুসলমানের জীবনের মৌলিক তিনটি বিভাগ / ৪৫৯
জাতি ধ্বংসের তিন কারণ / ৪৫৯
জাতীয় সমৃদ্ধির তিনটি উপায় / ৪৫৯
মুসলিম জাতি এবং বর্তমান সময় / ৪৬০
জাতিসমূহের ধ্বংসের স্বভাবজাত নীতি / ৪৬০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

বয়ান : ১

প্রসঙ্গ : আল্লাহর যিকির

এ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই রূহ বা জীবন দ্বারা স্পন্দিত। শুধুমাত্র দেহ কাঠামো দ্বারা কোন জিনিসই জীবিত থাকতে পারে না, যদি না তাতে আত্মা থাকে। কোন মানুষের দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেলে সে মানুষটিকে বলা হয় মুর্দা বা মৃত। তাকে আর রেখে দেয়া যায় না। তার লাশ দাফন করে দেয়া হয় অথবা জ্বালিয়ে ছাই করা হয় কিংবা পানিতে ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে দেয়া হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

কুরআনুল কারিমের একটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। সম্পূর্ণ আয়াত সম্পর্কে বিশেষ কিছু আরয করছি না; বরং আয়াতের অংশবিশেষ সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে শরীয়তের রূহ বা আত্মা। আয়াতের এই বিশেষ অংশটি হলো– 'ওয়ালা যিকরুল্লাহি-আকবর'। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির শ্রেষ্ঠতম।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– 'নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে রক্ষা করে। গর্হিত ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ তায়ালার যিকির হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।' [আনকাবূত : ৪৫]

নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে কীভাবে মানুষকে বাঁচায় সেদিকে না গিয়ে আমি এখন 'ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার' সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করছি।

আমলই শরীয়তের প্রাণ

সকল আমলের মধ্যে আল্লাহর যিকিরই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। এর চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই; বরং প্রতিটি আমল আল্লাহর যিকির-এর কারণেই মকবুল হয় এবং মকবুলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে। নামাযে যদি আল্লাহর যিকির না থাকে, স্মরণ না থাকে, তবে নামায হয়ে পড়বে আত্মাহীন বা প্রাণহীন। রোযায় যদি আল্লাহর যিকির না থাকে তাহলে রোযা হয়ে যাবে প্রাণহীন আর যাকাতে যদি আল্লাহর যিকির না থাকে তাহলে যাকাতও হয়ে যাবে প্রাণহীন বা আত্মাহীন। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের সকল আমলের রূহ ও প্রাণ হলো আল্লাহর যিকির– আল্লাহর স্মরণ। কাজেই যিকরুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করার অর্থ হবে শরীয়তের আহকামসমূহের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কারণেই আমি এ আয়াতটি আজকের আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি।

এ কথা আপনাদের জানা আছে, এ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই রূহ বা জীবন দ্বারা স্পন্দিত। শুধুমাত্র দেহ কাঠামো দ্বারা কোন জিনিসই জীবিত থাকতে পারে না, যদি না তাতে আত্মা থাকে। কোন মানুষের দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেলে সে মানুষটিকে বলা হয় মুর্দা বা মৃত। তাকে আর রেখে দেয়া যায় না। তার লাশ দাফন করে দেয়া হয় অথবা জ্বালিয়ে ছাই করা হয় কিংবা পানিতে ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা, ঐ মানুষটি, যার সাথে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে, মন ও প্রাণের আকর্ষণ থাকে, এক মিনিটের জন্য বিচ্ছেদ প্রাণে সয় না; অথচ যখন রূহ বের হয়ে বিদায় নেয়, তখন প্রত্যেকটি মানুষ তাকে ভয় পায়। আতঙ্কিত হয়ে বলে– তাড়াতাড়ি একে আমাদের কাছ থেকে দূর করা হোক। তাহলে বুঝা গেল, ভালোবাসা ও সম্পর্ক মূলত রূহের আত্মার সাথে ছিল। আত্মা বের হয়ে গেল, সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই এ জগতে প্রকৃত ও মৌল বস্তু হলো রূহ বা আত্মা। রূহ-বিহীন কোন কিছুই জীবিত থাকতে পারে না; স্থায়ী হতে পারে না। যেমন- জগতের জড় বস্তুগুলোও স্থূল দেহ কাঠামোবিশেষ। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর মধ্যে যিকরুল্লাহর রূহ না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো অস্তিত্বহীন বস্তুর মতো। এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা হবে না। নামাযে যদি আল্লাহর যিকিরে অমনোযোগিতা এসে যায়, তবে নামায শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ সারশূন্য, প্রাণহীন হয়ে যাবে। তাই কুরআন পাকে বলা হয়েছে–

اقم الصلوة لذكرى

নামায কায়েম কর আমার যিকিরের জন্য। [তোয়াহা : ১৫]

যিকির না থাকলে নামাযের প্রাণ বরবাদ হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে শুধু ওঠাবসা অথবা শারীরিক ব্যায়াম– যার কোন মূল্য আল্লাহর নিকট নেই। এভাবে যদি রোযার মধ্যে যিকির, তেলাওয়াত এবং তারাবীহ না থাকে, তবে রোযাও একটি উপবাসে পরিণত হবে, যার কোন মূল্য ও মর্যাদা থাকে না। শুদ্ধ-সঠিক নিয়ত ও আল্লাহর যিকির দ্বারা রোযা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এটাই তো ইবাদত। যে ইবাদতে প্রাণ নেই সে ইবাদত তো আদতের নামান্তর। আদত ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– আদত স্থূল দেহ কাঠামোবিশেষ, যাতে স্মরণ থাকে না; আর যদিও স্মরণ থাকে তা নফসের স্মরণ হয়ে থাকে না। আর ইবাদত হলো ঐ কাঠামো, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থাকে, নিজ নফস বা প্রবৃত্তির স্মরণ থাকে না। আদত ও ইবাদতের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। কেউ যদি নিয়তবিহীন অবস্থায় পুরোটা দিন অনাহারে কাটিয়ে দেয়, পানি পান না করে, স্ত্রীর দিকে চোখ তুলেও না দেখে, তাহলেও তাকে উপবাস বলা হবে। আর যদি সঠিক নিয়ত ও আল্লাহর যিকিরের সাথে করে, তাহলেই একে রোযা ও ইবাদত বলা হবে।

একইভাবে হজে যদি যিকরুল্লাহ না থাকে এবং নিয়ত সহীহ না হয়, তাহলে হজ হবে না; বরং তা হবে বেড়ানো ও ভ্রমণ। আর যদি তাতে সহীহ নিয়ত থাকে তাহলে তা হজ হয়ে যাবে। এই হলো আদত ও ইবাদতের পার্থক্য। আদতের মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তির প্রেরণা কাজ করে থাকে, আর ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর যিকিরের আবেগ, উৎসাহ উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে। এ কারণেই তা ইবাদত বলে গণ্য হয়।

এ থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি, এ জগতের প্রাণ যখন আল্লাহর যিকির, তাহলে সম্পূর্ণ শরীয়তের প্রাণও আল্লাহর যিকির। পৃথিবী থেকে যদি রূহ চলে যায়, তাহলে পৃথিবী মৃতদেহে পরিণত হবে। তেমনি শরীয়ত থেকে যদি রূহ বের করে দেয়া হয়, তাহলে শরীয়ত আদতে পরিণত হবে, আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে যাবে; তা আর ইবাদত থাকবে না।

হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لا تقوم الساعة حتى يقال فى الارض الله الله -

কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এ বিশ্বে আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণকারী একজন মানুষও বিদ্যমান থাকবে।

অর্থাৎ আল্লাহর নাম নেয়ার যখন একজনও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন কেয়ামত সংঘটিত হবে।

কেয়ামতের প্রকৃত অর্থ হলো– বিশ্বজগতের মৃত্যু, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। মৃত্যুর পর শরীর যেমন ফুলে-ফেটে, পচে-গলে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি কেয়ামতের দিন শিঙায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড় পর্বতগুলো পেঁজা তুলোর ন্যায় উড়ে যাবে, পানি মাটির মধ্যে এবং মাটি পানির মধ্যে প্রবেশ করবে, সম্পূর্ণ বিশ্বজগত বিশৃঙ্খল-বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। সবকিছু হয়ে পড়বে এলোমেলো, নিয়ম শৃঙ্খলাহীন। এই হলো কেয়ামত।

এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে– কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণকারী একজন মানুষও বিদ্যমান থাকবে। যখন একজনও থাকবে না, তখনই বিশ্বের মৃত্যু হবে। বোঝা গেল, এ বিশ্বের রূহ বা প্রাণ হলো আল্লাহ তায়ালার যিকির। সম্পূর্ণ বিশ্বজগতের রূহ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সব কিছু আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রাণবন্ত

বিশ্বের প্রতিটি উপাদান, প্রতিটি অণু-পরামাণু আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রাণবন্ত। প্রকৃত কারণ হলো– বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অংশেও জীবনের স্পন্দন ও তৎপরতা আল্লাহর যিকির দ্বারাই স্পন্দিত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– প্রবহমান পানি আল্লাহর যিকির করে, যে মুহূর্তে তাসবীহ ও যিকির করা বন্ধ হয়ে যায়, সে মুহূর্তটা তার মৃত্যুর সময়, অর্থাৎ তখনই সে থেমে যায়। আর পানি যখন থেমে যায়, তখন কিছুদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়, দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে, নোংরা হয়ে যায়। প্রবহমান পানিতে ময়লা-আবর্জনা থাকতে পারে না। এ কারণেই প্রবহমান পানি অল্প-বিস্তর যা-ই হোক তাতে অযু করা জায়েয। তাতে যদি কোন ময়লা-আবর্জনাও পতিত হয়, তবে এতে তার পবিত্রতার মধ্যে কোন মন্দই থাকে না। এজন্য যে, এর মধ্যে তাসবীহ ও যিকরুল্লাহ জারি রয়েছে। যিকির পানিকে নাপাক অপবিত্র হতে দেয় না। আর স্থির পানি যদি পরিমাণে কম হয় এবং এতে অপবিত্র জিনিস মিশে যায় তাহলে সম্পূর্ণ পানি নাপাক অপবিত্র হয়ে যায়। এ পানি দিয়ে অযু ইত্যাদি কোনরূপ পবিত্রতা হাসিল করা যাবে না। অপবিত্র কেন হলো? এজন্য যে, তার রূহ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রবহমান পানি তাসবীহ ও যিকির করতে থাকে। আর অপ্রবহমান স্থির পানি তাসবীহ ও যিকির থেকে বঞ্চিত থাকে। আর এ হলো তার মৃত্যুর লক্ষণ।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– গাছের ডালপালাগুলো যে পর্যন্ত সতেজ ও শ্যামল থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর তাসবীহ ও যিকিরে রত থাকে। আর তাসবীহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে হলুদ রঙ ধারণ করে, শুকিয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। মনে হয় যেন রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে– নতুন কাপড় আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ করতে থাকে। যখনই তাসবীহ বন্ধ হয়ে যায়, তখনই ময়লা হতে শুরু করে। তাসবীহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ময়লা হতে থাকে, পরিধান ও ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। যতক্ষণ তা খুলে ধোপার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অথবা নিজ হাতে ধুয়ে পাক-পরিষ্কার করা না হবে ততক্ষণ আপনি একে পরিধান করার উপযোগী মনে করবেন না। বুঝা গেল, কাপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আল্লাহর যিকিরের ওপর নির্ভরশীল। যিকির বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এতে ময়লা আসতে শুরু করে।

মানুষের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিকির দ্বারাই হয়। যদি আল্লাহর যিকির না থাকে, তাহলেই মানুষের হৃদয়ে ময়লা, মরিচা ও অপবিত্রতা আসা শুরু করে। আল্লাহর যিকির বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মানুষ ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। অপরিষ্কার ময়লাযুক্ত মানবাত্মা ময়লা কাপড়ের মতো নিক্ষেপযোগ্য। একে কোন আল্লাহওয়ালা লোক পছন্দ করবেন না। আত্মার ভেতর যিকির যত বেশি থাকবে, আত্মাও ঠিক তত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। যিকিরের পরিমাণ যত হ্রাস পাবে, পাপ-পঙ্কিলতা ততই বৃদ্ধি পাবে। আর পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকার যতই বৃদ্ধি পাবে, শিরক ও বিদাতের উদ্দীপনা ততই উজ্জীবিত হয়ে ওঠবে। যে পর্যন্ত যিকির চালু থাকবে, রূহ সতেজ থাকবে, দেহ সতেজ থাকবে। পরিষ্কার হৃদয়ে নূর, জ্যোতি ও আলো থাকে। এতে নেক বা সৎকাজের আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

সারকথা হচ্ছে, মানুষ হোক অথবা পৃথিবীর যে কোন ক্ষুদ্র বস্তু, তা ঐ পর্যন্ত সতেজ সজীব থাকবে, জীবিত বলে গণ্য হবে, যে পর্যন্ত তার মধ্যে আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ থাকবে। যিকির বিদ্যমান না থাকলে বিশ্বের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। কার্যত এ বিশ্বকে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারীগণ ধরে রেখেছেন, সামলে রেখেছেন।

কৃষি ও ব্যবসা নয়– পৃথিবী টিকে আছে ঈমানদারীর জন্য

পৃথিবীর বহু মানবগোষ্ঠী এমন দাবি করে যে, আমরা বিশ্বকে টিকিয়ে রেখেছি। যেমন- কৃষক সমাজ দাবি করে থাকেন– আমরা বিশ্বকে এভাবে রক্ষা করছি যে,

বিশ্ববাসী পানাহার দ্বারা বেঁচে আছেন, আর আহার্য– গম, যব, চাল, চানা ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী আমাদের প্রচেষ্টায়ই উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা যদি শস্য উৎপাদন না করে বসে থাকি, তাহলে খাবার মিলবে না, আকাল দেখা দেবে, বিশ্ব মানব হবে ধ্বংস। কাজেই আমাদের প্রচেষ্টায়ই বেঁচে আছে বিশ্ববাসী। যদি কৃষক সমাজ ও জমিদার শ্রেণী সক্রিয় না থাকেন তবে বিশ্ববাসী ধ্বংস হয়ে যাবে। গম, যব, চাল, চানা ইত্যাদি সবই আমাদের প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়। যদি আমরা উৎপাদনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করি, তাহলে খাদ্যাভাবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই পৃথিবীর জীবন রক্ষা হচ্ছে আমাদের চেষ্টা ও শ্রমে। যদি কৃষক সমাজ পৃথিবীতে না থাকেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ীগণ বলেন, বিশ্বকে আমরা রক্ষা করছি এভাবে– কৃষক কাঁচামাল উৎপন্ন করে। এ কাঁচামাল দ্বারা আমরা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে দোকানে সাজিয়ে রাখি। ধান, চাল, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যদি আমরা সরবরাহ না করি তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে। কাজেই আমাদের প্রচেষ্টায়, আমাদের দ্বারা বিশ্ব রক্ষা পাচ্ছে, তোমাদের দ্বারা নয়। তুমি শস্য উৎপন্ন করছ, এতে কি হবে? এগুলো বেচাকেনা হবে আমাদের দোকানে। তুমি তুলা উৎপন্ন করছ, যদি তুলার গুটিগুলো পড়ে থাকে তাতে কি হয়? মিলে কাপড় তৈরি হয়ে আমাদের দোকানে এসে বিক্রি হবে। সুতরাং পৃথিবীকে আমরা রক্ষা করছি; তোমাদের দাবি ভুল। এ দু'দলের বিপরীতে একজন রাজনীতিবিদ বা একজন প্রশাসক বলেন– তোমাদের উভয়ের দাবি ভুল। দুনিয়াকে আমিই রক্ষা করছি। এজন্য যে, আমি দুনিয়াতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করছি। যদি আমি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা না করতাম তবে দুনিয়াতে সৃষ্টি হতো অরাজকতা। কৃষক ব্যবসায়ীকে এবং ব্যবসায়ী কৃষককে শেষ করে দিত। পুঁজিপতি শ্রমিকদের এবং শ্রমিকগণ পুঁজিপতিদেরকে নিঃশেষ করে দিত। ব্যবসায়ী কৃষকের ঘরে এবং কৃষক ব্যবসায়ীর দোকানে আক্রমণ করত। দুনিয়ায় দেখা দিত বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। আমি আমার ন্যায়নীতি ও শাসন দ্বারা সবকিছু ঠিক রেখেছি। আমি শাসকের আসনে বসে পৃথিবীকে রক্ষা করছি। কৃষক, ব্যবসায়ী এবং জমিদার কেউ-ই রক্ষা করছে না; বরং আমিই রক্ষা করছি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– তোমরা সবাই ভুল বলছ। পৃথিবীকে রক্ষাকারী হচ্ছে আমার নাম স্মরণকারীগণ। যে আমার যিকিরে নিমগ্ন থাকে, সে-ই দুনিয়াকে রক্ষা করছে। ব্যবসায়ী, কৃষক, জমিদার, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসক কেউ-ই নয়; বরং আমি এবং আমার নামের যিকিরকারীগণ পৃথিবীকে রক্ষা করছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আল্লাহর দাবি-ই সত্য, অন্য সকলেরই দাবি ভুল। একজন জমিদার যদি বলে ও দাবি করে– দুনিয়াকে আমিই রক্ষা করছি, তবে সে রক্ষা করেছে কখন? যদি কৃষকগণ সততা ও দিয়ানতদারির সাথে কাজ করে, অন্যের জমিতে হস্তক্ষেপ না করে, অন্যের এক ইঞ্চি জমিও জবর-দখল করে, অপরের শস্য জবরদস্তি নিয়ে আসে, তাহলে পরের দিনই তার বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের হবে। তখন তার জমিদারী কৃষিকর্ম কিছুই থাকবে না। পৃথিবীকেও রক্ষা করতে পারবে না। বোঝা গেলো, জমিদার যদি রক্ষা করে থাকে তবে তার সততা, সাধুতা ও সুবিচার দ্বারা রক্ষা করেছে। আর এসবই হলো আল্লাহর যিকির। তাহলে ফল দাঁড়াচ্ছে– যিকিরকারীগণ এই পৃথিবী রক্ষা করছে, দিয়ানতদার, সত্যবাদী ও সুবিচারকগণ রক্ষা করছেন। অসাধু, মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারীগণ নয়।

একজন ব্যবসায়ী যদি বলেন, 'আমি দুনিয়াকে রক্ষা করছি', সেক্ষেত্রে তার দাবি তখনই সঠিক হবে, যদি সে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, ব্যবসায়ী নীতি মেনে চলে, তার অন্তরে সজাগ অনুভব থাকে যে, আমার ক্রেতা ও গ্রাহকের যেন কোন ক্ষতি না হয়। এক মুহূর্তের জন্যও সে চায় না, গ্রাহকের চামড়া ছিলে রেখে দেব, তাকে নিঃস্ব করে দেব। এরূপ মন-মানসিকতা যেন তার না থাকে। সে বলে, গ্রাহক যদি আমার কাছ থেকে মাল ক্রয় করে তবে আমার কথা যেন তার স্মরণ থাকে। তাকে আমি উত্তম জিনিস দেব, ন্যায্যমূল্য রাখব, মাত্রাতিরিক্ত মূল্য রাখব না, ব্ল্যাক মার্কেটিং করব না; বরং সততার সাথে ন্যায্যমূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করব। এতে কোনরূপ ধোকাবাজি, প্রতারণা থাকবে না। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

غفر الله لرجل كان سهلا اذا اشترى سهلا واذا باع سهلا -

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী ব্যবসায়ীর জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বলেছেন– আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে মাফ করুন, ক্ষমা করুন, যে সহজ-সরলভাবে বিক্রি করে এবং সহজ-সরলভাবেই খরিদ করে। ইনসাফের সঙ্গে মূল্য নির্ধারণ করে। গ্রাহকদের সাথে সহজ-সরল ব্যবহার করে, কঠোর ব্যবহার না করে।

এমন করো না যে, দ্রব্যসামগ্রী কেনার সময় অল্পমূল্যে কিনবে, আর যখন বিক্রি করবে তখন ষাট গুণ অধিক দাম নিতে চাইবে। সর্বাবস্থায় নিজের জন্য মুনাফার প্রত্যাশী থাকে সে ব্যবসায়ী এমন নয়; বরং বেচার সময় উত্তম জিনিস প্রদান করে, মূল্য ও ন্যায্যমতে অল্প মুনাফা সাব্যস্ত করে। কেনার সময়ও মূল্য কম

দেয় না, বিক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। এ ব্যবসায়ী কে? তিনি হলেন সে ব্যক্তি, যিনি দীনকে সামনে রেখে ব্যবসা করছেন। ফলে ব্যবসা দুনিয়াকে রক্ষা করছে না; বরং সততা ও দিয়ানতদারী দুনিয়াকে রক্ষা করছে। যদি মিথ্যা, অসাধুতা ও নীতিগর্হিত পন্থায় ব্যবসা করে তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে হয়ত কিছুদিন কারবার চালু থাকবে, কিছু উন্নতি দৃষ্টিগোচর হবে, কিন্তু পরে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে তখন মূলধনও রক্ষা পাবে না, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অসাধুতা যদি থাকে, তবে দোকানই রক্ষা হবে না, দুনিয়াকে রক্ষা করবে কি? এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, ব্যবসায়ী দুনিয়াকে রক্ষা করছে না; বরং তার সততা ও সাধুতা দুনিয়াকে রক্ষা করছে। দিয়ানতদারীর মধ্যে পুনরায় আল্লাহর যিকির এসে গেল, কাজেই আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী যিকিরকারীগণ দুনিয়াকে রক্ষা করছেন, অন্য কেউই নন।

রাজ্যের শৃঙ্খলা দিয়ানত দ্বারা হয়, শাসন দ্বারা নয়

বিচারকের আসনে বসা জজ, শাসকের আসনে বসা প্রশাসক, নিশ্চয়ই তারা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্তু কখন? যখন তারা আদল ইনসাফ, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তারা যদি জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন করেন, সাধারণ মানুষ সকলকে একই দৃষ্টিতে না দেখেন, আপনজন ও অপরজনের মধ্যে পার্থক্য করেন, তবে সে দেশও ধ্বংস করবে– নিজেও ধ্বংস হবে, কিন্তু যদি আদল ইনসাফ-ন্যায়নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কুরআন পাকে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ানুগ ফয়সালা করো। সততার সাথে সুবিচার করো। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে যদি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও ফয়সালা হয়ে যায় তবে তা সহ্য করে নাও এবং হক ও সঠিক ফয়সালা করো, যদি তোমাদের পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয় তাতেও পরোয়া করো না। ইনসাফ করো, ন্যায়ানুগ ফয়সালা করো। [নিসা : ১৩৫]

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফতকালে নিজে একটি মামলা দায়ের করলেন। কাজী শুরায়হ তখন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মামলা ছিল এই– আমার একটি লৌহবর্ম, যা আমি যুদ্ধে ব্যবহার করতাম, অমুক ইহুদী তা জবর-দখল করে রেখেছে। সে দিতে চায় না। আলী (রা.)-এর দাবি ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

কাজী শুরায়হ খলিফাকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করলেন, অথচ তিনি খলিফার অধীনস্থ কর্মচারী। কিন্তু আদালত ন্যায় ইনসাফের স্থান। তা এত ঊর্ধ্বে যে, খলিফাকে (রাষ্ট্রপ্রধান)-ও আদালতে উপস্থিত হতে হবে। সাধারণ বাদী-বিবাদীর ন্যায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আদালতে এটা দেখা হবে না, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর জন্যে চেয়ার দিয়ে দাও। তাঁকে দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। রাষ্ট্রপ্রধানও যদি বাদী অথবা বিবাদী হয়ে আসেন, তবে তাঁকেও দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়, যেখানে সাধারণ বাদী-বিবাদীগণ দাঁড়িয়ে থাকে।

হযরত আলী (রা.)-এর নিকট সমন পৌঁছল। তিনি আদালতে উপস্থিত হলেন। ইহুদীকেও উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করা হলো। বাদী ও বিবাদী হিসেবে উভয়েই আদালতে উপস্থিত হলেন। একইভাবে উভয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। ইহুদীও দাঁড়ানো, রাষ্ট্রপ্রধানও দাঁড়ানো। রাষ্ট্রপ্রধানের মোকাবেলায় ইহুদীর কী মূল্য ও মর্যাদা ছিল? কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বিচারকের দৃষ্টিতে উভয়েই সমমর্যাদায় ছিলেন। তাই উভয়েই সমভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কাজী শুরায়েহ বাদীকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনার দাবি কি? আমিরুল মুমিনীন বাদী বললেন– আমার দাবি হলো– এই ব্যক্তি আমার লৌহবর্ম জবর-দখল করে রেখেছে। সে তা দিতে চায় না; অথচ লৌহবর্মটি আমার।

ইহুদী বলল– লৌহবর্ম তাঁর নয়। এটা আমার। অথচ হযরত আলী (রা.)-এর দাবি ছিল সত্য। প্রকৃতপক্ষে লৌহবর্মটি ইহুদীর ছিল না। কিন্তু কাজী শুরায়হ বাদীকে বললেন– কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে? বাদী বললেন, জি হ্যাঁ। তারপর একজন ক্রীতদাসকে এবং নিজের পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে পেশ করলেন সাক্ষীরূপে।

কাজী সাহেব বললেন– ছেলের সাক্ষ্য পিতার স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দু'সাক্ষী ব্যতীত দাবি প্রমাণিত হয় না। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে পেশ করুন। তিনি বললেন, অন্য কোন সাক্ষী আমার নেই। এ দু'জনই সাক্ষী ছিল, আমার ছেলে এবং আমার গোলাম। কাজী সাহেব বললেন– গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মাত্র

একজন। কাজেই আপনার পক্ষে রায় ও ডিক্রি দেয়া যায় না। কাজী সাহেব ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন যে, লৌহবর্ম তারই। সাক্ষীর অভাবে হযরত আলী (রা.) তা পেতে পারেন না। অথচ হযরত আলী (রা.)-এর দাবি সত্য ও সঠিক ছিল। কিন্তু তিনি আইনানুগ প্রমাণ পেশ করতে না পারায় রায় তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। এ ইনসাফের প্রতিক্রিয়া কি হলো?

ইহুদী তৎক্ষণাৎ সে স্থানে দাঁড়িয়ে বলল– 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

আন্তরিকভাবে সহীহ ঈমানের সাথে ইহুদী ইসলামে দাখিল হলো এবং বলল, যে ধর্মে এত আদল, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার রয়েছে যে, একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন সাধারণ দরিদ্র অমুসলিমকে একই দৃষ্টিতে দেখা হয় সে ধর্মই সত্য ধর্ম এবং আমি এ সত্যধর্ম স্বীকার করে নিলাম। ইহুদী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল আমার দাবি মিথ্যা। হযরত আলী (রা.) হলেন প্রকৃত দাবিদার। এই বলে সে লৌহবর্মটি দিয়ে দিল।

হযরত আলী (রা.) বললেন– এখন আমার লৌহবর্মের প্রয়োজন নেই। লৌহবর্মের এখন তুমিই মালিক, এটি তুমি নিয়ে যাও। তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ, আমার জন্য সব হয়ে গিয়েছে। একটি ন্যায়বিচার ও সততা কতজনকে উপকৃত করেছে! আমিরুল মুমিনীনের সততা প্রমাণিত হলো, ইহুদীর সত্য ধর্ম নসীব হলো, লৌহবর্ম সে পেয়ে গেল, ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও প্রকাশ পেল। একটি সততার কত রকত, কত উপকার প্রকাশ পেল! ব্যক্তিদ্বয় উপকৃত হলেন আলাদাভাবে, ধর্মের উপকার হলো আলাদাভাবে, ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পেল পৃথকভাবে।

কাজেই ইসলাম এটা চায় যে, বিচার ও বিচারকের আসনে বসে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সুবিচার করো– যদিও ফয়সালা তোমার বিরুদ্ধে হয়, নিজের সন্তানদের বিপক্ষে হয়, আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়, তবুও আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার হওয়া কর্তব্য।

একজন শাসক ও বিচারক যদি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তিনিই দুনিয়াকে রক্ষা করছেন। তবে হাকিম ও বিচারক নিজে রক্ষা করছেন না; বরং তার সততা, ন্যায়বিচার ও সাধুতাই রক্ষা করছে। এখানেও সেটা প্রমাণিত যে, যিকিরকারীগণই দুনিয়াকে রক্ষা করছেন। বিশ্বকে রক্ষাকারী জিনিস আল্লাহর যিকিরই, অন্য কিছু নয়। যদি কৃষক সমাজ, ব্যবসায়ীগণ সততা, সাধুতা ও দিয়ানতদারী ত্যাগ করে, যদি শাসক ও বিচারক দিয়ানত ও সাধুতা ত্যাগ করে,

যদি রাষ্ট্রপ্রধান দিয়ানত, সুবিচার বর্জন করে, তবে তারা সকলেই দুনিয়ার ধ্বংসের কারণ হবে। আর যদি সততা ও দিয়ানতদারীর সাথে কর্ম সম্পাদন করে, তবে বিশ্বের রক্ষাকারী তারাই হবেন। অতএব, বিশ্বকে দিয়ানত, আল্লাহর যিকির এবং আল্লাহর স্মরণই রক্ষা করছে, সামলিয়ে রাখছে।

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল। তিনি খলিফা এবং রাষ্ট্রপ্রধান তিনিই। হযরত উমর (রা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি এমনই ছিল যে, তাঁর নাম শুনলে বিশ্বের যে কোনো শাসকের পিত্ত পানি হয়ে যাওয়ার দশা। তাঁরই যুগে রোমের গভর্নর জাবালা ইবনে ইহাম ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসে হাজির। তারপর হজ সম্পাদনের জন্য মক্কায় গেলেন। তিনি যখন তাওয়াফ করছিলেন তখন ফাযারা গোত্রের একজন গ্রাম্য ব্যক্তিও তাওয়াফ করছিল। যারা হজ করেছেন তাঁরা জানেন মাতাফে (তাওয়াফের স্থান) অত্যন্ত ভীড় হয়। লাখ লাখ মানুষ একই সময় তাওয়াফ করে থাকেন। তখন ঠেলা-ধাক্কা লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য সেদিকে তখন কারো তেমন খেয়ালই হয় না। সকলে বুঝেন, সবাই আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। তাই ধাক্কা লেগে পড়ে গেলেও কেউ অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ভাবেন না, মোকাবেলা বা প্রতিঘাতও করেন না।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সেই ফাযারী ব্যক্তি যখন তাওয়াফ করছিল তখন জাবালা ইবনে ইহামও তাওয়াফে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় জাবালা ইবনে ইহামের লুঙ্গির উপর ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির পা পড়ে যায়। ফলে তাঁর লুঙ্গি খুলে যায়। তিনি ছিলেন তাঁর দেশের বাদশাহ। মুসলমান হয়ে এখানে এসে প্রবাসী। তখনও তার আবেগ ও মন-মানসিকতায় সে রাজকীয় ভাব অবশিষ্ট ছিল। তাঁর লুঙ্গির ওপর একজন গ্রাম্য লোক পা রাখবে, তার লুঙ্গি খুলে যাবে! এটা সহ্য হলো না তাঁর। সজোরে একটি থাপ্পড় মেরে দিলেন। এ আঘাতে গ্রাম্য ব্যক্তিটি ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জাবালা লুঙ্গি পরিধান করে তাওয়াফে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

গ্রাম্য ব্যক্তিটি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট গিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়ে বলল– আমাকে জাবালা অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মেরছে, প্রহার করেছে। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার লুঙ্গির ওপর পা রাখিনি। আর এর কোন বাস্তব কারণও থাকতে পারে না যে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন অপরজনের লুঙ্গির ওপর পা রাখবে। জনসমাগমের মধ্যে একজন অন্যজনের লুঙ্গি খুলে নিতে পারে কি? তাছাড়া আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার লুঙ্গির ওপর পা ফেলব, তা বিবেকেরও পরিপন্থী। অসৎ কোনো উদ্দেশ্যে পা দেব, তাও হয় না। মূলত হাজার হাজার মানুষের ভীড়ে ঠেলাঠেলির মধ্যে আমার পা পড়ে গেছে। এটা অনিচ্ছাকৃত, স্বেচ্ছায় করিনি। তবুও সে আমাকে সতর্ক করে দিতে পারত। আমাকে প্রহার করার

যৌক্তিক কারণ ছিল কি? এই দাবি করে বসলো গ্রাম্য লোকটি।

এবার হযরত উমর (রা.)-এর বিচারালয় থেকে জাবালা ইবনে ইহামের নামে সমন জারি হলো আদালতে হাজির হওয়ার জন্য। জাবালা হাজির হলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন– তুমি তাকে প্রহার করলে কেন? তিনি উত্তর করলেন– এ ব্যক্তি আমার লুঙ্গির ওপর পা রেখেছিল। হযরত উমর (রা.) বললেন– লুঙ্গির ওপর পা রেখেছে ঠিকই, কিন্তু সেখানকার অবস্থাই এমন ছিল যে, স্বেচ্ছায় কেউ এমন কাজ করবে না, এমনটি হয়ে যায়। অতএব, তোমার থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই গ্রাম্য লোকটি সমপরিমাণ শক্তিতে তোমাকে প্রহার করবে অথবা তুমি টাকা-পয়সা দিয়ে ফিদিয়া (পণ) আদায় করো। সে যে আঘাত পেয়েছে, তার পরিবর্তে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দাও। জাবালা বিস্মিত হয়ে বললেন, বাদশাহ এবং গ্রাম্য লোক সমান হয়ে গেল?

হযরত উমর (রা.) বললেন– ইসলামে সবাই সমান। এখানে কোন প্রকার উঁচু-নীচুর ভেদ নেই। বিশেষ করে আল্লাহর ঘরে একজন আমীর (প্রধান) ও একজন গ্রাম্য লোক সমান। একই কাতারে বাদশাহ এবং তার ক্রীতদাস দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে কোন ভেদাভেদ ও পার্থক্য নেই।

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে মাহমুদ (বাদশাহ) ও আয়া (ক্রীতদাস), কেউ গোলাম থাকেনি, কেউ গোলামের প্রতিপালকও থাকেনি।

এখানে সবাই বান্দা– সবাই দাস, প্রভু নয় কেউ। প্রভু একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি নিজ বান্দাদের প্রতিপালন করেন। এ দরবারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং গ্রাম্য লোক সবাই সমান, সমপর্যায়ের। বাদশাহ-ফকির একই স্তরের।

এ কথাগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হলো। এই ধর্মে সব শ্রেণীর মানুষকে একই লাঠি দিয়ে পরিচালনা করা হয়! তাই রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলেন এবং ইসলাম ত্যাগ করলেন। পুনরায় যথারীতি খৃষ্টান হয়ে গেলেন। তা দেখে খৃষ্টানরা আনন্দ-উল্লাস করল। তিনি হারানো রাজত্ব ফিরে পেলেন– রাজসিংহাসনে বসে গেলেন। বাদশাহ ফিরে আসায় প্রজাসাধারণ আনন্দ-উৎসব করল। আগের ধর্মও গ্রহণ করেছেন। যাক, ইসলাম এসবের পরোয়া করেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন– একজন সাহাবী (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে

ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলেন। জাবালা তা জানতে পেরে ঐ সাহাবী (রা.)কে ডেকে পাঠান। তিনি তো মুসলমান হয়েছিলেন, তাই ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান ও ধারণা ছিল। সাহাবী গিয়ে হাজির হলেন। জাবালা বললেন– আপনি কি জানেন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এক গ্রাম্য ফযারী ব্যক্তির সাথে আমার মামলা হলো। আমি একথা বলে চলে আসি যে, বাদশাহ এবং গ্রাম্য ব্যক্তি সমান হতে পারে না। কিন্তু আসার পর আমি দেখছি, আজ পর্যন্ত আমি শান্তি পাইনি– সান্ত্বনা পাইনি। সত্য কথা সেটাই ছিল যা হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন। সত্য সঠিক ধর্ম ইসলামই। আমি এতে লজ্জিত, অনুতপ্ত যে বেদীন হয়ে গেলাম। আমি পার্থিব রাজত্ব পুনরায় পেয়ে গেছি সত্য কিন্তু আমার অন্তরে সুখ-শান্তি নেই। আমার মন চায়, আমি পুনরায় মুসলমান হয়ে যাই। কিন্তু আমি তো বাদশাহ, তাই আমার সম্মান ও পদমর্যাদা বহাল রাখতে চাই। যদি এমন কোন উপায় বের করা যেতো যে, আমি সমাজে বলতে পারি যে, আমি মুসলমান হয়েছি এটা কোন বড় কথা নয়, আমি এই নেয়ামতও লাভ করেছি।

আর নেয়ামত এমন হতে পারে– আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) তাঁর কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন। যদি তিনি এ ওয়াদা করেন, তবে আমি এটাকে উসিলা করে মুসলমান হয়ে যাব। পরে তিনি শাদী দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা আমিও অস্বীকার করে দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার জন্য একটা কৌশল হয়ে গেল। আমি আমার নিজ জাতিকে বলব– আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর মত বাদশাহ, যাঁকে বিশ্বের সকল রাজা-বাদশাহ ভয় পান, তিনি যখন তাঁর কন্যা দান করেছেন, তখন এ রাজত্বের চেয়ে তাঁর কন্যাই আমার জন্য অধিক সম্মানের। কাজেই আমি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম।

সাহাবী বললেন– আমি আমিরুল মুমিনীনের নিকট আলোচনা করব, তারপর এসে আপনাকে জানাব।

তিনি ফিরে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আরয করলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন– তুমি ওয়াদা করে আসলে না কেন? উমরের মেয়ে ইসলামের মোকাবিলায় কোনো জিনিস হলো? যদি একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং উমর (রা.)-এর মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়, তবে ঐ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের তুলনায় আমার মেয়ের কোন মূল্যই নেই। তোমার ওয়াদা করে নেয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, আমি ওয়াদা করলাম।

সাহাবী বললেন– আমিরুল মুমিনীন! আমি ভয় করছিলাম, আমি কেমন করে ওয়াদা করব?

তিনি বললেন– ঠিক আছে, অনতিবিলম্বে ইস্তাম্বুল সফর করো এবং তাকে বদ উমরের কন্যা প্রস্তুত। সাহাবী গেলেন। যখন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করলেন, তখন জাবালা ইবনে ইহামের জানাযা বের হচ্ছিল। ভাগ্যে তার ইসলাম ছিল না। ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু ভাগ্যে ছিল না। সাহাবী (রা.) ফিরে আসলেন।

আমি এ কথা বলছিলাম, বিচারালয়ের বিচারক যখন বাদশাহ ও ক্রীতদাসকে ফকির, দরিদ্র, চাকর, নওকর ও তাদের মালিককে বিচারকের আসনে বসে একই দৃষ্টিতে দেখবেন, এই নীতি পালন করবেন, তাহলে এটাই হলো প্রকৃত দীন ও দিয়ানত। একজন বিচারক বিচারকের আসনে বসে, একজন প্রশাসক শাসনের আসনে বসে বিশ্বকে রক্ষা করেন এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ শান্তি ও শৃঙ্খলা তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যখন দীন ও দিয়ানতের নীতিগুলো পালিত হয়। আর দীন ও দিয়ানতের নীতিসমূহ পালন করার অর্থই হলো আল্লাহর যিকির। বুঝা গেল, দুনিয়া আল্লাহর যিকিরে টিকে আছে, শাসনে নয়। যিকির দ্বারা রক্ষা পাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নয়। যিকিরুল্লাহ দ্বারা রক্ষা পাচ্ছে, কৃষিকাজ ও চাষাবাদে নয়।

অতএব, আল্লাহ তায়ালার কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। দুনিয়াকে তারাই রক্ষা করছেন, যারা আল্লাহর যিকির করছেন। অন্য কেউ রক্ষা করছেন না। অন্য যারা দাবি করছেন, তারা ব্যবসায়ী হোক, কৃষক হোক, প্রশাসক হোক, রাজনীতিবিদ হোক তাদের দাবি ভুল। দুনিয়াকে রক্ষা করছেন আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারীগণ।

দেহের ওপর রাজত্ব করেন দুনিয়ার বাদশাহগণ আর কলবের ওপর রাজত্ব করেন আল্লাহওয়ালাগণ

দৃশ্যত আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারী নিরীহ ব্যক্তির সমাজে কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। তাদের কোন সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর নেই। অথচ তাদের সর্ববৃহৎ সৈন্যবাহিনী হলো আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাওয়াই তাদের সর্বোত্তম শক্তি। মাওলানা যামী (রহ.) এক জায়গায় বলেছেন–

ببس حقیر گداپان عشق راکس قوم

شاہان بے کمر وخسدوان بے کلاہ اند

যারা আল্লাহ আল্লাহ যিকির করে, তারা আল্লাহর আশেক।

আল্লাহপ্রেমে মত্ত ব্যক্তিদের তুচ্ছ মনে করো না। তারা ধনাগার, সম্পদ ও মুকুটবিহীন বাদশাহর দল।

যারা আল্লাহ আল্লাহ করছেন, তাঁরা আল্লাহপ্রেমিক ও আশেকের দল। তাঁদেরকে অবজ্ঞা ও অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখো না। যদিও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, পুরাতন, ছেঁড়াফাঁড়া। তাঁদের অধিকারে কোন প্রাসাদ বা বাংলো নেই, দাস-দাসী নেই, কুড়েঘরে বাস করেন তাঁরা। তাঁদেরকে অবজ্ঞা করো না, হেয় ও তুচ্ছ মনে করো না। তাঁরা বাদশাহ, যদিও মাথায় রাজমুকুট নেই, লক্ষ লক্ষ টাকার পুটকা (থলি) তাঁদের বাঁধা নেই। এরা মুকুটবিহীন বাদশাহ। পার্থক্য এটুকু– মুকুটধারী বাদশাহগণ দেহের ওপর রাজত্ব করেন, আর তাঁরা আত্মার ওপর রাজত্ব করেন। কোন কোন সময় মানুষ বাধ্য হয়ে, অপারগ হয়ে রাজার রাজত্ব মেনে নেয়। আর অন্তরে তার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না। অন্তর থেকে অভিশাপ করতে থাকে। অথচ আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব আত্মার ওপর থাকে। মানুষ যদি একাকী নির্জনেও থাকে তবুও অসম্মানসূচক শব্দে তাঁদের নাম উচ্চারণ করে না। এ-ই হলো প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা যা নির্জনে থাকলেও অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মান পূর্ণমাত্রায় থাকে আবার জনসমাবেশে আসলেও বিদ্যমান থাকে। অপর দিকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জনসমাবেশে থাকে। কেননা প্রত্যেকের অন্তরে এ আশঙ্কা থাকে, যদি আমি কোন গোস্তাখী করি, তবে পুলিশ এসে ঘাড় ভেঙ্গে দেবে, কারাগারে যেতে হবে– এ ভয়ে মানুষ বাদশাহর সম্মান করে। আর একাকী নির্জনে বসে অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের সামনে ও পেছনে কিংবা একাকী নির্জনেও গোস্তাখী করে না। মানুষ বুঝে, এতে আমার পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালাগণ না থাকলেও তাঁদের রাজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে

আল্লাহওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁদের বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। তাঁরা কেবল চোখের আড়াল নয়, দুনিয়া ত্যাগ করে পরপারে চলে গেলেও তাঁদেরকে সম্মান করা হয়, শ্রদ্ধা করা হয়। হযরত উমর (রা.)-এর নাম উচ্চারিত হলে শ্রদ্ধায় অন্তর ভরে যায়। আমরা বলি 'রাদিআল্লাহু আনহু'– আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আজও ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নাম শোনলে আমরা শ্রদ্ধায় নত হই এবং 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি আযমাঈন' বলি। আল্লাহ তাঁদের কবরকে নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিন।

তাঁদের প্রতি এমনই ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নাম নিয়ে কেউ গোস্তাখী করে, তবে আপনারা জান কুরবান করার জন্য তৈরি হয়ে যাবেন। তা সহ্য করবেন না। অথচ তাঁদের কেউ-ই আজ পৃথিবীতে নেই। তাঁদের ভক্তদের এই অবস্থা। তাঁদের রাজত্ব সবাই মেনে নিয়েছেন। এই সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি কিসের? তাঁদের মধ্যে কারো নিকট ধনাগার, রাজমুকুট, রাজপোশাক ছিল না। ছিল শুধু আল্লাহর দরবারে মকবুলিয়াত। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর মকবুল বান্দা। এরই বরকত রয়েছে মানুষের অন্তরে। তাঁদের ঐসব মহত্ত্বের কারণে আজো আপনি শ্রদ্ধাবনত হয়ে যান। তাঁদের রাজত্ব ছিল আত্মার ওপর। আর এমন রাজত্ব যে, তাঁরা দুনিয়াতে নেই অথচ তাঁদের রাজত্ব সুরক্ষিত।

মি. আরনল্ড স্যার সৈয়দের সময় আলীগড় ভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। প্রিচিং অব ইসলাম (চৎবধপযরহম ড়ভ ওংষধস) নামে তিনি একটি বই রচনা করেন। ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের দু'টি যুগ তিনি দেখিয়েছেন। ইসলাম বিশ্বে কিভাবে প্রসার ও বিস্তার লাভ করেছে, আরব, ভারত এবং চীনদেশে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল ইসলামের রীতিনীতি, আদব এবং ইসলাম প্রচারকারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, চরম ত্যাগ, সীমাহীন কষ্ট– এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি একটি বিস্ময়কর কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন– আমি হিন্দুস্থানে একটি বিস্ময়কর বিষয় লক্ষ করেছি, যা বিশ্বের অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। অবশ্য তিনি হয়তো দেখেননি, এটা অন্যত্রও রয়েছে– তিনি কেবল হিন্দুস্থানেই দেখেছেন। কথাটা হচ্ছে এই– আমি আজমীর গেলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি কবরে শোয়ে থেকে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের ওপর রাজত্ব করছে। তার নাম হলো 'সুলতানুল হিন্দ'– হিন্দুস্থানের বাদশাহ। অর্থাৎ হযরত খাজা আজমিরী (রহ.)। তাঁকে আমিরুল হিন্দ, ইমামুল হিন্দ, সুলতানুল হিন্দ বলা হয়। এজন্য যে, হযরত খাজা আজমিরী (রহ.) হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচার করেছেন। একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে বসে পড়েছেন। হিন্দু-মুসলমান, অন্যান্য অমুসলিম সবাই তাঁর দরবারে হাজির হতেন, ভক্তি সহকারে বসতেন, তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত সত্য কথা শোনতেন। তাঁর দিয়ানত ও সততা, কারবারে পরিচ্ছন্নতা, আল্লাহপ্রেম দেখে দেখে আত্মা প্রভাবিত হতো। ফলে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। আরনল্ড লিখেছেন– হযরত খাজা সাহেবের হাতে প্রত্যক্ষভাবে নিরানব্বই লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ প্রায় এক কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছেন। তাঁর খলিফাদের হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা আলাদা। খাজা সাহেব যাদেরকে নিজ হাতে ইসলামে

দীক্ষিত করেছেন, তাদের সংখ্যা হলো নিরানব্বই লাখ। তাছাড়া এদের হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা ভিন্ন। তিনি লিখেন– আমি আজমিরে এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখলাম। এক লোক কবরে শায়িত এবং বাদশাহ সেজে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসন দখল করে রেখেছেন। সকলের অন্তর ও আত্মার ওপর তিনি রাজত্ব করছেন। মানুষ আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য তাঁর সমাধিস্থলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে কোন কোন অজ্ঞ-মূর্খ মানুষ শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে সম্মান যখন শরীয়তের বরখেলাফ হবে, তখন তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কেউ কেউ তাওয়াফ ও সেজদা করে বসে। উদ্দেশ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা হলেও তরীকা ও পন্থা ভুল গ্রহণ করেছে। আরেক দল ফাতেহা পাঠ করেন। ফয়য হাসিল করেন। শরীয়তের অনুগতও থাকেন। শরীয়তের অনুসরণ ও বিরুদ্ধাচরণ নিজ নিজ স্থানে রয়েছে; তবে ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে সবার অন্তরে। সবাই হাজির হন ভক্তির সাথে। খাজা সাহেব (রহ.) এ জগতে নেই, অথচ আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হই। তাঁর জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করা হতো, কবরেও সে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর কারণ কি? এটাই তো, যেহেতু তাঁদের রাজত্ব আত্মার ওপর রয়েছে। আল্লাহওয়ালাগণ আত্মা ও হৃদয়ের বাদশাহ হন। অপর দিকে দুনিয়ার বাদশাহগণ দেহের, পাহাড়-পর্বত ও মাটি-পাথরের বাদশাহ হয়ে থাকেন। হৃদয়ে-অন্তরে তাদের রাজত্ব, তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে না। মানুষ মনে মনে কামনা করে এদের শাসন ক্ষমতা শেষ হয়ে যাক, আমরা স্বাধীন হয়ে যাই। আর আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্কে আন্তরিকভাবে কামনা করে– তাঁদের রাজত্ব আরো মজবুত, স্থায়ী ও সুদৃঢ় হোক। তাঁদের প্রেম ও ভালোবাসায় যদি আমরা ফানা হয়ে যেতে পারি, তবেই আমরা সফলকাম হবো। আমাদের ইহজগত-পরজগত উভয় জগতই সুন্দর হয়ে যাবে। মাওলানা জামী (রহ.) বলেন–

بیبس حقیر گرمدایان عشق را کیں قوم

شان بے کمر و خسروان بے کلاہ اند

আল্লাহর ইশক ও প্রেমে মত্তগণকে তুচ্ছ মনে করো না; তারা
ধনাগার ও রাজ মুকুটহীন বাদশাহের দল।

আল্লাহওয়ালাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো না। তাঁরা মুকুটহীন বাদশাহ। দুনিয়াতে থাকাকালীনও, দুনিয়া ত্যাগ করে যাওয়ার পরও। সমগ্র দুনিয়া তাঁদের

প্রজার অন্তর্ভুক্ত। নবী (আ.)গণের নাম উচ্চারিত হলে আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'আলাইহিস সালাম' বলি, দরূদ ও সালাম পাঠ করি, তাঁদের সাহাবীদের নাম উচ্চারিত হলে 'রাদিআল্লাহু আনহু' বলি। তাঁদের উত্তরসূরীদের নাম আসলে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলি, কোন ওলী বা কোন মুমিনের নাম আসলে 'মরহুম ও মগফুর' বলি। এক কথায় দোয়ার সাথে স্মরণ করি। তাঁদের মহব্বত ও ভালোবাসায় অন্তর গলে যায়। বুঝা গেল, এই মনীষীদের ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেন রয়েছে? এ কারণে যে, তাঁদের অন্তরে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ ছিল। আল্লাহর যিকির তাদেরকে এমন করেছে। যেমন- হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اذا راو اذكر الله

আল্লাহওয়ালাদের মাহাত্ম্য হলো– যখন আল্লাহর যিকির উচ্চারিত হয়, তখন তাদেরও আলোচনা হতে থাকে। যখন তাদের আলোচনা হতে থাকে তখন আল্লাহরও যিকির হয়।

خاصان خدا خدا نه باشند-

لیکن از خدا جدا نه باشند-

আল্লাহর খাস বান্দাগণ আল্লাহর সমতুল্য কখনই নন; তবে তাঁরা আল্লাহ থেকে পৃথকও নন।

আল্লাহওয়ালাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা মূলত আল্লাহর যিকিরের কারণেই। আল্লাহ তায়ালার যিকির দ্বারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কার্যত আল্লাহ তায়ালার যিকিরই সবচেয়ে বড় সালতানাত। এ সালতানাত যদি এসে যায়, তখন তাঁদের হুকুমাত কলবের ওপর কায়েম হয়ে যায়। আম্বিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা আল্লাহর যিকিরের কারণেই হয়।

আল্লাহওয়ালাদের দুনিয়াকে পদাঘাত করার কারণ

আল্লাহওয়ালাদের কাছে এমন কোন সম্পদ নিশ্চয়ই রয়েছে যে কারণে তারা দুনিয়ার সম্পদকে পদাঘাত করেন। তাঁদের নিকট দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব কিংবা তার ঐশ্বর্য, শান-শওকত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজ-সিংহাসন, রাজমুকুট, প্রাসাদ, বাংলো এসবের কোন মূল্য বা মর্যাদা নেই। সমগ্র দুনিয়া তারা প্রত্যাখ্যান

করেন– পদাঘাত করেন। কারণ, তাদের কাছে আরও বড় কোন বস্তু রয়েছে। এ কারণে তারা অবজ্ঞাভরে দুনিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। মা'আয আল্লাহ! তারা তো কেউ একেবারে উম্মাদ নন যে, সমগ্র দুনিয়া পদাঘাত করবেন। বরং দুনিয়ার চেয়ে উত্তম সাম্রাজ্য তাঁদেরকে দান করা হয়। সেটা এসে যাবার পর সমগ্র দুনিয়াটাই তাঁদের চোখে তুচ্ছ-মূল্যহীন হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেন বটে কিন্তু এর কোন মূল্য, এর প্রতি তাদের অন্তরে কোন মোহ থাকে না। এ কারণে যে, এর চেয়ে অধিক মূল্যবান ও উত্তম বস্তু তাদের কাছে রয়েছে– যা তাদের অন্তরে।

গাওসুল আযম হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর খানকায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হতো। তাঁর খানকা শরীফে আল্লাহর যিকির করার জন্য একেক ওয়াক্তে দশ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হতো। লঙ্গরখানা হতে খাবার ভাগ করে দেয়া হতো। সনজর রাজ্যের বাদশাহও হযরত জিলানী (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন। সনজর খুরাসানের অন্তর্গত এক বিশাল রাজ্য। সে দেশের একটি প্রদেশ ছিল, যাকে নিমরোজ বলা হতো। নিমরোজ প্রদেশও সনজর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত শায়খের খানকায় হাজার হাজার মানুষের মেহমানদারী করা হয় দেখে বাদশাহ চিন্তা করলেন, হযরতের কাছে টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই। তাহলে কিভাবে তিনি এত লোকের আদর আপ্যায়ন করেন? বাদশাহ সম্পূর্ণ নিমরোজ প্রদেশ হযরতের নামে হেবা করে দানপত্র লিখে পাঠালেন। দানপত্রে লেখা ছিল– সমগ্র প্রদেশ আপনার খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলাম। এর বার্ষিক আমদানী লাখ লাখ টাকা। তা আপনার মেহমানদের আদর-আপ্যায়নে কাজে দেবে। হয়তো আপনার অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তাই এ সমগ্র প্রদেশ ও সম্পত্তি গ্রহণ করুন।

সুবহানাল্লাহ! হযরত শায়খ উত্তর দিলেন। সনজরের বাদশাহর দেয়া কাগজের অপর পৃষ্ঠায় উত্তরস্বরূপ দু'টি কবিতা লিখে পাঠালেন। সনজরাধিপতির 'চতর' যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার ভাগ্য যেন অন্ধকার হয়ে যায়– আমার অন্তরে যদি থাকে সনজরের রাজত্বের মোহ ও লোভ।

چوں چتر سنجری رخ بختم ختم سیاہ یادے

دردل بود اگر ہوس ملک نجم

মোদ্দাকথা, সনজরের বাদশাহর যে 'চতর' রয়েছে– বাদশাহর মুকুটের পেছন দিকে কারো একটি পট্টি থাকে– যাকে চতর বলা হয়। যেন কালোর ভেতর

বাদশাহর উজ্জ্বল চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এটা হলো মহত্ত্ব ও সম্মানের লক্ষণ। মাথায় মুকুট থাকবে, এর পেছনে থাকবে চতর। এতে স্বর্ণের কারুকার্য থাকে। ঐ চতরটি কালো রঙের থাকে। হযরত শায়ক লিখলেন– সনজরের বাদশাহর 'চতর' যেমন কালো– আমার ভাগ্যও তদ্রূপ কালো, অন্ধকার হয়ে যাক। সেটা কখন? যদি আমার অন্তরে সনজর রাজ্যের প্রতি সামান্যতম লোভ ও মোহ সৃষ্টি হয়ে থাকে– আমি হতভাগা দুর্ভাগা হয়ে যাই। আমার অন্তরে সামান্যতম মোহও নেই।

লোভ ও মোহ কেন নেই? তার কারণ ও উত্তর পরবর্তী কবিতায় দিয়েছেন। বলেন–

زانگر یافتم خبراز ملک نیم شب

من ملک روز بیک جو نمی خرم-

যখন থেকে আমি মধ্যরাতের রাজত্বের সংবাদ পেয়েছি, তখন থেকে আমি নিমরোজের রাজ্যকে একদানা যব দিয়েও ক্রয় করব না।

এর প্রতি আমার কোন আগ্রহ আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। নিমশব (মধ্যরাত)-এর রাজ্য কি? অর্থাৎ মধ্যরাতে উঠে জাগ্রত হয়ে সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত নামায আদায় করি। এই যে সাম্রাজ্য আমি পেয়েছি; এর বিনিময়ে নিমরোজের রাজ্যকে একদানা যব দিয়েও খরিদ করব না। একটি যবের দানা পরিমাণ মূল্যও এর নেই আমার নিকট। নিমশবের (মধ্যরাত) রাজত্ব আমার রয়েছে– নিমরোজের রাজত্বের কোন প্রয়োজন আমার নেই। অর্ধের রাতের রাজ্য লাভ করেছি– অর্ধেক দিনের রাজ্যের কোন প্রয়োজন নেই।

خلیل اسادر ملک یقیں زن

ذوائے لاالاحب الافلیں زن

হযরত ইবরাহীম (আ.) চন্দ্র-সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখে বলেছিলেন– এদের আমি পছন্দ করি না। এরা উদিত হয়– অস্ত যায়। এদের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই, সম্পর্ক নেই।

আমার মহব্বত ও ভালোবাসা ঐ মহান সত্তার সাথে, যে সত্তা সর্বদা উদীয়মান। তার কোন অস্ত ও অস্তিত্বহীনতা নেই। অস্তগামী বস্তুর প্রতি আমার কোনরূপ

ভালোবাসা নেই। এ কারণেই অস্থায়ী জিনিসের কোন প্রকার মূল্য ও মর্যাদা ওলীগণের কাছে থাকে না।

আমি বলছিলাম ওলীগণ সমগ্র দুনিয়ার ওপর পদাঘাত করেন। হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) একটি প্রদেশকে অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন– আমার অন্তরে যদি সামান্যতম আগ্রহ ও ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে আমি যেন হতভাগা-দুর্ভাগা হয়ে যাই। সনজর রাজ্যের কোন প্রয়োজন আমার নেই। এর কারণ ছিল এই– তাঁদের নিকট অন্য রাজত্ব ছিল, যা এ রাজ্য হতে অনেক বিশাল। যখন বৃহৎ রাজ্য লাভ হয়, হাতে এসে যায়, তখন ছোট রাজ্যের কি প্রয়োজন?

আল্লাহওয়ালাদের রাজত্বের বিশালতা

শীর্ষস্থানীয় ওলীদের একজন ছিলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)। একদিন তাঁর মুখ দিয়ে এমন একটি কথা বের হয়ে পড়ল, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মারাত্মক। তিনি যখন আল্লাহপ্রেমে বিভোর হয়ে পড়লেন, মারেফতের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন, তখন 'প্রেমে মত্ত' অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হলো– 'আমার রাজ্য আল্লাহর রাজ্য হতে অনেক অনেক বড়।' এ কথা শুনে মুরীদগণ নিশ্চুপ পেরেশান। শায়খের যখন হুঁশ হলো এবং তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন তখন মুরীদগণ আরয করলেন– হযরত! আজ আপনার মুখ দিয়ে কুফরি কথা বের হয়েছে!

তিনি বললেন– কুফরি কথা!

মুরীদগণ বললেন– জি হ্যাঁ!

তিনি বললেন– তাহলে তোমরা আমাকে সাজা দাওনি কেন? কুফরি কথা তোমরা সহ্য করলে কেমন করে? সাথে সাথে সাজা দেয়া উচিত ছিল। আর যদি কখনো কুফরি কথা বের হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সাজা দেবে। এমন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তৎক্ষণাৎ সতর্ক করা উচিত, সাবধান করা উচিত।

মুরীদগণ নীরব হয়ে গেল। দু'চার দিন পর আবার ঐ মত্ততা দেখা দিল এবং ঐ বাক্য আবারও উচ্চারণ করলেন– 'আমার রাজ্য আল্লাহর রাজ্য হতে বৃহৎ ও বিরাট।' এবার মুরীদগণ প্রস্তুতই ছিলেন। শায়খের আদেশও ছিল। তাই চাবুক নিয়ে সবাই শায়খকে প্রহার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শায়খ যে মাকামে অবস্থান করছিলেন, চাবুকাঘাত তাঁর ওপর একটিও পতিত হয়নি। যত প্রহারই

করল সব আঘাতই পড়ল তাদের দেহে, তাদের কোমরে। শায়খের আদেশের কারণে তারা প্রহার করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু প্রহারের সাথে সাথে আঘাত ও ব্যথা পাচ্ছিল তাঁরা নিজেরাই। আঘাতের পর আঘাতে তারা সবাই রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। শায়খের কিন্তু কিছুই হলো না। যখন তারা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং সকলের শরীর হতে রক্ত ঝরতে শুরু করল, সে মুহূর্তে শায়খ মত্ততামুক্ত হলেন। ফিরে পেলেন পার্থিব জ্ঞান। তখন দেখতে পেলেন উপস্থিত সবাই অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? তোমাদের ওপর এ বিপদ আসল কেন? মুরীদগণ আরয করল– হুযুর! আপনার আদেশ ছিল যে, কোন কুফরি কথা আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে আমাকে প্রহার করবে। আমরা প্রহার করতে লাগলাম, কিন্তু আঘাত লাগল আমাদের শরীরে। শায়েখ (রহ.)-এর দেহে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

শায়খ বললেন, ঐ বাক্যটি কি যাকে তোমরা কুফরি কথা মনে করেছিলে? একজন আরয করল– হযরত! আপনার মুখ দিয়ে এ বাক্য বের হয়েছিল– 'আমার রাজ্য আল্লাহর রাজ্য হতে অনেক বড়।'

হযরত বললেন– বোকার দল! এটা কুফরি কথা হলো কেমন করে? এটা তো ঈমানের কথা। এটা যদি তোমরা বুঝতে না পার তাহলে এর কোন ওষুধ ও চিকিৎসা আমার নিকট নেই। তোমরা বোঝার জন্য চেষ্টাও করোনি, শুধু শব্দাবলী শুনেছ। এ বাক্য তো ঈমান ও তাওহিদের বাক্য। তারা বলল– হযরত! এ বাক্য ঈমান ও তাওহিদের বাক্য হলো কেমন করে যে, আপনার রাজ্য আল্লাহর রাজ্য হতে অনেক বড়।

ولذكر الله اكبر - ورضوان من الله اكبر -

হযরত বললেন– এর অর্থ বুঝে নাও। বলো দেখি, আল্লাহর রাজ্য কি এবং কোথায়? আল্লাহর রাজ্য আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, আমি-তুমি এসবই হলো আল্লাহর রাজ্য। আর আমার রাজ্য কি? আল্লাহর অনেক যাত (মূল সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী)। এসবের মধ্যেই আমি সায়ের করি, ভ্রমণ করি– এগুলোর মধ্যে উরূজ করি, আরোহণ করি। দিন-রাত আল্লাহর যাত ও সিফাত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকি। তাই আমার রাজ্য হলো আল্লাহর যাত। আর আল্লাহর রাজ্য হলো আমার সত্তা। এবার বল দেখি, আমার রাজ্য বড় না আল্লাহর রাজ্য? মূলত তারা যাই বলবেন, তা ঈমানই হবে। আমরা এক কথা (আমাদের বিবেক অনুযায়ী) বললেও কুফর হয়ে যাবে। এখন এর ওষুধ কি? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ বাক্য ছিল, কুফুরি বাক্য। কিন্তু শায়খ বললেন– এটা হলো প্রকৃত ঈমান।

আমার রাজ্য হলো আল্লাহর যাত ও সিফাত। কাজেই আমার রাজ্যের তুলনায় সমস্ত বিশ্বের কোন হাকীকত আছে কি? কাজেই আমার রাজ্যই বড়।

বিষয় আমি আরয করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো– যারা এ রাজ্য লাভ করতে পেরেছেন তারা এ (পার্থিব) রাজ্যের লোভ কেন করবে? যারা এ দৌলত ও সালতানাত লাভ করেছেন; আল্লাহর যাত ও সিফাত সায়ের ও ভ্রমণ করে, ঊর্ধ্বারোহণ করে, যাত ও সিফাতের রহস্যাবলী তাঁদের নিকট প্রকাশ হতে তাকে। ইলম ও মারেফত, জ্ঞান ও মাআরিফের নব নব দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন তারা এ বিশ্বের প্রতি চোখ তুলেও তাকান না। এ দুনিয়া তো দুনিয়া। তারা চন্দ্র ও সূর্যকেও গুরুত্ব দেন না। ওসবেরও কোন গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদা তাদের নিকট থাকে না।

আল্লাহর নাম ছাড়া বিশাল থেকে বিশাল সৃষ্টিরও কোন মূল্য নেই

এটা কবির কল্পনা নয়; বরং এ হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সমগ্র আরবে তাঁর দুশমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তারা বলতে লাগল, আমাদের মূর্তিগুলোকে মন্দ বলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীনের প্রচারক ছিলেন। কারও দোস্ত-দুশমনীর ব্যাপারে তিনি চিন্তিত ছিলেন না; বরং তিনি দীন প্রচার করতে থাকলেন। আবু তালেব ছিলেন তাঁর আপন চাচা। তিনি নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর অটল থাকলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য-সহায়তা করতেন। সমাজপতিরা একত্রিত হয়ে আবু তালেবের কাছে এসে বলল,. হে আবু তালেব! তোমার ভাতিজা আমাদের পেরেশান করে তুলেছেন। তিনি আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চান। তিনি নতুন ধর্ম প্রচার করছেন। আমরা তা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের দুর্বলতা হলো, তুমি তাঁর সাহায্যকারী। অথচ তুমি আমাদের প্রধানদের প্রধান। এ ব্যাপারে তোমাকেই মাধ্যম ঠিক করলাম। তুমি আমাদের পক্ষ থেকে একবার তোমার ভাতিজার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করো দেখ, তিনি কি চান? তিনি যা চান তা-ই আমরা তাকে দেবো। কিন্তুঐ কালেমার প্রচার থেকে যেন বিরত থাকেন। তুমি একবার তাঁর সাথে কথা পরিষ্কার করে নাও, যেন পরে আমরা দোষী সাব্যস্ত না হই। ইচ্ছে করলে আমরাও স্বাধীন হয়ে যেতে পারি এবং আমরা যা ইচ্ছে তা করতে পারি। তিনিও

তাঁর যা ইচ্ছা তা করবেন। কিন্তু তুমি তো মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছো। শুধুমাত্র তোমার কারণেই আমরা অপারগ হয়ে পড়ি।

আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন– হে আমার ভাতিজা! তোমার স্বজাতি প্রধানগণ আমার নিকট এসেছিল। তারা জানতে চাইছে, তোমার উদ্দেশ্য কি? তোমার স্বজাতি এ কথাও বলেছে– তোমার উদ্দেশ্য যদি ধন-দৌলত হয়ে থাকে, তবে সারা দেশের ধন-দৌলত একত্রিত করে তোমার পদতলে ঢেলে দেবে। এখন থেকে তুমি হবে এসব ধন-দৌলতের মালিক, তারা হবে তোমার অধীন। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য সুন্দরী লাবণ্যময়ী রমণী হয়ে থাকে, তবে হেজাযের সকল নারী তোমার সামনে এনে দেয়া হবে। তোমার ইচ্ছেমত পছন্দ করে রেখে দাও। আমরা খেদমতে পেশ করে দেব। আর যদি তুমি রাজ্য ও ক্ষমতা চাও, তবে আমরা সবাই তোমাকে আমাদের বাদশাহ বলে স্বীকৃতি দেব এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেব। তুমি যা চাইবে তা-ই দেয়া ও পূর্ণ করতে আমরা প্রস্তুত। ধন-দৌলত, ক্ষমতা, রাজ্য, সুন্দরী রমণী যা-ই চাও, তা-ই হাজির, তা-ই প্রস্তুত। কিন্তু প্রভুর দোহাই যেন ঐ কালেমাটি প্রচার না করা হয়। আমাদের দেব-দেবীর অবমাননা না করে এ ব্যাপারে বিরত থাক। আমরা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সকল কিছু দিতে প্রস্তুত।

আবু তালেব বলেন– হে আমার ভাতিজা! তোমার স্বজাতির প্রধানরা এ কথা বলেছে এবং আমাকে মাধ্যম হিসেবে তোমার নিকট পাঠিয়েছে।

জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে চাচা! আপনার যা বলার ছিল তা কি বলা হয়েছে?

বললেন– হ্যাঁ, বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এখন আমার কথা শুনুন। আল্লাহর কসম! যদি আমার জাতি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র তুলে দেয়, তবুও আমি এ কালেমার প্রচার থেকে সরে আসবো না। সমগ্র পৃথিবীতে এ কালেমা প্রচার করতে থাকব অথবা নিজের জীবন নিঃশেষ করে দেব।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা থেকেই অনুমিত হলো, দুনিয়া তো বড় কথা নয়। চন্দ্র-সূর্য এবং আকাশের চাকচিক্যকেও তিনি অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন। এ কালেমা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নিকট রয়েছে, ততক্ষণ না চন্দ্র তাঁর নিকট প্রিয়, না সূর্য। বোঝা গেল, এ কালেমা চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও অধিক উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ– এই হলো আল্লাহর নাম। আল্লাহর নামেই বিশ্ব জিন্দা ও সজীব রয়েছে। চন্দ্র-সূর্যের কি মূল্য, কি মর্যাদা আছে?

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ এমন– হে আল্লাহ! আমি তোমার ঐ নামের আশ্রয় গ্রহণ করছি, যে পবিত্র নাম তুমি সূর্যের ওপর লিখে রেখেছো। যে নামের কারণে সূর্য জীবন লাভ করছে। আমি ঐ নামের মাধ্যমে দোয়া করছি। তাহলে বোঝা গেল চন্দ্র-সূর্যের জীবনও আল্লাহর নামের দ্বারাই ক্রিয়াশীল। মহান আরশের খুঁটিগুলোর ওপর আল্লাহর নাম লেখা থাকায় সে প্রাণবন্ত হয়েছে। এ নামের বরকতেই ওগুলো কায়েম রয়েছে। কাজেই আল্লাহর নাম, আল্লাহর যিকির সর্বোত্তম জিনিস। এর বাইরে চন্দ্র-সূর্য মহান আরশ-কুরসীর কোন হাকীকত ও মর্যাদা নেই। আরশ ও কুরসীর মর্যাদাও আল্লাহর নামের কারণেই। যদি আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরশ ও কুরসী থেকে নিজ নাম প্রত্যাহার করে নেন, তবে হাজার হাজার আরশ ও কুরসীর কোন মূল্য থাকবে না। কিন্তু যেহেতু তাতে আল্লাহর নাম রয়েছে, তাই মর্যাদাবান ও সম্মানের বস্তু হয়ে গেছে।

কলবে মুহাম্মদী (সা.) : আল্লাহর যিকরের ভাণ্ডার

এবার ভাবুন, 'আরশ-কুরসী' লওহ ও কলম সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগত একদিকে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলব মুবারক একদিকে। যে বড়ত্ব, যে শ্রেষ্ঠত্ব এই কলব মুবারকের হবে তা আরশ-কুরসী, লওহ-কলম সমগ্র সৃষ্টি জগত এক করলেও হবে না। এ কারণে যে, তাঁর কলব মুবারক আল্লাহর যিকরের ভাণ্ডার আর আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর যিকির সবচেয়ে মহান। যখন এটা লাভ হয়ে যায়, তখন সব কিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কোন জিনিসের আর কোন মর্যাদা থাকে না।

আল্লাহর মুবারক নামের ওজন

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হাশরের ময়দানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সাথে গুনাহের ৯৯টি ফাইল থাকবে। এত বেশি গুনাহ সে করেছে, ৯৯টি ফাইলই গুনাহে পরিপূর্ণ থাকবে এবং এক-একটি ফাইল এত বিশাল হবে, যদি একটি খোলা হয়, তাহলে আসমান-জমিন এর ভেতর এসে যাবে, সংকুলান হয়ে যাবে। এখন অনুমান করুন অবশিষ্ট ৯৮টি ফাইল কত বিরাট হবে। মোট কথা, এর গুনাহ এত বেশি হবে যে, সৃষ্টজগতে এর সংকুলান হবে না।

সে লোক হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। আল্লাহর সামনে তাকে হাজির করা হবে। গুনাহর নথিগুলো সামনে রাখা থাকবে এবং সে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে

নেবে– তার নাজাতের আর কোন উপায় নেই, পথ নেই; ৯৯টি নথিই গুনাহে পরিপূর্ণ। সে তৈরি হয়ে থাকবে, আল্লাহ হয়তো এখনই আদেশ করবেন– একে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। এ জাহান্নামেরই যোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন– হে বান্দা! এ সকল গুনাহ তুমি করেছ?

সে আরজ করবে– হ্যাঁ, আল্লাহ! আমি করেছি।

আল্লাহ বলবেন– তোমার কোন ওজর-আপত্তি আছে?

বলবে– হে আল্লাহ! কোন ওজর-আপত্তি নেই। নিজের দুর্ভাগ্য ও পাপিষ্ঠতার কারণেই এসব হয়েছে। আমিই এসব অপকর্ম করেছি, আমার বলার কিছুই নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূর্ণ করেছি। প্রবৃত্তির দাসত্বে, কামনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম। কোন দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে করিনি। এবার তার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যাবে, এখনই তার ওপর আদেশ হবে, তাহলে জাহান্নামে যাও, তোমার জন্য অন্য কোন স্থান আমার নিকট নেই।

আল্লাহ বলবেন– তোমার গুনাহর ৯৯টি নথির মধ্যে একখানা নেকীও আছে আমার নিকট। তখন ছোট একটি কাগজ বের করা হবে– সমগ্র জীবন সে কি নেকী করেছে! দেখা যাবে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়েছিল। অর্থাৎ মুসলমান হয়েছিল। একবার মাত্র কালেমা পড়েছিল। এই একটি নেকীই তার রয়েছে, অন্য কোন নেকী নেই। ৯৯ দফতরের মধ্যে নেকীর ছোট একটি কাগজের টুকরা পড়ে থাকবে। আল্লাহ বলবেন– তোমার একমাত্র এ নেকীটি রয়েছে। যাও, আমলের পাল্লায় তোমার নেকী-বদি পাপ-পুণ্যের ওজন তোমার কর্তৃত্বাধীনে করিয়ে নাও। ঐ ব্যক্তি আরজ করবে– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কেন লজ্জিত করছেন? হে আল্লাহ! এই ৯৯ নথির মোকাবেলায় এ ছোট কাগজের টুকরার কি ওজন থাকতে পারে? আমি তো জাহান্নামেরই উপযুক্ত। আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন। আমার কোন আপত্তি নেই।

আল্লাহ বলবেন– না-না, আমার নিকট জুলুম-অত্যাচার নেই। রতি রতি হিসাব হবে। যাও, তোমার উপস্থিতিতে আমল ওজন করিয়ে নাও। নয়তো তোমার এ সন্দেহ হতে পারে, আমার ফেরেশতারা তোমার প্রতি জুলুম করেছে, ওজনে কম করে দিয়েছে।

সে আবারো আরজ করবে– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কেন লজ্জিত করছেন?

আল্লাহ বলবেন– যাও, ওজন করিয়ে নাও! মাপিয়ে দেখ।

তখন সে যাবে এবং ওজন করাবে। ৯৯ দফতর পাল্লার একদিকে রাখা হবে ও ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা অন্যদিকে রাখা হবে। পরিমাপকালে দেখা যাবে, ৯৯

দফতরের ওজন কম হয়ে গেছে এবং কাগজের টুকরাটি ভারী হয়ে গেছে।

আল্লাহ বলবেন– যা তোকে জান্নাত দান করলাম, নাজাত পেয়ে গেলি। এর কারণ সম্পর্কে বলবেন– 'ওলা যিকিরুল্লাহি আকবর।' আল্লাহর যিকির সর্বোত্তম ও ভারী জিনিস। তুমি লক্ষ লক্ষ বছর গুনাহ করতে থাক কিন্তু একবার সত্য-সঠিক ও আন্তরিকভাবে সাথে তাওবা করে নাও। এ তাওবার এত ওজন যে, লাখ লাখ বছরের গুনাহয়ও সে ওজন হবে না, হতে পারে না। এজন্য যে, আল্লাহর যে আজমত, মহত্ত্ব ও মর্যাদা রয়েছে তা বিশ্বজগতের কোন জিনিসে নেই, হতে পারে না। ঐ ব্যক্তিকে নাজাত দেয়া হবে। আল্লাহর যিকির অত্যন্ত মহৎ ও মর্যাদাবান। সামান্য এক টুকরা কাগজ ৯৯ দফতরের ওপর প্রধান ও ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকই জানেন, সে ঐ কালেমা কত ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে পড়েছিল। আর ঐ ইখলাস ও আন্তরিকতা সকল জিনিসকে তখন হীন করে দিয়েছে।

হুযুরে কল্‌ব যিকরে ওজন বাড়ায়

আসলে ওজন যা হবার তা তো ইখলাসেরই হয়ে থাকে। আমরা তো রাতদিন আল্লাহ আল্লাহ বলি কিন্তু তা গাফলতের সঙ্গে। হৃদয়ের গভীরে আন্তরিকতা থাকে না। শুধু দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্যই আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করে থাকি। অথচ এ আল্লাহ আল্লাহ বলাটাই সার। এতে প্রাণ নেই, যার ফলে মূল্য ও মর্যাদা হবে, ওজন হবে। প্রকৃতপক্ষে ওজন হলো খালেস নির্ভেজাল স্মরণের মধ্যে। শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলাই যথেষ্ট নয়। যে পর্যন্ত আল্লাহ শব্দ উচ্চারণের সাথে অন্তরের গাফলত ও উদাসীনতা থাকবে সে পর্যন্ত তার কোন মূল্য নেই, কোন মর্যাদা নেই। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেছেন–

درزباں تسبیح ودردل گاؤ وخر

ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر۔

মুখে সুবহানাল্লাহ আর অন্তরে গরু ও গাধা– এ ধরনের তাসবীহতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে!

মুখে তাসবীহ জারী আছে– কিন্তু অন্তরে ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজনের চিন্তা। দোকানের কথা ভাবছে, আর জবানে আল্লাহ আল্লাহ– এটাও যিকির; কিন্তু কলবী যিকির নয়; বরং জবানী যিকির। অন্তরকে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন না করে শুধু মুখে আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। কোন পাহলোয়ানের

লাশ পড়ে আছে। বিশাল বপু তার। কিন্তু তার সে বিশাল মৃতদেহের কি কোন কদর থাকে, মূল্য থাকে?

একজন জ্বরাক্রান্ত লোক। দুর্বলতার কারণে উঠতে পারছে না। তবে তার ভেতরে প্রাণ স্পন্দন আছে, সে জীবিত। তার মূল্য আছে। যদি তাকে কেউ কতল করে দেয়, তাহলে খুনী সাব্যস্ত হয়ে সে ফাঁসিতে ঝুলবে। সে একথা বলতে পারবে না, এই লোক তো মৃতপ্রায় ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সে মারা যেত। আপনি আমাকে খুনী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিচ্ছেন কেন? সে তো মরেই যেত। ঘটনাচক্রে আমার আঘাতে মরে গেছে।

তাকে বলা হবে– তুমি জীবিত মানুষকে হত্যা করেছ। জানের ওপর আক্রমণ করেছ। এজন্য তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ (কিসাস) নিতে হবে। আর যদি পাহলোয়ানের মৃত লাশের ওপর পঞ্চাশটি আঘাতও কেউ করে, কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। কারণ এতে প্রাণ ছিল না। কাজেই এর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। এর চেয়ে একটি পাথরেরও অধিক মূল্য রয়েছে, কিন্তু লাশের কোন মূল্য নেই। আপনার পাথর কয়েক টাকা মূল্যে হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে কিন্তু মৃতদেহ দশ পয়সা দামেও বিক্রি হবে না। কারণ পাথর দালান নির্মাণের কাজে লেগে যাবে, মরদেহ দ্বারা তা হবে না। এ কোন কাজেরই নয়। একে দাফন করতে হবে বা পুড়িয়ে ভস্ম করতে হবে অথবা পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। মূল্য ও মর্যাদা হয় রূহ ও প্রাণের কারণে। আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, হজ পালন– এসবই হলো স্থূল দেহ এবং এগুলোর আত্মা ও প্রাণ হলো আল্লাহর যিকির, আল্লাহর স্মরণ। অন্তরে জাগরণ, সতর্কতা, একাগ্রতা আল্লাহর সাথে নিগূঢ় সম্পর্কই হলো এসবের আত্মা। যদি অন্তরে স্মরণ না থাকে, তবে মুখ দ্বারা আল্লাহ আল্লাহ যতই বলা হোক, কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দের ভেতর আন্তরিকতা না থাকবে। আসলে একাগ্রতাই প্রকৃত মূল্য। কেয়ামতের দিন আল্লাহর যিকিরই সবচে' মহান হিসেবে প্রকাশ ঘটবে। এক টুকরা কাগজ ৯৯ দফতরের ওপর ওজনদার ও ভারী হয়ে যাবে এজন্য যে, সে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ শব্দ বলেনি; আল্লাহ বলার মধ্যে হৃদয়ে ছিল অত্যন্ত ইখলাস, আন্তরিকতা ও অন্তরের সম্পর্ক। যিকিরের অর্থ কেবল আল্লাহ আল্লাহ বলাই নয়; বরং অন্তরের নিগূঢ় সম্পর্ক ও সর্বদা সজাগ থাকা। আল্লাহর স্মরণ থাকবে সর্বদা-সর্বক্ষণ। ঐ স্মরণের সাথে শব্দগুলো বেরুতে থাকবে, শব্দগুলো আল্লাহর স্মরণে অভিভূত থাকবে। একেই বলা হয় যিকরুল্লাহ। এমন যিকির যখন অন্তরে থাকবে, তখন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বাক্যও যদি বলে, তবু এর মূল্য হবে, মর্যাদা হবে।

কল্‌বের আবেগানুভূতিতে উচ্চারিত শব্দে তাসীর পয়দা হয়

আল্লাহওয়ালাদের ছোট বাক্যেও প্রভাব থাকে, প্রতিক্রিয়া হয়। এটা শব্দের কারণে নয়; বরং শব্দের ভেতর নিহিত থাকে অর্থ ও অন্তরের স্মরণ। আর এরই প্রতিক্রিয়া হয় অন্যদের অন্তরে। নয়তো কাব্য-কল্পনার কী আর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে? কেউ যদি অতি সুন্দর কথাও বলে– আর কবিদের চেয়ে সুন্দর কথা কে বলতে পারবে? একজন কবি যদি পঞ্চাশটি কবিতাও আবৃত্তি করে, তবুও তেমন কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হবে না। বড়জোর মানুষ সাবাশ, ধন্যবাদ দেবে। পরবর্তীতে এর কোন ক্রিয়াই অবশিষ্ট থাকবে না। আর এসব বিষয়কে মানুষ তার অন্তরে স্থান দেয় না এ জন্য যে, এসবের প্রকৃত অর্থ ও বাস্তবতা থাকে না। কেবল বাকপটুতাই সার।

জনৈক কবি এক আমীরের প্রাসাদে হাজির হলেন। তিনি আমীরের গুণ-কীর্তন করে দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন। আসলে শিল্পসম্মত কবিতা এমনই হয়– যাতে সত্যের চেয়ে মিথ্যাই থাকে বেশি। কবিতার মধ্যে যদি সব কথাই সত্য হলো– তাহলে কবিতা আর কি হলো! যে পর্যন্ত তাতে অনেক মিথ্যার সংশ্রব না ঘটল, মাত্রাতিরিক্ত কথাবার্তার সংমিশ্রণ না হলো– সে পর্যন্ত এটি কোনো উৎকৃষ্ট কবিতাই হবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল– কবিতার সংজ্ঞা কি? উত্তরে বলা হলো– যেটা (কবিতা) সর্বাধিক মিথ্যা হবে, সেটাই সর্বাধিক উত্তম হবে। তাতে অনেক মাত্রাতিরিক্ত কথাবার্তা থাকবে। এতে কেবল এমন শব্দই থাকে যা স্থূল ও অর্থহীন। যাক, ঐ কবি আমীর সম্পর্কে দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। ইরান-তুরান একসঙ্গে করে দিলেন। এমন সব কথা বললেন– আপনার সিংহাসনের পায়াগুলো আকাশে স্থাপিত, আপনার মুকুট কাংগরা (বিজয় চিহ্ন) সপ্তম আকাশে পৌঁছে গেছে, আপনার চোখের সামনে সুরাইয়া (নক্ষত্র) আলোকহীন, চন্দ্রও আলোহীন; আপনার নয়নে যে চাকচিক্য রয়েছে, আপনার হাতে যে শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে, বিদ্যুৎও তা দেখাতে পারে না– যা আপনার দু'টি করতে পারে।

শুনে তো আমীর সাহেব খুবই আনন্দিত হলেন। কারণ, লোকটি তাঁর বিরাট প্রশংসা করেছে। কবিতা শুনে বললেন– আপনি পরশু আসবেন। আপনাকে আমি দু'হাজার টাকা বখশিস দেবো। কবি সাহেবও অতি আনন্দিত হলেন এবং দরবার থেকে বের হয়েই পাঁচশ' টাকা ধার করে ফেললেন। বাড়িতে মোরগ পোলাও-এর ব্যবস্থা করলেন। উন্নতমানের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করলেন।

কারণ, আগামী পরশু দুই হাজার টাকা পাবো– পাঁচশ' টাকা পরিশোধ করে দেব, তারপর পনেরশ' টাকা অবশিষ্ট থাকবে। এরপর আমার চেয়ে আমীর– বিত্তশালী কে আর হবে?

ওয়াদা মোতাবেক সময় মতো উন্নতমানের শেরওয়ানি পরে আমীরের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন। আমীর সাহেব বসেই ছিলেন। চোখ তুলেও দেখছেন না। দীর্ঘ সালাম দিলেন কিন্তু আমীর সাহেব চোখ তুলছেন না। কিছুক্ষণ পর কবি সাহেব গলা খাকারি দিলেন। তবুও আমীর সাহেব খেয়াল করলেন না। অবশেষে কবি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন– হুযুর! আমি হাজির হয়েছি।

আমীর বললেন– আপনি কে?

কবি তো অবাক! বললেন– আমি ঐ কবি, যে গত পরশু হাজির হয়ে আপনার প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করেছিল। হুযুর ওয়াদা করেছিলেন দুই হাজার টাকা দান করবেন। আমি সেই ওয়াদা মোতাবেক হাজির হয়েছি। আমীর বললেন– তুমি অতি বোকা। তুমি আমাকে শব্দ দিয়ে আনন্দিত করেছিলে; আমিও শব্দ দিয়ে তোমাকে খুশি ও আনন্দিত করেছি। তোমার শব্দগুলোর যেমন কোন অর্থ ও বাস্তবতা ছিল না, আমার শব্দেরও কোন বাস্তব অর্থ নেই। অর্থাৎ যে কবিতা তুমি পাঠ করেছিলে, তার যেমন কোন অর্থ ছিল না– আমিও দু'হাজার টাকা দিতে বলেছি, এরও কোন অর্থ নেই। তুমি বেশ বোকা। তোমার প্রতিদান তুমি পেয়েছ।

কবি তো থ। বললেন– হুযুর! আমি আপনার কথার ওপর ভরসা করে পাঁচশ' টাকা ধার করে ফেলেছি।

আমীর ধমকের সুরে বললেন– কে তোমাকে বলেছিল? বোঝা গেল, তুমি অনেক বোকা ও নির্বোধ। কবি না হয়ে যদি বুদ্ধিমান হতে, তবে বুদ্ধির কিছু মূল্য হতো।

আসলেও তো তাই। নিরেট শব্দের কোন মান-মর্যাদা ও মূল্য থাকে না– যে পর্যন্ত শব্দের মাঝে অর্থ না থাকবে এবং অর্থের মধ্যে থাকবে হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস– সে পর্যন্ত শব্দের কোন মূল্য নেই। আমাদের মত মানুষ যখন আল্লাহ আল্লাহ করবে, তা মৌখিকই হবে; এতে আন্তরিকতা থাকবে না। আর আল্লাহওয়ালাগণ যখন আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবেন, তখন অন্তরের সাথে যিকির করবেন। এতে মহব্বত ও মারেফাত সম্পর্কেও আন্তরিকতা এবং নিসবত মাশাআল্লাহ সবই বিদ্যমান থাকে। তাই মুখ দিয়ে তাঁরা যে শব্দই বের করেন, অপরের অন্তরে তা প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কুতুবে আলম হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (রহ.) চিশতিয়া সিলসিলার প্রধানদের অন্যতম। তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা রুকনউদ্দীন ইলম অর্জনের জন্য দিল্লী যান। আট-দশ বছর পর অতি সুযোগ্য আলেম হয়ে বাড়ি ফিরলেন। হযরতের মুরীদগণ আরয করলেন– সাহেবজাদা আলেম হয়ে এসেছেন, যদি তাঁকে দিয়ে ওয়াজ করানো হয়...।

হযরত বললেন– হ্যাঁ ভাই! অবশ্যই ওয়াজ করানো দরকার। ইলম যখন শিখেছে, তখন তা প্রকাশ ও প্রচার হোক। অন্যরা মাসায়েল শিক্ষা করে নিক। সাহেবজাদা দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত মূল্যবান ওয়াজ করলেন। শ্রোতারাও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এ কারণে যে, বহু মাসআলা তিনি বয়ান করেছেন। মানুষ মাসায়েল শিক্ষা করলেন। সাহেবজাদার অনেক প্রশংসা করলেন কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। অর্থাৎ কেউই কান্নকাটি করল না, কারো ওপর প্রেমের মত্ততা দেখা গেল না– কিছুই হলো না। শুধু অনেক মাসআলা বয়ান করলেন। মানুষ তার মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করল।

মাওলানা রুকনউদ্দীনের ওয়াজ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন হযরত কুতুবে আলম (রহ.) মিম্বরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি একটি বাক্য বললেন– ভাই! রাতে এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল। রুকনউদ্দীনের মা অধমের জন্য ক্ষীর রান্না করেছিলেন আর তা খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। বিড়াল এসে তা খেয়ে গেল আর অধম বঞ্চিত হলো।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। তারা পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়তে শুরু করল। মসজিদে যেন একটা ঝড়ের সৃষ্টি হয়ে গেল। এখন বলুন, এতে কি জিনিস ছিল? আসলে কি রান্না করা ক্ষীর ছিল আর বিড়াল এসে তা খেয়ে নিয়েছিল? তা যদি না হয়, তাহলে এতে কোন্ সে হাকীকত ও মারেফাত ছিল? প্রকৃতপক্ষে অন্তরে যে আবেগ-অনুভূতির প্রতিক্রিয়া ও তাসীর ছিল– তা ঐ উচ্চারিত শব্দগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলল। সে গিয়ে কর্ণকুহরে এবং হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি উচ্চারিত শব্দের পথ ধরে হৃদয়ে গিয়ে পড়ে। ফলে হৃদয়ে আল্লাহর জোয়ার আসে। এ কারণেই শ্রোতাগণ চিৎকার করতে থাকে, চিল্লাতে থাকে। এটা উচ্চারিত শব্দগুলোর প্রভাব ছিল না; বরং শায়খের কলব-এর প্রভাব ছিল। আসলে আল্লাহওয়ালাগণ অন্তরে আবেগ-অনুভূতি ঢেলে দেন। শব্দ সেখানে যন্ত্রের মত কাজ করে। শব্দগুলোর কোন মূল্য থাকে না। আল্লাহওয়ালার কাছ থেকে যদি আপনি অন্তরের কোন আবেগ-অনুভূতি নিয়ে যান পরকালে দীনের মাহাত্ম্য ও মহব্বতের– সেগুলো শব্দের আবেগ-অনুভূতি নয়; বরং তা হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি। যদি হৃদয়ে আবেগ-অনুভূতি না-ই

থাকতো তাহলে উত্তম-সুন্দর শব্দে আপনি প্রভাবান্বিত হতেন না। প্রভাব বিস্তার শব্দাবলী করে না; বরং শব্দের অর্থ প্রভাব বিস্তার করে। উচ্চারিত শব্দের অর্থের ভেতরে লুকানো থাকে আল্লাহর যিকির– যার মাধ্যমে কলব আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়। কলবে হরকত পয়দা হয়– গতির সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে–

ولذ كر الله اكبر

সবচেয়ে বেশি ভারী, সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশালী জিনিস হলো আল্লাহর যিকির। [আনকাবুত : ৪৫]

আল্লাহর যিকিরের মোকাবেলা দুনিয়া ও দুনিয়ার বস্তুসমূহ করতে পারে না।

আল্লাহর যিকির কলবে জারি হলে বান্দা আরশের অধিবাসী হয়ে যায়

যখন বান্দার অন্তরে আল্লাহর যিকির এসে যায়, তখন লক্ষ লক্ষ রাজত্ব একদিকে এবং আল্লাহর যিকির একদিকে। এ অবস্থায় কোন জিনিসের কদর ও মূল্য থাকে না।

শাহ গোলাম আলী (রহ.)– যিনি হযরত মির্জা মাজহার জানজানা (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা ছিলেন এবং নকশবন্দী সিলসিলার অন্যতম প্রধান সম্মানিত ব্যক্তি– তাঁর ওখানেও অনেক মেহমানদারী ও আতিথেয়তা করা হতো। মুরীদদের ভীড় লেগেই থাকতো। দোয়াড়াইশ' লোক সব সময় থাকতো। হিন্দুস্থানের টুংক রাজ্যের শাসক নওয়াব মীর খান তাঁর মুরীদ ছিলেন। তিনি দেখলেন শাহ সাহেবের খানকা শরীফে অনেক মেহমানদারী করা হয়, অথচ কোন সম্পত্তি, ধন-দৌলত বা জায়গির (তালুক) কিছুই নেই। তিনি টুংক রাজ্যের পুরো একটি জেলা দিয়ে লিখে পাঠালেন– এ জেলা আমি আপনাকে দান করলাম। এর আমদানী মাসিক কয়েক হাজার টাকা হবে। এর দ্বারা মেহমানদের ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। তিনি পিতলের পাতে লিখে পাঠালেন– এ পুরো জেলা আমি শাহ গোলাম সাহেবের নামে দান করলাম। যথা সময়ে এ দলীল শাহ সাহেবের নিকট পৌঁছল এবং তাঁর খেদমতে পেশ করা হলো– আপনার মুরীদ নবাব মীর খান এ সম্পূর্ণ জেলা হাদিয়াস্বরূপ পেশ করেছেন।

জবাবে দলীলের অপর পৃষ্ঠায় শাহ গোলাম আলী (রহ.) একটি কবিতা লিখে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন– যেমনটা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) কবিতা লিখে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি ছিল এই–

ما ابروئے فقر و قناعت نمی بریم

با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

আমি দারিদ্র আর অল্পে তুষ্টির সম্মানকে নষ্ট করব না। আমীরকে বলো, আহার্য নির্ধারণ করা আছে এবং তা আকাশ হতে অবতীর্ণ হচ্ছে। তোমার আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এত বেশি ইস্তগনা (অমুখাপেক্ষিতা) ও অন্তরের জাগরণ ততক্ষণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে কোন বিশেষ দৌলত জমা না থাকে। আর ঐ দৌলতই হলো আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকিরই সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বড় জিনিস। সুতরাং জেলা, প্রদেশ সম্পূর্ণ দুনিয়াই কোন জিনিস নয়। আল্লাহর যিকিরের তুলনায় চন্দ্র-সূর্যও কোন মূল্যবান ও মর্যাদাশীল বস্তু নয়। অন্তরে যখন আল্লাহ পাকের যিকির স্থান করে নেয়, তখন মানুষ আরশের অধিবাসী হয়ে যায়। কথাবার্তা বলে আরশের উর্ধ্বের– নিম্ন জগতের কথাবার্তা বলে না তখন। এ-ই হলো আল্লাহর যিকির– যা সম্পূর্ণ শরীয়ত ও বিশ্বজগতের রূহ ও প্রাণ। যদি এ দুনিয়া থেকে আল্লাহর যিকির নিঃশেষ হয়ে যায়– তবে সেদিনই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, এ বিশ্বকে খতম করে দেয়া হবে। যদি কারো অন্তর থেকে যিকির বেরিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে ঈমান ও ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। কোন কওম ও জাতি থেকে যদি যিকির বেরিয়ে যায়, তাহলে ঐ জাতি লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে– তাদের মান-সম্মান রাজ্য ও ক্ষমতা যাই থাক। মোটকথা, যে পর্যন্ত দীন-দিয়ানত, আল্লাহর যিকির থাকবে না, সে পর্যন্ত ঐ বস্তুজগত সজীব ও কর্মতৎপর থাকবে না। কারণ, যিকিরই হলো সব জিনিসের আত্মা।

যিকরুল্লাহর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশস্থল

আল্লাহর যিকির প্রকাশের সবচে' মাধ্যম হলো নামায। এর মাধ্যমেই সবচে' বেশি যিকির প্রকাশ পায়। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে।
[আনকাবুত : ৪৫]

লজ্জাহীনতা থেকে রক্ষা করে– যেগুলো শরীয়তের বিধানে অবৈধ গুনাহ, সেসব হতে নামায রক্ষা করে। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে–

ولذ كر الله

নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ।

নামাযের রূহ হলো যিকির, আর যিকির اكبر সব জিনিসের চেয়ে বড়। সবচে' বড় যিকিরের রোশনী, যিকিরের ঔজ্জ্বল্য যখন আসবে, তখন কোন জুলমত থাকতে পারবে না, কোন অন্ধকার থাকতে পারে না। গুনাহই হোক কি অন্য কিছুই হোক, শেষ হয়ে যাবে। এর দ্বারা একটি সন্দেহের জবাব বের হয়ে আসে। তা হচ্ছে– আপনার মনে এ প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, আমরা তো নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে থাকি। মসজিদ নির্মাণ করে থাকি। এতে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করি। ছেলেদেরকেও নিয়ে আসি মসজিদে। তারপরও মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছি। অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার কথাবার্তাও হয়ে যায়। নামাযও পড়ছি, এসব কাজও হচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে, নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করবে। অথচ আমরা নামাযীও আবার গর্হিত কাজকর্মেও লিপ্ত।

উক্ত সন্দেহের সাধারণ একটি উত্তর হচ্ছে– আপনি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করে দেখুন যে মোটেই নামায পড়ে না। তার মধ্যে কি পরিমাণ মন্দ ও গর্হিত কাজকর্ম রয়েছে এবং নামাযী ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণ রয়েছে। আপনি এ দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখতে পাবেন। নামাযী ব্যক্তি যদি মন্দ ও খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েও যায়, তবুও এত অধিক পরিমাণে হবে না, যে পরিমাণ বেনামাযীর ক্ষেত্রে হবে। নামাযী ব্যক্তির অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় থাকে। এক উত্তর তো হলো এই– আল্লাহর যিকির ও নামায অবশ্যই মন্দকাজ থেকে রক্ষা করে, বিরত রাখে। কিন্তু আপনি বিরত থাকছেন না, কিছু কিছু মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছেন। আর যে ব্যক্তি মোটেও নামায পড়ে না, সে অনেক বেশি লিপ্ত রয়েছে। কাজেই বিশেষ এক সীমা পর্যন্ত নামায আপনাকে রক্ষা করছে।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) আমাদের পীর ও মুর্শিদ। তিনি ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। মোল্লা মাহমুদ সর্বপ্রথম শিক্ষক আর মাওলানা মাহমুদ সর্বপ্রথম ছাত্র। দুই মাহমুদ দিয়ে দারুল উলুমের শুরু ও সূচনা।

الٰہی عاقبت محمود گرداں۔

হে আল্লাহ! পরিণাম ও ভবিষ্যৎকে মাহমুদ (প্রশংসনীয়) করুন।

সূচনা যখন মাহমুদ দিয়ে হয়েছে সমাপ্তিও ইনশাআল্লাহ মাহমুদ দিয়েই হবে। শায়খুল হিন্দের খাদেমগণের মধ্যে হযরত মাওলানা উজায়র গুল সাহেবও ছিলেন। তিনিও সৈয়দ এবং সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। সীমান্তের সৈয়দগণকে খান বলা হয়। সবাই খান 'পাঠান' উপাধিতে ভূষিত। 'খান' 'পাঠান' তাদের দেশে সম্মানসূচক শব্দ।

আমি যখন আফগানিস্তান গিয়েছিলাম, তখন স্থানীয় পত্র-পত্রিকা প্রচার করেছিল মাওলানা তৈয়্যিব খান। অথচ আমি পাঠান নই। কিন্তু তাদের ওখানে 'খান' হলো সম্মানজনক শব্দ। সে মোতাবেক মাওলানা উজায়র গুল সাহেবকেও পাঠান বলা উচিত; তবে তিনি ছিলেন সৈয়দ। তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন এবং কোন কোন সময় এত বেশি জোশের সাথে কথা বলতেন– মনে হতো যেন তার চেয়ে ছোট কারও সঙ্গে কথা বলছেন। অর্থাৎ বেআদবীপূর্ণ কথাবার্তাও বলে ফেলতেন। অথচ হযরত সেদিকে খেয়ালও করতেন না।

একদিন বুখারী শরীফের দরসে তিনি প্রশ্ন করলেন– হযরত! এ মাসআলাটি কেমন? হযরত সাধারণ একটি উত্তর দিলেন। তিনি বলে উঠলেন– নিজেই জানেন না; তাই অতি সাধারণ উত্তর দিয়ে সামনে বাড়ছেন। পড়াতে বসেছেন অথচ উত্তর দিতে পারছেন না– এ জাতীয় অনেক কথাবার্তা বলতেন। এটা ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস। আমাদের সাথে যখন আলাপচারিতা করতেন, তখন 'আপনি' বলেই সম্বোধন করতেন। 'আপনি' বলতেছেন, মাঝখানে জোশ এসে গেল। তখন 'তুমি' বলতেন। তারপর 'তুই' বলতেন। এরপর বলতেন– আরে 'খবিস, তুই' একথা বলছিস। অর্থাৎ 'আপনি' দ্বারা শুরু করতেন আর 'খবিস' বলে শেষ করতেন। এটা তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। হযরতের শানে বেআদবীর কথাবার্তাও বলে দিতেন। এক ব্যক্তি হযরতের নিকট আরয করল– হযরত! এই লোকটি এতদিন ধরে আপনার খেদমতে থেকেছেন অথচ তাহযীব ও ভদ্রতা শিখতে পারেননি। অনেক বাজে ও অনর্থক কথাবার্তা বলেন! পঁচিশ বছর আপনার খেদমত ও সাহচর্যে থেকে কিছুই শিখলেন না!

হযরত বললেন– এবার ভেবে দেখ, তিনি যদি বিশ-পঁচিশ বছর সাথে না থাকতেন তাহলে কি হতেন? সঙ্গে থেকেও যখন অবস্থা এই, যদি না থাকতেন তাহলে কি হতেন?

আমিও একথাই বলছিলাম– নামায পড়েও যখন এত মন্দকাজে লিপ্ত, যদি নামায না পড়তেন তবে অবস্থা কি দাঁড়াতো? কত মন্দ ও গর্হিত কাজে জড়িত

থাকতেন? সহজ উত্তর হলো এই– নামাযী ব্যক্তি যদি মন্দকাজে লিপ্ত হয়ও তবে বেনামাযীর তুলনায় কমই হবে।

তবে প্রকৃত উত্তর হলো– নামায পড়েও যদি মানুষ মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না থাকে, অশ্লীল ও লজ্জাহীনতার কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা না করে, তবে বুঝতে হবে– নামাযে শুধু দেহ ও কাঠামো দাঁড় করিয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালার যিকির– যা নামাযের রূহ ও প্রাণ– তার অন্তরে নেই। যদি রূহ বিদ্যমান থাকত তবে নিশ্চয়ই রক্ষা পেয়ে যেত। নামায অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে রক্ষা করতো যদি নামাযের মধ্যে প্রাণ থাকতো। যদি প্রাণহীন নামায হয়– যাতে রূহ নেই, তাহলে লাশের ন্যায় নামায কোন জিনিসই না। এতে কোন কাজ হবে না। এ জাতীয় নমাযও কোন কাজে আসবে না। ওঠাবসার নাম নামায নয়। নামায আল্লাহর যিকির ও স্মরণ– তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্য প্রকাশের নাম। অন্তর থাকবে আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত এবং অন্য সব বস্তু অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্তরে আল্লাহর যিকির যত অধিক থাকবে, সে মোতাবেক মন্দ ও লজ্জাহীনতার কাজ থেকে নামাযী ব্যক্তি বিরত থাকবে। যিকির ও স্মরণ যত অল্প হবে, পাপাচার থেকে হেফাযতও হবে সে অনুপাতে। আর নামাযে যদি যিকির একেবারেই না থাকে, তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েও রক্ষা পাবে না। কারণ তার নামাযে রূহ নেই, প্রাণহীন নামায। সুতরাং প্রকৃত উত্তর হলো– 'নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আল্লাহর কালাম সত্য।' 'নিশ্চয়ই নামায লজ্জাহীন, অশ্লীল ও গর্হিত কাজকর্ম হতে রক্ষা করে।' কেন রক্ষা করে? এজন্য যে, 'আল্লাহর যিকির অত্যন্ত মহান ও শ্রেষ্ঠ জিনিস। আল্লাহর যিকির ও স্মরণের জন্যই নামায পড়া হয়।' যিকির হলো রূহ বা প্রাণ। তাতে যদি প্রাণ না থাকে, তাহলে তার রক্ষা করার শক্তিও থাকবে না।

আত্মা না থাকলেও বাহ্যিক আমল ছাড়তে নেই

আমি একথাও বলেছি– আপনারা এরূপ মনে করবেন না, আমাদের নামাযে যখন পূর্ণাঙ্গ যিকির হয় না, শুধু নামাযের কাঠামোই হয়– সুতরাং প্রাণহীন এ নামায মন্দকাজ হতে রক্ষা করছে না। অতএব আজ থেকে একে ত্যাগ করে দেব। এ নামাযে কি উপকার হবে? না, এমনটা করবে না। এই দেহ ও কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে রাখো। যদি প্রাণ নাও থাকে, শরীর তৈরি করে রাখো।

বডি তৈরি থাকলে যথাসময়ে রূহ এসে যাবে। যদি দেহই না থাকে তবে রূহ আসবে কোথায়? সুতরাং এ আকৃতিকে ধরে রাখো, তৈরি করে রাখো। প্রাণহীন হলেও প্রস্তুত করে রাখো। উত্তম ও উন্নত কাঠামোতে উত্তম রূহই আসবে। আজ না হোক আগামীকাল আসবে। দীর্ঘদিন নামায আদায় করার পর খেয়াল হবে, মনের গতি পাল্টাবে– প্রাণহীন নামায পড়ছি। এগুলো নষ্ট হচ্ছে, এতে প্রাণ সৃষ্টি করা দরকার। দীর্ঘকাল নামায পড়ার পর এ খেয়াল আসবে এবং নামাযে আত্মা ও প্রাণ এসে যাবে। তাই ত্যাগ না করা আবশ্যক। মাওলানা রূমী (রহ.) যেমন বলেছেন–

بہر دین و بہر دنیاء بہر نام

اللہ اللہ کردہ باید والسلام-

ধর্মের জন্য হোক, দুনিয়ার জন্য হোক, সুনামের জন্য হোক
আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতেই থাকো, এতেই মঙ্গল।

এ কারণে যে, যিকির করতে থাকলে একদিন ইখলাস ও আন্তরিকতা এসেই যাবে। যদি ঘরই (দেহ) না থাকে তবে মুসাফির (রূহ) এসে অবস্থান করবে কোথায়? কাজেই গৃহ নির্মাণ করে রাখুন, হয়তো যিকরুল্লাহ নামের মুসাফির এসে যাবে এবং এই গৃহে অবস্থান করবে। সুতরাং লোক দেখানো নামায হোক, অন্তরের ধ্যান ও মনোযোগবিহীন নামায হোক– ফরয আদায় করতে থাকুন। আকার-আকৃতিই রূহকে একদিন আকর্ষণ করবে ইনশাআল্লাহ। এ চিন্তা করা উচিত নয়, যখন রূহই নেই, এ নামায পড়ে উপকার কি হবে? উপকার এতেও রয়েছে। অন্তত মুফতি সাহেব ফতোয়া দেবেন, নামায সহীহ হয়েছে। অন্তরের খবর তিনি রাখেন না। যখন আল্লাহ তায়ালার হাজার হাজার মাখলুক আপনাকে নামাযী বলবে, তখন আল্লাহর নিকটও নামাযী বলে পরিগণিত হবেন। এ কারণে যে, মাখলুক হলো রাজসাক্ষী। সে যেভাবে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। যখন রাজসাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন– অমুক ব্যক্তি নামাযী, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে নামাযী বলে গ্রহণ করে নেবেন। হতে পারে নামাযের এ স্থূল কাঠামো কেয়ামতের দিন নামাযের কারণ হয়ে যাবে। কাজেই ত্যাগ করা উচিত নয়।

সার কথা, পূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, নামাযের হাকীকত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করব এবং এসব কথাও বয়ান করব যে, নামায কিভাবে মন্দ, অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। কেবলমাত্র যিকরুল্লাহ

সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরয করা উদ্দেশ্য ছিল, যা আয়াতের দ্বিতীয় অংশে। আর তা-ও এ কারণে যে, আল্লাহর যিকির হলো সমগ্র জগতের আত্মা ও প্রাণ। শরীয়ত থেকে যদি আল্লাহর যিকির বেরিয়ে যায়, তবে শরীয়তের আমলগুলো মৃতদেহে পরিণত হবে। পৃথিবীতে যদি আল্লাহর যিকির না থাকে, তাহলে দুনিয়াও প্রাণহীন শবদেহে পরিণত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর যিকিরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

বেশি বেশি যিকির ও যিকিরের স্বাদ হাসিল করার উপায়

অধিক যিকিরকারী হওয়ার সহজ উপায় হলো– শরীয়ত যে সকল দোয়া ও আমল শিক্ষা করার জন্য আদেশ করেছে, ছোটবেলা হতে ছেলেমেয়েদের এসব মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে যেসব দোয়া পাঠের নির্দেশ রয়েছে তাও শিখিয়ে দিয়ে তাতে অভ্যস্ত করে দেয়া। এতেই 'যিকরে কাসীর' তথা অধিক যিকির হয়ে যাবে। আর এগুলোকেই 'যিকরে কাসীর' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে করো।'

অধিক যিকির কি? কোন কোন আলেম অধিক যিকির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন– বিভিন্ন সময়ের জন্য যেসব যিকির ও দোয়া বর্ণিত রয়েছে সেগুলো নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে পাঠ করে নেয়াই হলো 'অধিক যিকির'। যেমন নিদ্রা যাওয়ার জন্য যখন খাটে যাবে, তখন শোয়ার দোয়া পাঠ করে নেবে। যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে, তখন জাগ্রত হওয়ার দোয়া পড়বে। আহারের আগে ও পরে দোয়া পাঠ করবে। মল-মূত্র ত্যাগকালে যখন পায়খানায় যাবে, প্রথম বাম পা ভেতরে দেবে ও দোয়া পাঠ করবে। বের হওয়ার সময় প্রথম ডান-পা বের করবে এবং দোয়া পাঠ করবে। নতুন কাপড় পরার সময় দোয়া পড়বে। স্ত্রীর নিকট গমনের সময় দোয়া পাঠ করবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দোয়া পাঠ করবে। মোটকথা, যে সকল স্থান ও সময়ের জন্য দোয়া বলে দেয়া হয়েছে, সেগুলো যথানিয়মে পাঠ করাই হলো 'অধিক যিকির'। এসব দোয়া পুস্তিকা আকারে ছাপাও হয়েছে। ছোটদেরকে যদি এসব দোয়া মুখস্থ করিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যাবে, জিন্দেগীও ইসলামী হয়ে যাবে। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে– মল-মূত্র ত্যাগকালে, পানাহার কালে, পোশাক পরিধানকালে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎকালে, অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, স্ত্রীর সাথে মিলনের সময়– এসব দোয়া পাঠ করতে হয়। তাহলেই জিন্দেগী

ইসলামী রূপ ধারণ করবে এবং যিকিরকারীর অধিক যিকিরও বিনাক্লেশে লাভ হয়ে যাবে। অতি সহজ আমলগুলো বাচ্চাদের মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং বড়দের মুখস্থ করিয়ে ফেলা। মাস-দেড় মাসে সব মুখস্থ হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাটটি দোয়া হবে। যদি বেশিও হয়, একশ'র বেশি হবে না। যদি দৈনিক একটি করে দোয়া মুখস্থ করা হয়, তাহলে তিন-চার মাস সময় লাগবে এবং তিন-চার মাস সময়ে সম্পূর্ণ দীনের রূহ 'যিকির' হাসিল হয়ে যাবে। আর বাচ্চারা তো অতি সহজে মুখস্থ করে নিতে পারবে। কয়েক দিনেই তাদের কাজ হয়ে যাবে। এভাবে 'যিকরে কাসীর'-এর দৌলত হাসিল হয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ কাজটিও করে নিতে পারেন– প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর কিছু সময় আল্লাহর কাজে ব্যয় করা। পার্থিব কাজকর্মের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় রয়েছে। এ থেকে কিছু সময় যদি আল্লাহর কাজের জন্য ব্যয় করা হয়, তবে এটা বড় কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ জীবনই আল্লাহর কাজে ব্যয় করা ও কিছু সময় পার্থিব কাজে ব্যয় করা উচিত ছিল। অথচ আমরা সবটুকু সময়ই দুনিয়ার জন্য নিয়ে যাই, সামান্যতম সময়ও আল্লাহর নামে ব্যয় করি না। প্রতিদিন ফজরের নামায শেষে একশ'বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। ইস্তেগফার– 'আসতাগফিরুল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়াতুবি ইলায়হি' একশ'বার, দরূদ শরীফ একশ'বার পড়ুন। এটা কোন কঠিন কাজ নয়। পনর-বিশ মিনিটের ব্যাপার। এতে যিকরে কাসীর হাসিল হয়ে যাবে। ঐসব দোয়া সকালে একবার এবং রাতে শোয়ার সময় একবার পড়ে নিন। যদি দু'বেলা না পারি তাহলে অন্তত যে কোন এক সময়– সকাল হোক, বিকাল হোক– পড়ে নেব। এ উদ্দেশ্যে শোয়ার সময় আধঘণ্টা ব্যয় করি। এতে আমাদেরকে যাকেরীনদের মধ্যে গণ্য করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে মহান যিকিরের ফযিলতও হাসিল হয়ে যাবে। মানুষ যদি ধার্মিক হতে চায় তবে ধর্মকর্ম অতি সহজ। দুনিয়া উপার্জন অত্যন্ত কঠিন কাজ। চব্বিশ ঘণ্টা মন-মস্তিষ্ক দোকানে লাগিয়ে না রাখলে দুনিয়া অর্জন হয় না। কিন্তু দীন ও আল্লাহর যিকির সামান্য সময়েও হতে পারে। বিশ মিনিট ব্যয়ে দুনিয়া অর্জন কঠিন কিন্তু দীন হাসিল করা সহজ। মানুষ সহজকে ত্যাগ করে কঠিনকে গ্রহণ করেছে। সকাল-বিকাল ও বিভিন্ন সময়ের পাঠ্য দোয়াগুলো শিখে নিন, যথাসময়ে পাঠ করুন, ইনশাআল্লাহ অনেক বরকত পেয়ে যাবেন।

আমার পাঠ করা আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করলাম। মহান আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর যিকির ও স্মরণ করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর মর্জি মোতাবেক চলার শক্তি দিন। দীনের

মহব্বত দিয়ে আমাদের অন্তর ভরে দিন। আর মহব্বতের মাধ্যমে দীনের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য পালন করে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন!

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب- اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم- وارنا منا سكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم- وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين بر حمتك يااالرحم الراحمين-

বয়ান : ২

প্রসঙ্গ : আল্লাহর মারেফাত

মানুষ যদি চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ অন্তরে অনুভব করতে পারে ও তা বুঝতে পারে। মানুষ হাজারো পরিকল্পনা করে– কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। কিন্তু সফলকাম হয়– সফলতা লাভ করে অল্প সংখ্যক মাত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য হয়। কোন মানুষ কি চায়, আমি অকৃতকার্য হই। আমার শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক। কেউ কি পছন্দ করে আমি দোকানপাট করে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হই? মুনাফা ও সফলতার আশা নিয়েই তো ব্যবসা শুরু করে, সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম করে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের চেষ্টাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিতকারী ঐ সত্তাটি কে?

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالأَنْعَـٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ط كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

তুমি কি দেখনি, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদ্‌গত করি। পর্ববতসূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গিরিপথ সাদা-লাল ও নিকষ কালো। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জীবজন্তু ও প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীগণই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল। [ফাতির : ২৭-২৮]

অভিনন্দনের জবাবে[১]

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এইমাত্র আপনাদের সামনে আমার একজন শ্রদ্ধেয় ভাই দারুল উলুম দেওবন্দ এবং সেখানকার বুযুর্গদের সম্পর্কে এমন কি আমার সম্পর্কেও যেসব কথাবার্তা বলেছেন এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো– দারুল উলুম ও সেখানকার বুযুর্গদের সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, তা সবই সত্য। দারুল উলুম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং সেখানকার অনেক বুযুর্গ ছিলেন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এখনও রয়েছেন। তবে আমার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন এটা কেবল তাঁর সুধারণা, মহানুভবতা। আমার মধ্যে এমন কোন গুণ ও যোগ্যতা নেই; শুধু এতটুকু আছে যে, তিনি নিজে যেমন দারুল উলুমের ফাযিল এবং সেখানকার বুযুর্গদের খুশচীন ফয়েযপ্রাপ্ত, আমিও দারুল উলুমের একজন ফাযিল ও ফয়যপ্রাপ্ত।

দারুল উলুমের উন্নতি অদৃশ্য শক্তির দান

দারুল উলুমের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো– বিগত ৩৫ বছরে আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা হলো– দারুল উলুমের পরিচালনায় অদৃশ্য একটি শক্তি রয়েছে। এ কথা কেবলই একটি অপবাদ যে, অমুক মুহতামিম বিরাট কাজ করেছেন, দারুল উলুমকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আসলে এটা কেবল একটি মাধ্যম বা উসিলামাত্র; প্রকৃতপক্ষে দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অদৃশ্য শক্তি দ্বারাই হচ্ছে। আর অপবাদস্বরূপ নাম এসে যায় যে, অমুক মুহতামিম বা পরিচালক হিসেবে রয়েছেন। তিনি এই করেছেন, সেই করেছেন। অথচ তাঁর দ্বারা যা কিছুই হয়েছে, সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়েছে।

کارزلف تست مشک افشانی اما عاشقاں

مصلحت را تہمتے بر اہوئے تو بستہ اند

---

১. ২৯ জুলাই ১৯৬৩ ইং আফ্রিকায় এ ওয়াজ করেছিলেন।

ফারসি কবি তার প্রিয়জনকে সম্বোধন করে বলছেন– বাস্তবে প্রকৃত মাহবুব ও প্রিয়জন আল্লাহ তায়ালাই– তাঁকেই বলছে, তোমারই কেশগুচ্ছের প্রতিক্রিয়া, যে মেশককে কালো ও সুগন্ধিময় করে সৃষ্টি করেছে। অপবাদস্বরূপ বলা হয়ে থাকে– মেশক হরিণের ভেতর পয়দা হয়। নিরীহ হরিণের কি শক্তি, কি ক্ষমতা ছিল– মেশক পয়দা করবে? তার মধ্যে রয়েছে কেবলই রক্ত। রক্তকণাকে একত্র করে কালো করে দেয়া, তারপর সুগন্ধ করে দেয়া। হে আল্লাহ! এ তো কেবলমাত্র তোমারই কাজ, হরিণের কাজ নয়। হরিণের শিরার ভেতর রক্ত জমে মেশক পয়দা হচ্ছে! হে আল্লাহ! তুমিই সৃষ্টিকারী, হরিণ কস্তুরির পয়দাকারী নয়। সে একথাও জানে না যে, তার মধ্যে রক্ত রয়েছে। সে একথাও অনুভব করতে অক্ষম, রক্তকণার মধ্যে কিভাবে সুঘ্রাণ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যখন মৃগনাভী থেকে সুগন্ধি বের হলো– মানুষ বলতে আরম্ভ করলো, 'হরিণের ভেতর হতে সুগন্ধি বের হয়েছে।' অথচ ক্ষমতাহীন হরিণ এ কথাও জানে না, সে রক্ত কোথা হতে আসছে? কিভাবে কালো রঙ ধারণ করছে, কিভাবে মৃগনাভীর সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন, অমুক ব্যক্তি মুহতামিম, তাঁর যুগে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তার জানা নেই। উন্নতি কিভাবে হয়েছে, কিভাবে এ দারুল উলুম পরিচালিত হচ্ছে। এটা হলো– কেবল একটি অদৃশ্য শক্তি যা পরিচালনা করছে। এটি একটি অসার কথা যে, অমুক ব্যক্তি এ সব করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এমন মুখলেস নিঃস্বার্থ বুযুর্গানেদীনের হাতে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যাঁদের ইখলাস ও আন্তরিকতার বরকতে আজ পর্যন্ত দারুল উলুম সচল রয়েছে। অথচ অপবাদ আসছে আমাদের ওপর। বরং আমাদের মন্দগুলো দারুল উলুমের ছায়ার নিচে লুকিয়ে রয়েছে। আসল উন্নতি তো দারুল উলুমেরই। এর পরিচালক এমন তেজোদীপ্ত শক্তি দ্বারা একে চালু করে যান, সেই শক্তিতে আজও তা সমানভাবে চলছে। আমাদের কাজ একে পরিচালনা করা নয়,। আমরা তো নিজেদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত রেখেছি যাতে আমাদের কাজ হয়ে যায়, স্বার্থরক্ষা হয়। আমরা দীন ও ইলম হাসিল করছি। এ হলো দারুল উলুমের বরকত। এমন নয় যে, আমরা দারুল উলুমকে তৈরি ও পরিচালনা করছি। তাকে তার পরিচালক উন্নতি দান করছেন; বরং গায়েবি (অদৃশ্য) শক্তি তা পরিচালনা করছে এবং ঐ সকল ওলী ও বুযুর্গদের বরকত, যাঁদের ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র মারেফত বা পরিচয় লাভই দারুল উলুমের প্রাণ

কিভাবে তাঁরা ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন?

বাস্তব কথা হলো– প্রতিষ্ঠাকারী সবাই ছিলেন আরিফ বিল্লাহ, আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর মারেফত (পরিচয়) ও তাঁর গুণাবলীর সঠিক জ্ঞান তাঁদের অন্তরে ছিল। তাঁরাই দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের বরকতেই আজ পর্যন্ত দারুল উলুম গতিশীল রয়েছে। তাই দারুল উলুমের প্রকৃত রূহ ও প্রাণ আল্লাহর মারেফত, আল্লাহর পরিচয়– তাঁদের অন্তরে ছিল। তাঁরাই এর ধারক ও বাহক ছিলেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

راس العلم معرفة الله

সর্বোত্তম ইলম হলো আল্লাহর মারেফত ও পরিচয়।

আপনি পাহাড়-পর্বত, মাটি ও জমিনের পরিচয় লাভ করুন। আপনার বাসভবনের পরিচয় লাভ করুন। পৃথিবীর মধ্যে ময়ূর প্রভৃতির পরিচয় লাভ করুন কিন্তু আপনাকে আরিফ (পরিচয়কারী) বলা হবে না। যদি আল্লাহ পাকের যাত ও সিফাতের পরিচয় লাভে সক্ষম হন, তাহলেই কেবল আপনাকে আরিফ বলা হবে। আলেম (জ্ঞানী), কামিল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) বলা হবে। ঐসব বুযুর্গানেদীন আরিফ বিল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার শানে জালালী ও জামালীর পরিচয় তাঁদের ছিল। এরই বরকতে এত বিরাট কাজ করে গিয়েছেন। আজ প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে বিশ্বের সর্বত্র এর ফয়েয পৌঁছে আলো বিতরণ করে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত থেকে আট হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানেও দারুল উলুম পরিচিত একটি নাম। এ হলো তাঁদের বরকতের প্রকাশ। আর তাঁদের বরকত আল্লাহর মারেফতের অধীন ছিল। তাই প্রকৃত জিনিস যা দারুল উলুমকে পরিচালনা করছে, তা হলো আল্লাহর মারেফত, আল্লাহর পরিচয় লাভ।

আসল কথা, আল্লাহর মারেফতই হলো বিশ্বজগতে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম। এ জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, হাদীসের আগমন ঘটেছে। এ কাজের জন্যই উলামায়ে কিরামের চেষ্টা-পরিশ্রম, যেন আল্লাহর মারেফত হাসিল হয়ে যায়।

দলিল দিয়ে নয়, মানুষ আল্লাহকে স্বীকার করে স্বভাবজাতভাবে

কালামে পাকে আল্লাহর মারেফত ও পরিচয় লাভের অনেক পথ ও পন্থা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সব পন্থার সার হলো– আল্লাহর কুদরত ও মহাশক্তির কিছু বাস্তব নিদর্শন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু নিদর্শনবিশেষ সর্বত্র রয়েছে।

যিনি এ সবের পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার মারেফাত ও পরিচয় লাভে সক্ষম হয়েছেন। প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদে আছে– 'ইমারত ও দালান দেখে নির্মাতার পরিচয় পাওয়া যায়, লেখা দেখে লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, কবিতা দেখে কবির পরিচয় লাভ হয়।' সুতরাং এ বিশাল বিশ্বজগত এবং এর মহানিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করে আপনা থেকেই স্বীকার করতে হয় যে, এসবের নির্মাণকারী অতি মহান, অত্যন্ত পরাক্রমশালী যাত ও সত্তা রয়েছেন। সে মহান যাতই এ সব সৃষ্টি করে রেখেছেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ঘটনা। তাঁর যুগে উমাইয়া বংশের খলিফা ছিলেন মাহদী। তাঁর দরবারে এক নাস্তিক আসলো। সে আল্লাহর যাত ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। সে বলল– আল্লাহ আছে, তা আমি স্বীকার করি না। এই বিশ্বজগত তার ক্রমবিবর্তনের ধারায় আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। মানুষের জন্ম-মৃত্যু– সবই হলো এ বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই। এ-ই ছিল তার দাবি। যা যা বলছে তা খণ্ডন করার জন্য সে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল– মুসলমানদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ আলেম তাঁকে আমার মোকাবেলায় ডাকা হোক। আমি তাঁর সাথে এ বিষয়ে বাহাস করতে প্রস্তুত। সে আরও বলল– বিশ্ববাসী ভুল-ভ্রান্তিতে রয়েছে এবং অযথা নিজের শক্তি ও সামর্থকে অদৃশ্য শক্তির অধীন করে রেখেছে, যে শক্তি সমগ্র বিশ্বকে প্রতিপালন ও পরিচালনা করছে। সে যুগে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আলেম ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। খলিফা মাহদী ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। সময় ছিল রাত। উল্লেখ্য যে, রাতেই খলিফার দরবার বসতো। লোকটিকে এ কথা বলে পাঠানো হলো– ইমাম সাহেব যেন এসে এই নাস্তিকের সাথে বাহাসে অবতীর্ণ হন এবং তাকে বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করেন।

খলিফার প্রেরিত লোকটি গিয়ে পৌঁছালো। বাগদাদ শরীফে একটি বিশাল নদী রয়েছে। যাকে বলা হয় দজলা (তাইগ্রীস)। এক তীরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদসমূহ আর অন্য তীরে ছিল শহর। তাই নদী পার হয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছতে হলো তাঁকে।

প্রেরিত লোকটি বলল– খলিফার দরবারে একজন নাস্তিক উপস্থিত হয়েছে। সে দাবি করছে– আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোন অস্তিত্ব নেই। এই বিশ্বজগত প্রাকৃতিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আপনাকে বাহাস করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন– আপনি গিয়ে বলুন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।

লোকটি ফিরে গিয়ে বললো– আমি ইমাম সাহেবকে বলে এসেছি। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন।

এদিকে খলিফার দরবার চলছে। খলিফা, মন্ত্রীবর্গ আমির-উমরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই মাহফিলে উপবিষ্ট। নাস্তিকও বসে আছে। ইমাম সাহেবের অপেক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু ইমাম সাহেব আসছেন না। রাত বারোটা বেজে গেছে কিন্তু ইমাম সাহেব তখনও আসেননি।

নাস্তিক নিজের জন্য সুযোগ মনে করে বলতে লাগলো– মনে হয় ইমাম সাহেব ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, কোন বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উপস্থিত হয়েছে। তার সাথে পেরে ওঠা যাবে না। তাই হয়তো নিজ গৃহে আত্মগোপন করে আছেন। আপনারা বিশ্বাস করুন, তিনি আসবেন না। আমার সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহস কেউ-ই দেখাতে পারে না।

খলিফা ভাবিত হলেন। উপস্থিত সবাই হয়রান ও পেরেশান হচ্ছেন। নাস্তিক বসে বসে তার বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রকাশ করে চলেছে। রাত যখন একটা বেজে গেল, তখন ইমাম সাহেব দরবারে এসে পৌছলেন। খলিফা তাঁকে যথাযোগ্য আদব ও সম্মান প্রদর্শন করলেন, যেমনটা উলামায়ে কেরামের জন্য করা উচিত। খলিফার সঙ্গে সকলেই ওঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

খলিফা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি এত বিলম্ব করলেন কেন? রাত আটটায় লোক পাঠানো হয়েছিল, আর এখন বাজে একটা। এত অধিক বিলম্বের কারণ কি? খলিফার নির্দেশ দ্রুত পালন করা উচিত ছিল; এতটা বিলম্ব করা উচিত হয়নি।

ইমাম সাহেব বললেন– এক আজব ও অদ্ভূত ঘটনা ঘটে গেছে– যে কারণে আমার বিলম্ব হয়েছে। জীবনে আমি এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি। আমি বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েছি যে, এ কী ঘটনা ঘটলো!

ইমাম সাহেব এত জোর দিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন যে, উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন।

ইমাম সাহেব বললেন– বিস্ময়কর ঘটনাটির মর্ম আমি এখনও বুঝতে পারছি না, কী ঘটনা সংঘটিত হলো! উপস্থিত সবাই যখন ঘটনা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন, তখন খলিফা নিজেই বলতে লাগলেন– বলুন কি ঘটনা

ঘটেছে?

তিনি বললেন, ঘটনা হলো এই– আমি যখন শাহীমহলে আগমনের লক্ষ্যে রওয়ানা হলাম, তখন পথিমধ্যে ছিল বিরাট নদী। নদীর তীরে যখন পৌঁছলাম তখন রাত গভীর। কোন মাঝি-মাল্লা নেই, কোন নৌকা নেই। নদী পার হওয়ার কোন উপায়ই নেই। আমি হয়রান-পেরেশান হচ্ছিলাম– কেমন করে নদী পার হবো। আমি এভাবে পেরেশান ও চিন্তামগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ দেখতে পেলাম– নদীর মাঝ থেকে একের পর এক অতি সুন্দরভাবে তৈরি তক্তা বের হতে আরম্ভ করলো। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখছিলাম আর বলছিলাম– হে আল্লাহ! নদী হতে মণি-মুক্তা বের হতে পারে, মাছ ছুটে আসতে পারে, কিন্তু এরূপ তক্তা কোথা থেকে বের হচ্ছে? এ তো কখনো দেখিনি, কখনো শুনিওনি? আমি এ চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলাম। হঠাৎ এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হতে লাগলো। তক্তাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটার সঙ্গে অন্যটি জোড়া লাগতে আরম্ভ করলো এবং নৌকার আকার ধারণ করলো। আমি বললাম– হে আল্লাহ! কিভাবে নৌকা তৈরি হয়ে গেল, কে বৃক্ষ চিরে তক্তা তৈরি করলো, পরস্পরে জোড়া দিল। ওপর নীচ হয়ে তক্তাগুলি সংযোজিত হলো!

আমি এ চিন্তাই করছিলাম। এমন সময় দেখি হঠাৎ নদী থেকে পিতলের পেরেক বের হতে আরম্ভ করছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তক্তার জোড়ায় ঢুকতে শুরু করছে। সব ঠিকঠাক হয়ে অতি উন্নতমানের একটি নৌকা তৈরি হয়ে গেল।

আমি বিস্ময়াভিভূত! বিষয় কি! ব্যাপার কি! তক্তা দিয়ে পানি নৌকার ভেতর প্রবেশ করছিল। এ সময় নদী থেকে এক প্রকার তেল বের হলো এবং সকল জোড়ায় তেল লেগে গেল। এবার তাতে পানি প্রবেশও বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তখনো ঐ চিন্তায় বিভোর। এরপর দেখলাম নৌকাটি আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং নদীর কিনারায় এসে এমনভাবে থেমেছে, মনে হয় যেন আমাকে আরোহী করতে চায়। আমিও আরোহণ করলাম। নৌকা নিজেই আমাকে নিয়ে চলতে লাগলো। নদীর স্রোত উপেক্ষা করে বিপরীত দিকে চলছিল। কেননা শাহী মহল বিপরীত দিকে ছিল।

আমি পেরেশান ছিলাম– ইয়া আল্লাহ! স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালিয়ে কে নিয়ে যাচ্ছে? শেষ পর্যন্ত শাহী মহলের নিকট এসে এমনভাবে থেমে গেল, যেন আমি অবতরণ করতে পারি। আমি অবতরণ করলাম। তারপর আমি দেখতে দেখতে নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেল। নদীর এপারে ঘণ্টা খানেক এবং ঐ পারে

ঘণ্টা-খানিক দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম, এটা হলো কি? এই ছিল ঘটনা এবং আমার বিলম্বের কারণ।

এবার নাস্তিক বলে উঠলো– ইমাম সাহেব! আমি তো শুনেছিলাম, আপনি একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী আলেম কিন্তু এখন দেখছি শিশুর মতো কথাবার্তা বলছেন। এ-কি সম্ভব যে, নদীর পানি থেকে নিজে নিজে তক্তা বেরিয়ে আসবে, নিজে নিজে জোড়া লেগে যাবে, পেরেক নিজে নিজে ঢুকে যাবে, তেল নিজেই এসে লেগে যাবে, নৌকা এসে নিজেই আপনার নিকট পৌঁছে যাবে, আপনি আরোহণ করলে নিজেই চলতে লাগবে, নিজেই আপনাকে নিয়ে এপারে পৌঁছিয়ে দেবে। এ কি কোন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের কথা হতে পারে! আমি মনে করেছিলাম আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম। ইমাম আপনার উপাধি অথচ কথা বলছেন আপনি বোকার মতো, ছেলে মানুষের মতো। এটা কেমন করে সম্ভব যে, নৌকার কোন প্রস্তুতকারী নেই অথচ নৌকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। পেরেক ঢুকাবার কোন মিস্ত্রী নেই অথচ ঢুকে যাচ্ছে। তেল নিজেই লেগে যাচ্ছে কোন লেপনকারী ছাড়াই। নৌকা চলছে অথচ কোন মাঝি-মাল্লা নেই। নিজেই চলছে। শাহী মহল চিনে ও পরিচয় করে নিচ্ছে অথচ পরিচয় করিয়ে দেয়ার কেউ নেই। এসব কোন বুদ্ধিমানের কথা হতে পারে না।

ইমাম সাহেব বললেন– আচ্ছা তবে কি এসব কথা জ্ঞানবুদ্ধির পরিপন্থী বোকা ও নাদানদের কথা?

সে বললো– হ্যাঁ, অবশ্যই তা বোকা ও নাদানদের কথা।

এবার ইমাম সাহেব বললেন– একটি নৌকা মিস্ত্রী ছাড়া তৈরি হতে পারে না, পরিচালকবিহীন চলতে পারে না, মিস্ত্রী ছাড়া গ্রথিত হতে পারে না। আর এদিকে এত বিরাট বিশ্বজগত– যার ছাদ হলো আকাশ, যার বিছানা হলো ভূ-মণ্ডল, যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণী, এসব নিজেরাই হয়ে গেছে, স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টি হয়েছে, পরিচালকবিহীন চলছে, চাঁদ নিজেই চলছে, সূর্য নিজেই চলছে– এটা কি কোন বুদ্ধিমানের কথা, বিবেক-বুদ্ধির কথা? একটি সাধারণ নৌকা– যা মানুষ তৈরি করতে পারে– তা প্রস্তুতকারক ছাড়া তৈরি হতে পারে না; তাহলে এ বিশাল সৃষ্টিজগত– যা মানবশক্তির বহু ঊর্ধ্বে, তা নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে গেল কেমন করে? এখন চিন্তা করে দেখ– তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি শিশুসুলভ, না আমার? আমি নির্বোধ না তুমি নির্বোধ?

এখানেই শেষ হয়ে গেল এবং নাস্তিক শুষ্ক মুখ ও মলিন চেহারা নিয়ে চলে গেল। এখন তর্ক করবে কি? তার জ্ঞান-বুদ্ধির সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

এজন্য বলি, প্রকৃত কথা হলো– আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর মারেফত ও পরিচয় দলিল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়; বরং মানুষের আত্মা ও প্রকৃতি নিজেই বলতে থাকে, সৃষ্টিজগতের কোনো স্রষ্টা নিশ্চয়ই রয়েছেন। মানুষের আত্মার ওপর কুদরতি চাপও রয়েছে। একজন অমুসলিম এবং একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেও তার অন্তরে এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। অথচ সে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেনি। কোন মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেনি, কিন্তু তার অন্তরে এর প্রবল প্রভাব অনুভব করে।

মানুষ যদি চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ অন্তরে অনুভব করতে পারে ও তা বুঝতে পারে। মানুষ হাজারো পরিকল্পনা করে– কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। কিন্তু সফলকাম হয়– সফলতা লাভ করে অল্প সংখ্যক মাত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য হয়। কোন মানুষ কি চায়, আমি অকৃতকার্য হই। আমার শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক। কেউ কি পছন্দ করে আমি দোকানপাট করে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হই? মুনাফা ও সফলতার আশা নিয়েই তো ব্যবসা শুরু করে, সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম করে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের চেষ্টাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিতকারী ঐ সত্তাটি কে?

মানুষের ইচ্ছা, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকে যে, তার সন্তান হোক কিন্তু বিয়ে করার পর বিশ-ত্রিশ বছর কেটে যায়; কত চিকিৎসা করা হয়, দোয়া ও তদবীর করা হয়, কিন্তু সন্তান লাভ হয় না। আবার কেউ কেউ চায় আমার সন্তান না হোক। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেন সন্তান উৎপাদন বন্ধ থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও ঘন ঘন সন্তান জন্মলাভ করতে দেখা যায়। সার কথা, কেউ কেউ চায় সন্তান না হোক কিন্তু হচ্ছে। আবার কেউ চায় সন্তান হোক কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে, সন্তান হচ্ছে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় তার ব্যবসাতে মুনাফা হোক কিন্তু তা হচ্ছে না। আবার কারো কারো বা মুনাফা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এসব হচ্ছে কোন অদৃশ্য *মহাশক্তির জোরে?*

মানব *জাতি হচ্ছে সৃষ্টির সেরা।* তার কর্মকাণ্ডই যখন সফল হচ্ছে না, তখন *ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি* ইতর প্রাণীর কোন কথাই ওঠে না। এদের স্তর অনেক নিচে। বৃক্ষ-তরু বা পাথরের স্তর আরো নিচে। সৃষ্টির সেরা মানব জাতিই যখন

তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে ব্যর্থ, তখন অন্যদের আলোচনা করাটা নিরর্থক। সর্বোত্তম সৃষ্টিই যখন অপারগ-সহায়হীন, তাহলে নিশ্চয়ই মহাশক্তিশালী কোন সত্তা রয়েছে যা এসবকে পরিচালনা করছে এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষ হাজারো আকাঙ্ক্ষা করে, অনেক অনেক কামনা-বাসনা থাকে তার অন্তরে, কিন্তু সব পূর্ণ হয় না। সে পেরেশান হয়, কষ্ট করে কিন্তু যা হওয়ার তাই হয়। চেষ্টা-তদবীর পেরেশানী সব বেকার হয়ে যায়। ইহলোক ছেড়ে করে কেউ কি পরলোকে যেতে চায়? সবাই বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, সাবধানতার সাথে পথ্য সেবন করানো হয়। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রাতঃভ্রমণ করে। আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে চলে যায়, যেন কোন মতে প্রাণে বাঁচতে পারে। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে হাজির হয়, বাদশাহ-নবাব, ধনী-দরিদ্র সবাইকে মজবূর হয়ে বাধ্য হয়ে যেতে হয় পরপারে। যদি অর্থব্যয়ে প্রাণ রক্ষা সম্ভব হতো, তবে বিত্তশালী, পুঁজিপতি একজনেরও মৃত্যু হতো না; নিঃস্ব-গরীবরাই কেবল মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হতো। আর রাজা-বাদশাহগণ মৃত্যুর নামও উচ্চারণ করতেন না। কোষাগারের দ্বার খুলে দিতেন মালাকুল মওতের জন্য। কিছু তার সহকর্মী ফেরেশতাগণের জন্য ঘুষ হিসেবে নিজের প্রাণ রক্ষার খাতিরে। এভাবে সম্পদশালীরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যেতেন। অথচ বাস্তবে সবাইকে মরতে হয়। কেউ মরতে চায় না, কিন্তু সবাই মরছে। চিন্তার বিষয়, কোন্ সে সত্তা যিনি সবাইকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছেন? কে সেই মহান যাত যিনি ইচ্ছা ও মর্জির খেলাফ আমাদের জীবন কেড়ে নিচ্ছেন? এ পৃথিবীতে আমরা স্বেচ্ছায় আগমন করিনি, প্রস্থানও স্বেচ্ছায় হবে না। যখন আসতে হয় তখনও আমরা অসহায়, আসতে বাধ্য। যখন ইহলোক ত্যাগ করে যাওয়ার সময় হবে তখনও যেতে বাধ্য। আমরা যে অসহায়-হীনবল তা আমরা অপর এক শক্তির মাধ্যমে অনুভবও করি। মজবূরের জন্য কোন না কোন মজবূরকারী অবশ্যই থাকতে হবে– যে আমাদেরকে বাধ্য করবে।

আমরা মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্টি। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করিনি। আমরা যেহেতু মাখলুক বা সৃষ্ট সুতরাং মাখলুকের জন্য খালেক অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা অবশ্যই থাকতে হবে– যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। নইলে নিজেদেরকেই সৃষ্টিকর্তা হতে হবে। আমর যেহেতু অসহায়-আজ্ঞানুবর্তী, তাই একজনকে অবশ্যই ক্ষমতাসীন থাকতে হবে। আমরা যেহেতু রিযিক (আহার্য) প্রাপ্ত তখন রাযিক (আহারদাতা) একজন অবশ্যই থাকবেন। মানুষ তার প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ এবং আল্লাহর নিদর্শসমূহের পরিচয় লাভে সক্ষম হয়ে যায়।

দলিল-প্রমাণাদি দিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভের কোন প্রয়োজন নেই; বরং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই এমন সব বিষয় রয়েছে যেগুলো তাকে আল্লাহ ও আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করতে, মেনে নিতে বাধ্য করে।

আকল ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া গেলে তো দার্শনিকরা আরেফ ও কামেল হয়ে যেতেন

নিত্যদিনকার ঘটনাবলী থেকেও আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করতে পারি। তবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। যদি প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ হতো, তাহলে দার্শনিকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ আরিফ ও ওলী হতেন, আল্লাহর ভক্ত ও অনুসারী হতেন। কিন্তু বাস্তবে অনেক দার্শনিক ও জ্ঞান-বুদ্ধির পূজারী আল্লাহ থেকে অনেক দূরে ও আল্লাহবিমুখ রয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর মারেফত বিবেক-বুদ্ধি ও প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

হযরত ইমাম রাযী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও একত্ববাদের ওপর এমন একশ' প্রমাণ বের করেছিলেন, যেগুলো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অত্যন্ত মজবুত ছিল তাঁর এসব দলিল। এসব দলিল-প্রমাণের ওপর তাঁর অহংকারও ছিল যে, আমার ঈমানই সর্বাধিক মজবুত ও সুদৃঢ়। কারণ, ঈমান ও আল্লাহর একত্বের ওপর একশ' দলিল-প্রমাণ আমি কায়েম করেছি। তাছাড়া অশিক্ষিত মানুষকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন, অবজ্ঞার চোখে দেখতেন এ কারণে যে, এদের ঈমান কোন মজবুত ভিত্তি ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রকৃত ঈমান হলো আমার ঈমান– আমি সুদৃঢ় দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিশ্বাস করেছি– অশিক্ষিত লোক যার কিছুই জানে না। তাদের ঈমান হলো তাকলীদী বা অন্ধ অনুকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

একদিন ইমাম রাযী (রহ.) একটি কৃষি খামারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। খামারের এক কৃষক তাঁর সামনে এলো। বেচারা কৃষক অশিক্ষিত ছিল। মৌলভীও ছিল না, দার্শনিকও ছিল না। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কে? সে উত্তর দিল– আমি একজন মুসলমান। আবার জিজ্ঞেস করলেন– মুসলমান কাকে বলা হয়? উত্তর দিল– যে ব্যক্তি স্বীকার করে আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, পরকাল সত্য, সে-

ই মুসলমান। ইমাম সাহেব বললেন– তুমি মুসলমান তা ঠিক। কিন্তু তোমার ঈমানের প্রমাণ কি? গ্রাম্য কৃষক বললো– মনে হয় তুমি কোন নাস্তিক! এই বলে লাঠি হাতে নিয়ে ইমাম সাহেবের পিছনে ধাওয়া করলো, দাঁড়াও! এখনই তোমাকে প্রমাণ দিচ্ছি কেমন করে আমি মুসলমান! ইমাম সাহেব সামনে আর কৃষক পিছনে দৌড়াচ্ছেন। কৃষক বলছে– মুসলমান হওয়ার প্রমাণ তালাশ করছো? মুসলমান আল্লাহর পরিচয় লাভ করে অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা, দলিল-প্রমাণ দিয়ে নয়। প্রমাণের অস্তিত্ব তো কাঠের মতো, যা আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়, পানির ওপর ভেসে যায়, বাতাসে উড়ে যায়। কাজেই আল্লাহর অস্তিত্ব দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহর অস্তিত্ব ও মারেফাত অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা লাভ হয়। আর অন্তরের সুদৃঢ় অটল বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আমি আছি, আমার নিদর্শনসমূহও আছে।

কুরআন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে

কুরআনুল কারীম যেখানেই আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ পেশ করেছে, সেখানে মানতিকী ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশ করেনি; বরং বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী পেশ করে বলেছে, তোমরা এসবকে গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কর এবং এসব থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণসহ অনুধাবন কর। আর এসবের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ কর।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি ঘটনা আমার স্মরণে আসছে। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল– আপনি আল্লাহর পরিচয় লাভ করলেন কেমন করে? তিনি বললেন– আমি শাহতুত গাছের পাতা থেকে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছি। শাহতুতের পাতা বকরী খেলে বের হয় গোবর, হরিণ খেলে বের হয় মৃগনাভী, রেশমের পোকা খেলে বের হয় রেশম। একই পাতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে। এক স্থানে গোবর, এক স্থানে মেশক, অন্য স্থানে রেশম। এসব পাতার স্বভাবজাত নয়। স্বভাবজাত কাজ একটি হতে পারে, একটিই হয়ে থাকে, একাধিক হতে পারে না। এর স্বভাবের ওপর কোন্ সৃষ্টিকারী রয়েছেন– যিনি কখনো এ থেকে গোবর, কখনো মেশক আর কখনো রেশম সৃষ্টি করছেন? আমি এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পাতা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছি। মানুষ যদি বুঝতে চায়, তবে একটি ক্ষুদ্র পাতা থেকেও আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। আর

যদি বুঝতে না চায়, তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) হাজারো দলিল-প্রমাণ পেশ করলেও, হাজারো মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) দেখিয়ে বললেও বুঝবে না। আবু জাহেলের ভাগ্যে এ বুঝ ছিল না, আমরণ সে বুঝেনি। আবু লাহাব-এর ভাগ্যে রাসূলকে মান্য করার যোগ্যতাই ছিল না, শেষ পর্যন্ত সে মান্য করেনি। মান্য করলেন, আনুগত্য স্বীকার করলেন সিদ্দীকে আকবর (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.)। কেউ সিদ্দীক হলেন, কেউ হলেন ফারুক। আর যারা অমান্য করলো, তারা হলো আবু জাহেল, আবু লাহাব। বোঝা গেল, মানুষ যখন স্বীকার ও আনুগত্য করতে না চায়, তখন নবী-রাসূলও মানাতে পারেন না, আর যদি মানতে উদ্যোগী হয়, তাহলে ক্ষুদ্র শাহতুতের পাতা দেখেও আল্লাহর পরিচয় লাভে সক্ষম হয়।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো– আপনি কি মুসলমান?

তিনি বললেন– হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ!

সে জিজ্ঞেস করলো– মুসলমান কাকে বলা হয়?

উত্তর দিলেন– ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন করলো– আপনি কীভাবে জানতে পারলেন আল্লাহ এক, তিনি বিদ্যমান আছেন এবং বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করেছেন?

এবার ইমাম সাহেব যদি এ উত্তর দিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ কথা ঘোষণা করেছেন; তবে ঐ অশিক্ষিত ব্যক্তি তা অনুধাবনে সক্ষম হতো না। তাই তার বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাকে উত্তর প্রদান করলেন, তাকে বোঝালেন। বললেন– আমি আল্লাহর অস্তিত্বকে আশ্চর্যজনকভাবে জানতে পেরেছি। আমি পৃথিবীতে এমন একটি প্রাসাদ দেখেছি, যা রৌপ্য দিয়ে নির্মিত। এর মধ্যে কোন দরজা-জানালা, রওশনদান বা কোন প্রকার ছিদ্র নেই। এর ভেতরে স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত আরো একটি মহল রয়েছে। সে মহলেও দরজা, জানালা, ছিদ্র ইত্যাদি কোন কিছুই নেই। মোটকথা, এমন দু'টি প্রাসাদ রয়েছে। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রাসাদ দু'টি লক্ষ্য করছিলাম, হঠাৎ প্রাসাদের দেয়াল ভেঙ্গে গেল এবং এর ভেতর থেকে একটি প্রাণী বেরিয়ে আসলো। জন্মগ্রহণের পর শিশুরা অসহায় নির্বোধ থাকে, কিন্তু এই বাচ্চাটি এমন কাজ শুরু করে দিল যা অভিজ্ঞ প্রধানরা করে থাকেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই প্রাসাদের ভেতরে বাইরের কেউ যায়নি। আর বাচ্চাটি যেহেতু ভেতর থেকে বের হয়েছে, তাই অবশ্যই এ

প্রাসাদের ভেতর কোন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি তাকে প্রাসাদের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এ দ্বারা আমি এটাও বুঝতে পারলাম যে ঐ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর যাত ছাড়া অন্য কেউ নয়।

উপস্থিত জনমণ্ডলী আরয করলো– হযরত! যে রৌপ্য নির্মিত প্রাসাদ আপনি দেখে এসেছেন তা কোথায়? আমরা তো আজ পর্যন্ত তা দেখতে পাইনি? আবার রৌপ্যের প্রাসাদের ভেতরে স্বর্ণের আরেকটি প্রাসাদ রয়েছে। আপনি এমন প্রাসাদ কোন জগতে দেখেছেন, কোথায় দেখেছেন?

ইমাম সাহেব বললেন– তোমাদের এখানেও এ প্রাসাদটি রয়েছে।

তারা বললো– আমরা তো তা কখনো দেখিনি?

ইমাম সাহেব বললেন– তোমরা চোখ বন্ধ করে রেখে দিলে এর কোন ঔষধ ও চিকিৎসা আমার কাছে নেই। এ প্রাসাদটি তোমাদের ঘরেও রয়েছে।

তিনি বললেন– তোমরা কি কখনো ডিম দেখনি? এ হলো রৌপ্য নির্মিত একটি প্রাসাদ। এর ভেতর যে হলুদ রঙ রয়েছে, তা হলো স্বর্ণের মহল। এর মধ্যে দরজা, জানালা, ছিদ্র কোন কিছু নেই। বাইরের জিনিস ভিতরে এবং ভিতরের জিনিস বাইরে আসা-যাওয়া নেই। মুরগী ডিম নিয়ে বসে পড়ে। উনিশ দিন পর হঠাৎ উভয় প্রাসাদের দেওয়াল ভেঙ্গে যায় এবং ভেতর থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাগুলো বড়দের মত কাজ করতে আরম্ভ করে দেয়। অথচ সে কোন স্কুল-কলেজে যায়নি, কোন ডিগ্রী লাভ করেনি। পিতা-মাতার কাছ থেকেও কোন শিক্ষা পায়নি, অথচ পিতা-মাতার ন্যায় দানা খুটে খুটে খেতে শুরু করে দেয়। মাতা-পিতার ভাষায় কথাও বলতে শুরু করে।

অপরদিকে মানব শিশুকে যতক্ষণ মক্তবে বসানো না হবে, বই-পুস্তক, কিতাব পাঠ না করানো যাবে, সে পর্যন্ত মাতৃভাষাও শিখতে পারে না, কবি-সাহিত্যিক হতে পারে না। অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে তো কোন কথাই নেই। মাতৃভাষা সম্পর্কে যতক্ষণ বই-পুস্তক পড়ানো না হয়, লেখাপড়া করতে পারে না। কোনো মানব-সন্তান শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া মাতৃভাষাও পড়তে লিখতে পারে না। ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করার জন্য অনেক সফর করতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়, এরপর অন্য ভাষা শিখতে সমর্থ হয়। আর এখানে সোনা-রূপার প্রাসাদ থেকে একটি বাচ্চা বেরিয়ে এসে কড়-কড় আওয়াজ করতে থাকে এবং পিতা-মাতার ন্যায় কাজ করতে থাকে। যেন বয়স্কদের স্বভাব-প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। এই

নিশ্ছিদ্র প্রাসাদে কে তাকে শিক্ষা দিয়েছে? কে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তুমি এভাবে কথা বলবে। কে শিক্ষা দিয়েছে– প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে দানা খুটে খেতে হবে। এ শিক্ষা কে দিয়েছে? এ শিক্ষা দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ যিনি বলেছেন–

رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی

আমাদের প্রভু ঐ মহান যাত– যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর প্রত্যেক জিনিসের উপযোগী হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন– তুমি এ কাজ কর, এভাবে কর। [তাহা : ৫০]

যখন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মানবীয় কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। নড়ন-চড়ন, আহার-নিদ্রা, ওঠাবসা, কথা বলা, কোনরূপ শিক্ষা ছাড়াই করতে পারে। সুতরাং অবশ্যই তার ভেতর কোন শিক্ষা দানকারী রয়েছেন– যিনি অন্তরে পথ-নির্দেশ করছেন। আর ঐ পথ-নির্দেশকারীই হলেন মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি অদৃশ্য থেকে অন্তরে রাহনুমায়ী ও পথ-নির্দেশ করছেন।

অন্তরে আল্লাহ আসেন, ধারণায় নয়

কত চমৎকারই না বলেছেন আকবর ইলাহাবাদী–

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

তুমি তো হৃদয়ে আসো
মম ধারণায় তুমি আসো না।

প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে একথা রয়েছে– এমন কোন মহাশক্তিশালী যাত নিশ্চয়ই রয়েছেন, যিনি তাঁর শক্তি বলে এ বিশ্ব-কায়েনাত পরিচালনা করছেন। তাঁর যাত ও সত্তা মানবীয় জ্ঞান-সীমানার মধ্যে আসতে পারে না। তাই আকবর বলছেন–

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں بھی تری پہچان یہی ہے

তুমি তো হৃদয়ে আসো
মম ধরণায় তুমি আসো না।
আমি তো জেনে গেছি–
এই হলো তব পরিচয়।

যে সত্তা অন্তরে আসেন, ধারণায় আসেন না– এই তো আল্লাহর পরিচয়। যে বস্তু অন্তরে আসে, মানুষ প্রথমে তা বুঝে নিতে পারে। আমাদের অন্তরে প্রথমে একটি কল্পনা আসে। তা আমরা ভালভাবে বুঝে নিই। আমাদের অন্তরে কোন মতাদর্শের সৃষ্টি হলে প্রথমে আমরা তা হৃদয়ঙ্গম করে নিই। আর আল্লাহর সন্দেহমুক্ত অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে আসে অথচ আমরা তা বুঝতে পারি না, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না– তাঁর হাকীকত কি, তাঁর অবস্থা কি ও কেমন? মানুষ অসহায় ও অপারগ হয়ে অবশেষে তাঁর অস্তিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আত্মার মতো আল্লাহ আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র

বিষয়টি ঠিক এভাবে ভাবুন, যেমন- আপনি বিদ্যমান রয়েছেন। আপনার মধ্যে রূহ (আত্মা)-ও বিদ্যমান আছে। শরীরের প্রতিপালন ভেতরে থেকে রূহই করছে। শরীরে যে লাবণ্য রয়েছে, সজীবতা রয়েছে, তা রূহেরই কাজ। আত্মা যদি প্রস্থান করে, তাহলে শরীর শুকিয়ে যাবে, পচে-গলে কয়েক দিনের মধ্যে মাটির সাথে মিশে যাবে। মাটি মাটির সাথে, পানি পানির সাথে, হাওয়া হাওয়ার সাথে, আগুন আগুনের সাথে মিশে যাবে। সকল প্রকার প্রকৃতি নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব জিনিসকে আত্মাই একত্রিত করে রেখেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনি আত্মাকে দেখতে পাননি। অথচ বিশ্বাস করতে বাধ্য, নিশ্চয়ই আত্মা বিদ্যমান রয়েছে। যদি রূহ না-ই থাকতো, তাহলে আমাদের জীবন প্রদীপ উজ্জ্বল ও সচল আছে কেমন করে? আজ পর্যন্ত আপনি আপনার আত্মার অস্তিত্ব ও অবস্থানের ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ দাঁড় করতে পারেননি। কোন দার্শনিকও একথা বলেনি যে– দলীল-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ কর যে, আমার ভেতর আত্মা আছে, নইলে আমি মানবো না। একটি প্রমাণও যদি না থাকে, তবুও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিতে আপনি বাধ্য। যদি না মানেন, তাহলে আপনাকে জীবিত বলা যাবে না, আপনি জীবিত বলে দাবি করতে পারবেন না– বলতে হবে আপনি মৃত। আর জীবিত বলে দাবি করলে অর্থ দাঁড়াবে– আপনার মধ্যে রূহ বিদ্যমান আছে। অথচ মৃতের ভেতর রূহ থাকতে পারে না।

এবার জিজ্ঞাসা হলো– আপনারা কি কখনো আত্মাকে দেখেছেন? আপনাদের নিকট কোন প্রমাণ আছে কি? আমি সকলকে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের ভেতর রূহ আছে বলে কি কোন চাক্ষুস প্রমাণ কারও কাছে আছে? কোনই প্রমাণ নেই। আমি জানতে চাই, আপনারা কি কখনো আত্মা দেখেছেন? অবশ্যই আপনাদের জবাব হচ্ছে, কখনো দেখিনি। রূহের আকার-আকৃতি, রঙ-রূপ কেমন? আপনারা বলবেন– এসব কিছুই জানি না, তবে রূহ অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এবার বলুন, একটা প্রমাণও নেই, কখনো দেখেননি অথচ রূহ বিদ্যমান রয়েছে। রূহ এমন এক মাখলুক (সৃষ্টি) যাকে মানুষ বিনা দলীল-প্রমাণে মানে এবং বিশ্বাস করে। আর আল্লাহর যাতকে মানবে না, বিশ্বাস করবে না– সত্যিই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

আমাদের শরীর যখন আত্মাবিহীন এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারে না, তখন এত বিরাট বিশ্ব– যার মস্তক হলো আকাশ, পা হলো ভূমণ্ডল– এত বিশাল দেহ, রূহবিহীন কিভাবে টিকে থাকতে পারে! যদি তাঁর মধ্যে এমন রূহ বিদ্যমান না থাকে, যে রূহ একে পরিচালনা করছে, সচল ও সক্রিয় রেখেছে?

সার কথা, আপনি যেমন আপনার আত্মার জন্য দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নন, শুধুমাত্র একীন-বিশ্বাসের বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র কায়েনাত বা সৃষ্টজগতের মহাপরিচালককে প্রমাণ দিয়ে স্বীকার করা হয়নি; বরং অন্তরের একীন-বিশ্বাসের প্রবল চাপে মেনে নিতে হয়েছে।

যদি কোন একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষের শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, তুমি দেখে আসো, রূহ কোথায় বসে আছে, কি অবস্থায় আছে। মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, হাতে, পায়ে অথবা অন্য কোথাও। রূহের সিংহাসন কোথায়? তাহলে ঐ ব্যক্তি বলবে– যেখানেই দৃষ্টিপাত করছি, সেখানেই রূহের রাজত্ব, রূহের তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অথচ ইশারা-ইঙ্গিতে বলা যাবে না, রূহ অমুক স্থানে বসা আছে। যেখানেই দেহ বিদ্যমান, সেখানেই রূহ উপস্থিত– রূহ কার্যকর। চুল, নখ, চোখ– সর্বত্রই রূহ রয়েছে। আর যেমনিভাবে আমাদের রূহ আমাদের দেহে রয়েছে এবং আকার-আকৃতি হতে পবিত্র, ইশারা-ইঙ্গিতেও দেখান যায় না– ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বজগতের প্রাণকেন্দ্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর প্রতিও ইশারা-ইঙ্গিত করে বলতে পারবেন না– তিনি অমুক স্থানে রয়েছেন। তাঁর জন্য কোন দিকও নির্ণয় করতে পারবেন না। তিনি স্থান-কাল, ইশারা-ইঙ্গিত একদিক ও জেহেত হতে পাক-পবিত্র। তবে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে তাঁরই দ্যুতি– তাঁরই জ্যোতি কার্যকর রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন; তিনজনের পরামর্শে তিনি চতুর্থ, পাঁচজনের পরামর্শে তিনি ষষ্ঠ। তাছাড়া কমবেশি যাই হোক– যেখানেই তাঁরা থাকুক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন। [মুজাদালা : ৭]

তা সত্ত্বেও তাঁকে ইশারা-ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করা যায় না। তিনি মহান আল্লাহ। তাঁর কোন আকার নেই। তিনি দেহ হতে পাক-পবিত্র। আকার-আকৃতি হতে, রঙ-রূপ হতে পবিত্র। আল্লাহর সৃষ্টি আত্মারই যখন এ অবস্থা যে, ইশারা-ইঙ্গিত করে দেখানো যায় না; সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ পাকের যাত ও সত্তা এসব হতে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে; কল্পনাতীত ঊর্ধ্বে, তার বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ পর্যন্ত আপনারা কখনো আত্মার কায়া বা আকৃতি দেখেননি। আপনারা এ বিশ্বাসও রাখেন যে, রূহের কোন দেহ-কাঠামো নেই। আল্লাহ তায়ালাও আকার-আকৃতি হতে পাক-পবিত্র।

আপনারা কি আত্মার কোন রঙ-রূপ দেখেছেন? না, দেখেননি। রূহের কোন রঙ-রূপ নেই। আমরা যে কালো-শাদা দেখছি– এ হলো দেহের রঙ। রূহের কোন রঙ হয় না।

অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি থাকে রূহের প্রতি, দেহের প্রতি নয়

এ কারণেই আধ্যাত্মিক মনীষীদের কাছে কালো-সাদার কোন মূল্য ও পার্থক্য থাকে না। তাঁদের লক্ষ্য থাকে কেবলমাত্র রূহানিয়াতের প্রতি, রূহের জ্যোতি ও উজ্জ্বলতার প্রতি– গায়ের চামড়া কালো হোক কিংবা সাদা– তাতে কিছু আসে যায় না। এ হলো বাইরের বিষয়। ঐ ব্যক্তি ভুলপথের অনুসারী, যে প্রকৃত জিনিস বর্জন করে কেবল আবরণের চাকচিক্য দেখে। বাস্তব ও সত্যিকার অনুসন্ধানীর দৃষ্টি আবরণ ও শরীরের প্রতি নিবদ্ধ হয় না, সে দেখে স্বভাব-চরিত্র।

হযরত বেলাল (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অত্যন্ত কালো ও কুৎসিত ছিলেন। তাঁর ওষ্ঠদ্বয় বেশ মোটা ছিল। চেহারায় কোনরূপ লাবণ্য ছিল না। যখন তাঁর বিয়ের প্রয়োজন দেখা দিল তখন সম্ভ্রান্ত কুরাইশের প্রধান সাহাবী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন– বেলাল আমাদের নেতা, আমাদের সরদার। তাঁর জন্য সকলের কন্যাই হাজির। সেখানে যদি কালো-সাদার পার্থক্য ও ভেদাভেদ থাকত, তবে কোন শ্বেতসুন্দরী কনে তাঁকে দেয়া হতো না। সাদা চামড়াওয়ালারা তা আদৌ পছন্দ করতেন না। ইসলাম এসব ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে। ইসলামের ঘোষণা– আকার-আকৃতি, রঙ-রূপ দেখো না; সীরাত, নৈতিকতা ও ধর্মপরায়ণতা দেখো। রঙ-রূপ হলো ক্ষণিকের বস্তু, বাইরের বিষয়। বাহ্যিক বস্তুগুলো নিতান্ত সাময়িক। অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। প্রকৃত জিনিস হলো স্বভাব, সীরাত ও নৈতিকতা– যা স্থায়ী, চিরসঙ্গী।

আকার-আকৃতি ও রঙকে আপনি যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে করুন, এর সৃষ্টিই হয়েছে ক্ষণভঙ্গুর হিসাবে ধ্বংস হওয়ার জন্য। এ জিনিস টেকসই হয় না, হবে না– নষ্ট ও ধ্বংসই এর পরিণতি। যদি কয়েক দিন জ্বরে ভুগতে হয়, তাহলে দেখা যাবে– রূপ-লাবণ্য প্রায় শেষের পথে। অতি যত্নের সাথে দীর্ঘদিন পুষ্টিকর খাবার খেয়ে যে রূপ-লাবণ্য অর্জন করেছিল, অল্পদিনের জ্বর তা নিঃশেষ করে দিল। আর যদি জ্বর-ব্যাধিতে আক্রান্ত নাও হন, তবে বার্ধক্য তো অবশ্যম্ভাবী। বার্ধক্য এসে সকল রূপ-লাবণ্য শেষ করে দেবে, খতম করে দেবে। রঙ-রূপ কিছুই থাকবে না, থাকবে না লাবণ্যও। আর যদি বার্ধক্যও না আসে তবে মৃত্যুর কঠিন থাবা সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেবে, মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। সুতরাং শরীর ও তাঁর রূপ-লাবণ্য ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সেবা-যত্ন করে এর শ্রী-শোভা ধরে রাখবেন কত দিন, কত কাল? যতই সেবা-যত্ন করুন, যথাসময়ে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। রোগ-ব্যাধি একে নষ্ট করে দেবে। অনেক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তায়ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হয়। এমনিভাবে একদিন মৃত্যু এসে ধ্বংসকার্য সম্পূর্ণ করে দেবে। সুতরাং যে শরীর, যে চেহারা-ছবি, রূপ-লাবণ্য নষ্ট হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, একে রক্ষার জন্য, এর শ্রী-সুরত বাড়ানোর জন্য মহামূল্যবান সময় ব্যয় করা সময়ের অপচয়েরই নামান্তর, আর কিছু নয়।

এক বুযুর্গের ঘটনা। তাঁর খানকা ছিল। অনেক মুরীদ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের আশায় একত্রিত হয়েছিল। শায়খ এঁদের তরবিয়ত করতেন। এক ব্যক্তি এসে নতুন মুরীদ হলো এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকির-আযকার ও সাধনা আরম্ভ করলো। প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছিল সে। যিকিরের প্রভাব তখনো তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত হয়নি। শায়খের খানকা'র নিয়ম ছিল– তাঁর ঘর হতে খানা পাক

করে সবাইকে দেয়া হতো। শায়খের ঘরে ছিল একজন দাসী। সে প্রত্যেক রুমে খাবার পৌঁছে দিতো। নবাগত মুরীদকে খাবার দিয়ে যেতে দস্তুর মতো ঐ দাসী এলো। দাসীটি ছিল সুন্দরী সুশ্রী। দাসীর ওপর নজর পড়লো নতুন মুরীদের। মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেল। তার অন্তরে প্রেম ও আসক্তির আগুন জ্বলে উঠল। এখন দাসী আসার সাথে সাথে সে খাবার পাত্র রেখে তার পানে অপলক চেয়ে থাকে। শায়খ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেন। সে এসেছিল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আর এখন দাসীর প্রেমে বাঁধা পড়েছে। তার সাথে মন দেয়া-নেয়া ও ইশক সৃষ্টি করেছে। তিনি এর চিকিৎসা করলেন। আল্লাহ- ওয়ালাদের চিকিৎসা অনেক সময় শুধু বাক্য ও বচন দিয়ে হয় না। তাঁরা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে, আপনা-আপনি চিকিৎসা হয়ে যায়। শায়খ যখন দেখলেন, নতুন মুরীদের অন্তরে দাসীর প্রতি প্রেম ও আসক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রভাব ফেলেছে, আল্লাহ-আল্লাহ করার পরিবর্তে দাসীই তার ওযীফা হয়ে পড়েছে, আল্লাহর প্রতি ধ্যান না করে, দাসীর রূপ-লাবণ্যের ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছে, তখন এর চিকিৎসা ও সংশোধন হওয়া কর্তব্য মনে করলেন। চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নিলেন– দাসীকে তিনি কোলাপ দিলেন। এতে তার দাস্ত হওয়া শুরু হলো। বিকেলবেলা তার এমন অবস্থা হলো যে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে কি না, নাকে হাত রেখে তা দেখতে হয়েছে। রঙ-রূপ, লাবণ্য, শোভা-সৌন্দর্য সবই শেষ হয়ে গেছে। হাড়-মাংস, চামড়া সবই একাকার হয়ে পড়লো। তার চেহারা ভয়ানক বিকৃত আকার ধারণ করলো। দাসী একটু সুস্থ হলে শায়খ তাকে বললেন– ঐ মুরীদকে খাবার দিয়ে এসো এবং তোমার সাথে কেমন আচরণ করে, এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করো। দাসী খাবারসহ মুরীদের কামরায় পৌঁছলো। সে চলতে পারছিল না। তার পাগুলো কাঁপছিলো। তার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চেহারা-সুরত নষ্ট হয়ে গেছে। হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে। আগে যখন খাবার নিয়ে আসার সময় হতো, তখন মুরীদ সাহেব তার আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। দাসী কখন আসবে, আমি নয়নভরে তাকে দেখবো! আমার প্রাণ জুড়াবে, পরাণ শীতল হবে। কিন্তু এবার তার চেহারা-সুরত দেখে অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হলো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল– খানা রেখে চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও। দাসী চলে গেল।

শায়খ জানতে চাইলেন– সে তোমাকে দেখে কি করলো? উত্তরে দাসী বলল– হযরত! আজ এমন ব্যবহার করেছে। দেখা তো দূরের কথা, ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আমাকে বলেছে, খানা রেখে তাড়াতাড়ি চলে যাও। চোখ তুলেও আমাকে এক নজর দেখেনি।

এবার শায়খ বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! সংশোধন হয়েছে, চিকিৎসা হয়েছে।

শায়খ মুরীদের কক্ষে তাশরিফ আনলেন। মুরীদকে সাথে নিয়ে এসে তার হাত ধরে ঐ স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে দাসী মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। সেখানে মলমূত্রে ভর্তি ছিল। শায়খ বললেন– এ হলো আপনার প্রেমিকা। এগুলো তুলে নিয়ে যান এবং সযত্নে সংরক্ষণ করুন। এ কারণে যে, আপনার প্রেম দাসীর সঙ্গে ছিল না, ছিল পায়খানার সাথে। যতক্ষণ এ সব মলমূত্র দাসীর ভেতরে ছিল, ততক্ষণ আপনার প্রেম ও ভালোবাসাও ছিল। যখন এ সব বেরিয়ে গেছে, আপনার প্রেমাসক্তিও শেষ হয়ে গেছে। অতএব আপনার প্রেম দাসীর সাথে ছিল না, ছিল এসব মলমূত্রের সাথে। এখন আপনার এ প্রেমিকাকে নিয়ে যান এবং বাক্সে সযত্নে সংরক্ষণ করুন। আর সময় সময় এ সবের জিয়ারত ও সাক্ষাৎ করতে থাকুন। ঐ দিন থেকে বেচারা মুরীদ প্রেমের সত্যিকার হাকীকত বুঝতে পারলেন।

তাই বলছিলাম– বাইরের চেহারা-সুরত প্রেম ও ভালোবাসার বস্তু নয়, স্বভাব-চরিত্র ও নৈতিকতাই আসলে কাম্য ও ভালোবাসার বিষয়। রূপ-লাবণ্য, আকার-আকৃতি নষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার যোগ্য। রঙ-রূপ প্রকৃতপক্ষে আবর্জনার শামিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেতরে থাকে, রূপ-লাবণ্যও থাকে। যদি এগুলো বেরিয়ে যায়, শোভা-সৌন্দর্যও খতম হয়ে যায়। অথচ সীরাত, উন্নত স্বভাব ও নৈতিকতা সর্বকালে, সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যদি উন্নত সীরাত, ইলম ও কামাল, মহৎ গুণাবলী থাকে, তাহলে আপনি যতদিন পৃথিবীতে থাকবেন গুণী ও গুণবান হিসেবে থাকবেন; কবরে গেলেও পূর্ণতার সাথে, গুণবান হিসেবে যাবেন। হাশরের মাঠে পূর্ণতার সাথে গুণবান হিসেবে পৌঁছবেন। এসব জায়গায় আকৃতি ও রূপ-লাবণ্য আপনার সঙ্গী হবে না। একমাত্র সীরাতই সর্বদা মানুষের সাথে থাকবে। সুতরাং কর্তব্য হলো, সীরাত ও চরিত্রকে উন্নত ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করা– সাধনা করা। আকার-আকৃতি, রূপ-লাবণ্যের জন্য চিন্তা-ভাবনা, সাধনায় দিনরা লেগে থাকা নয়। এসব হলো ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার বস্তু। একদিন এসব ধ্বংস হবেই; আর তা ধ্বংস হওয়া অবধারিত।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর যুগে একজন তাবেঈ ছিলেন। তাঁর নাম হযরত আতা ইবনে আবি-রাবাহ (রহ.)। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস এবং হাবশী। তাঁর গায়ের রঙ ছিল কালো। তাঁর চেহারা সুন্দর ছিল না। তবে এত বেশি ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী তিনি ছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে ইমাম সাহেব (রহ.) বলেন–

ما رايت افضل من عطاء بن ابى رباح

আমি আমার জীবনে হযরত আতা ইবনে আবি-রাবাহ (রহ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বড় আলেম, গুণবান ব্যক্তি পাইনি, দেখিনি।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যে ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবার বুঝুন, তাঁর স্থান ও মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে! কত শীর্ষস্থানীয় আলেম তিনি! ইলম ও জ্ঞান কত বিপুল যে, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর জন্য আসক্ত। অথচ আকার-আকৃতিতে কৃষ্ণাঙ্গ, অপছন্দনীয়। সুতরাং ইসলাম কোনকিছুর গুরুত্ব ও মর্যাদা আকার-আকৃতির ওপর রাখেনি, রেখেছে সীরাতের ওপর। তাই অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক অবস্থা উত্তম ও উন্নত হওয়া উচিত।

চেহারা-সুরত নয়; স্বভাব-চরিত্রের কারণে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত

তাছাড়া আকার-আকৃতি, রূপ-লাবণ্য, শোভা-সৌন্দর্য সর্বদা মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে, ফিতনায় পতিত করে; আর সীরাত ও উন্নত স্বভাব-চরিত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে, সম্মান ও মর্যাদা দান করে। আমি, আপনি হযরত ইউসুফ (আ.) থেকে বেশি সুন্দর নই। পবিত্র কুরআনে তাঁর হুসন ও জামাল, শোভা-সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। হাদীস শরীফে এসেছে– আল্লাহ তায়ালা শোভা-সৌন্দর্যকে একা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দান করলেন। কত সুন্দর-লাবণ্যময় ছিলেন তিনি। মিসরের সম্ভ্রান্ত নারীরা একত্রিত হলেন। তাঁর পবিত্র নিষ্পাপ দেহ সৌষ্ঠব দেখে বলে উঠলেন–

لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

এ ব্যক্তি কোন মানুষ নন; বরং কোন অভিজাত ফেরেশতা, আকাশ হতে অবতরণ করেছেন। [ইউসুফ : ৩১]

এত হুসন ও জামাল, এত কান্তিময় সৌন্দর্য ছিল; অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) যেখানে যেখানে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, রূপ-সৌন্দর্যই তাঁকে বিপদগ্রস্ত করেছে। কিনানের কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন– কারণ ছিল রূপ-সৌন্দর্য। ভাইয়েরা হিংসা করে কূপে ফেলে দিয়েছিল। পথিকরা কূপ হতে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং মিসরের বাজারে বিক্রি করে দিল। ক্রীতদাসও হলেন ঐ রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই। জুলেখা তাঁর প্রেমাসক্ত হয়েছিল; আর এ কারণেই নয় বছর কারাবাস

করতে হলো তাঁকে। আবার যখন মিসরের রাজ্য লাভের সময় আসলো তখন বললেন–

اجعلنى على خزائن الارض -

হে মিসর অধিপতি! রাজ্য আমার হাতে ন্যস্ত করো, আমি রাজ্য পরিচালনা করে দেখাবো। খাদ্য ও কৃষি বিভাগ আমার হাতে অর্পণ কর। [ইউসুফ : ৫৫]

কারণ হিসেবে একথা বলেননি–

انى حسين جميل

মিসরের রাজত্ব আমার হাতে দাও, কেননা আমি অত্যন্ত সুন্দর। [ইউসুফ : ৫৫]

বরং বলেছেন–

انى حفيظ عليم

এজন্য যে, আমি জ্ঞানী– আমার মধ্যে রাজ্য পরিচালনার শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে। [ইউসুফ : ৫৫]

মোটকথা, যখনই তিনি বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই হয়েছেন। আর যখন রাজত্ব লাভ করেছেন তখন সীরাত, জ্ঞান ও যোগ্যতা অগ্রাধিকার পেয়েছে। সুতরাং সীরাত মানুষকে মর্যাদার শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে পারে। আর রূপ-সৌন্দর্য উন্নতি, সমৃদ্ধি ও মর্যাদা শীর্ষস্থান লাভের কারণ হতে পারে না।

যেমন– আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানব জাতি সুন্দর। আবার জীব-জন্তুর মধ্যেও অনেক সুন্দর সুন্দর জীবজন্তু রয়েছে। ময়ূর কতই না সুন্দর! তার পাখায় কত সুন্দর রঙ ও কারুকার্য রয়েছে। পাহাড়-জঙ্গলে যে বন-মোরগ রয়েছে, তাদের ডানায় রয়েছে বিচিত্র রঙ-এর সমাবেশ। কত সুন্দর সুশ্রী সে মোরগ। অসংখ্য হিংস্র জন্তুও আছে দেখতে বেশ সুন্দর। আপনারা বাঘ দেখে থাকবেন। এর চামড়া এত সুন্দর, দেখে মনে হয়, অত্যন্ত মূল্যবান কম্বল গায়ে লাগিয়েছে। তার রঙ কারুকার্যময়। ফুল বোটা কত সুন্দর! কত উন্নত ও চমৎকার! মানুষ বাঘের চামড়ার মতো কম্বল তৈরি করছে, আর বাঘের শরীরে রয়েছে কুদরতের তৈরি কম্বল। পাখিদের শরীরের রঙ কত সুন্দর! তাদের চেয়ে সুন্দর আর কে আছে! যদি উন্নত ও মর্যাদার ভিত্তি এবং বুনিয়াদ রূপ-সৌন্দর্য হতো, তাহলে

এদেরকেই আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা বলা হতো। আপনারা এ দাবি কেন করছেন যে, আপনারাই আশরাফুল মাখলুকাত! আপনাদেরই অনেক ভাই-বন্ধু রয়েছেন যাদের রঙ, রূপ-লাবণ্য কম হওয়া সত্ত্বেও তাকওয়া, তাহারাত, আল্লাহ-ভীতি ও পবিত্রতার কারণে মহামনীষীগণও তাঁদের সামনে বিনয়াবত হয়ে পড়েন। মর্যাদা ও উন্নতির মাপকাঠি যদি রূপ-লাবণ্য হতো, তাহলে হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রশংসা কেউ করতো না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আতা ইবনে আবি রাবাহের প্রশংসা করতেন না। এজন্য যে, তাঁদের আকার-আকৃতি কুৎসিত ছিল। অথচ তাঁদের সীরাত, নৈতিক গুণাবলী ছিল অত্যন্ত উন্নত। আর তাই তাঁদের সম্মান করা হতো, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত ছিল। সুতরাং বুঝা গেল, মানুষ কেবল আকার-আকৃতিতে মানুষ নয়; বরং মানুষ মানুষ হয় উন্নত স্বভাব চরিত্র ও নৈতিক উৎকর্ষের বদৌলতে। মাওলানা রূমী বলেন–

گر بصورت ادمی انساں بدے

احمد و بو جہل ہم یکساں بدے

যদি আকার-আকৃতির কারণে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতো, তবে হযরত আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা ও আবু জাহল একই ধরনের মানুষ হতাম।

কারণ, আবু জাহেলের আকৃতিও মানুষের মতো অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানব আকৃতির ছিলেন। অথচ সীরাত-চরিত্র ও নৈতিকতার প্রতি খেয়াল করুন, দৃষ্টি দিন! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত আরশ হতেও ঊর্ধ্বে; আর আবু জাহেলের সীরাত অধঃপতনের চরম নিম্নস্তরে। সীরাত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল বা তার চেয়েও বেশি। অথচ আকার-আকৃতি হিসেবে উভয়ই মানুষ। তাই মাওলানা বলেন–

گر بصورت آدمی انساں بدے

احمد و بو جہل وہم یکساں بدے

ازروں چوں گور کافر پر حلل

وز دا بذروں قہد خدائے عزوجل

বাইরের আকৃতির দিকে খেয়াল কর– একজন কাফেরের সমাধি; তার কারুকার্য, সৌন্দর্য, ওপরস্থ চাদর ও সামিয়ানা, ফুলের তোড়া– সবই নয়ন ও মনোমুগ্ধকর; কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখ, আল্লাহর আযাব ও শাস্তিতে তা পরিপূর্ণ। সুতরাং আকার যদি ভাল ও উন্নত হয়, আর ভেতরে ইলম ও জ্ঞান না থাকে, স্বভাব-চরিত্র উন্নত না হয়, আল্লাহর মারেফাত– প্রেম-প্রীতি না থাকে তাহলে এমন হবে, যেন কাফেরের কবর। যার উপরে সুন্দর চাদর বা শামিয়ানা ও ফুলের তোড়া রয়েছে আর ভেতরে রয়েছে আল্লাহর আযাব। তাই বুঝা গেলো– মানুষ-মানুষ হয় সীরাত ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে, আকর-আকৃতি বা সুন্দর চেহারার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হয় না।

চরিত্রবানরাই ইতিহাসে স্মরণীয়

দুনিয়াতে প্রত্যেক যুগে হাজার হাজার সুন্দর-সুন্দরীর আগমন ঘটেছে এবং কালের চক্রে মাটির সাথে মিশেও গেছে। তাদের সম্পর্কে কেউ কোন খবর রাখে না। অথচ যাঁরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শবান ছিলেন, আজ পর্যন্ত তাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে। নবী (আ.)গণের নাম উচ্চারিত হলে শ্রদ্ধার সাথে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয়। সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা হলে 'রাদিয়াল্লাহু আলহুম' বলা হয়। আর ওলীদের আলোচনা হলে 'রাহিমাহুমুল্লাহ' বলা হয়। অথচ তাঁরা সশরীরে বিদ্যমান নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কালো ছিলেন, কেউ শ্বেত-শুভ্র ছিলেন, কেউ বা হলুদ রঙের ছিলেন, কেউ ছিলেন লাল। কার কি রঙ ছিল কেউ জানে না; কিন্তু নাম উচ্চারণ করেন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে। কারণ তাঁদের সীরাত, তাঁদের ইলম ও জ্ঞান, কামাল ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের জানা আছে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নাম এসে গেলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মাথা ঝুঁকে যায়। যদি এ সব বুযুর্গ সম্পর্কে কেউ বেআদবীমূলক কথা বলে, তাহলে আপনি জান কুরবান করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। আমরা এ অপমান সহ্য করতে পারি না। সবার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে অথচ তাঁরা কেউ আজ এ দুনিয়াতে নেই, আমাদের সামনে নেই। আমাদের সামনে রয়েছে তাঁদের সীরাত, ইলম ও জ্ঞান এবং তাঁদের উত্তম আদর্শ।

আদর্শবানরাই আল্লাহর খেলাফতের হকদার

মূল ও আদর্শরূপে গ্রহণ করার যোগ্য বিষয় হলো ইলম, মারেফত, সৎ-স্বভাব এবং উন্নত চরিত্র। আম্বিয়ায়ে কেরাম চেহারা সুরত উন্নত ও সুন্দর করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেননি। এসব তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন। হৃদয়ের গভীরে রব্বানী আখলাক পয়দা করা, জাগ্রত করা, আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করা– এ সব ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে মানবজাতির আগমন ঘটেছে আল্লাহ তায়ালার খলিফা ও প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। খলিফা তিনিই হতে পারেন যাঁর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী থাকে। একজন কবি ঐ ব্যক্তিকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যার মধ্যে কাব্যগুণ আছে। একজন কামার ঐ লোককেই তার নায়েব বানাবে, যে এ বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। একজন মিয়াঁজী– যিনি ছেলেদের কুরআন হেফয করান; তিনি ছেলেদের মধ্য থেকে ঐ ছেলেকে তাঁর প্রতিনিধি বানাবেন, যে কুরআন মজীদ হেফয করে নিয়েছে এবং হাফেয হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যোগ্য গুণাবলীর অধিকারী যখন হয়ে যাবে, তখনই কেবল খলিফা বা নায়েব হতে পারে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলিফা এমন লোককে বানান, যাঁর মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার আখলাক জন্মে থাকে। আল্লাহর ইলম ও কামালত, জ্ঞান ও পূর্ণতাও তার মধ্যে এসে যায়। আল্লাহ তায়ালার নায়েব ও খলিফা চেহারা-সুরত দেখে বানানো হয় না; বরং সীরাত, স্বভাব-চরিত্র দেখে বানানো হয়। যে ব্যক্তি নবী (আ.)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলবে, সে-ই আল্লাহর নায়েব ও খলিফা হয়ে যাবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেঈদের প্রতি আপনাদের অন্তরে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা রয়েছে, তা তাঁদের কামালত, পূর্ণতা, উন্নত চরিত্র ও গুণাবলীর কারণেই। আপনি যদি কোন আলেমের প্রতি অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখেন, মহব্বত ও ভালোবাসা রাখেন, উচ্চাসন দানে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর চেহারা দেখে নয়, রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের কারণে নয়; অবশ্যই এজন্য করবেন যে, তাঁর মধ্যে ইলম আছে, উন্নত চরিত্র ও নৈতিক উৎকর্ষ রয়েছে। সত্যিকার অর্থে ইলম হলো বিষয়। মানুষের নয়, সাধারণত মানুষের মধ্যে কোন ইলম ও জ্ঞান নেই, আখলাক ও নৈতিকতা নেই। এসব চেষ্টা-সাধনা করে অর্জন করতে হয়; কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়।

ইলমেদীন অর্জন করার জন্য অনেক মাদরাসা আছে। নয়-দশ বছর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পাঠ্যসূচী অধ্যয়ন করলে মানুষ আলেম হতে পারে। চরিত্র গঠন ও সংশোধনের জন্য রয়েছে খানকা। শায়খের সাহচর্যে থেকে চেষ্টা-সাধনা করতে হয়; তারপর আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন হয়, নৈতিক গুণাবলী অর্জিত হয়। কিন্তু এমন কোন প্রতিষ্ঠান কি আছে, যেখানে জাহালত ও মূর্খতা শিক্ষা দেয়া হয়? আর আপনারা ছেলেদেরকে ভর্তি করে দেন মূর্খতা ও জাহালাত শিক্ষা লাভের জন্য? পৃথিবীতে এমন কোন খানকা কি আছে, যেখানে ছেলেদেরকে ভর্তি করে আপনি বলবেন– হযরত! একে বদ আখলাক, অসৎ চরিত্র শিক্ষা দেন, আমরা আপনাকে মাসিক বেতন দেবো। অসৎ চরিত্র শেখার জন্য কোন খানকা নেই। আপনারা এর খুঁজও করবেন না। মানুষের জন্ম হয় একটা স্বভাবের ওপর। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় একটা সুপ্ত ক্ষমতা অন্তরে নিয়ে। অর্জন করার এ গোপন শক্তি ও বস্তুটি হলো ইলম ও আখলাকের মূল; মূর্খতা ও জাহালত নয়। সুতরাং চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির জন্য চেষ্টা-সাধনা করা উচিত, ইলম ও জ্ঞানার্জনের জন্য পরিশ্রম করা প্রয়োজন। চামড়া সুন্দর সুশ্রী ও শরীর আকর্ষণীয় করার জন্য চেষ্টা করে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এসব জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে দেয়া হয়, সে-ই পেতে পারে। এটা কারো চেষ্টা দ্বারা অর্জিত হয় না।

মানুষের মূল পদার্থ এক : শ্রেষ্ঠত্ব স্বভাব চরিত্রে

এ কারণেই পবিত্র কুরআন একটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

> হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এ দু'জন হতে সবারই আগমন হয়েছে। সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ মিশ্র বরণ, কেউ সুন্দর সুশ্রী, কেউ কুৎসিত– সকলে এক আদম (আ.)-এর সন্তান। খান্দান ও গোত্র আমিই সৃষ্টি করেছি, যেন একে অন্যের পরিচয় লাভ করতে পারো। [হুজুরাত : ১৩]

এই লোক অমুকের সন্তান-বংশধর, যেন উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ করা যায়। খান্দান ও গোত্র দ্বারা পরিচিতি ও উত্তরাধিকার লাভ হয়। এ কারণে খান্দান নয় যে, গর্ব ও অহংকার করে বলবে– আমি শায়খ, আমি সৈয়দ, আমি উচ্চ বংশের আর অমুক নিচু বংশের। ইসলাম এসবের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। ঘোষণা করেছে– সবাই সমান। তবে তোমার মধ্যে একটা উঁচু নিচু বা ওপর নীচ রয়েছে– তবে তা তোমাদের ইচ্ছাধীন, তোমাদের সামর্থাধীন। যে কেউ ইচ্ছা করলে ওপরে উঠে যেতে পারে, ইচ্ছা করলে নীচেও নেমে যেতে পারে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَـٰكُمْ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক মুত্তাকী সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানের পাত্র। [হুজুরাত : ১৩]

যার মধ্যে তাকওয়া, তাহারাত, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতা কম, আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও মর্যাদাও কম। তাকওয়া অর্জন করা আর না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তাকওয়া অর্জন করে যে কেউ সম্মানের পাত্র হতে পারে। আর ফাসেক ও ফাজের, পাপীষ্ঠ হয়ে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে যেতে পারে। জন্মগতভাবে সকলের মূল উপাদানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ উপরে, কেউ নিচে– এসব কিছুই নেই। ইরশাদ হয়েছে–

كلكم بنو آدم وادم من تراب -

তোমরা সবাই আদম (আ.)-এর সন্তান আর আদম (আ.)কে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

সুতরাং তোমাদের সকলের মূল উপাদান মাটি। এমনটা নয়, কিছু মানুষ সোনা দিয়ে, আর কিছু মানুষ মাটি দিয়ে; কিছু মানুষ লোহা দ্বারা, কিছু মানুষ পিতল দ্বারা সৃষ্টি। যে কারণে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। না না। সকলেই মাটি দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের পিতাকেই যখন মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন আমাদের মধ্যে সোনা আসবে কেমন করে, কোথা থেকে?

মাটির কাজ কি? মাটি যত নিচে থাকবে, ততই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ থাকবে; আর যত ওপরে উঠবে, ততই অপদস্থ হবে। যদি মাটি ওপরে উঠে চোখে পতিত হয়, তাহলে আপনি অভিশাপ করবেন। কাপড়ে পড়লে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করবেন এবং ঘৃণাভরে বলবেন– এটা কোথা থেকে আসলো? কিন্তু যদি জুতা দিয়ে দলিত-মথিত হতে থাকে, তখন তার খেয়ালও করবেন না। যখনই ওপরে ধাবিত হবে, তখনই তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হতে থাকবে।

আল্লাহর দরবারে মকবুল হন বিনয়ীরা

মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম যাঁর মধ্যে বিনয়, নম্রতা অর্থাৎ আযিজী-ইনকেসারী রয়েছে। আর যে গর্ব-গরিমা ও অহংকার করবে তার পরিণতি হবে এমন– মাটি চোখে পড়লে যেমন তা পীড়াদায়ক হয়, মানুষ তাকে অভিশাপ দেয়, ঘৃণা করে; ঠিক তেমনি তাকে বর্জন ও পরিহার করার চেষ্টা করবে। হাদীসে বলা হয়েছে–

আল্লাহর জন্য যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সম্মানের উচ্চ শিখরে স্থান দান করেন। আর যে লোক নিজেই সম্মানিত হতে চায় তার অপদস্থ হওয়া অনিবার্য।

কোন এক কবি বলেছেন–

پستی سے ہو وسر بلند اور سر کشی سے پست

اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے

যে অহংকারী, তাকে অপদস্থ করে দেয়া হয়। আর যে নম্র ও বিনয়ী হয় তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়– এ পথে বিস্ময়কর ব্যবস্থা রয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তি যদি নেক আমল করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং গর্ব করে বলতে শুরু করে– হে আল্লাহ! আমি নামায পড়েছি, আমি রোযা রেখেছি (যেন সে এক বিরাট কাজ করে ফেলেছে); আমি নামায পড়ে আপনার ওপর বিরাট ইহসান করেছি– তখন আল্লাহ তায়ালা জবাব দেন– হে অপদার্থ! তুই এমন কি কাজ করেছিস? তোর ভেতর শক্তি আমি দান করেছি। তোর ইচ্ছাশক্তি আমি দিয়েছি, উপায়-উপকরণ আমি যোগাড় করে দিয়েছি, তুই কি করেছিস? আর যদি মানুষ নামায-রোযা সব কিছু করেও বলে– হে আল্লাহ! আমি তো কিছুই করতে পারিনি; যা কিছু করেছি তা তোমারই দয়া, তোমারই ফযল– আমার তো কোন শক্তিই নেই। তখন আল্লাহই বলেন– ইরাদা (ইচ্ছা) তুমিই করেছিলে, মসজিদের দিকে তুমিই চলে গিয়েছিলে; আমলের জন্যে দৃঢ় সংকল্প তুমিই হয়েছিলে, তুমিই সব কিছু করেছো। আসল কথা, সে বলেছিল কিছুই করিনি; কিন্তু আল্লাহ তাকে উপরে তুলে দিলেন। বলা হয়, তুমিই সবকিছু করেছো।

আর যে ব্যক্তি বলে– আমি করেছি, তখন 'আমি'র গলায় ছুরি চালানো হয়। বলা হয়, তুমি কিছুই করোনি– এসব তো আমারই দান। মানুষের জন্য কর্তব্য

হলো– এসব কিছু করেও বলবে, আমি কিছুই করতে পারিনি, আমি দুর্বল, আমি অপারগ।

এসব কথা এ কারণে বলবে যে, আল্লাহর নেয়ামত ও দান অসংখ্য-অগণিত, সীমাহীন। কেউ যদি এসবের শুকর আদায় করে, তাহলে তার শুকর সীমাহীন হবে না, হতে পারে না। সে নিজেই সসীম। সুতরাং দেমাগ, জ্ঞানবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য সবই তার সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ হয়ে সীমাহীন কাজ করবে কেমন করে! আল্লাহর দান ও নেয়ামত হলো সীমাহীন, আর মানুষের শুকর হলো সীমাবদ্ধ। সুতরাং একথা স্বীকার না করে উপায় নেই, মানুষ শুকর আদায়ে এ কথা বলবে– হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অপারগ, আমি তোমার শুকর আদায় করতে পারছি না। তোমার নেয়ামত সীমাহীন আর আমার শক্তি-সামর্থ্য সীমিত, খুবই কম। নিজের অপারগতা প্রকাশ করা এবং অক্ষমতা স্বীকার করে মেনে নেয়া আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

হযরত দাউদ (আ.) কে নির্দেশ দেয়া হলো–

اعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

হে দাউদ! আমার শুকর আদায় কর। [সাবা : ১৩]

দাউদ (আ.) আরয করলেন– হে আল্লাহ! তোমার শুকর আদায় করা আমার জন্য ফরয, কর্তব্য। অবশ্যই তোমার আদেশ পালন করা কর্তব্য; আমি অবশ্য তা পালন করবো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না– শুকর আদায় করবো কেমন করে, কিভাবে? এ কারণে যে, যখন নেয়ামতসমূহের শুকর আদায় করতে বসবো, তখন এ শুকর আদায় করার তাওফিক তুমি দান করবে। তাহলে তাওফিক আরেকটি নেয়ামত হয়ে গেলো। এরও শুকর আদায় করতে হবে। এভাবে যখনই শুকর আদায় করবো, তার আগমুহূর্তে তুমিই এর তাওফিক দান করবে। আর তখন এরও শুকর আদায় করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক শুকর-এর পূর্বে শুকর আদায় করতে হবে। সুতরাং এভাবে আমি শুকর আদায় শুরুই করতে পারছি না; তাহলে শুকর আদায় করবো কেমন করে? এতে যে আমি সম্পূর্ণ অপারগ, আমার শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার এটা।

এরপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জবাব এলো–

হে দাউদ (আ.)! তুমি যদি একথা বুঝতে পারো যে, তুমি সম্পূর্ণ অপারগ, শুকর আদায় করতে পারবে না; তবে এ-ই হলো শুকর আদায়। নিজের অক্ষমতা

স্বীকার করে নাও, নিজের দুর্বলতা অবনত মস্তকে মেনে নাও। কে এমন আছে যে, আমার শুকর আদায় করতে পারবে! আমার যথাযোগ্য আনুগত্য করতে পারবে! ফরয কাজগুলো আদায় করে একথা বলো– কিছুই করতে পারিনি। এ-ই হলো শুকর আদায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। নিজের দুর্বলতা-অক্ষমতা স্বীকার করে নাও। বান্দার কাজ এটাই যে, সবকিছু আদায় করেও একথা বলবে– 'আমি কিছুই করতে পারিনি।' আর এ কথা কেবল বিনয় নয়; বরং কিছুই করতে পারিনি– এটাই বাস্তব ও প্রকৃত সত্য।

আসল কথা হলো, আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না থাকে, তাহলে আমাদের নাজাত ও মুক্তি হবে না, আমাদের আমল কবুল হবে না; আমাদের নামাযগুলো মকবুল হবে না। আমাদের নামাযে কী আছে? আছে শুধু চিন্তা-কল্পনা, প্রোগ্রাম ইত্যাদি। প্রকৃত নামায ছিল নবী (আ.)গণের, ওলী (রহ.)গণের। এটা তো হলো আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানী যে, আমাদের এ জাতীয় নামাযগুলো কবুল করে নেন। অথচ আমাদের আমল প্রাণহীন। এতে জান-প্রাণ কোন কিছুই নেই।

কেবল আল্লাহর অনুগ্রহই নাজাতের উপায়

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

لن ينجى احد كم عمله

তোমাদেরকে তোমাদের আমল নাজাত দিতে পারবে না,
যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী হবে।

হযরত শায়খ জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ.) পরকাল সম্পর্কিত একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবে পূর্ববর্তী উম্মত বনি ইসরাইলের একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বনি ইসরাইলের একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দিনরাত আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তিনি তো মানুষ ছিলেন– সামাজিক জীব; অতএব পানাহারের প্রয়োজন হতো। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনও ছিল। ঘরবাড়িও ছিল, আত্মীয়-স্বজনও ছিল। তাদের সঙ্গে কিছু সময় থাকতে হতো, কিছু সময় ব্যয় করতে হতো। তবে এসব আবেদের পছন্দ ছিল না। তিনি সামান্য সময় স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজনের সাথে অতিবাহিত করার চেয়ে বরং ঐ সময়কেও আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করতে আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে তিনি স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি সব ত্যাগ করে সমুদ্রের

মধ্যে অবস্থিত এক দ্বীপের পাহাড়ের টিলায় আস্তানা স্থাপন করলেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ অবসর-চিন্তামুক্ত হলেন। ফলে চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করার সুযোগ পেলেন। সে যুগে সংসার ত্যাগ জায়েয ছিল। কিন্তু ইসলাম এ প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। পূর্বযুগের উম্মতগণের মধ্যে রূহবানিয়ত বা সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রথা জায়েয ছিল। সব ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে নির্জনে চলে যাওয়া বৈধ ছিল। এ আবেদও সব কিছু ত্যাগ করে নির্জনে চলে গেলেন। এমন স্থানে চলে গেলেন যেখানে অন্য কেউ পৌছতে পারবে না। সাগরের মাঝখানে দ্বীপের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বসে পড়লেন। সেখানে তিনি কোনোরকম একটি ঘর তৈরি করে নিলেন। আল্লাহ তায়ালার দয়া হলো। টিলায় একটি ডালিমের গাছ উৎপন্ন হলো এবং তাতে অত্যন্ত সুমিষ্ট ডালিম ধরতে লাগলো। আর সাগরের নোনতা পানির ভেতর থেকে আল্লাহ তালালা মিঠা পানির একটি ঝর্না প্রবাহিত করে দিলেন।

ফলে আবেদের কাজ ছিল এইটুকু– প্রতিদিন একটি করে ডালিম খেয়ে নিতেন, এক পেয়ালা পানি পান করে নিতেন; আর অবশিষ্ট সময় নামাযে ব্যস্ত থাকতেন। রাতে নিদ্রা এবং দিনে কোথাও যাওয়া-আসা, কোন কাজকর্ম, কিছুই তাঁর ছিল না। দিন-রাত কেবল নামায আর নামায। এভাবে পাঁচশ' বছর পার হয়ে গেল।

আবেদের এই ইবাদত অত্যন্ত খালেস ও নির্ভেজাল ছিল। সেখানে লোক দেখানোর কোন ব্যাপারই ছিল না, সুনাম ও সুখ্যাতি লাভও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানে শোনারও কেউ ছিল না। কেবল তিনি এবং তাঁর আল্লাহ। এভাবে পাঁচশ' বছর খালেস ইবাদত করলেন।

পাঁচশ' বছর অতিবাহিত হয়ে যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! আমাকে নামায পড়াকালীন সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুদান করো এবং সিজদারত অবস্থায় আমার লাশকে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখো যেন কেয়ামতের দিন আমাকে তোমার সিজদাগুজার বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। মৃত্যুর পর অন্তত সিজদার আকৃতি বিদ্যমান থাক– এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর এই দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। হাদীসে বলা হয়েছে– সিজদারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ পর্যন্ত তাঁর লাশ সিজদারত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। তিনি আরও ইরশাদ করেন– যখন তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো এবং তাকে আল্লাহর দরবারে পেশ

করা হলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন– হে আমার বান্দা! আমি আমার দয়াগুণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করলাম। এখন তুমি চিরকাল সুখ-শান্তিতে জান্নাতে বসবাস করো। ফেরেশতাদের আদেশ করা হলো, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও! এ আমার মকবুল বান্দা, আমি তাকে আমার দয়াগুণে নাজাত দান করেছি।

এ কথা শুনে আবেদের মনে সন্দেহ হলো। আমি পাঁচশ' বছর ইবাদত করেছি। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছি। বিষয়, ধন-সম্পত্তি, দৌলত সব বর্জন করেছি; আর আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আমার দয়াগুণে তোমাকে নাজাত দান করলাম!' অন্তত আমাকে খুশি করার জন্য এ কথাটি বলতে পারতেন যে, তোমার নামাযের কারণে তোমাকে ক্ষমা করলাম। তুমি ঘর-সংসার ত্যাগ করেছিলে– এর বিনিময়ে তোমাকে নাজাত দিলাম। তাহলে আমার অন্তরও সন্তুষ্ট হয়ে যেতো। কারণ তাহলে বুঝতাম, আমার আমলের মূল্য প্রদান করা হয়েছে। আমি পরিশ্রম করেছি দেশ, খেশ, সমাজ ত্যাগ করেছি– এরপরও নাজাত দান করলেন তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে। মনে হচ্ছে যেন আমি কিছুই করিনি! তবে এটা ছিল মনের একটা জল্পনামাত্র যা তার অন্তরে উদিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা অন্তরের খবরও রাখেন। তাই ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, জান্নাতের পরিবর্তে এ বান্দাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও এবং জাহান্নাম থেকে এতটুকু দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখ যেখান থেকে জাহান্নাম পাঁচশ' বছরের দূরত্বে থাকে। কথামতো তাকে সেরূপ স্থানে পৌছানো হলো। যখন সেই স্থানে জাহান্নামের গরম হাওয়া অনুভব হতে লাগলো তখন এ আবেদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর শুকিয়ে গেলো এবং পিপাসায় কাতর হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। জাহান্নামের সামান্য তাপেই তাঁর প্রাণ শুকিয়ে গেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, এ সময় একটি হাত প্রকাশিত হলো, যে হাতে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি ছিল। আবেদ দৌড়ে গেলো সেই হাতের দিকে। হে আল্লাহর বান্দা! এই পানিটুকু আমাকে দান করো। সে অগ্রসর হলো– হাতটি পেছনে চলে গেলো; সে আরো অগ্রসর হলো– হাতটি আরো পেছনে চলে গেলো। আবেদ বলতে লাগলো– আল্লাহর ওয়াস্তে পানিটুকু আমাকে দান করো!

উত্তর হলো, পানি দেয়া হবে, তবে এর মূল্য আদায় করতে হবে।

আবেদ জিজ্ঞেস করলেন– এর মূল্য কি?

বলা হলো– পাঁচশ' বছরের খালেস ইবাদত যদি মূল্যস্বরূপ দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে পানির এ পেয়ালা দেয়া যেতে পারে, নতুবা নয়।

আবেদ বললেন– আমার কাছে পাঁচশ' বছরের ইবাদত রয়েছে এবং তাড়াতাড়ি তাই পেশ করে দিলেন। আর পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে পানি পান করলেন। তখন মনে হচ্ছিল যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, এ আবেদকে ফিরেয়ে নিয়ে আসো এবং পুনরায় আমার সামনে হাজির করো। আবেদকে পেশ করা হলে আল্লাহ তায়ালা বললেন– হে বান্দা! তোমার পাঁচশ' বছরের ইবাদত হতে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। তুমি পাঁচশ' বছরের ইবাদত করেছিলে। এর বিনিময়ে তুমি এক পেয়ালা পানি পেয়েছো। আর এ মূল্য তোমার সম্মতিক্রমেই স্থির করা হয়েছিল। আমি করিনি, তুমিই রাজি হয়ে পাঁচশ' বছরের ইবাদত প্রদান করেছিলে এবং এর বিনিময়ে এক পেয়ালা পানি গ্রহণ করেছিলে। কাজেই পাঁচশ' বছরের ইবাদতের প্রতিদান হতে আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। কারও দাবি দাওয়া বাকী রইল না। এখন তুমি হিসাব দাও, ঐ লাখ লাখ পেয়ালা পানির, যা তুমি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় পান করেছো– এ সবের পরিবর্তে তুমি কি কি আমল করে এসেছো। আর দুনিয়াতে থাকাকালীন অগণিত ডালিম খেয়েছো, এক-একটি দানার হিসাব দাও। এসব দানার পরিবর্তে কত সিজদা, কত রুকু করেছ, কত ইবাদত করেছ?

এসব তো হলো দানা-পানির কথা। তোমার চোখে জ্যোতি দান করেছিলাম যা দিয়ে তুমি দেখতে। প্রতিটি দৃষ্টিপাতের হিসাব দাও– এ সবের বিনিময়ে কি পরিমাণ ইবাদত নিয়ে এসেছো! দুনিয়ায় থাকাকালে তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে। এতে তোমার জীবন রক্ষা হতো। এক একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব দাও! এগুলোর বিনিময়ে কতটা ইবাদত তুমি নিয়ে এসেছো! তাছাড়া তোমার দেহে আমিই প্রাণ দিয়েছিলাম। ফলে পাঁচশ' বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছো, ইবাদত করতে পেরেছো। এ শক্তি-সামর্থের হিসাব দাও। আর এর বিনিময়ে তুমি কি পরিমাণ ইবাদত করেছো! তোমার জন্য মিঠা পানির ঝর্না, মিষ্টি ডালিমের গাছ, আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। এর মাধ্যমে তুমি জীবিত ছিলে। আমার সৃষ্ট সূর্য তোমাকে তাপ ও আলো দান করেছে, তোমার দেহ ঠিক রেখেছে– এসবের হিসাব দাও। এগুলোর বিনিময়ে কি কি ইবাদত করেছো?

আবেদ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। আরয করলেন– হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই নাজাত তোমার দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা হয়, বান্দার ইবাদত ও আমল দ্বারা নয়। আমলের মূল্য হলো এই; পাঁচশ' বছরের আমল দিয়ে এক পেয়ালা পানি পাওয়া গেলো। আর তাও আপনার দয়ায়। যদি আপনি বলতেন– এ পেয়ালা ঐ ব্যক্তি পাবে যে এক লাখ বছর ইবাদত করেছে, তাহলে আমি পানিটুকু গ্রহণের সুযোগ

পেতাম না। তুমি আমার ক্ষমতার মধ্যে মূল রেখেছো। তাই আমি কিনতে পেরেছি। এটাও তোমারই মেহেরবানী। কাজেই নাজাত তোমার দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা হয়ে থাকে, আমল দ্বারা হয় না।

আমল অনুগ্রহের আলামত

তাই বলে এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে, আজ থেকে নামায ত্যাগ করে বসে থাকবেন। যেহেতু দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা নাজাত হবে, তাই আমলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করে কোন লাভ নেই, কোন প্রয়োজন নেই। দয়া যার ওপর হওয়ার, হবে। যার ওপর হওয়ার নয়, হবে না। আমরা পরিশ্রম করবো কেন?

এমন ধারণা করবেন না। নাজাত দয়ার দ্বারা হবে সত্য, কিন্তু এটা কেমন করে বুঝবেন, আমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও কৃপাদৃষ্টি রয়েছে কি না! এর আলামত হচ্ছে আমল। আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া ও কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। আমল ত্যাগ ও বর্জন করা দয়া ও কৃপাদৃষ্টি না থাকারই লক্ষণ। আখেরাতে যখন দয়া হবে, তখন প্রতিদানে জান্নাত দেয়া হবে। দুনিয়াতেও দয়া– আখেরাতেও এ দ্বারা সাফল্য আসবে।

জান্নাত ঈমানের প্রতিদান, আমলের নয়

ঈমান এমন একটি অমূল্য সম্পদ, যার বিনিময়ে জান্নাত লাভ হবে। জান্নাত আমলের বিনিময়ে নয়। আমল হচ্ছে নিদর্শন ও লক্ষণ মাত্র। এর দ্বারা ঈমানের পরিচয় লাভ হবে। জান্নাত প্রকৃতপক্ষে ঈমানের প্রতিদান, ঈমানের বিনিময়। এর উদাহরণ হচ্ছে, আপনি সোনা ক্রয়ের জন্য স্বর্ণকারের দোকানে গেলেন। এক হাজার টাকার সোনা ক্রয় করবেন। আপনি তো এমন করেন না যে, এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন, আর স্বর্ণকার সোনা দিয়ে দিলো, আপনি হাতে নিয়ে চলে আসলেন। বরং প্রথমে সোনা যাচাই করবেন, তা খাঁটি কিনা। তাতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা আছে কিনা। নিয়ম হলো, সোনাকে কষ্টিপাথরে ঘষতে হবে। পাথরের ওপর সাদা রেখা পড়লে স্বর্ণ খাঁটি হওয়ার লক্ষণ। তখন আপনি হাজার টাকা দিয়ে সোনা নিয়ে আসবেন। আর যদি কষ্টিপাথরের ওপর ময়লা বা মেটে রঙের রেখা পড়ে, তাহলে আপনি বুঝবেন স্বর্ণ খাঁটি নয়, এতে ভেজাল রয়েছে। ফলে আপনি তা ক্রয় করবেন না।

এবার আপনি সোনা কিনলেন, দোকানদারকে হাজার টাকা দিলেন। তবে এই হাজার টাকা কিন্তু রেখাগুলোর মূল্য নয়– যা কষ্টিপাথরের ওপর পড়েছিল; বরং তা হলো স্বর্ণের মূল্য। রেখাগুলো সোনা খাঁটি হওয়ার চিহ্ন ছিল মাত্র। এর মাধ্যমে সোনা খাঁটি প্রমাণিত হলো। ঠিক তেমনি পরকালের বাজারে জান্নাত ক্রয় করা হবে ঈমানের বিনিময়ে, আমলের বিনিময়ে নয়। আমলগুলো হবে রেখাতুল্য চিহ্নমাত্র। ঈমান খাঁটি ও নির্ভেজাল ছিল কি-না তা আমলের কষ্টিপাথরে পরখ করা হবে। আর এ ঈমান প্রদান করা হবে মূল্যস্বরূপ। এরপর মিলবে জান্নাত। আর যদি আমল খারাপ ও মন্দ হয়, তাহলে তা হবে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ ঈমানের লক্ষণ, কৃত্রিম ঈমানের নিদর্শন। ফলে তা পূর্ণাঙ্গ বিনিময় পেতে পারে না। প্রতিদান যা পাওয়া যাবে, তা আমলের নয়, ঈমানের। আমল হচ্ছে খাঁটি ঈমান পরিচয়ের মাধ্যম। আমলকে এভাবেই দেখা হবে। যদি বেহেশত আমলের প্রতিদান ও বিনিময় হতো, তাহলে ভেবে দেখুন– আমি, আপনি পঞ্চাশ বছর ইবাদত করেছি। ফলে জান্নাতেও পঞ্চাশ বছর অবস্থান করতাম। এরপর কান ধরে বের করে দেয়া হতো। যাও, বের হও; প্রতিদান দেয়া হয়েছে। অথচ আমরা জান্নাতে চিরকাল থাকবো। এটা আমলের প্রতিদান নয়। কেননা আমল তো করেছি সীমিত সময়। অথচ ঈমান হলো এমন একটি রত্ন যা চিরকাল থাকবে। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার অন্তরে দৃঢ় সংকল্প বিদ্যমান থাকে। সে যদি কোটি বছরও বেঁচে থাকে, তবে ঈমান রত্নটিকে হাতছাড়া করবে না। ঈমান দুনিয়াতেও থাকে, পরকালেও থাকে। এ হলো চিরস্থায়ী বিষয়। এ কারণে প্রতিদানও চিরস্থায়ী। আমল চিরস্থায়ী নয়। তাই জান্নাত আমলের প্রতিদান হতে পারে না। একে দেখা হয় লক্ষণ ও চিহ্ন হিসেবে। তবে বাহ্যিকভাবে আমলকে অবশ্যই দেখা হবে এবং জান্নাত আমলের প্রতিদান বলে মনে হবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে জান্নাত হলো ঈমানের প্রতিদান। কোন মানুষ যদি নামায আদায় করে, রোযা রাখে, সব আমলই সম্পাদন করে অথচ ঈমান না থাকে, তাহলে কি সে জান্নাত লাভ করতে পারবে? পারবে না। বোঝা গেলো আমল দ্বারা জান্নাত লাভ হবে না। জান্নাত লাভ হবে ঈমান দ্বারা। ঈমান যদি থাকে, তাহলেই আমল গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঈমানের যাচাই-বাছাই আমল দ্বারা হবে।

তাই আমি আরয করছিলাম, নাজাত হবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে। কিন্তু আমল হলো দয়া ও মেহেরবানী প্রাপ্তির লক্ষণ, এটা ত্যাগ করা উচিত নয়।

মোট কথা, মানুষের মূল্য ও মর্যাদা আকার-আকৃতি, রূপ-লাবণ্যে নয়; বরং সীরাত ও স্বভাব-চরিত্রে। সীরাত ও স্বভাবের সম্পর্ক রয়েছে ইলমের সাথে, আখলাকের সাথে, নেক আমলের সাথে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এবং পরকালের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে। এসবের মাধ্যমে চরিত্র গঠন হয়। আর এটাই হলো আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটা উন্নত ও সুন্দর করা অবশ্যই প্রয়োজন।

কুদরতের দলিল-প্রমাণ

তাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনেক প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। আপন সত্তা ও গুণাবলী প্রমাণ করেছেন। তবে এসব প্রমাণ দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক নয়; বরং দুনিয়ার নানা বস্তু হাজির করে বলেছেন, এ সবের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করো– তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব বুঝতে সক্ষম হবে। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি এ আয়াতও আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রমাণ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

হে মুখাতিব (সম্বোধিত ব্যক্তি)! তুমি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করছেন। [ফাতির : ২৭]

পানির প্রকৃতি ও স্বভাব হলো নিম্নমুখী। একে কোন শক্তিবলে ওপরে তুলে নিলো, পানি নিম্ন হতে উত্থিত হলো। আপনারা বল প্রয়োগে ওপরে নিয়ে গেলেন, নইলে পানি নিচে যাবে। এটা নিম্নে গমনকারী। আবার দেখেন পানি হাজার হাজার মাইল ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো? সে স্থান হতে আবার বর্ষণ শুরু হলো। এ বর্ষণ সৃষ্টিকারী কে? এখানে প্রথম দলীল হলো– পানিকে ওপরে উঠিয়ে আমরাও নেইনি, আমাদের পূর্বপুরুষরাও নেননি। কোন মহাযাত ও সত্তা রয়েছে, যাঁর নির্দেশে পানি সে জায়গায় পৌঁছেছে এবং পানি তার প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধে উপরে উঠতে বাধ্য হয়েছে। এ থেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; তিনিই পানি ওপরে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। অতঃপর উপর থেকে অবতরণে বাধ্য করছেন।

বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং ভূগর্ভে তা শোষিত হয়ে যায়। এতে জমি রসযুক্ত হয়। এরপর ভূমি হতে নানা ফল, শাক-সবজি, আনাজ-তরকারী ও অন্যান্য ফসল

উৎপন্ন হতে শুরু করে।

فاخرجن به ثمرات مختلفا الوانها–

আমি বারি বর্ষণ করে নানারূপ ফল উৎপন্ন করি। এসব ফলমূলের উৎপাদনকারী কে? [ফাতির : ২৭]

বীজ বপন কৃষক করে সত্য, তবে মাটির নিচ থেকে চারাটি অঙ্কুরিত করছে কে? আমরা, নাকি আমাদের পূর্বপুরুষরা? না, না। কৃষক বীজ বপন করে বসে আছে। তারপর খবরও নেই তার– মাটির ভেতর কি কি কাজকর্ম হচ্ছে! মাটির তলার এ বীজকে মাটির সাথে মিশিয়ে তার থেকে অঙ্কুর বের করে দেয়া কেবলমাত্র আল্লাহর তায়ালারই কাজ। এর কুঁড়ি এতটা নরম ও ভঙ্গুর হয় যে, মানুষের আঙ্গুলের স্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। এর কোন মূল্য বা দাম থাকে না। তবে কতটা শক্তি যে, মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এখন বলুন, একে এত শক্তি কে দান করলো? মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে অথচ মধ্যাকর্ষণ বলে, বস্তুর গমন ভূ-পৃষ্ঠের দিকে। আপনি ঘাসকে ওপরে ছুঁড়ে মারেন– ওপরে থাকবে না, নিচে পড়ে যাবে। অথচ তার স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওপরের দিকে নিয়ে আসলো কে? পানি ওপরে তোলা, নিচের দিকে নামানো, এরপর মাটির নিচে রাখা বীজের মধ্যে শক্তি দান, বীজ ফেটে কুঁড়ি বের হওয়া, মাটির নিচ থেকে আত্মপ্রকাশ; এসব কাজ সম্পাদনকারী মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ নয়।

এর প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে এভাবে–

مختلف الوانها

(নানা রঙের) আপেলের রঙ আলাদা, আমের রঙ আলাদা, আঙ্গুরের রঙ আলাদা। প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ পাকই জানেন, কত প্রকার রয়েছে– কত রঙ ও স্বাদ রয়েছে! আপেলের মধ্যে অনেক রঙ ও প্রকার আছে। আমের মধ্যেও অনেক প্রকার আছে। তেমনি আঙুরও কয়েক প্রকার। অথচ মূল একই। স্বাদ পৃথক পৃথক। তবে সবারই মূল মাটি। মাটির ভেতর থেকে বের হচ্ছে অথচ রঙ ভিন্ন ভিন্ন। যদি মাটিই রঙদানকারী হতো তাহলে সব কিছুরই একই রঙ হতো। রঙের ভিন্নতা– কালো-সাদা, লাল-নীল প্রভৃতি আল্লাহ ছাড়া আর কে করতে পারে?

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

> আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– রঙের এ বিভিন্নতা শুধুমাত্র ফল-ফুলেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পাহাড়-পর্বতকে দেখ– কোনটি সাদা, কোনটি নীল, কোনটি কালো, কোনটি সবুজ ও লাল রঙের। [ফাতির :২৭]

এ কথাটি আমার হৃদয়ে উদিত হয়েছে আজ। অর্থাৎ আমি যে আয়াত পাঠ করেছি, তা আজ সফরকালে স্মরণ হয়েছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আসছিলাম। দেখতে পেলাম, কোন পাহাড় নীল রঙের, কোনটি লাল, কোনটি গোলাপি, কোনটি কালো, কোনটি থেকে কয়লা বের হচ্ছে। পাহাড়গুলোর রঙের এ বিভিন্নতা যদি পাহাড়ের নিজস্ব বিশেষত্ব হতো, তাহলে একই রঙের হতো; নানা রঙের হতো না। বোঝা গেলো, কোন সর্বশক্তিমান কর্তা রয়েছেন, যিনি তাঁর ইচ্ছা মতো এদের রঙ দান করেছেন। পাহাড় নিজে থেকে কোন রঙ গ্রহণ করছে না।

কালো রঙও সাধারণ নয়; বরং অত্যন্ত কালো মূল কিতাব একে বলা হয়, যার মধ্যে অত্যধিক কালো রঙ থাকে। পাহাড় থেকে কয়লা বের হচ্ছে, যা অত্যধিক কালো। এরপর বলছেন– এভাবে মানব সমাজকে দেখ, তাদের মধ্যেও বিভিন্ন রঙ রয়েছে। আরবদের দেখো, তাদের রঙ লাল। হাবশীদের দেখ, তাদের রঙ অত্যন্ত কালো। তাতারীরাও কালো রঙের। চীন এবং জাপানীরা হলুদ রঙের। ভারতে তাকাও, এখানে রয়েছে সকল রঙের সমারোহ। কালো-সাদা প্রভৃতির মিশ্রণ। সব রঙের মানুষ এ দেশে পাওয়া যাবে। সাদা-কালো হওয়া যদি মানুষের স্বভাবজাত হতো, তাহলে কেউ কালো, কেউ সাদা হলো কেন? সবাই মানুষ। সকলের মর্জির প্রতি লক্ষ্য না করে বরং তাদের অপছন্দের রঙ দান করছে অন্য কোন শক্তি। এমন কোন্ স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করছেন।

এরপর ইরশাদ করেছেন– শুধু মানবজাতির বিশেষত্ব নয়, চতুষ্পদ জীব-জন্তুদের প্রতি দৃষ্টি দিন। এদের মধ্যেও রঙের বৈচিত্র রয়েছে। বিভিন্ন রঙ-রূপের হাজার হাজার জন্তু। বাঘের এক রঙ, হরিণের অন্য রঙ। বক সাদা, কাক কালো, তিতির সবুজ, ময়ূর হরেক রঙের। প্রত্যেকটি প্রাণী হিংস্র-অহিংস্র, পশুপাখি– সবারই রঙ ভিন্ন ভিন্ন! রঙের কোন সীমা-সংখ্যা নেই। এদের প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে নানা রঙ রয়েছে। গাভী কালো, সাদা, লাল, চিত্রল আরো হরেক রঙের। উট-বকরিরও একই অবস্থা।

এটা যদি প্রাণীকুলের স্বভাবজাত হতো, তাহলে একই রঙ হতে এত নানা রঙ ও

রূপ কেন? মানব স্বভাবের চাহিদা অনুযায়ী একই রঙ ছিল। কিন্তু অনেক রঙ ও রূপ কেন? পাহাড় একই রঙের না হয়ে অনেক রঙের কেন? সুতরাং এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, প্রতিটি জিনিসের স্বভাবজাত চাহিদার বিরুদ্ধে রঙ প্রদানকারী হলেন ঐ মহান সত্তা যাঁর হাতে সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে, যিনি যাকে যেমন ইচ্ছা রঙ দান করেন, যেমন ইচ্ছা আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেন। আর এসব জিনিসের আকার-আকৃতি ও রঙ-রূপের ভিন্নতা দেখে আল্লাহর শান ও ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা, আকার-আকৃতির ভিন্নতা, চেহারার ভিন্নতা। বর্তমানেও কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে রয়েছেন। কোটি কোটি মানুষ পরপারে চলে গেছেন। ভবিষ্যতেও কোটি কোটি মানুষ আসবেন। অথচ অবিকল একই আকার-আকৃতির দু'জন মানুষ পাওয়া যাবে না। আল্লাহর ইলম এতই অসীম যে, প্রতিটি মানুষকে সম্পূর্ণ আলাদা আকার-আকৃতি দান করেছেন।

এছাড়া পার্থক্য করার জন্য এটাও করা যেত– একজনের নাক এক জায়গায়, অন্যজনের অন্য জায়গায়। কারো কান দেহের অগ্রভাগে, কারো পেছনে। অথচ তা করা হয়নি; বরং নাক কান এমন এমন স্থানে বসানো হয়েছে, যে স্থানে হওয়াই সঠিক ও মানানসই। চোখও যথার্থ ও উপযুক্ত জায়গায় বসানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও পার্থক্য আছে। মোট কথা, রঙ-রূপ, আকার-আকৃতি সবই ভিন্ন ভিন্ন দেয়া হয়েছে।

এরপর হলো ভাষার ভিন্নতা। একটি পাখি, যেমন তোতা। সে ভারতের হোক, আরবের হোক কিংবা তুর্কিস্তানের– যে কোন দেশের হোক, সবারই ভাষা একই। গরু-গাভী, হিন্দ-সিন্ধ যে কোন স্থানের হোক, ভাষা একই হবে। মোরগ যে কোন দেশের হোক, একইভাবে আওয়াজ করবে। তবে মানুষ বৈচিত্র্যময় ভাষায় কথা বলে। এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, জার্মান, ফ্রান্স, হিন্দুস্থান প্রভৃতি দেশে পৃথক পৃথক ভাষা। আমাদের ভারতবর্ষে মৌলিকভাবে এক্শ' দশটি ভাষায় কথা বলা হয়। প্রত্যেকটি প্রদেশের ভাষা আলাদা। পাঞ্জাবি, সিন্ধী, মাদ্রাজি, বাঙ্গালী, বেলুচি, মুরাদাবাদী প্রভৃতি। এর প্রতিটি ভাষায় প্রভেদ রয়েছে। দিল্লীর উর্দু এক রকম, লক্ষ্ণৌর উর্দু অন্য রকম। বিহারের আলাদা, ইউ.পি'র আলাদা। মানুষ হলো বিস্ময়কর প্রাণী। এরা অসংখ্য ভাষায় কথা বলে। দুনিয়ার ভাষাসমূহ গণনা করলে হাজার হাজার হবে। যদি যে কোন ভাষা, যেমন– আরবি ভাষা মানুষের স্বভাবজাত হতো, তাহলে মানব জাতির ভাষা একই হতো। কারো আরবি, কারো তুর্কী শিক্ষাদানকারীই শিক্ষা দিয়েছেন। এ হলো আমার শক্তি ও ক্ষমতা। আমি আত্মাকে পথনির্দেশ করি–

এভাবে কথা বলো। তোমরা ভাষা শিক্ষাদানকারী নও। সন্তান যখন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মাতাপিতাকে একটি একটি করে শব্দ সন্তানকে শিক্ষা দিতে হয় না; বরং সে নিজেই কথা বলতে শুরু করে। ঐ সত্তা কে যিনি অদৃশ্য থেকে অন্তরে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন! সার কথা, ভাষার বিভিন্নতাও আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরিচয় লাভের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রমাণ।

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন–

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ

আল্লাহর কুদরত ও মহাশক্তির নিদর্শনাবলীর মধ্যে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রঙ-রূপের বিভিন্নতাও। [রূম : ২২]

এতে কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। তবে ঐসব মানুষের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। যারা এ চিন্তা করে যে, এই ভিন্নতা কেন? এতে কোন রহস্য রয়েছে নিশ্চয়ই! মানুষ যদি আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে চায়, তাহলে সৃষ্টিজগতের বিভিন্নতার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর পরিচয় লাভের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে। ভাষা, গঠন-আকৃতি, রঙ-রূপ, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু সবকিছুর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। একই ধরনের কোন জিনিস নেই। মানুষ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করতে বসে, তাহলে সে-ও বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টি করতে চাইবে। একই ধরন ও একই রঙের হোক– তা সে পছন্দ করবে না। এ বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রকৃতির আবেগ ও মনোভাব কে সৃষ্টি করেছেন? একই ধরনের হোক– এটাই তো ছিল স্বভাবজাত চাহিদা। এক একজনের পোশাক-পরিচ্ছদ একেক ধরনের। বিভিন্ন জাতি প্রতিদিন নতুন নতুন ফ্যাশন আবিষ্কার করছে। আজ যা ফ্যাশন, আগামীকাল তা অচল। নতুন আরেক ফ্যাশন এসে যাবে। আর চলমান শতাব্দীর পর কি কি ফ্যাশন তৈরি হবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এসব যদি মানুষের স্বভাবজাত হতো, তাহলে যে কোন একটির ওপর মানুষ স্থির থাকতো। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি জিনিসে ভিন্নতা রয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধিতেও রয়েছে ভিন্নতা। এসব ভিন্নতা সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা। স্বভাবজাত নয়; বরং মহাশক্তিশালী কর্তার কর্ম। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন, সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষ যদি আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে চায় তাহলে তার নিজের প্রতি দৃষ্টি দিক– তা হলে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হবে।

পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিন, আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবেন। মোদ্দাকথা, যে জিনিসের দিকেই দৃষ্টি দিন না কেন, আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রকাশ্য ও ধ্রুবসত্য বলে দেখতে পাবে। আর যদি চিন্তা-ফিকির না করা হয়, তাহলে নবী (আ.)গণ তালিম দিলেও মানবে না। যারা মানতে চায়, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি জিনিসকে শিক্ষক, উপদেষ্টা ও মুবাল্লিগ করে সৃষ্টি করেছেন।

যাই হোক, আমি এ আয়াত এজন্য তেলাওয়াত করেছিলাম যে, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অস্তিত্বকে মেনে নেয়ার জন্য স্বভাবজাত প্রমাণ পেশ করেছেন। প্রমাণও এমন সহজ-সরল যে, গ্রাম্য-শহুরে অশিক্ষিত মানুষও তা বুঝতে পারেন। এর জন্য কোন দার্শনিক তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআন হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শনকারী কিতাব। এর মধ্যে এমন সব দলীল-প্রমাণ থাকা উচিত যা সর্বসাধারণ বুঝতে সক্ষম। যদি মানতেকী ও দার্শনিকদের মতো 'সকলে আউয়াল' বানানো হতো, একাধিক ভূমিকা সংযোজন করে নতীজা বের করা হতো তাহলে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে অক্ষম হতেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে এমন সব সরল-সহজ প্রাকৃতিক দলীল-প্রমাণ দ্বারা, যা স্বল্পবুদ্ধি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বুঝতে সক্ষম এবং সহজে বুঝতে পারে।

এ আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছিলাম এবং এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা পেশ করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমাদের ইহ-পরকালীন খায়ের ও বরকত নসীব করুন। তাঁর মারেফাত, ইলম ও আমলের তাওফিক দান করুন। তাঁর পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে চলার তাওফিক দিন। দীনকে আমাদের পোশাক বানিয়ে দিন। আমাদের দুনিয়া-আখেরাত সঠিক করে দিন। পরকালে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করুন এবং তাঁর পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিয়ারত ও সাহচর্য নসীব করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع عليم- وارنا مناسكنا
وتب علينا انك انت التواب الرحيم - واخر دعوانا ان احمد
لله رب العالمين-

বয়ান : ৩

আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি

দুনিয়ার কোন লোকটি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নন? হাতেগোনা ক'জন নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না– এদের ছাড়া দুনিয়ার সকলেই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, তারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোন না কেন। ধর্মের ভিত্তিই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা, তাঁকে মেনে নেয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। একজন ইহুদীও এ কথা বলবে না যে, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নই। কোন খৃষ্টান একথা বলবে না, আমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট। কোন মুশরিক, যে কোটি কোটি দেবতার পূজা করে সে-ও এ কথাই বলে যে, প্রধান আল্লাহ একজনই। এটাও বলে যে, আমি প্রধান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি। সার কথা, সকলেই আল্লাহর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। তাহলে মুমিনের জন্য নতুন কথা কি? আল্লাহর উপর সন্তুষ্টিতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ✡ ارْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ✡
فَادْخُلِى فِى عِبَادِى ✡ وَادْخُلِى جَنَّتِى ✡

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এটা হলো পবিত্র কুরআনের একটা আয়াত, যা আমি এখন আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করলাম। এটি সূরা ফযরের শেষ আয়াত। এখানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন–

হে নফসে মুতমাইন্নাহ! (নিশ্চিন্ত শান্ত মন) ফিরে চলো নিজের প্রতিপালক প্রভুর পানে এমতাবস্থায় যে, তুমি আল্লাহর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। আমার বিশেষ বান্দাদের সাথে মিলে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। [ফজর : ২৭-৩০]

উল্লিখিত আয়াতে অনেক ইলম ও মা'রিফ, জ্ঞান ও মৌলিক তত্ত্ব রয়েছে। তবে এখানে এত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই, সময়ও নেই। তাই আয়াতের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর বয়ান করা এবং সকল তত্ত্ব ও রহস্য সবিস্তার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তবে আয়াতের হক তখনই আদায় হবে যখন নফসে মুতমাইন্নার ব্যাখ্যা করা হবে। নফসে মুতমাইন্না কি? কাকে বলা হয়?

ارجعى الى ربك -

তোমার রবের দিকে ফিরে যাও।

কেন এই ফিরে যাওয়া? আগমন নিশ্চিত হলেই না কেবল প্রত্যাগমন হয়। সুতরাং সর্বপ্রথম আগমনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। রাযি এবং মারযি হবার অর্থ কি? বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য কি? জান্নাতে প্রবেশের কাইফিয়ত ও অবস্থা কেমন? সার কথা, এখানে অনেক মৌলিক বিষয় রয়েছে যার সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মাকসুদই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনার বিষয়। ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অথচ এত লম্বা সময় এখন নেই। তাই আয়াত সম্পর্কিত তিনটি বিষয় নিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাব।

আয়াতটি একটি ঘটনা সম্পর্কিত এবং এর প্রতি ইঙ্গিতও করা হয়েছে। অন্যটি হলো সুসংবাদ। আয়াতে তার স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। আরো একটি আছে। সেটি হলো পুরস্কার, যা আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এ তিনটি কথারই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করবো।

অন্তিমকালের সম্বোধন

আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পূর্বে অন্তিম সময়ে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হবে। তখন তার শেষ সময়। যেন তার অন্তিমকালীন সম্বোধন। জীবদ্দশায় যেমন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল– নামায পড়, রোযা রাখ, হজ কর প্রভৃতি। এসব জীবদ্দশার সম্বোধন। আর এ হলো জীবনের অন্তিম সময়ের সম্বোধন। মানুষ যখন আপন প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য যাচ্ছে এবং এ দুনিয়ার জিন্দেগী খতম হয়ে যাচ্ছে– ঐ সময়েরই এই সুসংবাদ যা এ আয়াতে বলা হয়েছে। আর ঐ সময় একটি পুরস্কারেরও ওয়াদা করা হয়েছে। হে নফসে মুতমাইন্নাহ! কখন এ সম্বোধন করা হবে? হাদীসে এর সবিস্তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যখন মুমিনের অন্তিমকাল, শেষ সময় উপস্থিত হয়, তার রূহ বের করার কাজ শুরু হয়, তখন মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা)-এর সহকর্মী ও সহায়তাকারীরা ঐ ব্যক্তির নিকট হাজির হন।

মালাকুল মওতের সহায়তাকারী দু'ধরনের। একদল হলেন আসহাবুশ-শিমাল (বাম দিকের), অন্য দল আসহাবুল ইয়ামীন (ডান দিকের)। ডানদিকের

ফেরেশতাদের অবস্থা হলো– তাঁরা শ্বেত-শুভ্র, সুন্দর, উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সুন্দর-উজ্জ্বল তাঁদের চেহারা। আর বাঁ-দিকের ফেরেশতাদের অবস্থা হচ্ছে– চেহারা অত্যন্ত কালো-অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীতিপ্রদ। যখন মুমিনের রূহ কবয করার সময় হবে, তখন প্রথমে ডানদিকের ফেরেশতাদের পাঠানো হবে, যাঁদেরকে আসহাবে ইয়ামীন বলা হয়। হাদীসে বলা হয়েছে– মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি দূর থেকে তা দেখতে পাবে। মনে হবে যেন কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য আলো ছড়াচ্ছে এবং এগুলো ধীরে ধীরে তার নিকটবর্তী হচ্ছে। সে অবাক হবে। ভাববে, এ কি! এসব ফেরেশতা যাঁদেরকে আসহাবুল ইয়ামীন বলা হয় অর্থাৎ মালাকুল মওতের ডানপাশের ফেরেশতা। দূর থেকে এ জন্য দেখানো হয় যে, নতুন এক জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, নতুন জগতের মাখলুক সামনে আসছে। হঠাৎ হাজির হয়ে পড়লে মুমিন ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেতে পারেন, আতঙ্কিত হয়ে হায়-হুতাশ শুরু করে দিতে পারেন। তাই দূরে রেখে তাদের জামাল, সৌন্দর্য-উজ্জ্বলতা দেখানো হয়। তারপর ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা হবে যেন আস্তে আস্তে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

এ সময়টা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির জন্য চরম বিস্ময়ের হয়। এই সূর্য-চন্দ্রগুলো কি? ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে এগুলো নিকটবর্তী হয়ে যায়। এমন স্পষ্ট হয় যে, এঁরা কেবল আলোকখণ্ড নয়; বরং এদের আকার-আকৃতি সবই দৃষ্টিগোচর হবে। তাঁরা ঐ মুমিনের সাথে অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও স্নেহ-মমতার আচরণ করেন। এমনটা করেন না যে, উপস্থিত হওয়ামাত্র রূহ কবয করে নেন; বরং আগ্রহ-উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন এবং বলেন– 'হে পবিত্র রূহ, পবিত্র নফস। এ শরীর থেকে বেরিয়ে আসো, যাকে তুমি তোমার নেক আমল দ্বারা পাক-পবিত্র করেছিলে। তুমিও পাক, তোমার শরীরও পাক। কোথায় বেরুবে, কোথায় যাবে? সে জায়গা অবশ্যই সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দের হবে এবং দয়ালু প্রভুর সন্নিকটে যিনি কখনো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না, রাগান্বিত হবেন না'; বরং তোমার প্রতি দয়া করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।' তাঁর পাশে চলো! এ যেন হৃদয়গ্রাহী বাণী, যাতে তাঁর হৃদয়ে পরকালের প্রতি আবেগ আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ সময় তারা দুনিয়ার অপবিত্রতা, কষ্ট-ক্লেশের কথাও বর্ণনা করেন। তারা বলেন– তুমি কত অপবিত্র কষ্টকর জায়গায় আবদ্ধ আছো! পবিত্র জগত যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই, চিন্তা-ভাবনা নেই; বরং রয়েছে আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-ফূর্তি! সে জগতের দিকে চল, ঐ মালিকের দরবারে চল, যাঁর উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করেছ, কষ্ট-ক্লেশ-পরিশ্রম করেছ। এখন ফল লাভ ও পুরস্কার প্রাপ্তির সময়

নিকটবর্তী হয়েছে। এ বাণীসমূহ সত্যিই আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। ফলে মুমিনের অন্তর, মন-মস্তিষ্ক পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন এই দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের যাত্রা সহজ হয়ে যাবে। পরকালীন জগতে যাত্রা করা সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে যাবে।

মৃত্যুর ফেরেশতা মুমিনকে উৎসাহ দিয়ে পরকালে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন

সার কথা, প্রথমে দুনিয়ার অসারতা, ক্লেশ ও যাতনা ও এর প্রতি বিতৃষ্ণা অন্তরে জাগিয়ে তোলেন এবং পরকালের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তবুও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু মানুষের জন্য কষ্টকর। এ দুনিয়া ত্যাগ করে, যেখানে জীবনের পঞ্চাশ-ষাটটি বছর অতিবাহিত করেছে– এখন অজানা অন্য এক জগতে চলে যেতে হবে! এ কারণে দেহ বর্জন করা যেমন রূহের জন্য কঠিন ও কষ্টকর, দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করাও তেমনি কষ্টকর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু মানুষের জন্য অপছন্দনীয় ও ইচ্ছাবিরুদ্ধ। ফলে যত সুসংবাদই দেয়া হোক, দান ও নেয়ামতের বাণী শোনানো হোক, স্বভাবজাত ভয় ও ভীতি থেকেই যায়, মন অগ্রসর হতে চায় না। তবে এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা দুনিয়াতে থাকাকালে নিজে মন-মস্তিষ্ককে পরকালের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, আহ্বান আসার সাথে সাথে সানন্দে তা গ্রহণ করবেন।

একদিন আমি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর মজলিসে হাজির ছিলাম। আরো দু'তিনজন ছিলেন। মজলিসটি সাধারণ ছিল না। এ অবস্থায় হঠাৎ হযরতের তবীয়তে জোশ ও আবেগ দেখা দিলো। তিনি এদিক-সেদিক দেখতে লাগলেন, অপরিচিত কেউ আছেন কি না। যখন দেখলেন কেউ নেই, মনে হলো অত্যন্ত গোপন কোন রহস্যের কথা বলবেন। এদিক-সেদিক দেখে যখন আশ্বস্ত হলেন অন্য কেউ নেই, তখন তিনি আমাদের সম্বোধন করে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আমি মৃত্যু ও পরলোক গমনের জন্য এভাবে তৈরি হয়ে বসে আছি যে, যদি এখনই পরকালের ডাক এসে যায় তবে খুশিতে সানন্দে চলে যাবো।

হযরত কথাটি বললেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট তা বিস্ময়কর মনে হলো। কারণ এ আর এমন কি নতুন কথা! মৃত্যুর সময় যাঁরই ঘনিয়ে আসবে, ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়, যেতে তো হবেই। একথা বলা যে, 'আমি তৈরি হয়ে বসে

আছি'– এর স্বার্থকতা কি? আপনি প্রস্তুত থাকুন অথবা না-ই থাকুন, মৃত্যু যখন আসবে, যেতে আপনাকে হবেই। এতে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকার কি আছে! আমাদের বিস্ময় এ কারণে যে, এটা তো তেমন কোন গোপন রহস্যজনক কথা নয়। এর জন্য হযরত এদিক-সেদিক দেখে নিলেন, কোন অপরিচিত, অচেনা কেউ আছে কি-না। পরে বিষয়টির হাকীকত বুঝতে পেরেছি। এক তো হলো মৃত্যুর স্বাভাবিক আগমন যখনই আসবে মানুষ চলে যাবে। যেমন- মানুষ পৃথিবীতে আগমনে বাধ্য। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠানোর ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়াই তাকে আসতে হয়। তেমনি যখন পরলোকে নিয়ে যেতে চান, তখনও তাকে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, যেতে তাকে হবেই। এ হলো আল্লাহ তায়ালার কাজ। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ও কানুনের সামনে মানুষ অসহায় ও বাধ্য। আরেক হলো সন্তুষ্টি। আনন্দের সাথে যাত্রা করবে। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ তায়ালার মহব্বত ও ভালোবাসা অন্তরে প্রবল হয়ে যায়। আখেরাতের নেয়ামতসমূহের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। পরকালের নেয়ামতের তুলনায় পার্থিব নেয়ামত তুচ্ছ, মূল্যহীন মনে হয়। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সমগ্র পৃথিবী ও এতে অবস্থিত সকল বস্তুসামগ্রী হতে বেশি মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ মনে হয়। এমন মনে হয় যে, কুরআনের একটি আয়াত যদি আমি বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে আমার এ অবস্থা হয়ে যাবে যে, এ নেয়ামতের পরিবর্তে যদি দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তথাপি এর জন্য আমি প্রস্তুত থাকবো। আর এ অবস্থা তখনই হয়, যখন আল্লাহ ও দীন ইসলামের মহব্বত-ভালোবাসা অন্তরে প্রাধান্য লাভ করে, প্রবল হয়ে যায়। আর তখনই কেবল মানুষের অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং খুব দ্রুত দুনিয়া থেকে চলে যেতে চায়। কোন আরিফ বলেছেন–

خرم اں روز کزیں منزل ویراں بروئیم

تا در میکدہ شاداں وغزل خواں بروئیم

সে মুবারক দিন কখন আসবে, যেদিন এ অসার পৃথিবী ত্যাগ করে আরাম ঐ সুখ-শান্তিময় দেশে পৌঁছে যাবো, ঐ কাঙ্ক্ষিত জনপদে পৌঁছে যাবো, যে স্থানের ওয়াদা আমাদের সাথে করা হয়েছে।

আর এ কারণেই তাঁদের অন্তরে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুর সময় স্বয়ং আল্লাহ মুমিনের সাথে কথা বলেন

হাদীস শরীফে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لايتمنين احد كم الموت-

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা না করে।

এ কারণে যে, মৃত্যু এসে জীবন ও আমলকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। নেক আমলসহ জীবন যত দীর্ঘ হবে, ততই ভাল ও মঙ্গলজনক। কাজেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করো না। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে–

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۞

হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা যদি নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের ওলী ও আপনজন বলে দাবি করো, তাহলে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে তোমাদের সততা প্রমাণ করো। [জুমুআ : ৬]

এতে বুঝা গেলো, মুমিন হওয়ার এবং আল্লাহর ওলী ও আপনজন হওয়ার বিশেষ চিহ্ন হলো– মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে উদিত হবে। আর এখানে বলা হচ্ছে, কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বক্তব্য দু'টি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। এক স্থানে আদেশ করা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করো, অন্য স্থানে বলা হচ্ছে কখনো তা করো না। কথা দুটি পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলো। কিন্তু অন্য একটি হাদীস বিষয়টি স্পষ্ট ও খোলাসা করে দিয়েছে। বলা হয়েছে–

لا يتمنين احد كم الموت بضر نزل به-

কোন ব্যক্তি আপদ-বিপদে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা যেন না করে।

আসলে এটা হলো ধৈর্যহীনতা ও আল্লাহর ওপর অবিশ্বাসের পরিচায়ক। বিপদে পড়ে মানুষ একথা বলে বসে, মরণ হয়ে যাক; অথচ যদি মরণ আসে তাহলে পরপারেও বিপদাপদই থাকে। তখন কি হবে? বিপদগ্রস্ত হয়ে মরণ কামনা করা– পক্ষান্তরে আল্লাহর পুরস্কার ও দানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর;

ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক। এমন বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে যদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করা হয়– তাহলে সেটা চিরকাম্য ও প্রশংসনীয়।

হযরত বেলাল (রা.)-এর যখন মরণের সময় ঘনিয়ে আসলো, তখন আনন্দে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো, যেন তাঁর অন্তর থেকে আনন্দ-ফুর্তি উথলে পড়ছে। উপস্থিত লোকজন আরয করলো– অন্তিমকাল, এখনই আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার কথা; অথচ এ অবস্থায়ও এত আনন্দ-উল্লাস! উত্তরে তিনি বললেন–

غدا نلقى محمدا و اصحابه-

আগামীকাল ইনশাআল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ হবে।

এ কারণেই আমার এত আনন্দ-উল্লাস! এ জাতীয় আনন্দ কাম্য। তাই কেউ যদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তা পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর যদি বিপদাপদে অতিষ্ঠ হয়ে, আতংকগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তা খুবই নিন্দনীয়।

আসল কথা, বিলায়ত যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন মৃত্যুর আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন–

اللهم حبب الموت الى من يعلم انى رسولك-

হে আল্লাহ! প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে মৃত্যুকে প্রিয় করে দাও! তার অন্তরে মৃত্যুর মহব্বত পয়দা করে দাও যে আমাকে তোমার নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করে।

অপর এক হাদীসে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

الموت تحفة المؤ من يو صل الحبيب الى الحبيب-

মৃত্যু মুমিনের জন্য তোহফা (উপহার) বিশেষ। এজন্য যে, প্রেমিককে তাঁর মাহবুব ও প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

প্রকৃত প্রেমিক হলে প্রিয়জনের সান্নিধ্য তার একান্ত কাম্য হয়; অপছন্দনীয় হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রেমিক হবে, সে আল্লাহর সাক্ষা লাভের

আকাঙ্ক্ষা করবেই। তবে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ মৃত্যু না হবে। মৃত্যু হলো আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতের মাধ্যম। এ মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর দিদার লাভ করতে পারবে না। সার কথা, যখন বিলায়ত হাসিল হয়ে যায়, তখনই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হয়। এক্ষেত্রে ঐ জাতীয় মানুষের কথা উদ্দেশ্য নয়। তবে আমাদের মত সাধারণ মুমিন, যারা মৃত্যুকে স্বভাবতই অপছন্দ করে, মালাকুল মওত ও তার সহকর্মীগণ এসে তাদেরকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিতে থাকেন। বলেন– এ অপবিত্র, আবর্জনাময় জগতে পড়ে আছে। এবার ঐ জগতে চলো, যিনি কখনো কঠোর ও দয়াহীন হবেন না, তাঁর দয়া ও মেহেরবানী চিরকাল থাকবে। যখন তাঁর হৃদয়ে দান ও নেয়ামতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পরজগতে যেতে সে রাজি হয়ে যায়, তখন রূহ কবয করা শুরু হয়। কোন কোন মুমিন এমনও রয়েছেন, যাঁরা ফেরেশতাদের দেখে সন্তুষ্টচিত্তে যেতে চান। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু স্বভাবতই ভয়-ভীতির বিষয়। এ কারণেই তাঁর রূহকে রাজী ও সন্তুষ্ট করেই কবয করতে হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতেও যেন তাকে মজবূর না করা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখাই উচিত। এ হলো মুমিনের সাথে দয়া, মেহেরবানী ও নরম আচরণ। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ঐ সময় ফেরেশতাগণ কিছু উপহারও সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং মুমূর্ষু মুমিনকে তা দেখান। জিনিসগুলো যখন সামনে আনা হয়, তখন ঐগুলো দেখে ঐ মুমূর্ষু মুমিন আত্মহারা হয়ে যান। আর তখনই নিজের জোশ ও সাহস দেখাতে চান।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– এরপর রূহ এত সহজ-সরল ও আরামের সাথে বেরিয়ে যায় যেমন পানিভর্তি মশকের মুখ খুলে দিলে পানি বের হয়ে যায়, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকে না। এভাবে প্রাণপাখি আল্লাহর দিকে উড়ে যায়। তখন রূহকে সম্বোধন করে বলা হয়– 'হে নফসে মুতমাইন্নাহ! ফিরে চলো তোমার প্রভুর দরবারে এমন অবস্থায় যে, তুমি রবের প্রতি এবং রব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।' মিলে যাও আমার প্রিয় বান্দাদের দলে, ঢুকে পড় আমার জান্নাতে। ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ পয়গাম পৌঁছে দেয়া হয়– হে পবিত্র আত্মা! চলে এসো! তুমি নিজেও পাক ছিলে, তোমার শরীরও পাক ছিল। এ তো হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে দেয়া সুসংবাদ। আর উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ সুসংবাদ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা প্রত্যক্ষভাবে দান করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই সম্বোধন করে বলেন– হে নফসে মুতমাইন্নাহ! এখন বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই, চলে এসো প্রভুর দরবারে। প্রভুও তোমার, তুমিও প্রভুর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। এ সম্বোধন ও সুসংবাদ দান স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে দেয়া হবে।

সকলেরই মরণ হবে, তবে সুসংবাদ প্রদান এবং সম্বোধন করা হবে কেবল মুমিনগণকে, অন্য কাউকে নয়।

মুমিনের জন্য সন্তুষ্টির সুসংবাদ ঘোষিত হবে

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত সুসংবাদ কি? সুসংবাদ হচ্ছে রাজিয়া, মারজিয়া। অর্থাৎ হে নফসে মুতমাইন্নাহ! এ অবস্থায় ফিরে এসো যেন তুমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। সন্তুষ্টির ঘোষণাই হলো সবচে' বড় ও সর্বোত্তম নেয়ামত। মুমিনকে বলা হবে, তুমি আমার প্রতি এবং আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। মুমিনও রাজী থাকবে– এর অর্থ কি?

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এমন একটি প্রশ্ন জাগতে পারে– দুনিয়ার কোন লোকটি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নন? হাতেগোনা ক'জন নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না– এদের ছাড়া দুনিয়ার সকলেই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, তারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোন না কেন। ধর্মের ভিত্তিই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা, তাঁকে মেনে নেয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। একজন ইহুদীও এ কথা বলবে না যে, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নই। কোন খৃষ্টান একথা বলবে না, আমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট। কোন মুশরিক, যে কোটি কোটি দেবতার পূজা করে সে-ও এ কথাই বলে যে, প্রধান আল্লাহ একজনই। এটাও বলে যে, আমি প্রধান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি। সার কথা, সকলেই আল্লাহর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। তাহলে মুমিনের জন্য নতুন কথা কি? আল্লাহর উপর সন্তুষ্টিতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য কোথায়? হাদীস শরীফে এ সন্তুষ্টিরও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে– এক প্রকার রিযা ও সন্তুষ্টি হলো আল্লাহর যাতের সঙ্গে। এ ধরনের রিযা ও সন্তুষ্টি ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের মানুষই বলে– আমি স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী এবং সন্তুষ্ট আছি। যে পর্যন্ত ঐ সকল কাজকর্মের ওপর রাজী ও সন্তুষ্ট না হবে, যা বান্দার জন্য করা হয়। অর্থাৎ তকদীর-অদৃশ্যের ওপর রাজী থাকতে হবে। প্রতিটি কাজের ওপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার সঙ্গে করেন। এটাও ঈমানের জন্য প্রয়োজনীয়। আল্লাহ তায়ালা যেমন খালিক ও মালিক তেমনি রবও তিনি। রব অর্থ প্রতিপালক। প্রতিপালনের সময় সেসব কাজও করা হয়, যার দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বান্দা অসন্তুষ্ট হয়; আবার এমন কাজও করা হয়, যার প্রতি বান্দা রাজী ও খুশি থাকে।

মা সন্তান লালন পালন করেন। সন্তানকে যেমন আদর-যত্ন করেন তেমনি প্রয়োজনে শাস্তিও দেন, চড়-থাপ্পড়ও মারেন। তার মঙ্গলের জন্যই তা করেন। বাবা যেমন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন, তেমনি দুষ্টুমি ও পড়াশোনা না করলে, মক্তবে না গেলে সাজা-শাস্তি, মারপিটও করেন, শাসন করেন। কখনও কখনও এ কথাও বলেন– আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও; তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না। অন্তরে মহব্বত আছে ঠিকই অথচ এসব কথা বলছেন। আবেগের সাথে বলছেন, আর যদি এসব কর, তাহলে দেয়ালে ধাক্কা মেরে তোমাকে জানে মেরে ফেলবো। কিন্তু সত্যিই কি তার অন্তরে ছেলেকে মেরে ফেলার ইচ্ছা রয়েছে, না শুধু ছেলেকে সাবধান, সতর্ক করার জন্যই এসব বলছেন। সার কথা, যেমন আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা করেন, তেমনই প্রয়োজনে সাজা-শাস্তিও দান করেন। মা যেমন স্নেহ-মমতার কারণে লালন-পালন করেন, প্রয়োজয়ে বাধ্য হয়ে সাজা-শাস্তি ও কঠোর আচরণও করেন। এটাও লালন-পালনেরই একটা অংশ। এটা লালন-পালন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাচ্চা যেমন মায়ের দুধ পান করানোর ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে, খাবার তৈরি করে খাওয়ানোর ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে; একইভাবে যদি প্রয়োজনে চড়-থাপ্পড় মারে, সাজা-শাস্তিও দেয়, তখনও রাজীই থাকে। একথা বলে না, তুমি আমার মা নও, আমি তোমার পুত্র নই। এমনটা যদি ঘটে, তাহলে বলা হবে ছেলেটি বেজায় খারাপ-অকৃতজ্ঞ। মায়ের দুধ পান করার প্রতি যেমন সে সন্তুষ্ট ও খুশি থাকে, তেমনি মায়ের চড়-থাপ্পড়, সাজা-শাস্তির ব্যাপারেও রাজী থাকা তার কর্তব্য। কারণ, সাজা-শাস্তি তার উপকার ও মঙ্গলের জন্য করা হয়। কেননা তার সাথে মা-বাবার সম্পর্ক স্নেহ-মমতার, দুশমনি ও শত্রুতার সম্পর্ক নয়। মা যদি সাজা প্রদান না করেন তাহলে সন্তানের জীবনধারা ঠিক হবে না। স্নেহ-মমতা, ভদ্রতা-সামাজিকতা এসব কিছুই শিখতে পারবে না। নেক ও যোগ্য উত্তরাধিকারী তাকেই বলা হয়, যে মা-বাবার শাসন ও প্রহারের ওপর এভাবেই সন্তুষ্ট থাকে, যেভাবে পানাহার করানোর ওপর রাজী থাকে। পড়ালেখা না করার কারণে যদি শাসন করে এক বেলার খানা বন্ধ করে দেয় তবুও সন্তুষ্ট থাকে। কেননা তার জানা আছে, এসব তার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য করা হচ্ছে।

বাস্তব সত্যি হলো– দুধের শিশুও এ কথা বুঝে যার এখনও জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশ হয়নি। মা দুধপান করানোর সময় যেমন মায়ের কোলে যায়, যখন চড়-থাপ্পড় মারেন তখনও মা-মা বলেই কাঁদতে থাকে এবং মায়ের কোলেই যায়। সে বুঝে মায়ের কোল ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই। মায়ের কোলেই আমার শান্তি। সার কথা, পানাহার করানো এ সবই তরবিয়তের অন্তর্ভুক্ত। সময়ে প্রহার করা,

শাসন-শাস্তি দেয়া সবই তরবিয়ত। প্রকৃত বান্দা সে-ই, যে আল্লাহর সকল কাজের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তায়ালা বিত্তশালী, ধনবান বানিয়ে দিলে যেমন রাজী ও সন্তুষ্ট থাকে, সকল নেয়ামত ছিনিয়ে যদি তাকে সর্বহারা নিঃস্ব করে দেন, তখনও সে তেমনি রাজী ও সন্তুষ্ট থাকে। আর তখনই বলা হবে এ লোক প্রকৃতই আল্লাহর অনুগত বান্দা। নেয়ামতকালে যেমন সন্তুষ্ট থাকবে, বিপদকালেও তেমনই সন্তুষ্ট থাকবে। এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বিপদে নিপতিত করেন দুশমনির কারণে নয়; বরং এ-ও মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে, যা লালন-পালনেরই একটা অংশ।

কখনও কখনও নেয়ামত দেয়া হয় এবং বিপুল নেয়ামত দেয়া হয়। প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা দেয়া হয়। অথচ বান্দা নেয়ামত ও ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। সে আল্লাহর শুকর, কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য দিন-রাত আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে অবনত হয়ে থাকার পরিবর্তে আয়েশ-আরাম, আনন্দ-ফুর্তি, অপব্যয় করে নেয়ামতসমূহকে আল্লাহ-বিমুখতার উপকরণ বানিয়ে ফেলে। এবার নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিসহ চিন্তা করে দেখুন, থাপ্পড় মারার প্রয়োজন আছে কি না? সাবধান সতর্ক করা দরকারী কি-না? মানবতার ফয়সালা তখন এটাই হবে– তাকে সতর্ক করা হোক। এ কারণে কখনো কখনো সম্পদ ও দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবে তা প্রকৃতপক্ষে ছিনিয়ে নেয়া নয়। না হয় বলতে হবে– 'মাআযাল্লাহ' আল্লাহর ধনাগারে ঘাটতি পড়েছে। তাই বান্দার দৌলত ছিনিয়ে ঘাটতি পূরণ করছেন। বরং সতর্ক করার জন্য তা করা হয়; হয়তো এতে সে সতর্ক ও সংশোধিত হয়ে যাবে। সকল অপকর্ম থেকে বিরত থাকবে, মন্দ কাজ ত্যাগ করে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে কখনো কখনো বিপদাপদে পতিত করে তাদের পরীক্ষা করে নিই। কোন ভয়-ভীতি দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখি, কখনো শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত করে পরীক্ষা করি, যেন তারা পুনরায় কান্নাকাটি করে আমার দিকে রুজু হয়, প্রত্যাবর্তন করে, আমার আশ্রয়ে এসে যায়। [আন'আম : ৪২]

এমন অনেক জাতি ছিল, যারা সতর্ক হয়েছিল, আল্লাহর দরবারে মাথানত করেছিল, ঝুঁকে ছিল, তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। তখন তাদের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে নেয়ামত দান করা হয়েছিল, দানের বর্ষণ শুরু হয়েছিল। অথচ অনেকে এমনও রয়েছে, যারা সতর্ক-সাবধান হয়নি, মাথানত করেনি। তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞

> কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তখনও তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের অন্তর এতে আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরলো। [আন'আম : ৪৩]

এমন কেন হয় না– যখন আমার পক্ষ থেকে বিপদ দেয়া হয়, তখন তারা মাথানত করবে, কান্নাকাটি করবে! অথচ এমন কেন করে না? এ কারণে যে, তাদের হৃদয় পাথর হয়ে গিয়েছে, এরা সতর্ক হয় না, উপদেশ তাদের ওপর কোন কাজ করে না, প্রভাব বিস্তার করে না। শয়তান ইহকালীন জীবনকে তাদের সামনে এত চাকচিক্যময় ও লোভনীয় করে দিয়েছে যে, পরকালীন জিন্দেগীর কল্পনাও তাদের অন্তরে উদিত হয় না। তারা মনে করে, ইহজীবন তাদের শক্তি-সামর্থের মধ্যেই রয়েছে। কেউ এটাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। দুনিয়া তাদের কাছে এতটাই সুন্দর, শোভাময় ও লোভনীয় হয়ে যায় যে, এর চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে অন্য সব ভুলে যায়। অন্যদিকে খেয়াল করে না। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে দান করতে পারেন সেভাবে নিয়েও যেতে পারেন, ছিনিয়ে নিতে পারেন।

فلمانسوا ما ذكروا به-

উপদেশকে যখন উপেক্ষা করে, প্রত্যাখ্যান করে, সবই ভুলে যায়। যতই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় সবই বৃথা যায়। এরূপ করা সত্ত্বেও

فلما فتحنا عليهم ابواب كل شيئ –

আমি পরীক্ষামূলক সকল প্রকার নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিই, সবদিক থেকে

উন্মুক্ত করে দিই। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আহারে প্রাচুর্য, মাল-সামানের আধিক্য এবং সন্তান দান প্রভৃতি।

فلما فر حوا بما اوتوا

-এসব পেয়ে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, জীবন সামগ্রী আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে, শক্তির মধ্যে রয়েছে, কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, এমন শক্তি কারো নেই– তারা নতিজা ভুলে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে– তখন হঠাৎ আমি তাদের পাকড়াও করি, শাস্তির পাঞ্জা তাদের ধরে ফেলে। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ বিপদ কোথা থেকে আসলো? এমন বিপদ আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এটা কোথা থেকে আসলো!

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

তখন জালিমদের শেকড় কেটে ফেলা হয়, মূলোৎপাটন করা হয়, অত্যাচার ও অত্যাচারী উভয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। [আন'আম : ৪৫]

এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর তরবিয়ত ও লালন-পালনে যেমন দান ও ইনাম রয়েছে, তেমনি সাজা এবং প্রতিশোধও রয়েছে তরবিয়তের মধ্যে। রবুবিয়াতের কারণে যেমন দেয়া হয়, ছিনিয়ে নেয়াও রবুবিয়াতের কারণেই হয়। সাবধান! সতর্ক ও উপদেশ প্রদানের জন্য কখনও কখনও এমনটা করা হয়।

কেবল আল্লাহর যাত নয়, কাজের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকবে হবে

মোট কথা, সত্যিকারের বান্দা ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, যে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহর সকল কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ যদি দান করেন তাতেও রাজী, যদি ছিনিয়ে নিয়ে যান তবু রাজী। তাঁর ইনাম ও পুরস্কারের প্রতি যেমন রাজী, শাসন-সাজার ব্যাপারেও তেমনই রাজী। তিনি পাপকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেও রাজী থাকেন। নেয়ামত ও মসিবত প্রদানকারীও আল্লাহ তায়ালা এবং তিনি হিকমত ও বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হয়েই তা প্রেরণ করেন। সুতরাং তাঁর দেয়া নেয়ামতের ওপর সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকব মসিবতের ওপর রাজী ও সন্তুষ্ট হবো না– এটা কোন যুক্তিতেই ঠিক নয়। নেয়ামত ও মসিবত উভয় অবস্থায়ই সন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত। সুতরাং রাজী ও

সন্তুষ্ট ঐ বান্দাকে বলা হবে, যে শুধু আল্লাহর যাতের প্রতিই নয়; বরং তাঁর সকল কাজকর্মের ওপরও রাজী ও সন্তুষ্ট থাকে। তার তকদীর (অদৃশ্য)-এর ওপর রাজী থাকে। তার কাজকর্ম ও ব্যবহারের প্রতিও রাজী থাকে। বান্দা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়– নেয়ামত-মসিবত উভয় অবস্থায় সমান রাজী। নেয়ামত পেয়েও আল্লাহকে স্মরণ করে, বিপদে পড়লেও আল্লাহকে স্মরণ করে; সমানভাবে স্মরণ করে– তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও সন্তুষ্টি ও রাজী শুরু হয়। এ বান্দাই প্রিয় বান্দা, সর্বাবস্থায়ই সে আমার বান্দা। সুতরাং আমিও তার। সে যেহেতু আমার প্রতি রাজী আমিও তার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। তখন আয়েশ-আরাম, বিপদ-মসিবতের প্রতি তার লক্ষ্য থাকে না, নজর থাকে না; বরং তার ধ্যান ঐ আল্লাহর প্রতি, যিনি নেয়ামত ও মসিবত প্রদানকারী। আরাম-আয়েশ, সুখ-সাচ্ছন্দ, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কোন কিছুতেই সে অন্যমনস্ক হয় না, তার ধ্যান সর্বদা আল্লাহর দিকেই থাকে।

দিল্লীর সিংহাসনের শেষ বাদশাহ জফর শাহ একজন সুফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নানা ধরনের বিপদাপদ এবং রাজ্য বিপর্যয় তাঁকে আরো সুফী ও ভাবুক বানিয়ে দিয়েছিল। তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় কবিদেরও অন্যতম ছিলেন তিনি। বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি একটি ছোট্ট কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি নিতান্ত দুঃখজনক, আশ্চর্যজনক ও সতর্ককারী ছিল। প্রথম কথাটি ছিল এমন–

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر

رہے دیکھتے اوروں کے عیب وھنر

پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر

تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

নিজের ব্যাপারে খবর নেই, অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত,
অপরকে দোষারোপ করছি– মন্দ বলছি,
যদি নিজের দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হতো, দেখতে পেতাম,
তাহলে নিজেদেরকেও অপারগ মনে করতাম;
বরং তাদেরকে ভালই মনে করতাম।

জনৈক আরব কবি বলেছেন–

لعمرى ان ذنبى لشغلا

بنفسى عن ذنوب بنى امية-

আল্লাহর কসম! আমি আমার গুনাহ ও অপকর্ম নিয়ে এতই ব্যস্ত, বনি উমাইয়ার দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করার সময় সুযোগ আমার নেই।

বাদশাহ জফরও তাই বলেছেন। নিজ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য ছিল না, অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, যখন নিজ দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন আমার দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের কোন ভেদাভেদই ছিল না। তারপর বলছেন–

ظفر آدمی اسکو نہ جانئے گا

گو پوکی ہی صاحب فہم وذکاء

جسے عشق میں پادخدانہ رہی

جسے طیش میں خوف خدانہ رہا

তাকে মানুষ মনে করো না, সে যতই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হোক;

আরাম-আয়েশের সময় যে আল্লাহকে স্মরণে রাখেনি,

ক্রোধের সময় আল্লাহর ভয় যার অন্তরে থাকেনি।

সত্যিকার মানুষ তো সে-ই, যে আরাম-আয়েশ কিংবা বিপদাপদ– সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রাখে, ভুলে না যায়। পৃথিবীতে নেয়ামত দেয়া হয় পরীক্ষা করার জন্য, বিপদাপদ ও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সেই তো প্রকৃত বান্দা, যে উভয় অবস্থায় রাজী থাকে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাকেই বলা যাবে, সে আল্লাহর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। রাজী থাকার অর্থ এ নয় যে, আমরা আল্লাহকে স্বীকার করে নিলাম, তাঁর যাতকে মেনে নিলাম এবং যাতের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। এভাবে তো মুমিন, কাফের সকলেই রাজী রয়েছে। মুমিনের রাজী হয়ে যাওয়ার মানে হলো, আল্লাহর কাজকর্মে, আল্লাহর তকদীরে, আল্লাহর বান্দার সাথে যে ব্যবহার করেন তাতে রাজী ও সন্তুষ্ট হওয়া। আল্লাহ তায়ালা যদি রাজ্য দান

করেন তাহলে বলবে– হে আল্লাহ! আমি সন্তুষ্ট, আমি তোমারই গোলাম, তোমারই বান্দা। যদি বলা হয়, সিংহাসন ত্যাগ করে যুদ্ধে যাত্রা কর– তখনও 'রাজী' বলে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়ে যায়। যদি বলা হয়, জীবন দিয়ে দাও, তখনও বলে– আমি রাজী, আমি সন্তুষ্ট। যদি বলা হয়– তোমার সব কিছু আমি ছিনিয়ে নিচ্ছি; তখনও বলে– আমি তাতেও সম্পূর্ণ রাজী ও সন্তুষ্ট আছি। হে আল্লাহ! তুমি যা-ই করবে, আমার মঙ্গলের জন্য করবে। এতে তোমার কোন উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নেই। তুমি সমগ্র সৃষ্টিজগত হতে বেনিয়ায, অমুখাপেক্ষী! আল্লাহ তায়ালা নিজের কোন স্বার্থ বা উপকারের জন্য বান্দার নেয়ামত ছিনিয়ে নেন না, বিপদগ্রস্ত করেন না, নেয়ামতও দেন না। লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– সকল মানুষ যদি সমবেত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পরহেযগার ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, সবার অন্তরাত্মা নবীদের মতো হয়ে যায়, তবুও আমার রাজ্যে চুল পরিমাণ অনু-পরমাণুর ন্যায়ও উন্নতি সাধিত হবে না। আর যদি সবাই শয়তানের চেয়েও খারাপ ও মন্দ হয়ে যায় তবুও আমার রাজ্যের বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তায়ালা লাভ-লোকসানের পরোয়া করেন না। সুতরাং তিনি যা-ই করেন, বান্দাদের উপকার ও মঙ্গলের জন্য করেন এবং বান্দাও এসবের ওপর সর্বতোভাবে রাজী ও সন্তুষ্ট থাকবে। আর একেই বলা হয় রাজিয়া। এ অবস্থায় আমাদের কাছে এই সংবাদ আসে– তুমি দুনিয়াতে থাকাকালীন রাজী ছিলে– আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, এসবের ওপর তুমি তোমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছো, সর্বাবস্থায় সকল কাজে তুমি রাজী ছিলে। এখন এটা কি সম্ভব– আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবো না? আমিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। সুতরাং তুমি মারজি এবং আমি তোমার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট।

কখন মানুষ সাহেবে নিসবত হয়

আপনারা শুনে থাকবেন, অমুক সাহেবে নিসবত বড় বুযুর্গ ছিলেন, অন্যতম সাহেবে নিসবত ছিলেন। এখানে নিসবতের অর্থ হলো– আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক এত গভীর ও মজবুত হয়ে যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। উভয়পক্ষ থেকে যখন রিযা ও সন্তুষ্টির সম্পর্ক তৈরি হয়, তখনই বলা হয় লোকটি সাহেবে নিসবত হয়ে গেছেন। এক পক্ষের সন্তুষ্টিতে সাহেবে নিসবত হবে না। উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি হলেই কেবল সাহেবে নিসবত বলা হবে। সুফীগণের ভাষায় এটাকেই সাহেবে নিসবত বলা হয়।

যেমন- বিয়ে তখনই সম্পাদিত হয়, যখন পাত্রী তাতে সম্মত থাকে। কেবল পাত্র যদি বলে, আমি রাজি আছি, কাজেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু পাত্রীর অসম্মতিতে কেমন করে বিয়ে হবে? উভয়পক্ষের সম্মতি থাকতে হবে। তাহলেই বিয়ে শুদ্ধ হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গভীর হবে। এমন মিলনে সন্তান লাভের মাধ্যমে সুন্দর সুখময় ফল প্রকাশ পাবে। উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি ও সম্মতিতে বিয়ে হয় বলেই এমন সুখ-শান্তির জীবন লাভে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে।

ঠিক তেমনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা উভয়পক্ষ থেকেই হতে হবে। আর তখনই বলা হবে এ লোকটি সাহেবে নিসবত। সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং বান্দার রাজী হওয়ার অর্থ দাঁড়ালো– আল্লাহর সব সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার প্রতি সে রাজী থাকবে। আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো তিনিও ঐ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট। বান্দা যদি কোন ভুল-ত্রুটিও করে থাকে তবু অসন্তুষ্ট হবেন না। যেহেতু এ বান্দার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ। কাজ করছে সন্তুষ্ট চিত্তে, তবে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে। এতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হবেন না।

এটা হলো ঐ উচ্চ মর্যাদা যে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বরকতময় পবিত্র যাত অত্যন্ত বিস্ময়কর। আল্লাহ তায়ালা যেন আপনার কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছেন। আপনার হৃদয়ে কোন কামনা-আকাঙ্ক্ষা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতিটি কামনা, প্রতিটি বাসনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করে দেন।'

অর্থ হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মন-মানসিকতা ও নিজ সত্তাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ওপর এভাবে বিলীন করে দিয়েছেন যে, তাঁর দ্বারা আল্লাহর মর্জির খেলাফ কোন কাজই হয় না। যা-ই হয় আল্লাহ তায়ালার মর্জি মতোই হয় এবং তা পছন্দনীয়ই হয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর নফস এতই পাক-পবিত্র– মানসিক ও প্রবৃত্তিগত কামনা-বাসনার উদ্রেক হলেও তা আল্লাহর মর্জি মতোই হয়ে থাকে। নবী যদি আপন স্ত্রীর কাছেও যান, তবে তা হচ্ছে প্রবৃত্তির কামনা-চাহিদা। তবে তাঁদের নফস এতটাই পবিত্র যে, এতেও আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে। ফলে এ কাজেও তাঁদেরকে আজর ও সওয়াব দেয়া হয়। আম্বিয়া (আ.)গণের সকল কর্মকাণ্ডই পছন্দনীয়। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁদের নফসকে ফানা করে

দিয়েছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন। যে লোক আল্লাহ তায়ালার সকল কাজকর্মের ওপর রাজী, তাঁর সকল ফয়সালা ও সিদ্ধান্তকে আনন্দচিত্তে মেনে নেন, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি এই পরিমাণ রাজী ও সন্তুষ্ট যে, তার প্রতিটি কাজে সন্তুষ্ট, প্রতিটি কাজ পছন্দনীয়।

এ জন্যেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

المجتهد يخطئ ويصيب - و من اخطأفله اجر ومن اصاب فله اجران -

মুজতাহিদ ভুলও করেন, শুদ্ধও করেন। শুদ্ধ করলে দু'টি প্রতিদান পাবেন। যদি ভুল করেন, তবে একটি প্রতিদান পাবেন।

ভুল করেও প্রতিদান পাবেন এ কারণে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে চেষ্টা ও সাধনা করছিলেন, সত্য সঠিক মাসআলা উদঘাটন ও প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হননি। তিনি তো ইচ্ছাকৃত ভুল করেননি; বরং তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। সে জন্য ভুল হয়ে গেছে। তিনি ভুল করার পরও এ কারণে সওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া হয়েছিল। ফলে ভুল করলেও তাকে শুদ্ধকারীদের মতো সওয়াব দেয়া হয়। তবে–

ایں خطا از صد صواب اولی تر است

এ ভুল শত শুদ্ধ সঠিক হতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম– এ কারণে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ফানা, ন্যায় ও সত্যের ওপর ফানা।

সাহেবে নিসবতের মর্যাদা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহেবে নিসবতের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর ব্যাপারে বলতেন–

دار الحق معه حيث دار

ন্যায় ও হক সে দিকেই মোড় নেয় যে দিকে হযরত উমর (রা.) মোড় নেন।

সাধারণভাবে বলা উচিত ছিল এমন– হযরত উমর (রা.) ন্যায় ও হকের দিকে (সর্বাবস্থায়) চলে যান, ন্যায় ও হকের সঙ্গে থাকেন। অথচ এখানে বলা হয়েছে– উমর যেদিকে মোড় নেন হকও সেদিকে ঘুরে যায়। কখন একথা বলা হয়েছে? যখন হযরত উমর (রা.) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মধ্যে নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন– এখন তিনি যাই করেন তা আল্লাহর মর্জি ও সন্তুষ্টিই হয়– তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি নিজেই এসে হযরত উমর (রা.)কে খুঁজে বেড়ায়। তখন যা-ই তিনি বলেন তাই হক ও সত্য হয়ে যায়। এ জন্যে বারটি বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর মতামতের অনুকুলে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি যা বলেছেন সে অনুযায়ী ওহী নাযিল হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ইসলামের শুরুর দিকে নারীদের প্রতি পর্দার হুকুম ছিল না। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত সকলের সঙ্গে মাহফিলে বসতেন, যিকির তেলাওয়াত করতেন, ইলমের কথাবার্তা শোনতেন। হযরত উমর (রা.) আরয করলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মজলিসে সব ধরনের মানুষ আসেন। সাহাবায়ে কেরাম যেমন আসেন, মুনাফিকরাও আসে। এমনটা আমার পছন্দ নয় যে, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত মুখ খুলে মাহফিলে বসে থাকবেন।'

তিনি এই মত দিয়েছিলেন। আর সে দিনই ওহী নাযিল হলো–

فَاسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ

ঘরে বসে থাকো, বের হয়ো না। তাদের সাথে কথাবার্তা বল, জিজ্ঞেস কর পর্দার আড়াল থেকে। [আহযাব : ৫৩]

অর্থাৎ তিনি যে মত দিয়েছিলেন, ঠিক সে অনুযায়ী ওহী অবতীর্ণ হলো।

এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) তাঁর মতামত পেশ করেছেন আর সে মোতাবেক ওহী নাযিল হয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কাবা শরীফ তাওয়াফ করার পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায এভাবে পড়া হয়– মাকামে ইবরাহীম মাঝে থাকে যেন ইস্তিকবালে কিবলাও হয়ে যায় আবার মাকামে ইবরাহীমও মাঝে এসে যায়। তাওয়াফ শেষে এ দু'রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব। অথচ ইসলামের প্রথম যুগে এমন ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন– এটা হলো ঐ পাথর যার ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের ছাপ রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বলছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) আরয করলেন–

لوكنا دظلى خلفه

হে আল্লাহর রাসূল! কতই না ভালো হতো, যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে মাঝখানে রেখে নামায আদায় করতাম। যে দিন এ কথা বললেন, সেদিন বিকেলেই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهِيمَ مُصَلًّى

> মাকামে ইবরাহীমকে মুসল্লা (নামাযের স্থান) বানাও, একে মাঝখানে রেখে দু'রাকাত নামায আদায় করো। [বাকারা : ১২৫]

এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা (বারটির মতো)– যা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) যে মত দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো, যেন তাঁর অন্তর ওহীর সম্পূর্ণ অনুসারী ছিল। অর্থাৎ তাঁর মন-মানসিকতা সেদিকেই ধাবিত হতো, সে অনুযায়ী ওহীর আগমন নিশ্চিত ছিল।

এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لوكان بعدى نبى لكان عمر-

> আমার আগমনের পর যদি নবুওয়তের দরজা খোলা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই উমরকে নবী বানানো হতো।

নবুওয়তের সাথে তাঁর এতটাই মুনাসিবত বা আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল যে, তিনি যে মত প্রদান করতেন, সে মোতাবেক ওহী অবতীর্ণ হয়ে যেত। এ অবস্থা কখন হলো? তখনই এ অবস্থা হয়েছে যখন হযরত উমর (রা.)-এর নফস ও প্রবৃত্তি, কামনা ও বাসনা সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফানা ও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। প্রবৃত্তির কোন চাহিদা আর অবশিষ্ট থাকেনি। এ অবস্থায় অন্তরে যে চাহিদাই হয়েছে, আল্লাহর মর্জি মতোই হয়েছে। আল্লাহর পছন্দনীয় হয়েছে। অতএব আল্লাহ রাজী ও সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ এটাই। বান্দার সকল কর্মকাণ্ডের ওপর তিনি

রাজী হয়ে যাবেন। এমনকি প্রবৃত্তিগত চাহিদা ও কামনা যদি হয়, এর প্রতিও আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকেন। যেহেতু প্রবৃত্তিগত এ কাজের উদ্দেশ্যও আল্লাহর তলব, আল্লাহর সন্তুষ্টি। কেননা বান্দার রাজী হয়ে যাওয়ার অর্থ তো হলো– আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি কাজকর্ম ও তকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। নেয়ামত পেলে যেমন রাজী, মসিবত আসলেও তেমনই রাজী। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই রাজী ও সন্তুষ্ট।

আল্লাহর সকল কাজে সন্তুষ্ট থাকার জাগতিক পুরস্কার

শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.)। তাঁর বাহুতে একটি ফোঁড়া হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করল। এটা থেকে সর্বদা রক্ত ঝরতে লাগল। প্রায় বত্রিশ বছর ছিল এ ক্ষত। তা থেকে অবিরাম রক্ত-পুঁজ বের হতো। ফলে বত্রিশ বছর ধরে তাঁকে চিৎ হয়ে শুতে হতো। পাশ ফেরারও উপায়ও ছিল না। চিৎ হয়ে শুয়ে পানাহার করতেন। অযু-নামায সবই এভাবে হতো। ভাবুন তো, একজন মানুষ একপাশ হয়ে খাটের ওপর বত্রিশ বছর পর্যন্ত শুয়ে থাকলে তাঁর অবস্থা কেমন হয়? অথচ হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.)-এর চেহারা সর্বক্ষণ উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল থাকত। যা কোন সুস্থ-সবল মানুষের চেহারায়ও কদাচিৎ দেখা যেত। লোকজন জিজ্ঞেস করতো– হযরত! আপনার সীমাহীন কষ্ট, দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে আপনি ওঠতে পারছেন না, পাশ ফেরাতে পারছেন না, চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এরপরও আপনি কী করে খোশ-মেজাজ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকেন! ঠিক বিপরীতমুখী দু'টি অবস্থার সমন্বয় হলো কেমন করে তা বুঝতে পারছি না।

উত্তরে তিনি বললেন– কষ্ট এলো। আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম– হে আল্লাহ! আমি সন্তুষ্ট, যে অবস্থায় তুমি রাখো। আমি এর উপর সন্তুষ্ট; যেহেতু আমার হিতাহিত মঙ্গল-অমঙ্গল সব ব্যাপারে তুমিই সর্বাধিক জ্ঞাত। আমি আমার ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবগত নই। এভাবে আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম। আর এখন এরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। আমার সবর ও রিযা, ধৈর্য ও সন্তুষ্টির অবস্থা এখন এমন– আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ফেরেশতাদের দেখতে থাকি। আলমে গায়েব, অদৃশ্য জগত আমার চোখের সামনে। আলমে মালাকুত (আত্মার-জগত) আমার সামনে সমুজ্জ্বল। ফলে আমি রোগমুক্তি ও আরোগ্য কামনা করি না; বরং এর প্রতিই সন্তুষ্ট আছি। সুতরাং কোন লোক যখন আল্লাহর কাজকর্মের প্রতি এভাবে সন্তুষ্ট থাকে, তকদীর ও আল্লাহর

ফয়সালাসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও ঐ বান্দার সকল কাজকর্মের ওপর রাজী হয়ে যান। সে যা-ই করুক আল্লাহ রাজী। আর এমন ব্যক্তি খারাপ ও মন্দকাজ করবে না। সব সময় উত্তম ও ভাল কাজই করবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা খুব আর্থিক অনটনে ছিলেন। সিরিয়ায় রোমানদের সাথে লড়াই চলছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য তৈরি হলেন এবং মুসলমানদের উৎসাহ প্রদান করলেন। ভয়ানক একটি যুদ্ধ সামনে– যে যুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করে যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহের আহ্বান জানানো হলো। চাঁদা দেবার সামর্থ্য সকলের ছিল না। বিত্তবানদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) ছিলেন। তিনি একশ' উট যোগাড় করে উটের জীন, লাগাম, গদি এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাথে দীর্ঘ সফরের জন্য পাথেয়ও যোগাড় করে দিয়েছিলেন, যাতে মুজাহিদদের খাবারের জন্য পেরেশান হতে না হয়। এভাবে সব প্রস্তুত করে একশ' উট হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এগুলো দেখে আনন্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং এমনভাবে চমকাতে লাগল যেন তাঁর চেহারার ওপর সূর্যের প্রভা বিরাজ করছে। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন–

ما على عثمان ما عمل بعد اليوم –

> আজ থেকে উসমান যে আমলই করুন না কেন, তাঁর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কোন অসন্তুষ্টি নেই, তিনি যা-ই করুন না কেন।

এর অর্থ এই ছিল না যে, তিনি (আল্লাহ না করুন) কবীরাহ গুনাহ করে ফেললেও আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন; বরং অর্থ ছিল, আজ থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর নফস এত মুতমাইন্নাহ হয়ে গেছে যে, তাঁর স্বভাবজাত কামনা-বাসনা সবই পাক-পবিত্র হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তা-ই করবেন, যা আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে দিলেন।

আন্তরিক সন্তুষ্টির সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য, অপারগতার নয়

আল্লাহ পাকের জন্যে মানুষের অন্তরে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যাতে তকদীর ও আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রফুল্লচিত্তে আন্তরিকভাবে তাঁর সন্তোষ লাভ হয়ে যায়। এটা জোরজবরদস্তির বিষয় নয়; সবর হবে আনন্দ ও প্রফুল্লচিত্তে। অপারগ ও বাধ্য হয়ে সবর সকলেই করে থাকে। আল্লাহ না করুন, যদি কারো পরিবারে কেউ মারা যায়, তাহলে তিন-চার দিন পর ধৈর্য সবর স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অথচ প্রকৃত সবর হলো, উপস্থিত সময়ে যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা হয়। বিষাদসিন্ধু যখন উথলে ওঠে, তখনই ধৈর্য ধারণ করা হবে সবর। যেমন- একজন বৃদ্ধা বসে বসে অনুনয়-বিনয় করে বিলাপ করছিল। তার একমাত্র ছেলে মারা গেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, বড় বুবু! সবর করো।

বড় বুবু দুঃখের মাঝেও রেগে গেলো। বললো– তোমার কেউ মারা গেলে তখন বুঝা যেত তুমি সবর কর কিনা। আমার একটা মাত্র ছেলে ছিল। সে চলে গেছে, কেমন করে সবর করব?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আচ্ছা তাহলে সবর করো না। এই বলে তিনি রওনা হয়ে পড়লেন। এরপর বৃদ্ধা জানতে পারল, উপদেশদাতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই পেরেশান হয়ে দৌড়ে গিয়ে বলল– আমি আপনাকে চিনতে পারিনি! আপনি সবর করার জন্য আমাকে বলেছিলেন। এখন আমি সবর করলাম, ধৈর্য ধারণ করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

الصبر عندل الصدمة الاولى -

ধৈর্যের সময় হলো তখন, যখন বিপদ পতিত হয়।

ক'দিন পরে সবাই সবর করতে পারে। এটা তো হলো নিরুপায় হয়ে সবর। এমন সবর সবাই করতে পারে। প্রকৃত সবর হলো যা স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে করা হয়। এটা তখন হয় যখন বিপদ-মসিবত আসে, আর বান্দা ধৈর্য সহকারে নিজেকে সান্ত্বনা দেবে– আল্লাহর তরফ থেকে যা-ই হয়েছে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কল্যাণই রয়েছে। আমি এর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট। সত্যিকার অর্থে এ সান্ত্বনাই হলো রিযা ও সন্তুষ্টি।

পরকালীন চিরন্তন দান ও নেয়ামতসমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপরই নির্ভরশীল

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুমিনকে এ সুসংবাদ দিয়ে দেয়া হয় যে, হে নফসে মুতমাইন্নাহ! আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি কাজ ও তকদীরের ওপর তোমার অন্তরে সন্তুষ্টি ছিল। হোক দুঃখ কিংবা সুখ, নেয়ামত কিংবা মসিবত, আনন্দ-উল্লাস কিংবা দুঃখ-বেদনা যাই হোক, সর্বাবস্থায় তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে। আমার জন্য খায়র ও কল্যাণই হচ্ছে সব– একথা তুমি মেনে নিয়েছিলে। এ অবস্থা যে ব্যক্তির ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সকল কাজের ব্যাপারে প্রফুল্লচিত্ত আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এখন তুমি এমনভাবে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন কর যে তুমিও সন্তুষ্ট, আমিও সন্তুষ্ট। তোমার জীবন আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি ব্যয় করেছ। এখন আমিও তোমার চিরন্তন জীবন আমার সন্তুষ্টিতে অতিবাহিত করাব। আমি তোমার প্রতি রাজী। আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না। এ মর্যাদা যখন তুমি লাভ করেছ, সুতরাং তোমার নাম এখন আমার বিশেষ বান্দাদের তালিকায় লিখে দিলাম। তুমি তাঁদের দলভুক্ত হয়ে গেলে। সাধারণভাবে বান্দা তো সবাই– কাফের, ফাজের সবাই বান্দা, ইবলিসও বান্দা। তবে খাস ও বিশেষ বান্দা নয়। যাদেরকে মুকাররব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) বলা হয়, যাদেরকে আবদ (দাস) বলা হবে, তারা হলেন এরাই, যাদের মধ্যে আবদিয়াত বা দাসত্ব রয়েছে। আবদিয়াতের অর্থ দাসত্ব। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সামনে এমন দাসের মতো থাকবে যে, তিনি যা-ই বলেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, অসন্তুষ্টির গন্ধও থাকবে না। এটাকেই বলা হয় আবদ মুতলাক বা 'পূর্ণাঙ্গ বান্দা'। আর এটাকেই পবিত্র কুরআন অন্য শব্দে তাফবীয অর্থাৎ অর্পণ বলেছে। ইরশাদ হয়েছে– 'আমার সকল বিষয় আল্লাহর সমীপে অর্পণ করলাম।'

সমর্পণেই শান্তি, বিচার-বিশ্লেষণে নয়

মূল কথা হচ্ছে, বান্দার শান্তি ও সান্ত্বনা হলো তাফবীযের মধ্যে। অর্থাৎ সকল কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট সমর্পণ করে দেয়ার মধ্যে। আর যত মসিবত ও বিপদ রয়েছে তা আসে তাফবীযের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ নিজের মর্জি মতো বিভিন্ন প্রস্তাব করে তার উপর চেষ্টা-তদবীর করার মধ্যে। আমরা নিজেরা প্রস্তাব করি– এটা এমন হওয়া উচিত, তেমন হওয়া উচিত। বসে বসে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করতে থাকি, এই হলো বিপদ। যদি প্রথমেই একথা বলে দিই– আল্লাহ তায়ালা

যাই করেন, আমি তাতেই সর্বান্তকরণে সন্তুষ্ট; তাহলে এরপর নিজ মর্জি-বিরুদ্ধ কোন কিছুই হয়েছে বলে ধারণা হবে না। মর্জি-বিরুদ্ধ কোন কিছু না হলে, তখন কোন ধরনের বিপদ বা সমস্যাও হবে না। যখন নিজের পূর্ব পরিকল্পনা আল্লাহর হাতে সব সমর্পণ করে দেবে এবং আন্তরিকভাবে একথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-ই হবে মঙ্গলময় ও কল্যাণকর হবে, তখন অন্তরে কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না। যদি নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়, তবুও রাজী; যদি দুঃখ-কষ্ট এসে যায়, তবুও রাজী। এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করেছিল– আপনার অবস্থা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন– ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করছ, যাঁর ইচ্ছানুসারে উভয়জগত পরিচালিত হচ্ছে।

সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কি ঐ স্তরে রয়েছেন যে, উভয় জগতের সকল কাজকর্ম আপনার মর্জি মতো পরিচালিত হচ্ছে? তিনি করলেন– আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঐ স্তরেই রয়েছি। লোকটি জিজ্ঞেস করল– তা কেমন করে হবে? উত্তর দিলেন– এভাবে হতে পারে এবং আমার মধ্যে হয়ে গেছে। অর্থাৎ উভয় জগতের সকল কাজকর্ম আল্লাহ তায়ালার মর্জি মতো পরিচালিত হচ্ছে, আর আমি আমার মর্জিকে আল্লাহর মর্জির মধ্যে বিলীন করে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালার মর্জি যা আমারও মর্জি তা। সুতরাং আমার মর্জি-বিরুদ্ধ কোন কিছু দুনিয়াতে হয় না, হতে পারে না। যদি কারো জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনি, আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ! এটা হওয়ার ছিল– হয়েছে। যদি কেউ দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে যাত্রা করে, তখনও আমি বলি, আলহামদুলিল্লাহ! এটাই হওয়া উচিত ছিল। আমি কে? আল্লাহ তায়ালা কোন কাজ করবেন আর আমি বলব, এটা উচিত হয়নি– এমন না হওয়াই উচিত।

যেমন- কোন বড়লোকের মৃত্যু হলো। খবর শুনে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া হলো– অমুকের অকাল মৃত্যু হয়েছে। এ অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আল্লাহর এ বান্দাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কোন কাজ অকালে হয়, অপাত্রে বা অসময়ে হয়? এটা অত্যন্ত বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য ছাড়া কিছু নয়। এর মানে দাঁড়ায়– আল্লাহ তায়ালাকে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা উচিত ছিল (মাআযাল্লাহ), কোন সময় কোনটি উচিত ও উপযোগী হবে। তারপর ঐ সময়ে এই বান্দার মৃত্যু দেয়া হবে। এটা খুবই দুঃসাহসিক কথা। যখন মৃত্যু আসবে, তার উপযুক্ত সময়ই তা আসবে। আল্লাহর মর্জি মতো আসবে। আমরা এ ব্যাপারে কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করব? কোন সাহসে বিরূপ মন্তব্য করব? কারও জন্ম হলে যথাসময়েই হবে, কারো মৃত্যু হলেও যথাসময়েই হবে। তাতে দুঃখ প্রকাশ করে 'অকাল মৃত্যু

হয়েছে' বলার কোন অধিকার আমাদের নেই। কেননা বান্দাকে সর্বাবস্থায় রাজী ও সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

তো ঐ বুযুর্গ বললেন– উভয় জগতের সব কাজকর্ম আমার মর্জি মতোই চলছে। অর্থাৎ সবই আল্লাহর মর্জি মতোই চলছে, আর আমি আমার মর্জিকে আল্লাহর মর্জির মধ্যে বিলীন করে দিয়েছি। ফলে আল্লাহর মর্জি যা, আমার মর্জিও তা। সুতরাং আমার মর্জি-বিরুদ্ধ কোন কিছু পৃথিবীতে হচ্ছে না। এই ছিল তাঁর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ আবদিয়াতের (দাসত্বের) মাকাম। যা-ই হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-ই হবে, কল্যাণময় হবে, উপযোগী হবে– এর প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি। অসন্তুষ্টির কি থাকতে পারে?

এই মাকাম ও মর্যাদাবানের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে– হে নফসে মুতমাইন্নাহ! তুমি যখন তোমার জীবদ্দশায় নেক আমল করেছ, রুশদ ও হেদায়াত দ্বারা নিজ প্রবৃত্তিকে শান্তিময় করেছিলে, আল্লাহ তায়ালার কোন কাজকর্মের প্রতি তোমার কোন আপত্তি ছিল না, সংশয় ছিল না, আল্লাহ যা করেছেন নির্দ্বিধায় এর প্রতি তুমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছ। তুমি যেহেতু সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছ, তাই আমিও সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তুমি রাজী তো আমিও রাজী।

দুনিয়াতেও প্রতিদানের বিধান কার্যকর রয়েছে

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেও প্রতিদানের প্রথা প্রচলিত রেখেছেন। অর্থাৎ অদল-বদল। তুমি যেমন করবে, আমিও তেমন করব। যে পথ ও পদ্ধতি তুমি গ্রহণ করবে, এদিক থেকেও সে মোতাবেক গ্রহণ করা হবে।

বনি ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ان تعود وانعد

তোমরা যদি পাপকর্ম থেকে ফিরে আস, আমিও শাস্তি প্রদান হতে ফিরে যাব।

ان عدتم عدنا

তোমরা যদি পাপকর্মের দিকে ফিরে যাও, আমিও শাস্তি প্রদানের দিকে ফিরে যাব।

من احب لقاء الله احب الله القائه-

যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাৎ লাভকে ভালবাসবে, পছন্দ করবে, আমিও তাঁর সাক্ষাৎকে পছন্দ করব।

ومن كره لقاء الله كره الله لقائه -

যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাৎ লাভকে অপছন্দ করবে, আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করব।

ان تنصروا الله ينصركم-

তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন।

فاذكرونى اذكركم-

তোমরা আমাকে (আল্লাহকে) স্মরণ করবে, আমি (আল্লাহ)ও তোমাদের স্মরণ করব।

সার কথা, প্রতিদানের নিয়ম চালু রয়েছে। বান্দার ব্যবহার যা হবে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার ব্যবহারও তেমনি হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানার কষ্টিপাথর

যদি কোন লোক সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে চায় তার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক কিরূপ, তাহলে সে দেখে নিক, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তার সম্পর্ক কিরূপ এবং কি পরিমাণ আছে। এর ওপর বিচার করে নিলেই জানতে পারবে আল্লাহর সঙ্গে তার কতটা সম্পর্ক রয়েছে। আপনার অন্তর যদি আল্লাহ হতে দূরে ও বিমুখ থাকে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকেও দূরত্ব ও বিমুখতা থাকবে। আর আপনার অন্তরে যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা থাকে, আল্লাহর স্মরণ থাকে, তাহলে আল্লাহর রহমত ও দয়াও আপনার দিকে থাকবে। এটাই কষ্টিপাথর, দাঁড়িপাল্লা– এর মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ জেনে নিতে পারেন, তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের পরিমাণ। নিজের অবস্থার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি না ফেলে কেবল আল্লাহর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে এ সমস্যার সমাধান কখনো হবে না; বরং নানা অভিযোগ দেখা দেবে। নিজের মর্জি-বিরুদ্ধ কোন কিছু হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে অভিযোগ সৃষ্টি হবে। সমগ্র পৃথিবী কাফের-মুশরেক দ্বারা পূর্ণ রয়েছে, অথচ বিপদ আর মসিবতের জন্য আমার ঘরটিই রয়েছে! আমিই বিপদগ্রস্ত হলাম, অথচ আমি মুমিন, আল্লাহ বিশ্বাসী। এমন অভিযোগ কেন জাগলো? এ কারণে যে, নিজের অবস্থার প্রতি খেয়াল নেই, দৃষ্টি নেই। বান্দা যখন একথা ভাবে যে, আমি কি পরিমাণ ইবাদত করছি, কি পরিমাণ আনুগত্য করছি তাঁর প্রতি, তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতি কতটা সন্তুষ্ট আছি– তখন নিজের কাজে যতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হবে, সে অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও করুণায় কম বেশি করা হয়েছে কিনা কিংবা তা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সহজেই বুঝে নিতে পারবে। কিন্তু যদি সে সার্বিকভাবে আল্লাহরই থাকে, তাঁর অনুগত থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দূরত্ব ও দয়া-করুণায় স্বল্পতা সম্ভব নয়, তা হতে পারে না। সার কথা, নিজের সম্পর্কে আল্লাহর ব্যবহারকে সঠিকভাবে অনুভব করার কষ্টিপাথর হলো– বান্দা নিজের কাজকর্ম ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ককে বিচার-বিবেচনা করে দেখে নিবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং আমরাও তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় রয়েছি?

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– দেখে নাও, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছ। যদি প্রতিবেশীকে কষ্ট দাও, জ্বালা-যন্ত্রণা ও নির্যাতন কর, তাহলে বুঝে নাও আল্লাহ এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত তোমার থেকে অনেক দূরে। তোমার প্রতি তাঁর আচরণও সে মোতাবেক হবে। তুমি যদি পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে দয়া ও স্নেহ-মমতার আচরণ কর, দান-দক্ষিণা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি এ আশা করতে পার যে, তোমার সঙ্গেও দয়া ও মেহেরবানীর আচরণ করা হবে। কষ্টিপাথর দেয়া আছে। সুতরাং মানুষ তার কাজকর্মকে ঐ কষ্টিপাথরে যাচাই করে আল্লাহর কাজকর্মকে বুঝে নেবে। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট থাকেন, সকাল-বিকাল আপনার হৃদয়ে এ অবস্থা বিরাজমান থাকে যে, যে ঘটনাই সংঘটিত হয়, তার উপর আপনি সন্তুষ্ট, পরিপূর্ণ সান্ত্বনা থাকে আপনার অন্তরে, আপনি শুকর আদায় করছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, তাহলে বুঝে নিন আল্লাহ তায়ালাও আপনার সকল কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, আপনাকে সৎপথের দিকে আকৃষ্ট করছেন আর আপনি তাঁর পছন্দনীয় পথেই পরিচালিত হচ্ছেন। আর আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর কাজকর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর প্রদর্শিত পথকে পছন্দ না করেন, তিনি আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে

যান, তাহলে মনে করবেন, তিনিও আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট আছেন। আপনার কাজকর্মের ওপর তিনি সন্তুষ্ট নন। আপনার ইবাদতও তাঁর পছন্দ নয়। আপনি যতই সেজদা করেন, যেহেতু তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট, ফলে সেজদা দ্বারা কিছুই হবে না।

এক খাদেম তার মালিকের সেবাযত্ন করে, খেদমত করে অথচ মালিকের প্রতি অন্তরে সুধারণা পোষণ করে না, ভক্তি রাখে না, তাহলে তার সেবাযত্ন মালিকের জন্য পীড়াদায়ক হবে। এমনিভাবে আরেকজন চাকর রয়েছে, যে মনিবকে অন্তরিকভাবে ভালবাসে, তবে লোকটি বোকা প্রকৃতির। প্রায় সময়ই তার ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। মনিব বলেন, একে কিছু বলো না, এ আমার আপনজন! ভুল হয়েছে তাতে কি হবে? সে তো মানুষ, ভুল-ত্রুটি হবেই। এর ভুল-ত্রুটির প্রতিও আমি সন্তুষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত জিনিস হচ্ছে অন্তরের ভালোবাসা, হৃদয়ের আকর্ষণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'হে বান্দা! তুমি যদি কেয়ামতের দিন এত বেশি গুনাহ নিয়ে হাজির হও যে, আসমান-জমিন তোমার গুনাহ দিয়ে ঢেকে যায়, তাহলে আমিও এর থেকে বিশাল রহমত ও মাগফেরাত নিয়েই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তবে শর্ত হলো, আমার আজমত ও বড়ত্ব তোমার অন্তরে থাকতে হবে।

প্রত্যেকটি মানুষ বুঝে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব কতটা তার অন্তরে বিদ্যমান আছে। সে ধন-সম্পদের মোকাবেলায় ধন-সম্পদই দেখে, নাকি আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের প্রতি লক্ষ করে। প্রয়োজন মেটানোর বস্তু ধন-সম্পদকে মনে করে, না আল্লাহ তায়ালাকে। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি উপায়-উপকরণের দিকে পতিত হয়, নাকি উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি। মূলত উপায়-উপকরণকে তাঁর নির্দেশ পালনার্থে গ্রহণ করা উচিত। অথচ আমাদের দৃষ্টি থাকে উপকরণের দিকে। আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু করেন। আমরা বলেও থাকি, সব কিছু আল্লাহ তায়ালাই করেন। আর উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা হয় কেবল অন্তরের আস্থা ও সান্ত্বনার জন্য।

উপকরণ সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকবে এবং অন্তরে এ বিশ্বাস থাকবে যে, উপায়-উপকরণ যদি গ্রহণ করা নাও হয় তবুও ঐ ফলই লাভ হবে। তবে যেহেতু আল্লাহর আদেশ আছে, তাই উপায়-উপকরণ গ্রহণ করছি, করতে বাধ্য হচ্ছি। বরং তাঁর আনুগত্যের তাগিদে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করছি। আর এ কষ্টিপাথরের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের আস্থা, সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস কতটা

উপকরণের প্রতি আর কতটা উপকরণ সৃষ্টিকারীর প্রতি রয়েছে। এভাবে আল্লাহর ব্যবহার বুঝে নিন। যে পথ ও পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকেও সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে মুমিনকে কাফেরকে নয়

বলা হয়েছে, হে নফস! আমার নিকট ফিরে এসো! আমি তোমাকে দুনিয়াতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম। কার্যত তুমি দুনিয়ার স্থায়ী অধিবাসী নও। তুমি আখেরাতের অধিবাসী। এখন তুমি আমার প্রতি তোমার পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। উদ্দেশ্য পূর্ণ ও সফল হয়েছে। সুতরাং এখন ফিরে এসো আমার নিকট এ অবস্থায় যে, তুমি আমার প্রতি এবং আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

যে বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্টি ও নির্ভরতা নেই, তাকে 'ফিরে এসো'– এ সম্বোধন করা হবে না। তুমি দুনিয়ার ছিলে, দুনিয়াতেই থাক।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, কাফেরের রূহ যখন ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, ফেরেশতাগণ নিয়ে যান, তখন আকাশের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও অভিশাপ করা হয় এবং সেখান থেকে তাকে নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়, ছুঁড়ে মারা হয়। আর সে রূহ জাহান্নামের নিম্নতম প্রকোষ্ঠে পৌঁছে যায়, যা ভূগর্ভে রয়েছে।

শায়খ আকবর এক জায়গায় লিখেছেন– প্রথম আকাশের নিচে যেসব জায়গা আছে, তা জাহান্নামের এলাকা, জাহান্নামের অংশ। আর প্রথম আকাশের উপরের সকল জায়গা জান্নাতের, জান্নাতের এলাকা। আমরা যেন এখন জাহান্নামে রয়েছি। আর এ থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আল্লাহ তায়ালা একটি রশি টানিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি রশিটা ধরবে, সে এ কারাগার থেকে বের হয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। ঐ রশিটি কি? হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

القران حبل الله لمحمدورمن السماء الى الارض

কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার রশি। আল্লাহ তায়ালা এ রশিকে আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঐ রশি ধারণ করবে, তাকে দুনিয়ারূপ জাহান্নাম থেকে বের করে তাঁর নিকট নিয়ে যাবেন। এ কারণে মুমিনগণ সর্বদা যেন এ

জাহান্নাম হতে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন। কাফেররা ঈমান আনেনি। তারা জাহান্নামে রয়েছে, চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। কথা এমন নয় যে, তাদেরকে জাহান্নামে দেয়া হবে। বরং তারা এখন জাহান্নামেই রয়েছে। যারা বের হওয়ার যোগ্য, তারা বের হয় যাবে; যারা থাকার উপযোগী তারা থেকে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা মুনিগণকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এ কারণে যে, নিজ নিজ পরীক্ষা প্রদান করে পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। কাফেরদেরও পাঠিয়েছেন কিন্তু তারা এসেছে চিরকাল এখানেই অবস্থান করতে। তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণই করবে না। এ পৃথিবীকে আমি তাদের জন্য জাহান্নামে রূপান্তরিত করে দেব। এজন্য কাফেরদেরকে দুনিয়া থেকে বের করে দেয়া হবে না। আর মুমিনকে বেরিয়ে যেতে হবে। তাই তাদেরকে 'ফিরে এসো' বলা হবে; 'চলে এসো' বলা হবে না। পাঠানো হয়েছিল কিছুদিনের জন্য, তাই ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। আমি তোমাদের ক'দিনের জন্য পাঠিয়েছিলাম, এবার ফিরে এসো।

কেন এই ফিরে যাওয়া

কোন অবস্থায়, কেন ফিরে যাবে? এর কারণ কি? কেনই বা তাদের ডাকা হচ্ছে? তাদের ডাকার কারণ হলো তাঁরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। আমার যে প্রতি অসন্তুষ্ট আছে, তাকে আমার কাছে ডাকা হবে না। সুতরাং ইরজিয়ী– 'ফিরে এসো', এর কারণ ও রহস্য হলো 'রাযিয়া-মারযিয়া'। তোমরা আমার প্রতি এবং আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ফলে আমার নিকট হবে তোমাদের স্থান। এমন স্থানে হবে না, যেখানে দূরত্ব থেকে যায়। আর যেসব লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, আমিও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা দূরে আছে, দূরেই থাকবে। দুনিয়াতেই হবে তাদের আবাস। যে দুনিয়া জাহান্নামের অংশ-বিশেষ। মুমিনকে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ সে ঈমান গ্রহণ করেছে। কাফের বের হতে চায় না। কারণ সে ঈমান গ্রহণ করেনি। সুতরাং তাকে বের করা হবে না।

বান্দা হতে না চাইলে আল্লাহও বান্দা বানান না

কেউ যদিএমন হয়, সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, তবেই তাকে বান্দা বলা হবে। আর প্রকৃত বান্দা হবে সে-ই। এ কারণে বলা হয়েছে–

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی-

আমার ঐ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা আমার খাস বান্দা এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। [ফজর : ৩০]

আমার দীন যারা গ্রহণ করেনি, তারা আমার বন্দেগী ও দাসত্বকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আমিও তাদেরকে আমার বান্দা বলতে চাই না। তারা নিজেরা যখন বান্দা হতে চায় না, তাই আমিও তাদের তা করতে চাই না।

এ ব্যাপারে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর একটি কথা চালু আছে– যখন দাফন করা হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করেন– তোমার প্রভু কে? রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর কাছেও মুনকার-নাকীর আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– তোমার রব (প্রভু) কে? রাবেয়া ছিলেন আল্লাহর প্রেমে মত্ত ওলীয়ে কামেল। তিনি বললেন– আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন, রবকে জিজ্ঞেস কর! তিনি আমাকে বান্দী ও দাসী বলে স্বীকৃতি দেন কি-না। আমিতো তাঁকে রব বলে জানি ও স্বীকার করি। ফলে আমি যদি পঞ্চাশবারও বলি 'তিনি আমার রব' আর তিনি বলেন, আমি তোমাকে আমার বান্দী বলে গ্রহণ করছি না– তাহলে আমার প্রভু বলে স্বীকার করায় কি ফায়দা হবে? সুতরাং রবকে প্রথম জিজ্ঞেস কর, তারপর আমাকে।

ফেরেশতারা তাঁর কথা শুনে পেরেশান। এ কেমন বান্দা যে, উল্টো আমাদের প্রশ্ন করা শুরু করেছেন। সার কথা হলো, যাঁকে তিনি বান্দা বলে গ্রহণ করে নেন, সে-ই হলো বান্দা। আর যার সম্পর্কে বলেন, তুমি আমার বান্দা নও, সে বান্দাও নয়, তার কোথাও কোন আশ্রয়ও নেই। কাফের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে– আমি তোমার বান্দা হতে চাই না। তোমার অনুগত দাস হতে চাই না, তোমার প্রদর্শিত পথের পথিক হতে চাই না। তখন আল্লাহ তায়ালাও বলে দেন– এ ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব তার নিজের ওপরই অর্পিত হয়েছে। যে দুনিয়ায় থাকা তোমার পছন্দ, সেখানেই চিরকাল থেকে যাও। আমার প্রতি যখন তোমার সন্তুষ্টি নেই, সুতরাং আমার কাছে আসতে পারবে না! আমার থেকে দূরে থাকাকে পছন্দ করেছ; দূরের জগতেই চিরদিনের জন্য থেকে যাও।

অপর দিকে মুমিন বান্দা বলে– আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর ঈমানের অর্থ হলো– আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি বিষয়ের প্রতি, প্রতিটি কাজকর্মের ওপর আমি রাজী, আমি সন্তুষ্ট। এ কারণেই আল্লাহ বলবেন– তুমি যখন রাজী, আমিও রাজী। অতএব, পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন তোমার নেই। চলে এসো, আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। এজন্য ارجعی শব্দ বলা হয়েছে– ফিরে এসো। তখন 'রাজী ও মর্জি'-এর সার্টিফিকেট নিয়ে সে ফিরে যাবে। তারপর বলা হবে– আমার বিশেষ বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাও! তুমিই আমার সত্য-সঠিক বান্দা, তুমিই আমার জান্নাতের উত্তরাধিকারী, তুমিই জান্নাতের উপযুক্ত। তুমি নৈকট্যের নিকটতম স্থান, 'মাকামে করীমে' পৌঁছে যাও।

এ কারণে আমিও বলছিলাম, এ আয়াতে অনেক ইলম, জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বর্ণনা করলেও তা শেষ হবে না। আমি কেবল তিনটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করলাম। একটি হলো, শেষ সময় যা সামনে আসে। দ্বিতীয় হলো, সুসংবাদ প্রদান– যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঐ অন্তিমশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে দেয়া হয় এই বলে যে, তুমি আমার প্রতি এবং আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তৃতীয় হলো, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই হলো সবচে' বড় ও সর্বোত্তম পুরস্কার। বিশেষ বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে নৈকট্যের বিশেষ স্থানে পৌঁছে যাওয়া– যা ইহজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যা পূর্বে আমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)কে দান করা হয়েছিল। পরে একটু পদস্খলনের কারণে সে স্থান থেকে সরানো হয়েছিল। আমরা সকলেই এখানে এ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি। আর আমরাই সে আগের জায়গার উত্তরাধিকারী হয়ে যেতাম যদি সে স্থানে আমরা জন্মগ্রহণ করতাম। আমরা এখানে এসে গেছি। আমাদের পিতাকে বলে দেয়া হয়েছে, আপনি যদি ঐ স্থানে প্রত্যাবর্তন করতে চান, যে স্থান থেকে আপনাকে অপসারণ করা হয়েছে, তাহলে সে স্থানে পৌঁছার জন্য দুনিয়ার গিরিপথ পার হয়ে আসার কষ্ট সহ্য করে আসতে হবে। সেজন্য আমার বিধান ও নীতিমালা প্রেরণ করব। ঐ নীতিমালা অনুসরণ করে যে জীবন অতিবাহিত করবে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। আর যে ব্যক্তি এসব নীতিমালা গ্রহণ করবে না, অনুসরণ করবে না, তাকে ফিরিয়ে আনা হবে না; সেখানেই থাকতে হবে তাকে।

আয়াতটি তেলাওয়াত করে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কি বলব, রাতে আমার ঐ বন্ধুকে বলেছিলাম কি বয়ান করব! তিনি বলেছিলেন, কিছু বয়ান করা উচিত। আমি বললাম, আমি মক্কা মুয়ায্যমা থেকে লিখেছিলাম– এ মসজিদে

এসে নামায আদায় করব। ওয়াজ করব– এটা আমি লিখিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, শুধু দেখা-সাক্ষাৎ করা; ওয়াজ করা উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ তিনি ঘোষণা করে দিলেন। আমি বললাম, কোন বিষয় তো আমার অন্তরে উপস্থিত নেই। বিষয়বস্তু আমাকে বলে দেয়া হোক। তখন এক বন্ধু বললেন, আল্লাহ তায়ালার রিযা ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে কিছু বয়ান করা হোক। আল্লাহ তায়ালার রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা কর্তব্য। এটা শুনে তার প্রতিভা এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর এটাই ছিল তাঁর জন্য পথ প্রদর্শন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের, আপনাদের সকলকে আমলের তাওফিক দিন! আমাদের সকলকে রাজী ও মরজি বানিয়ে নিন। তাঁর বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং তাঁর বরকত হাসিলের তাওফিক দান করুন। আর আমাদের সকলকে সে মহাসম্মানিত স্থানে একত্রিত করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبيل منا انك انت السميع العليم– وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم– صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يااارحم الرحمين–

বয়ান : ৪

সংশোধনের নিয়ম-কানুন

মানব সন্তান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ গোশতের পিণ্ডের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হয়। সে সময় তাঁর ভাল-মন্দের জ্ঞান থাকে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার শক্তি রেখেছেন। তারপর সে শুনে শুনে, দেখে দেখে, চিন্তা-ভাবনা করে করে, কয়েক বছরের পরিশ্রম ও চেষ্টার বিনিময়ে জ্ঞানী হয়; পরিশ্রম করে আলেম হয়। তবে জন্মগতভাবে জাহেল হয়েই জন্মগ্রহণ করে। মূলত মানুষের প্রকৃতিতে ইলম নেই; বরং মানুষের প্রকৃতিতে মূর্খতা রয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





দুনিয়ার সাধারণ অবস্থা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমরা যদি এ পৃথিবীর আকার-আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা করি, তাহলে এটাই প্রমাণ হবে যে, দুনিয়াতে দু'টি সিলসিলা বা পরম্পরা জারি আছে। এর একটা কল্যাণের, অন্যটি ক্ষতিকর বা অকল্যাণের। প্রত্যেকটি জিনিসেই এ দুটি শক্তি বিদ্যমান। শুধু আম্বিয়া (আ.) ও ফেরেশতাগণ ছাড়া। ফেরেশতা ও আম্বিয়া (আ.)-এর মাঝে কেবল খায়র ও কল্যাণ বিদ্যমান; মন্দ ও অকল্যাণ নেই। পৃথিবীতে যত ধরনের বস্তু আছে, তার মধ্যে কিছু খায়র– কিছু শার অর্থাৎ কিছু ভাল কিছু মন্দ রয়েছে। একচেটিয়া কল্যাণকর কোনটিই নয়। আবার শুধুই মন্দ ও অকল্যাণকরও কোনটি নয়। প্রত্যেকটি বস্তুর মাঝে মন্দ ও অকল্যাণের একটা দিক এবং ভাল ও খায়রের একটা দিক রয়েছে। রুটি একটি নেয়ামত– যা আমরা প্রতিদিন আহার করছি। এ দিয়ে যেমন জীবিকা নির্বাহ হয়, শক্তি ও বল বৃদ্ধি পায়; যদি খাওয়ার নিয়ম ভাঙ্গ করা হয়, তাহলে রুটিই মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। পানি– যার সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

আমি পানি দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে জীবন দান করেছি, সজীব করেছি। [আম্বিয়া : ৩০]

পানি যদি সীমাতিরিক্ত পান করা হয়, তাহলে এ পানিই মরণের কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। আমাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার আরেকটি উপকরণ হলো বাতাস। এ বাতাস যদি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে, তাহলে শ্বাস গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি হবে– বিনাশের কারণ হবে। এভাবে জমিন হচ্ছে আমাদের জন্য শয্যা সদৃশ। আর এটাই আমাদের জন্য কবর হয়ে যায়। জীবন-মৃত্যু উভয়েরই উপকরণ হলো মাটি। মোট কথা, প্রতিটি জিনিসেরই খায়র ও শার তথা ভাল ও মন্দ উয়ভটিই রয়েছে।

মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, দেখবেন– মানুষের মাধ্যমে যেমন উপকার হয়; খায়র ও কল্যাণ হয়– যতটা খায়র ও কল্যাণ মানুষ করতে পারে, অন্য কেউ তা পারে না। অথচ এই মানুষ যখন শার তথা অকল্যাণ শুরু করে দেয়, তখন এত মন্দ ও খারাপ কাজ করতে পারে যে, শয়তানও ততটা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আবার মানুষের দ্বারা যতটা উপকার ও সুখ-শান্তি লাভ হবে, ততটা ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্টও হতে পারে। মানুষের মধ্যে, খাবারে, পানিতে এবং বাতাসের মধ্যে তথা ব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ রয়েছে। তবে আমরা যতটা ভাবনা-চিন্তা করি, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়– মন্দ তো প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই আছে আর কল্যাণকে বাইরে থেকে এনে তার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। অর্থাৎ বস্তুর মূলে কোন কল্যাণ মজুদ থাকে না। পরিশ্রম ও সাধনা করা হলে কিছু সৌন্দর্য ও কল্যাণ এসে যায়। যদি পরিশ্রম না করা হয়, তাহলে মন্দের জন্য কোন শ্রম-সাধনার দরকার হয় না। তা স্বাভাবিকভাবেই মজুদ রয়েছে।

খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যসামগ্রীর কথাই ধরুন। এর ভালো ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো– সুস্বাদু হবে, রঙ সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত হবে। খাবারের এ গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আপনাকে শ্রম দিতে হবে। এর জন্য নিয়মিত খাবার তৈরি করতে হবে। আলমিরা বানাতে হবে। যেখানে আলো-বাতাস পৌঁছবে আবার ঠাণ্ডাও হবে– যাতে খাবার নষ্ট না হয়। খাবারের গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজন চেষ্টা করা। আর আপনি যদি খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করতে চান, চান যে দুর্গন্ধ এসে যাক, পঁচে-গলে বরবাদ হয়ে যাক, তাহলে এর জন্য কোন চেষ্টা বা পরিশ্রমের দরকার নেই। বরং আপনি চেষ্টা বা পরিশ্রম বাদ দিন, দু'দিনের মধ্যে সব বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে বুঝা গেল, এসব মন্দ বৈশিষ্ট্য খাবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছিল। আপনি আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। চেষ্টা ও শ্রম বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মপ্রকাশ করল, বেরিয়ে আসল।

কিংবা ধরা যাক, অতি উন্নত একটি বাগান। বাগানের সৌন্দর্য হলো– বাগানটি শস্য-শ্যামল, সতেজ, বৃক্ষ ও তৃণ-লতাগুলো সবুজ। তাতে ফুল ফুটে আছে। সবুজ ও সজীবতায় আচ্ছাদিত। এর জন্য আপনাকে অর্থ খরচ করতে হবে। চাকর ও মালী রাখতে হবে– যারা বাগানে পানি দেবে, চারাগুলো দেখাশুনা বা পরিচর্যা করবে। এরপরই কেবল বাগানের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকবে। অথচ আপনি যদি বাগান ধ্বংস করে দিতে চান, চারাগুলো শুকিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হোক– তা চান, তাহলে বেতনভুক্ত মালী-চাকর কোন কিছুর দরকার হবে না। আপনার শ্রম তথা বাগানের সেবা-যত্ন বন্ধ করে দিন। দেখবেন, ক'দিনের মধ্যেই বাগান নষ্ট হয়ে চারাগুলো শুকিয়ে গেছে, পাতা ঝরে গেছে, ডালগুলো ভেঙে গেছে, জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়ে গেছে। বুঝা গেল, মন্দ ও খারাবী এ বাগানের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। আপনি পরিশ্রমের মাধ্যমে তা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। পরিশ্রম ও পরিচর্যা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে লুকিয়ে থাকা খারাবী বেরিয়ে এলো। প্রমাণ হলো, মন্দ ও খারাবীর জন্য পরিশ্রম করার দরকার হয় না।

একইভাবে দেখুন, থাকার ঘর– যা কয়েক লাখ টাকা ব্যয় করে আপনি নির্মাণ করেছেন। এটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঝাড়ুদার প্রয়োজন। সময় সময় সংস্কারও করতে হয়। তবেই দালানটি সুন্দর থাকবে, দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে যদি আপনি ইমারতটি ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে এর জন্য চাকর ও কর্মচারীর প্রয়োজন হবে না। ঝাড়ু দেয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ছেড়ে দিন। প্রথমে ধুলোবালি, আবর্জনা জমতে শুরু করবে। তারপর আস্তর খসতে থাকবে, এরপর ইটগুলো খুলে খুলে পড়বে। কিছুদিন পর দালানটি বিধ্বস্ত হয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা গেল, দালানটি ধ্বংস করার জন্য পরিশ্রম করার দরকার নেই। সুন্দর ও ভালো রাখার জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। বুঝা গেল, উন্নতির জন্য, সুন্দর ও সুশ্রী রাখার জন্য শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। নিজে নিজে নষ্ট হয়, বিনাশ্রমে হয়ে যায়। আর এ-ই হলো পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম, সাধারণ অবস্থা।

মানব-প্রকৃতিতে মন্দ বিদ্যমান রয়েছে

এবার উপর্যুক্ত নিয়মে নিজেকে বিচার করে নিন। মানুষও পৃথিবীর একটি অংশ– একটি বস্তু। মানুষকে উপযুক্ত তথা উন্নত করার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। আপনি যদি কাউকে আলেম বানাতে চান, তাহলে কোন মাদরাসায়

পাঠাতে হবে। বাড়িতে রেখে শিক্ষা দিতে হলে কোন আলেমকে রাখতে হবে। তাঁকে বেতন দিতে হবে, তোয়াজ-তমিজ করতে হবে। ছেলেকে তিনি তিরস্কার করবেন, সাবধান করবেন– যাতে ছেলে পরিশ্রম করে, লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়। তারপর কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ছেলে আলেম হবে। অথচ মূর্খ, জাহেল বানানোর জন্য আজ পর্যন্ত কোন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কাজের জন্য কাউকে শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি যে, আমার ছেলেকে জাহেল-মূর্খ বানিয়ে দিন। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশু মূর্খ ও জাহেল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা দেয়ার জন্য, ইলম অর্জন করার জন্য শিক্ষকের দরকার হয়। মূর্খতা জন্মগতভাবেই থাকে। ইলম দ্বারা মূর্খতাকে বিলীন করে দেয়া হয়। যেমন- জনৈক কবি কত চমৎকারই না বলেছেন–

قرنہا باید تا یک سنگ خارا زآفتاب

لعل گردد خشاں یا عقیق اندر یمن

বছরের পর বছর দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে শক্ত পাথর সূর্যের উত্তাপ সহ্য করে করে, সূর্যের তাপে জ্বলে-পুড়ে কয়েক শতাব্দী কাটিয়ে দেয়ার পর যখন সেই পাথরই মণি, হীরা এবং ইয়াকুত-এর রূপ ধারণ করে, তখন তা হয়ে যায় অতীব মূল্যবান। ইয়াকুত ও হীরা হওয়ার জন্য পাথরকে সূর্যের তাপ সহ্য করতে হয়েছে, অপেক্ষা করতে হয়েছে সুদীর্ঘ সময়। তারপর মতি এবং হীরারূপে পরিণত হতে পেরেছে। অথচ পাথর হওয়ার জন্য কিছুই করতে হয়নি। প্রথম থেকেই পাথর তৈরি হয়েছিল। মতি তৈরির জন্য ধৈর্য-সহ্যের প্রয়োজন। মূল্যহীন পাথর তৈরির জন্য কোন শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন নেই। চমৎকার বলেছেন কবি– একটি পাথর শত সহস্র বছর সূর্যের তাপ ও আলোকে আকর্ষণ করবে, তারপর হবে বাদখশানী হীরা-মানিক। আরেক কবি বলেছেন–

ماہا باید یک پنبہ بدے دانہ کشت

جامہ گردد شاہدے را یا شہدے راکفن

একটি তুলার বীজ জমিতে বপন কর। কয়েক মাস মাটির নিচে পড়ে থাকবে যেন নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে। তারপর এর থেকে কুঁড়ি গজাবে, গাছ হবে, গাছে তুলা হবে। এরপর তুলাকে পরিষ্কার করতে হবে, ধুনাই করতে হবে, বস্ত্র তৈরির কারখানায় পাঠাতে হবে এবং কারিগর এর মাধ্যমে সূতা তৈরি করে

কাপড় বুনবে। তারপর কাপড়টি আপনার কোন প্রিয়জনের পোশাক বা কোন শহীদের কাফন হবে।

অথচ তুলার বীজটি যদি এসব কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার না করতো, তাহলে কাপড় হওয়ার সৌভাগ্য তার হতো না। প্রিয়জনের পোশাকও হবে না। তুলার একটি দানা– এটার কোন মূল্য নেই। তুলার বীজের মধ্যে এসব গুণাগুণ এসে যাওয়া, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জিনিস প্রিয়জনের মাথার তাজ হয়ে যাওয়া– সেটা তখনই হয় যখন বীজটি বিপাকে পড়ে ক্লেশ সহ্য করে মাটির সাথে মিশে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয় এবং কৃষকের দেয়া কষ্ট সহ্য করে– তখনই কেবল এ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। আসলে গুণবান হওয়ার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন। গুণহীন হওয়ার জন্য কোন শ্রমের দরকার নেই। ওই কবিই অন্যত্র খুব সুন্দর বলেছেন–

سالہا باید تا یک کردے از درس علم

عالمے گردد نکو یا شاعرے شیریں سخن

কোন মানব সন্তানকে আলেম ও কবি-সাহিত্যিক হওয়ার জন্য বছরের পর বছর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়– তারপর আলেম বা শায়ের (কবি) হয়। উস্তাদজির শাসন সহ্য করতে হয়, মকতবে যেতে হয়, নয়-দশ বছর পর্যন্ত কষ্ট-সাধনা করে কোর্স সম্পন্ন করতে হয়; এরপর না আলেম বা শায়ের হতে পারে এবং বিখ্যাত কবি হতে পারে। অথচ কষ্ট ও পরিশ্রম যদি সহ্য না করে, তাহলে মূর্খ ও জাহেল হওয়ার জন্য কোন কষ্ট ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। পরিশ্রম ছেড়ে দাও, মূর্খতা আছেই, বানাতে হবে না। মুর্খ ও জাহেল বানানোর জন্য আজ পর্যন্ত কোন মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেউ যদি বলে– ভাই! আমার ছেলেটিকে মূর্খ-জাহেল বানিয়ে দাও! তাহলে সে উত্তর দেবে– মূর্খ-জাহেল হয়ে তো মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠই হয়েছে। যদি কিছু বানাতে ইচ্ছা হয় তবে আলেম ও শিক্ষিত বানানোর জন্য চেষ্টা কর। শিক্ষক তাঁকে আলেম বানিয়ে দেবে। তবে শর্ত হলো, তাকে পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে। শিক্ষক নিজেও তার জন্য কষ্ট ও পরিশ্রম করবেন। এখন কথা হলো, গুণ পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়। আর মন্দত্ব ও খারাবীর জন্য কষ্ট ও পরিশ্রমের কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু 'মন্দ' সব কিছুর মাঝেই ধাতুগত ও জন্মগতভাবে রয়েছে।

চরিত্র গঠন করতে হলে চরিত্র গঠনকারীকে পরিশ্রম করতে হবে। ঠিক

তেমনিভাবে শিক্ষার্থীকেও তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতের শায়খগণ নিজেও পরিশ্রম করেন, মুরিদগণকেও কষ্ট-সাধনা করতে বাধ্য করবেন। বছরের পর বছর চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনা করার পর চরিত্র সংশোধিত হবে এবং নৈতিক উৎকর্ষতা সাধিত হবে। এ উদ্দেশ্যেই খানকা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেন আগ্রহী ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও সংশোধন করা যায়- নৈতিক উন্নতি লাভ হয়, সাধারণ মানুষকে মহামানবে উন্নীত করা যায়। এমন কোন খানকা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেখানে মানুষকে চরিত্রহীন, অসৎ চরিত্র বানানো হয়। আপনি যদি কাউকে বলেন, আমার ছেলে চরিত্রহীন হচ্ছে না- আপনি তাকে একটু চরিত্রহীন করে দিন। উত্তরে সে বলবে- আরে বোকা-নাদান! সে তো চরিত্রহীন হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরিশ্রম করা হয় সততা অর্জন করার জন্য, মন্দ-স্বভাব ও চরিত্রহীনতার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না।

মানুষের দু'টি উত্তম ও মহৎ গুণ রয়েছে- এক. ইলম ও আখলাক এবং দুই. জ্ঞান ও সচ্চরিত্র। এ দু'টি গুণই অনেক শ্রম ও কষ্টের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। মেহনত যদি না করে, তাহলে ইলমের পরিবর্তে জাহালত ও মূর্খতা- যা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে- সারা জীবনই বিদ্যমান থাকবে। সচ্চরিত্রের পরিবর্তে দুশ্চরিত্র জন্মগতভাবে রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ✡

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না, সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মুর্খ ছিলে। তোমার মধ্যে অণু পরিমাণ ইলম বা জ্ঞান ছিল না। [নাহল : ৭৮]

মানব সন্তান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ গোশতের পিণ্ডের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হয়। সে সময় তাঁর ভাল-মন্দের জ্ঞান থাকে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার শক্তি রেখেছেন। তারপর সে শুনে শুনে, দেখে দেখে, চিন্তা-ভাবনা করে করে, কয়েক বছরের পরিশ্রম ও চেষ্টার বিনিময়ে জ্ঞানী হয়; পরিশ্রম করে আলেম হয়। তবে জন্মগতভাবে জাহেল হয়েই জন্মগ্রহণ করে। মূলত মানুষের প্রকৃতিতে ইলম নেই; বরং মানুষের প্রকৃতিতে মূর্খতা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেই বলেন :

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

আমি আমার নফসকে নির্দোষ মনে করি না; নিশ্চয়ই নফস মন্দকর্মপ্রবণ। [ইউসুফ : ৫৩]

চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে কল্যাণ অর্জন করতে হয়। শার বা অকল্যাণ আগে থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রেও মন্দস্বভাব শুরু থেকেই বিদ্যমান আর সৎস্বভাব ও চরিত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। মূর্খতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাকে, ইলম ও জ্ঞান পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয়। এ দু'টি গুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। অর্থাৎ ইলম ও আখলাক, জ্ঞান ও চরিত্র। এ দু'টি গুণ মানুষের সত্তায় নেই। সত্তার মধ্যে আছে মূর্খতা, জাহালত ও কুস্বভাব। কারণ হলো– মানব সৃষ্টির যত উপকরণ আছে, সবই নাপাক, অপবিত্র। এগুলো দিয়ে ইলম জন্মলাভ করে না, করতে পারে না। এগুলোর মাধ্যমে সৎস্বভাব ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধিত হতে পারে না। এসব অপবিত্র জিনিসের মাধ্যমে জাহালত ও মন্দ-স্বভাব তৈরি হতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

আমি মানুষকে অপবিত্র শুক্র-বিন্দু দিয়ে সৃষ্টি করেছি। [ইয়াসিন : ৭৭]

অপবিত্র এ বীর্যবিন্দুতে কোন গুণ, অনুভূতি, মঙ্গল ও কল্যাণ, বিবেক ও বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই ছিল না; বরং ছিল অপবিত্র বীর্যবিন্দু। এটা শরীর থেকে বেরিয়ে আসলে গোসল ওয়াজিব, পোশাকে লাগলে ধোয়া ওয়াজিব। মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ। এর কারণে মানুষ ইবাদতের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। আর এ বিন্দু থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

এ সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত হচ্ছে– ঐ কাতরি বা শুক্রবিন্দু পবিত্র। যেমন- ইমাম শাফিঈ (রহ.) এ মত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশ ইমামের অভিমত হচ্ছে, মানব ধাতু তথা শুক্রবিন্দু নাপাক। কেউ কেউ পাকও বলেছেন। তবে তা নবী ও ওলীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে বীর্য থেকে নবী পয়দা

হয়েছেন, ওলী জন্ম নিয়েছেন– সেটাকে অপবিত্র বলি কেমন করে? যাক, কিছুটা মতভেদ আছে। তবে গর্ভে প্রবেশের পর কী হয়? চল্লিশ দিন পর রক্ত হয়ে যায়। আর রক্তকে কেউই পাক বলেননি। বুঝা গেল, আগের চেয়ে বেশি অপবিত্র হয়ে গেলো, অপবিত্রতার দিকে এগিয়ে গেলো। বীর্য সম্পর্কে মতভেদ ছিল– কেউ পাক বলেছেন, কেউ নাপাক। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– ঐ বীর্যবিন্দু চল্লিশ দিন পর রক্তের রূপ ধারণ করে। আর রক্ত অপবিত্র এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। রক্তকে কেউ-ই পবিত্র বলেননি। মানব উপাদানের দ্বিতীয় স্তর ও পর্যায় এতটাই অপবিত্র যে, এর অপবিত্রতা সম্পর্কে সকলেই একমত। চল্লিশ দিন পর এ রক্ত-বিন্দু একটি মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। তাতেও কোন গুণ ও খায়র নেই, কোন আলো ও জ্যোতি নেই। এর চল্লিশ দিন পর মাতৃগর্ভে হাড্ডি তৈরি করে তার ওপর গোশতের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া হয় এবং তার ওপর চামড়া তৈরি হয়ে যায়। এরপর মানুষের আকার-আকৃতি ধারণ করে। এসবের মধ্যে কোন গুণাগুণ নেই। সার কথা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপবিত্র উপাদান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে এ বিষয়টি এভাবে আলোচিত হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। [নূর : ১২]

খোলাসা কথা হলো, মাটির মধ্যে কোনো অনুভূতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, আদব-তমিজ, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই নেই। সবসময়ই তা পদদলিত হচ্ছে, জুতা দ্বারা দলিত-মথিত হচ্ছে। এ হলো মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। মাটির নির্যাস থেকে যে বীর্যের সৃষ্টি তাও অপবিত্র, বীর্য থেকে যে রক্ত সৃষ্টি হয় তাও অপবিত্র ও নাপাক। এরপর বলা হয়েছে–

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞

অতঃপর তাকে আমি শুক্রকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি। এরপর এ

শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতঃপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। (কিছুদিন পর) এ পিণ্ডকে অস্থি পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অস্থি পাঁজরকে গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই, । অতঃপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি (তথা মানুষ)-রূপে পয়দা করি; আল্লাহ তায়ালা কত উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কত নিপুণ তাঁর সৃষ্টি)! [মোমেনুন : ১৩-১৪]

আল্লাহ তায়ালা এখানে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতার বর্ণনা দিয়েছেন। মানবমণ্ডলী (উপাদানগতভাবে) প্রথমে মাটি ছিল। মাটি থেকে বীর্যবিন্দু সৃষ্টি হলো। তারপর জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, হাড়-হাড্ডি এবং এরপর দেয়া হলো রূহ বা আত্মা। এই বিভিন্ন পর্যায়ে মানব উপাদান যত রূপই ধারণ করেছে, সবই ময়লাযুক্ত, অপবিত্র। এসবের মধ্যে কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই। এসবের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আর যে স্থানে রেখে তৈরি করা হয়েছে, সেটাও নাপাক। মাতৃগর্ভে কোন আলো নেই, নেই কোন জ্যোতি। বাহ্যিক আলোও নেই, আধ্যাত্মিক নূরও নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ

আমি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। [যুমার : ৬]

তাতে অন্ধকার ছাড়া আলো ও জ্যোতির নাম-গন্ধও নেই। প্রথম হলো মাতৃগর্ভ। এতে কোন আলো নেই। এরপর গর্ভাশয়। আরও বেশি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ। আরও একটি অন্ধকারময় কোঠা রয়েছে, যার অন্ধকার আগের দুটি থেকেও বহুগুণ বেশি। এটাকে বলা হয় ঝিল্লি– যার দ্বারা সন্তান আচ্ছাদিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। এ ঝিল্লি কেটে বাচ্চা বের করেন দাই। তিনটি অন্ধকারের মধ্যে যেন মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সৃষ্টির উপাদানগুলো ময়লাযুক্ত, অপবিত্র। সৃষ্টির স্থানও অপবিত্র। এতসব ময়লা-আবর্জনার মধ্যে ইলম ও জ্ঞানের আলো আসবে কেমন করে? আখলাক, স্বভাব-চরিত্র গঠন হবে কেমন করে? ময়লা-

আবর্জনা ও নাপাকী থেকে গুণ সৃষ্টি হয় না। মানব সৃষ্টির মূলই যখন এসব উপাদান, তাহলে কোথা থেকে কেমন করে মানুষের মধ্যে গুণাগুণ আসবে?

মানুষের চরম উৎকর্ষ আল্লাহ্ প্রদত্ত

আপনাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, জগতে যত খায়র ও কল্যাণ আছে, সবই মানুষের মাধ্যমে হয়েছে, মানুষের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। মানুষের মধ্যে উলামা ও আওলিয়া কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন। আম্বিয়া (আ.), বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সবই মানব সমাজেই জন্মলাভ করেছেন। পৃথিবীকে মানুষই আবাদ করেছে, সুন্দর করেছে। আখেরাতও মানুষই সুন্দর করবে। মানুষের মধ্যে যেহেতু অনেক গুণাগুণ রয়েছে; তাই মানুষ যদি এতটাই অপবিত্র হতো তাহলে এসব খুবী ও গুণাগুণ তার মাঝে প্রকাশ পেল কোত্থেকে?

এর উত্তর শুনুন! আল্লাহ তায়ালা যেখানেই মানব সৃষ্টির উপাদানসমূহ বর্ণনা করেছেন, সেখানেই ঐ ময়লাযুক্ত জিনিসেরই আলোচনা করেছেন। তবে এসব জিনিস থেকে ইলম ও জ্ঞান, কামাল ও পূর্ণতা সৃষ্টি হয় না। মানুষের আত্মার সঙ্গে ইলমের সম্পর্ক। যেখানেই আত্মার আলোচনা করেছেন অন্তরে রূহকে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فنفخنا فيه من روحنا

আমি মানুষের হৃদয়ে আমার রূহ ঢেলে দিয়েছি। যেখানেই কামাল ও গুণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। মানুষের মধ্যে যে কামাল ও গুণ রয়েছে তা আমারই। আর যেখানেই ময়লাযুক্ত, অপবিত্র বস্তুসমূহের কথা বলা হয়েছে সেখানেই তা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

خلقنا الانسان من طين–

মানুষকে আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি;

خَلَقْنَا الْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

মানুষকে শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। [হেজর : ২৬]

যেখানে মানুষ এবং তার উপাদানের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে সম্পর্ক করা হয়েছে মানুষের সাথে। আর যেখানে রূহের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে– আমি রূহকে মানুষের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি।

সুতরাং বুঝা গেল, কামালত ও গুণাগুণ যা আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে প্রদত্ত। আর দোষ-ত্রুটি যা রয়েছে তা আগে থেকেই মানুষের জন্মগত। তাই কামাল ও গুণ দান হিসেবে অর্জনের জন্য মানুষকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকতে হয়। কামালত ও গুণাবলী সেখান থেকেই পেতে পারে। এক কথায়, মানুষের মধ্যে কোন কামালত ও গুণ নেই। ইলম, আখলাক, জ্ঞান ও চরিত্রের জন্য সাধনা করতে হবে। আল্লাহর দিকে ঝুঁকতে হবে। কেননা ইলম ও কামালতের জ্ঞান এবং আখলাকের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালার যাত, অন্য কোথাও তা নেই।

তবে ইলম যতটুকুই অর্জিত হোক, কার্যত মানুষ মানুষই থাকবে। জন্মগত অপবিত্রতা এবং অন্ধত্ব রয়েই যাবে। তাই ইলম আসার পর তা যত বৃদ্ধি পায়, সে অনুযায়ী আহলে-ইলম বিনয় ও তাওয়াজ্জুতে ডুবে থাকেন। তাঁরা মাথানত করে চলেন; অহংকার বা গর্ব করেন না। কারণ, তাঁদের জানা আছে, ইলম তাদের সত্তাগত কামাল ও গুণ নয়, তাঁদের নিজস্ব জিনিস নয়। তাই অহংকার ও গর্ব করা বোকামি। অন্যের দান– যা দিতেও পারে, আবার ছিনিয়েও নিতে পারে। এটা মানুষের নিজস্ব সম্পদ নয়। ধরা যাক, আপনি আপনার ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে কোন লোককে নিয়োগ করলেন। খাজাঞ্চি আপনার নির্দেশ মতো টাকা-পয়সা অন্যকে দান করতে থাকে। এ অবস্থায় খাজাঞ্চির অন্তরে এমন কল্পনাও আসবে না যে, সে এ ধনভাণ্ডারের মালিক এবং সেই এসব দান-খয়রাত করছে। তার জানা আছে, ধনাগারের মালিক অন্য ব্যক্তি। তার নির্দেশ ও অনুমতিতে সে তা খরচ করছে। সে কেবল একজন আমানতদার। তার কাজ কেবল ধন-সম্পদ যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। সে প্রকৃত মালিক নয়। তাই খাজাঞ্চির হৃদয়ে কখনো অহংকার বা গর্ব সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ সে জানে, এ ধনভাণ্ডার তার নয়। তেমনিভাবে মানুষ যত বড় আলেম ও বিদ্বান হোক না কেন, সে দেখতে পাবে, এসব ইলম তার সত্তাগত নয়, দানকৃত। এই উন্নত স্বভাব-চরিত্র তার নিজস্ব সম্পদ নয়; বরং তার মৌলিক উপাদান হচ্ছে ময়লাযুক্ত, অপবিত্র। এসব ইলম, আখলাক ও নৈতিকতা অন্যত্র থেকে এসেছে। তাই বুদ্ধিমান লোক কখনো অহংকার করে না, গর্ব করে না। যেহেতু নিজের মূল সে ভুলে যায়নি। বরং সে বলবে– আমি এ কামালত ও গুণাবলীর প্রতি শুকর আদায় করতে পারি, অহংকার ও গর্ব-গৌরব করতে পারি না। গর্ব করা যায়

নিজস্ব বস্তুর– এসব জিনিস আমার নিজস্ব নয়। দুনিয়াতে উলামা, আওলিয়া কেরাম, হুকামা (দার্শনিক) যাঁরা এসেছেন– যতই তাঁরা উচ্চ মাকামে পৌঁছেছেন, ততই নতশির হয়েছেন। তাঁদের ভাবনা ছিল– আমরা কিছুই না, আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও হীন। আমাদের মাঝে কোন কামাল নেই– কোন গুণ নেই, কোন ভাল কিছু নেই। কেননা ঐসব মহামনীষীর সামনে বাস্তবতা এবং প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

গুণবানরাই পূর্ণমাত্রার নম্র ও বিনয়ী

জগতে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সৃষ্টিজগতে তাঁর সমপর্যায়ের তো নেই-ই, কাছাকাছি মানেরও কেউ নেই। তাঁর পবিত্র যাত সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের শীর্ষে। আল্লাহ তায়ালার পর যদি কারো কোন সম্মান ও মর্যাদা থাকে, তবে তা বিশ্বনবী, শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রয়েছে। এত সম্মান, এত মর্যাদা, এত মহত্ত্ব সৃষ্টিজগতে আর কাউকে দেয়া হয়নি, যা হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। যদি গর্ব-অহংকার করা হতো, তাহলে তিনিই কেবল তা করতে পারতেন। গর্ব প্রকাশের ইচ্ছা করলে তিনিই করতেন। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অধিক নম্র-বিনয়ী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এ পৃথিবীতে ছিল না। তাঁরচে' বেশি অবনত মস্তক অন্য কেউ ছিল না। পদে পদে তাঁর নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ পেত। কখনও মাটিতে জুতাবিহীন আসন ছাড়া বসে আহার করে নিতেন আর বলতেন–

اكل كما يا كل العبد

আমি এভাবে আহার করি যেভাবে গোলাম বা ক্রীতদাস করে থাকে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রকাশ করেননি। যখন তিনি পথ চলতেন, তখন এমন হতো না, এমন বলতেনও না– আমি সবার আগে থাকব, অন্যরা আমার পেছনে থাকবে। এখানেও বিনয় ও নম্রতা। সাহাবায়ে কেরাম ডানে-বামে, আগে-পিছে চলতে থাকতেন। তিনি নিজের কোন বিশেষত্ব প্রকাশ হতে দিতেন না। এই হলো পরিপূর্ণ তাওয়াজু। আর এটাও ছিল আল্লাহ তায়ালার দানকৃত নেয়ামত, আল্লাহ প্রদত্ত কামাল। ফলে যতই আত্মগোপন করে সবার সাথে মিলেমিশে চলার চেষ্টা

করেছেন তিনি, তবু চলার সময় সকলের উপর তাঁকেই দেখা যেত– অথচ অনেক সাহাবী ছিলেন দীর্ঘদেহী। আর হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চতা ছিল মধ্যম। খাটো ও বেঁটে ছিলেন না, বেমানান লম্বাও ছিলেন না; অত্যন্ত মানানসই সুন্দর উচ্চতা ছিল তাঁর। অথচ যখন চলতেন সবার উপরে তাঁকে দেখা যেত। এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার দেয়া বুযুর্গী। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী কিংবা সকলের আগে থাকার চেষ্টা করতেন না। কোন মজলিসে যখন বসতেন, অন্যান্য মানুষও বসতেন। সাহাবায়ে কেরাম ডানে-বামে, আগে-পিছে বসতেন। তিনি নিজের জন্য কখনো কোন বিশেষ জায়গা নির্ধারণ করতেন না। অথচ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বুযুর্গী ছিল তাঁর। ফলে দীর্ঘকায় মানুষ মজলিসে বসা থাকলেও তাঁকেই সর্বোচ্চ দেখা যেত। এসব বলার উদ্দেশ্য হলো– মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরই মহান যাত ও সত্তা। অথচ সবচে' বেশি বিনয় ও তাওয়াজু তিনিই করতেন। কখনো তিনি বলেছেন– হে মানবসমাজ! আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমাকে আমার সীমায় রেখো। সীমালঙ্ঘন করো না, যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর সন্তান, আল্লাহর পুত্র বলেছে– যা স্বয়ং আল্লাহই বলে দিয়েছেন। আমার সম্মান ও বুযুর্গী হলো– আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলো। আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহও নই, আল্লাহর সন্তান বা বংশধরও নই। আল্লাহ পিতা-মাতা, সন্তান– এসব হতে পবিত্র। আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর রাসূল! এটা আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে তাঁর রাসূল বানিয়েছেন, বার্তাবাহক ও পয়গাম্বর বানিয়েছেন। এত সম্মান ও মর্যাদা আমাকে দান করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার এ কথা বলেছেন যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হে আমাদের সরদার!' বলেছিলেন– প্রকৃতপক্ষে তিনি সরদারই ছিলেন। তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সরদার। তবুও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– সাইয়েদ ও সরদার হলেন আল্লাহ। আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন যে, এমন সম্বোধন করো না যার দ্বারা সীমাতিরিক্ত প্রশংসা হয়ে যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لا تقولوا انا خير من يونس ابن متى

হে লোকসকল! আমার সম্পর্কে একথা কখনো বলো না যে, আমি হযরত ইউনুস (আ.) হতে শ্রেষ্ঠ– উত্তম।

অথচ তিনি ছিলেন সকল নবী ও রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ। তবুও এমন বলা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন– এভাবে আমার প্রশংসা করো না, যার দ্বারা অন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, অবমাননাকর মনে হয়। আমার তুলনামূলক প্রশংসা থেকে বিরত থেকো। এভাবে প্রশংসা করো না যাতে আমার তুলনায় অন্যদের মর্যাদার হানি হয় এবং আমার মর্যাদা বেশি মনে হয়। এটা আদবের খেলাফ এবং গোস্তাখিপূর্ণ। এ-ই হলো তাঁর পূর্ণাঙ্গ তাওয়াজু। কখনো এই বলে হেদায়ত করেছেন– আমার প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করো না। কখনো বলেছেন– আমার জীবদ্দশায় সম্মান কর, প্রশংসা কর। তবে সীমালঙ্ঘন করো না এবং ওফাতের পর আমার মাজারকে পূজা করো না, ইবাদত-গৃহে পরিণত করো না, সিজদা করো না, রুকু করো না, মাথা ঝুঁকিও না। আমার কবরকে মূর্তিপূজার আড্ডায় পরিণত করো না। আবার কখনো বলেছেন– আমার মাজারকে ঈদগাহ্ বানিও না, যাতে সেখানে মেলা বসে যায়। সেখানে দলবদ্ধ হয়ে লোকজন আসবে। সাবধান! এসব করো না। যে কোন স্থান থেকে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবে, তা আমার কাছে পৌঁছানো হবে। তবে তোমরা যখন হজ করতে আসবে তখন আমরা মাজার জিয়ারত করবে। তোমাদের ওপর এটা আমার হক– আমার অধিকার। তোমরা আমার মাজার জিয়ারত করবে, রওজার কাছে হাজির হবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– 'যে ব্যক্তি হজ করল অথচ আমার মাজার জিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল।' আমার এখানে আসবে– এটা হলো আমার হক। রওজা শরীফের জিয়ারত করার জন্য সফর করে যাবে এবং রওজার কাছে হাজির হয়ে সালাত পেশ করবে– এ আমার ইচ্ছা!

সার কথা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়ই হোক কিংবা ওফাতের পর– তিনি এমন সব আদব শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তাঁর আবদিয়্যাত বা আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ পেয়েছে– জীবদ্দশায়ই হোক কিংবা ওফাতের পর– বাড়াবাড়ি করো না, সীমালঙ্ঘন করো না। তারপর এ-ও বলেছেন–

لا تقومو! الى كما يقوم الاعاجم

আমার কাছে এসে আমার দরবারে হাজির হয়ে এমন করো না– আমি বসে থাকব, আর তোমরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমন অনারব রাজা-বাদশাহদের দরবারে লোকজন এবং রাজ-কর্মচারীরা হাত বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। বাদশাহ বসে থাকে আর লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– এমনটা করো না যা রাজা-বাদশাহদের সামনে করা হয়। এটা হচ্ছে সামাজিক রেওয়াজ বা দেশাচার। প্রকৃত আদব ও সম্মান এটা নয়। প্রকৃত আদব ও সম্মান হচ্ছে– অন্তরে আজমত ও শ্রদ্ধাবোধ থাকবে, ভক্তি ও ভালোবাসা থাকবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর বসে থাক যেমন আমি বসে থাকি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন, বাধা দিয়েছেন। এ-ই ছিল তাঁর পূর্ণাঙ্গ আবদিয়্যাত বা আল্লাহ্‌র দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলতেন– আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার বন্দেগী ও দাসত্বকে সামনে রাখ।

রিসালাত এবং বাশারিয়াত

মোট কথা, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) যেমন আল্লাহ তায়ালার বান্দা তেমনি তাঁর রাসূলও। রাসূল হওয়ার কারণেই তাঁদের থেকে মুজিযা এবং অনেক কেরামতও প্রকাশ পায়। একদিকে এত কেরামত ও মুজিযা যে, আঙুলের ইশারামাত্র চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়, ইশারা করামাত্র গাছ নিজের জায়গা ছেড়ে দৌড়ে এসে হাজির হয়, পানির পাত্রে আঙুল রাখলে আঙুল থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয় এবং এক সময় চৌদ্দশ' লোকের বিরাট বাহিনী তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্ত হয়ে যায়। একদিকে এসব হচ্ছে, অন্যদিকে ওহুদ যুদ্ধে প্রস্তরাঘাতে ললাট রক্তাক্ত হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছেন। একদিকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে– যাতে আকাশের চাঁদও প্রভাবিত হয়ে দুই টুকরা হয়েছে, অন্যদিকে এত দুর্বল-অসহায় যে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছেন। হাদীস শরীফে আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন জ্বর আসত তখন অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিত এবং কঠিনভাবে আক্রান্ত হতেন। একদিকে এত অসহায়ত্ব, অন্যদিকে এত মর্যাদা ও ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি যে, ইশারার সাথে চাঁদ দুই টুকরা হয়। ইশারায় সূর্য স্থান ত্যাগ করে, সময়ের চাকা থেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা এসব কোন উদ্দেশ্যে করেছেন যে, একদিকে চরম অসহায়ত্ব, দুর্বলতা, অন্যদিকে এমন দাবি যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল! এ কারণে করা হয়েছে– আম্বিয়া (আ.)গণের হাতে যখন নানা

মুজিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাবে, তখন যেন মানুষ তাঁদেরকে আল্লাহ্ ভাবতে শুরু না করে। বাশারিয়াত বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ রেখে দিয়েছেন, যাতে কেউ আল্লাহ বলে আখ্যা না দেয়। যেন একথা বলে, 'আল্লাহর বান্দা।' এ কারণেই তাঁর ইশারায় চাঁদ দুই টুকরা হয়, আবার অসহায়ভাবে গর্তেও পড়ে যান। একবার তো সাময়িক কিছুটা পরাজিতও হয়েছিলেন। রোগ-ব্যাধিও আক্রমণ করত, চিকিৎসা করারও প্রয়োজন হত। ইহুদীরা জাদু করেছিল। তিনি জাদুতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। পার্থিব চিন্তা-ভাবনাও আসতো, আনন্দ-উল্লাসও হতো। বাশারিয়াত বা মানবীয় কর্মকাণ্ড ও বিশেষত্ব যা রয়েছে তা সবই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রয়োগ হতো। আর তা এজন্য করা হতো, তাঁর মুজিয়া ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে কেউ যেন তাঁকে খোদা ভাবতে শুরু না করে; বরং যেন মনে করে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সকল বুযুর্গী ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার দান। এ কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তায়, কাজকর্মে বিনয় প্রকাশ করতেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা বান্দার সাথে করা হয়। যেন এমনটা প্রকাশ পায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) আল্লাহ প্রেরিত, আল্লাহর অত্যন্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ নন। তাঁরা মানুষ বা বাশার এবং বাশারিয়াত বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁদের ওপর প্রকাশ পেত এবং প্রবল ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেত।

সার কথা, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) থেকে পাক-পবিত্র ও শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাশীল অন্য কোন মানবগোষ্ঠী এ জগতে নেই। তাঁদের সরদার হলেন সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন–

انا نبى الانبياء

অন্যান্য নবীগণ হলেন উম্মতের নবী, আর আমি নবীগণের নবী।

এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, শেষ জমানার নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنصُرُنَّهٗ

আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদেরকে নবুওয়ত দান করব, কিতাব প্রদান করব, তারপর ঐ মহান রাসূল আগমন করবেন– যাঁর সম্পর্কে তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে– তখন ঐ রাসূল-এর ওপর ঈমান আনয়ন করো, তাঁর সাহায্য-সহায়তা করো, তাঁর অনুসরণ করো, তাঁর সাথে থেকে জীবন যাপন করো। *[আলে ইমরান : ৮১]*

আম্বিয়া (আ.)গণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনেন। আর ঈমান আনা হয় নবীর ওপর। মানে দাঁড়াল– তাঁকে নবীগণেরও নবী বানানো হয়েছে এবং সকল নবীকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনি। নবীগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাঁরাও যেন ঈমান আনেন। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

انا نبى الانبياء

আমি নবীগণের নবী।

নবীগণ উম্মতের জন্য নবী, আর আমাকে নবীগণের জন্যেও নবী বানানো হয়েছে। এত মহান, এত পবিত্র সত্তা যে, নবীগণের মধ্যেও সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁর। তাঁকে খাতামুন নাবিঈন বানানো হয়েছে। (আল্লাহ না করুন) অহংকার, গর্ব করলে তিনিই করতে পারতেন। অথচ তিনি ছিলেন সর্বাধিক নম্র ও বিনয়ী। বুঝা গেল, যত কামালাত রয়েছে, সবই আল্লাহ পাকের, আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। মানব সত্তায় কোন কামাল নেই, কোন গুণ নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথাবার্তার মাধ্যমে, আমল ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, মানুষ নিজেকে যেন গুণহীন, কামালশূন্য মনে করে। আর আল্লাহর শুকর আদায় করে ঐসব কামাল ও গুণের ওপর, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। তাই পৃথিবীতে যত মহামনীষীর আগমন

ঘটেছে, তাঁরা যত বেশি মহান হয়েছেন, ততই তাঁদের তাওয়াজু বা বিনয় বেড়ে গেছে। নিজেকে অধম ও নগণ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। কেননা প্রকৃত অবস্থা তো তাঁদের কাছে স্পষ্ট– এসব কামাল ও গুণ আমাদের নয়; বরং আল্লাহ্ তায়ালার দান। নিজের চোখে যখন দেখতে পান, কামালদাতাই কামাল দান করেন এবং যদি তা নিয়ে যেতে চান, নিয়েও নিতে পারেন– তা ধরে রাখার শক্তি মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন– মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে ইলম ও জ্ঞান, আখলাক ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রসহ জন্মগ্রহণ করে না, আমিই তা দান করি। বার্ধক্য বা শেষ সময় সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন–

مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

মানুষকে শেষমেষ এমন এক জরাজীর্ণ বয়সে এনে উপনীত করানো হয় যে বয়স অত্যন্ত পীড়াদায়ক। [হাজ : ৫]

মানুষ যখন শতাধিক বছর পার করে ফেলে তখন তার ইলম ও জ্ঞান একটু একটু করে লোপ পেতে থাকে। হয় চোখে দুর্বলতা দেখা দেয়, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে, দেমাগ দুর্বল হয়ে চিন্তা ও গবেষণাশক্তি লোপ পেয়ে যায়, শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে ইলমও শেষ হয়ে যায়। নতুন ইলম ও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কে সংরক্ষিত আগের অর্জন করা ইলম ও জ্ঞানও স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে বিদায় নিতে থাকে। পুরনো ইলম শেষ হয়ে যায় এবং নতুন ইলমের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। যেভাবে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই বিদায় নেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'ইলম তোমার নিজস্ব জিনিস নয়। যখন ইচ্ছা করেছি আমিই দিয়েছি, যখন ইচ্ছা করেছি নিয়ে গেছি।' এরপরও মানুষ গর্ব-অহংকার ও গৌরব করেত পারে কেমন করে? সে যদি ইলম ও কামাল পেয়ে যায়, তাহলে তো সে অন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবে– এই ইলম ও কামাল আমার নিজস্ব সম্পদ নয়। এটা আমার মালিকের, আমার প্রভুর; আমি তো কেবল খাজাঞ্চি। খাজাঞ্চির এ অধিকার নেই যে, দাবি করবে, আমি এ ধন-সম্পদের মালিক। এ সম্পদ তো মালিকের, আমি কেবল রক্ষক।

ঘটেছে, তাঁরা যত বেশি মহান হয়েছেন, ততই তাঁদের তাওয়াজু বা বিনয় বেড়ে গেছে। নিজেকে অধম ও নগণ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। কেননা প্রকৃত অবস্থা তো তাঁদের কাছে স্পষ্ট– এসব কামাল ও গুণ আমাদের নয়; বরং আল্লাহ্ তায়ালার দান। নিজের চোখে যখন দেখতে পান, কামালদাতাই কামাল দান করেন এবং যদি তা নিয়ে যেতে চান, নিয়েও নিতে পারেন– তা ধরে রাখার শক্তি মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন– মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে ইলম ও জ্ঞান, আখলাক ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রসহ জন্মগ্রহণ করে না, আমিই তা দান করি। বার্ধক্য বা শেষ সময় সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন–

مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

মানুষকে শেষমেষ এমন এক জরাজীর্ণ বয়সে এনে উপনীত করানো হয় যে বয়স অত্যন্ত পীড়াদায়ক। [হাজ : ৫]

মানুষ যখন শতাধিক বছর পার করে ফেলে তখন তার ইলম ও জ্ঞান একটু একটু করে লোপ পেতে থাকে। হয় চোখে দুর্বলতা দেখা দেয়, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে, দেমাগ দুর্বল হয়ে চিন্তা ও গবেষণাশক্তি লোপ পেয়ে যায়, শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে ইলমও শেষ হয়ে যায়। নতুন ইলম ও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কে সংরক্ষিত আগের অর্জন করা ইলম ও জ্ঞানও স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে বিদায় নিতে থাকে। পুরনো ইলম শেষ হয়ে যায় এবং নতুন ইলমের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। যেভাবে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই বিদায় নেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'ইলম তোমার নিজস্ব জিনিস নয়। যখন ইচ্ছা করেছি আমিই দিয়েছি, যখন ইচ্ছা করেছি নিয়ে গেছি।' এরপরও মানুষ গর্ব-অহংকার ও গৌরব করেত পারে কেমন করে? সে যদি ইলম ও কামাল পেয়ে যায়, তাহলে তো সে অন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবে– এই ইলম ও কামাল আমার নিজস্ব সম্পদ নয়। এটা আমার মালিকের, আমার প্রভুর; আমি তো কেবল খাজাঞ্চি। খাজাঞ্চির এ অধিকার নেই যে, দাবি করবে, আমি এ ধন-সম্পদের মালিক। এ সম্পদ তো মালিকের, আমি কেবল রক্ষক।

ইলম-আখলাক অর্জনের প্রথম পথ সোহবত বা সাহচর্য

আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের সত্তার মধ্যে কোন গুণ নেই। সে চেষ্টা-পরিশ্রম করলে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাহলে ইলম ও আখলাক অর্জনের পথ ও পদ্ধতি কি? একথা তো স্পষ্ট যে, ইলম ও আখলাক পরিশ্রম ও সাধনা করে উপার্জন করতে হবে– বিনা পরিশ্রমে তা অর্জিত হবে না, সৃষ্টি হবে না। তাহলে উত্তম আখলাক ও উন্নত চরিত্র গঠনের পথ ও পদ্ধতিটা কি?

ইলম ও আখলাক বা জ্ঞান ও উন্নত চরিত্র লাভের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সোহবত লাভ করা। অর্থাৎ কোন আলেম ও চরিত্রবানের সাহচর্য লাভ করা। আহলুল্লাহ এবং বুযুর্গানেদীনের খেদমতে অবস্থান করে, তাঁদের যবান থেকে মানুষ যখন জ্ঞানের কথা শোনবে তখন ইলম হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করবে। বুযুর্গদের সঙ্গগুণে স্বভাব-চরিত্র ও আখলাক পয়দা হবে, গঠিত হবে।

প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম বলা হয়। সাহাবায়ে কেরাম এভাবে ইলম হাসিল করেননি যে, কোন কিতাব সামনে খোলা রাখা, দিন-রাত মুতালাআ ও পাঠ করছেন– অর্থাৎ যেভাবে আমরা পাঠ করি। তাঁরা শুধু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে বসেছেন, সোহবত ও সাহচর্যের ফয়য লাভ করেছেন। সাহচর্যের বরকতে তাঁরা আলেম, আরেফ, কামেল, যাহেদ এবং দরবেশ হয়েছেন। ইলম ও আখলাকের সমূহ কামালাত এবং সর্বোচ্চ স্তর ও মর্যাদা তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে– আর তা তারা লাভ করেছেন। সর্বোত্তম পথ হলো– সাহচর্যের ফয়েয লাভ এবং ওলীদের সোহবত ও সাহচর্য লাভ করা। তাঁদের অন্তর ও আত্মার প্রভাব অন্যদের আত্মাকে প্রভাবিত করে। বুযুর্গদের হৃদয়ে যদি ইলম থাকে, তাহলে সহগামীদের হৃদয়ে তা পৌঁছে যায় অজ্ঞাতসারে। যদি তাঁদের মধ্যে পবিত্র স্বভাব ও নৈতিকতা থেকে থাকে, তাহলে তাদের আখলাক-চরিত্রও অনুগামীদের অন্তরে পৌঁছে যায়। হৃদয় প্রভাবিত হয়। এ কারণে সৎসঙ্গ ও নেক সোহবত গ্রহণ করার তাকিদ করা হয়েছে। অসৎসঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা, দূরে থাকা, ভাল ও নেক পরিবেশে থাকা, খারাপ ও মন্দ পরিবেশ থেকে পরহেয থাকা। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেছেন–

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

নেক সোহবত তোমাকে নেক করে দেবে এবং বদ সোহবত তোমাকে বদ করে দেবে।

সঙ্গ ও সাহচর্যের একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া থাকে। আর মানুষ তো মানুষ, আমি বলি প্রত্যেকটি জিনিসের সাহচর্যই ক্রিয়াশীল। আপনি কাপড়ের বাক্সে গোলাপ ভরে রাখুন। সপ্তাহখানেক পরে যখন তা বের করবেন, তখন দেখতে পাবেন সব কাপড় থেকে গোলাপের সুগন্ধি বের হচ্ছে। কাপড় কিন্তু গোলাপ ফুল ছিল না। গোলাপ ফুলের সাহচর্যের কারণেই ঘ্রাণ ছড়িয়ে মিশে গেছে এবং কাপড় থেকেও ঐ ঘ্রাণই বের হচ্ছে– যা গোলাপ ফুলে ছিল। আবার পোকার ভয়ে আপনি যখন গরম কাপড় বাক্সে রাখেন, তখন কাপড়ের সঙ্গে নেপথলিনও রাখেন কিংবা তামাকপাতা রাখেন– যাতে পোকা কাপড় কেটে নষ্ট না করে। শীতকালে যখন কাপড় বের করেন, তখন দেখা যায় কাপড় থেকে নেপথলিন ও তামাকের গন্ধ আসছে। কাপড় তামাক পাতার তৈরি নয়; অথচ নেপথলিন বা তামাকের সঙ্গ ও সাহচর্যের কারণে কাপড়েও সে ঘ্রাণ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

লোহা দেয়া হয় হাঁপরে। আনুমানিক পনের মিনিট আগুনে রাখার পর দেখা যাবে লোহাও আগুনের রঙ ধারণ করে লাল হয়ে গেছে। আগুন যা করে সে কাজ লোহাও করবে। তাপ ও আলোও থাকবে তাতে। আগুনের মতই রঙ লাল হয়ে যাবে। আপনি যদি এই গরম লোহাকে অন্য কোন জিনিসের ওপর রেখে দেন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই সব পুড়ে ছাই করে দেবে। অর্থাৎ যে কাজ আগুন করে, তা এখন এই লোহাও করবে। কারণ, আগুনের সঙ্গে থেকে নিজের মধ্যে এ গুণ সে অর্জন করেছে। এমনকি আকার-আকৃতি ও রঙও আগুনের মত হয়ে গেছে।

সুতরাং বুঝা গেল, সোহবত অত্যন্ত প্রভাবশীল। হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.) শীর্ষস্থানীয় ওলী ও কামেল বুযুর্গ ছিলেন। দিল্লীতে তাঁর মাজার রয়েছে। তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর পীর ছিলেন। তাঁর ঘরে হঠাৎ মেহমান আসলো। ঘটনাক্রমে তাঁর ঘরে কিছুই ছিল না। কয়েকদিন ধরে উপোস কাটাচ্ছেন। খাজা সাহেব তো পেরেশান! কেমন করে মেহমানের খাতির-যত্ন করবেন, ঘরে যে একটি দানাও নেই! মেহমানকে কি খাওয়াবেন– এই পেরেশানির মধ্যে একবার ঘরের ভেতর যাচ্ছেন আবার বেরিয়ে আসছেন। মেহমানদের পানাহারের ব্যবস্থা কি করবেন এ জন্য পেরেশান। ঘরে এক দানা গম-চালও নেই।

হযরত খাজা সাহেবের মুরীদদের একজন সরাইখানার মালিক। তাঁর ছিল

খাবারের দোকান। এ যুগে যাকে বলে হোটেল। কিছুদিন আগেও এটাকে বাটিয়ারা বলা হতো। অর্থাৎ খানা তৈরি করে বিক্রি করা হতো। যা হোক, সে বাটিয়ারা বিষয়টি বুঝতে পারল যে, শায়খের ঘরে উপবাস চলছে, খাবার-খাদ্য কিছু নেই। মেহমানদের কারণে পেরেশান হচ্ছেন। তখনই সে তার দোকানে গেল এবং তার দোকানে যত উন্নতমানের ভালো খাবার ছিল, সে খাবার দিয়ে খাঞ্চা তৈরি করল। এতে কয়েকজন মানুষের উপযোগী খাবার ছিল এবং হরেক রকম ভাল ভাল খাবার ছিল। লোকটি সে খাবার মাথায় করে নিয়ে আসল এবং হাদিয়াস্বরূপ খাজা সাহেবের খেদমতে পেশ করল।

হযরত খাজা সাহেব খুবই আনন্দিত হলেন। মেহমানদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে আহার করালেন, তাদের খাতির-যত্ন করলেন। আনন্দে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। আল্লাহর শুকর! মেহমানদের কোন অসুবিধা হয়নি, কষ্ট হয়নি। আমি তাদের আদর-আপ্যায়ন করতে পেরেছি।

মেহমানরা চলে গেলে খাজা সাহেব খুবই আবেগ ও জোশের সঙ্গে হোটেল মালিককে বললেন– আজ তুমি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছ। বল, তুমি কি চাও? আজ তুমি যা চাইবে, তাই পেয়ে যাবে।

হোটেল মালিকের মুখ দিয়ে এ কথা বের হলো– হযরত! আমাকে আপনার মত বানিয়ে দিন!

এ তো ছিল অস্বাভাবিক দাবি যে, হোটেল মালিক অবিকল হযরত বাকীবিল্লাহ বনে যাবে! খাজা সাহেবের তেমন যোগ্যতা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু হোটেল মালিক! বেচারা অতি সাধারণ মানুষ। তার সে যোগ্যতা ও শক্তি ছিল না। ইলম, আখলাকও সে স্তরের ছিল না। সে তার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার বাইরে আবেদন করে বসলো। যদি বলত, হযরত! দোয়া করে দিন, আল্লাহ যেন আমাকে নেক ও সালেহ বানিয়ে দেন। আমাকে জান্নাত দান করেন। অথচ তা না করে বরং বলল– আমাকে আপনার মত করে দিন।

খাজা সাহেব বললেন– তুমি তো তোমার শক্তি সামর্থের বাইরে আবদার করেছ! অন্য কিছু চাও!

সে বলল– আমি এটাই চাই; অন্য কিছু নয়।

এবার খাজা সাহেব পড়লেন মহাচিন্তায়। একে আমার মত করে দেবো কেমন করে? আমি যদি চেষ্টাও করি, তবু তার মধ্যে এ যোগ্যতা কোথায় যে, সে এত ইলম ও জ্ঞান হজম করতে পারবে, আখলাকী ও আধ্যাত্মিক কামালত ও

গুণাবলী সহ্য করতে পারবে– যা আমাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন! প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা আলাদা আলাদা। নবীগণের যোগ্যতা পৃথক। তাঁরা নবুওয়তের কামালত বরদাশত করেন। উম্মতের কোন কুতুব, গাওস এবং ওলীর এসব কামালত বরদাশত করার মত শক্তি নেই। তাঁরা বিলায়তের কামালত সইতে করতে পারেন। যে ওলী নয়, সাধারণ মুমিন সে বিলায়তের কামালত বরদাশত করবে কেমন করে? করতে পারে না। এ লোক তো সাধারণ মানুষ। সে তো আলেমগণের কামালতও বরদাশত করতে পারবে না। প্রত্যেকের যোগ্যতা থাকে ভিন্ন ভিন্ন। এক পোয়া পরিমাণের পাত্রে এক পোয়া গম রাখা যায়। এ পাত্র যদি বলে– আমার মধ্যে দুই মণ গম ভরে দাও। তাহলে ভরবেন কেমন করে? এর দুই মণ ধারণ ক্ষমতা নেই। হোটেল মালিকের বিষয়টাও ছিল তেমনি। পোয়া পরিমাণের যোগ্যতা নেই, দাবি করছে– আমার মধ্যে দশ মণ ভরে দিন! এবার খাজা সাহেব কেমন করে ভরে দেবেন?

পুনরায় খাজা সাহেব (রহ.) বললেন– তুমি তোমার সামর্থ্যের বাইরে আবদার করেছ। তোমার মধ্যে সে শক্তি ও ধৈর্য্য নেই। এইটুকু চাও, যে পরিমাণ তুমি সহ্য করতে পারবে।

সে বলল– কথাটা তো আমার মুখ থেকে বের হয়ে পড়েছে, সুতরাং আপনার মতই বানিয়ে দিন।

খাজা সাহেব আবারও চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন– বিসমিল্লাহ! চল আমার সঙ্গে।

তিনি তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাকে তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলেন। তার রূহতে তাসাররুফ করতে শুরু করলেন। এই পরিমাণ তাসাররুফ করলেন এবং তার রূহের মধ্যে নিসবত ও কামালত এমনভাবে ভরতে শুরু করলেন যে, অবশেষে তাঁর মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ঢেলে দিলেন। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, হোটেল মালিকের আকার-আকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে অবিকল খাজা সাহেবের আকৃতি ধারণ করল। এবার কামরা থেকে দু'জন খাজা বাকীবিল্লাহ বের হলেন। আকার-আকৃতি, রঙ-রূপ সবই এক। নিজের যোগ্যতাবলে তার অন্তরে কামালত এমনভাবে ঢেলে দিয়েছিলেন যে, বাহ্যিক আকার-আকৃতিও বদলে গেছে। মানুষ এভাবে তাঁদের চিনলেন যে, একজন অত্যন্ত ধীর-স্থির ও শান্তশিষ্টভাবে আসছেন। তাঁকে খুবই বলবান ও শক্তিশালী মনে হচ্ছিল। আর অন্যজন– খাজা বাকীবিল্লাহ– আসছেন এভাবে যে, তাঁর পদযুগল এবং শরীর ছিল কম্পমান। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর

ওপর এত বড় বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে তিনি তা সহ্য করতে পারছেন না। এতে মানুষ বুঝে নিল– এই লোক হোটেল মালিক; যার আকৃতি খাজা সাহেবের মতো হয়ে গেছে। তিন-চারদিন পর সে মারা গেল। বেচারা সহ্য করতে পারেনি।

ارزوے می خوالے و باندازہ خواہ

আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোন বাধা নেই; তবে এ পরিমাণ কর, যা সহ্য করতে পার এবং যে পরিমাণ যোগ্যতা তোমার রয়েছে।

কেন এ ঘটনা বর্ণনা করলাম? কারণ, দশ মিনিট খাজা বাকীবিল্লাহ'র সাহচর্যে থেকে হোটেল মালিক দ্বিতীয় বাকীবিল্লাহ হয়ে গেল। কেমন বিস্ময়কর আছর সোহবতের। সৎ ও নেকলোকের সোহবতে অন্তরে সততা ও নেকীর আগ্রহ জন্মে। ফলে মানুষের আত্মার মধ্যে যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, কামালত সৃষ্টি হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব কামালত ছিল, তা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত ও সাহচর্যের ফল।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বতের মুজেযা

আমি তো বলে থাকি– যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তাঁর মুজিযা হবে হাজার হাজার। আসমান-জমিনে অবস্থানকারীদের মধ্যে মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্র-সূর্যের ওপর পৃথকভাবে মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। দুনিয়ার সকল বস্তুর ওপর তাঁর মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। পাথর ও বৃক্ষ তাঁর নবুওয়তের সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁর হাতে থেকে কথা বলেছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হলো। সেটা বালুকাময় উন্মুক্ত স্থান। কয়েক মাইল পর্যন্ত কোন আড়াল ছিল না, বসার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছিল না। এক মাইল দূরে একটি গাছ, আরেক মাইল দূরে আরেকটি গাছ। গাছদুটিকে তিনি ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরে এসে সামনে হাজির। দুই মাইল দূরত্বের পথ অতিক্রম করে এসে পড়ল। আর শাখা-প্রশাখাগুলো এভাবে প্রসারিত করে দিল যেন, একটি তাঁবু হয়ে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি ইস্তেঞ্জা করলেন। তারপর চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। গাছদু'টি নিজ নিজ জায়গায় চলে

গেল। গাছের মধ্যে তাঁর মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাণীজগতের ওপর যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা আলাদা।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– একটি উট কান্নারত অবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলো। উটের চোখে অশ্রু। উটটি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মুবারকের ওপর মাথা রাখল। সে কান্না করছে। অশ্রু ঝরছে দু'চোখ থেকে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে ডাকালেন। মালিক আসলো। তিনি বললেন– এ উট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে– তুমি তার ওপর তার ক্ষমতার অধিক বোঝা চাপিয়ে দাও। তোমার কি লজ্জা হয় না যে, এ উটটি তোমার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। এর মাধ্যমেই তোমার উপার্জন। অথচ তার প্রতি তুমি নির্দয় আচরণ করছ! ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলো। মালিক তাওবা করল– হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন থেকে তার ওপর আর কোন জুলুম-অত্যাচার করব না। তার হক আদায় করব। তার ঘাস, বিচালী ঠিকমত দেব। তার শক্তি ও সামর্থানুযায়ী বোঝা বহন করাব। জীবজন্তু এসে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ পেশ করত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। আর তিনি এসবের ফয়সালা করে দিতেন। এটা ছিল তাঁর মুজিযা, অন্য কিছু নয়। এভাবে পাথর, কংকরও তাঁর নবুওয়তের সাক্ষ্য দিয়েছে।

হাদীসে আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর হাতে উঠালেন। কংকর তখন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলা শুরু করে। আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মজলিসে উপস্থিত সকলে শুনতে পেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকরগুলো সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর হাতে দিলেন। তখনও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি হযরত উমর ফারুক (রা)-এর হাতে দিলেন। তখনও তাসবীহ জারি। এবার হযরত উসমান (রা)-এর হাতে দিলেন, তারপর তাসবীহ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। সার কথা, এসব হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা ছিল। কংকর থেকেও সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ-এর আওয়াজ আসত।

চাঁদের দু'টুকরা হয়ে যাওয়া, কংকরের তাসবীহ পাঠ, পাথরের সাক্ষ্য দান, গাছের দৌড়ে আসা, আঙুল থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া– সবই মহা-মুজিযা ছিল– যা প্রকাশিত হয়েছে। আমি বলি, এসব মুজিযা একদিকে আর অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজিয়াস্বরূপ ছিলেন। সেটা কেমন করে? এভাবে যে, পাথরকে

নরম করে দেয়া সহজ, লোহাকে মোম বানিয়ে দেয়া সহজ। আর এসব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে। আর অন্য মুজিযা সবই তাঁর মুবারক মজলিসে হাজির হয়েছে। কাফের, মুশরেক, ভ্রান্ত-আকীদা, বদ-আমলকারী সবাই আসছে। সকল প্রকার মন্দ-খারাবী তাদের মধ্যে রয়েছে। অথচ যখন তাঁর মুবারক হাতে বায়াত হয়ে ফিরে যায়, তখন এমন অবস্থা নিয়ে ফিরে যায় যেন সে একজন আলেম, আরেফ, কামেল, জাহেদ, আবেদ, মুত্তাকী– সবই হয়ে গেছে। তার অন্তরে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। পাথরে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করা সহজ। কিন্তু মানবাত্মায় বিপ্লব ঘটানো অনেক কঠিন কাজ। সুতরাং প্রত্যেক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মুজিযা। কীভাবে এ মুজিযা প্রকাশিত হলো? সোহবতের বরকতেই তা হয়েছিল। তাঁর মুবারক সোহবত ও সাহচর্যে কয়েক মিনিটেই এমন প্রভাব সৃষ্টি হতো যা অন্যত্র বহু বছরেও সম্ভব হতো না। বায়াত করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কামেল হয়ে যেতেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এ অবস্থায় আগমন করলেন যে, তিনি কুফর ও শিরকে লিপ্ত। অথচ মুবারক হাতে বায়াত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন। সেটা এমন সময় ছিল যখন মুসলমানগণ গোপনে নামায আদায় করতেন। সব মিলিয়ে কেবল তের-জন মুসলমান হয়েছিলেন। দারে আরকামে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তাঁরা নামায পড়তেন। ফারুকে আযম সেখানে পৌঁছলেন, ঐ স্থানেই বায়াত করলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর আরয করলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি সত্যের ওপর নই? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– কেন হব না? আরয করলেন– তাহলে গোপনে নামায আদায় করার দরকার কি? আমাদেরকে আল্লাহর ওপর ভরসা করা কর্তব্য।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– চল! তিনি সামনে এবং হযরত উমর (রা.) পেছনে চললেন। এভাবে তাঁরা মসজিদে হারামে পৌঁছে গেলেন। মুশরেকদের মজলিস ছিল সেখানে। এ অবস্থায় হযরত উমর (রা.) ঘোষণা করলেন– যে জানে সে তো জানেই, যে জানে না সে এখন জেনে নিক– আমি উমর! আমি কালেমা পড়ে এসেছি–

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله -

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকল মুশরেক ক্ষুব্ধ হয়ে মারপিট করার জন্য উদ্যত হলো। হযরত উমর (রা.)ও তৈরি হলেন। মারামারি হলো, যুদ্ধ-লড়াই হলো!

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর ওপর এতটা ভরসা সৃষ্টি হলো কেমন করে? কাফের অবস্থায় যেমন সবার আগে এবং অগ্রগামী ছিলেন, ঈমান আনার পরও ঈমানদারদের মধ্যেও শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেলেন। এ-ই ছিল সোহবতে নববীর ফয়েয ও সাহচর্যের প্রভাব। সোহবতের বরকতেই তাঁরা সাহাবী হয়েছেন। আর সাহাবীগণ সম্পর্কে 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতে'র আকীদা হলো– উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে উত্তম, পবিত্র অন্য কেউ নেই। কেউ ওলী হয়ে যাক, গাওস-কুতুব হয়ে যাক, তবে সাহাবায়ে কেরামের পায়ের ধুলোরও সমান হবে না– হতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের যে শান ও মর্যাদা তা অন্য কারো হতে পারে না। এই মর্যাদা এ কারণে যে, তারা সরাসরি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। অন্যদের সে সৌভাগ্য হয়নি। তাই এ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। অতএব স্বভাব-চরিত্র গঠনের জন্য সর্বোত্তম ও মৌলিক বিষয়ই হলো সোহবত ও সাহচর্য। আমরা যদি নিজেদের ইলম-আখলাক, জ্ঞান ও চরিত্রকে সংশোধন করতে চাই, তাহলে যাঁরা নেক ও সালেহ আছেন তাঁদের সাহচর্য লাভ করা উচিত। তাঁরা যদি কোন কথাবার্তা নাও বলেন, তবুও তাঁদের কাছে বসে থাকলেও শুভপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে আমাদের হৃদয়ে।

জ্ঞান বুদ্ধিহীন বস্তুসমূহের সাহচর্য

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সাহচর্যের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন– নেক সোহবতের উদাহরণ হলো আতরের দোকানের মতো। আতর বিক্রেতার দোকানে বসলে, আপনি যদি আতর নাও ক্রয় করেন, তবুও আপনার মস্তিষ্কে সুগন্ধি প্রবেশ করবে, আপনার মন-মস্তিষ্ক মোহিত হবে। পোশাক-পরিচ্ছদে ঘ্রাণ লাগবে। যখন ঘরে ফিরবেন তখন অন্যরা বলবেন– এ সুঘ্রাণ আসছে কোথা থেকে? এতটা যদি না-ও হয় তবু আপনার নাকে, আপনার শরীরে সুগন্ধি পৌঁছে যাবে। আর যদি ক্রয় করে নিয়ে আসেন, শরীরে লাগিয়ে নেন, তাহলে তো সুবহানাল্লাহ! আতরের দোকানে যাওয়ার কারণে অন্তত মন-মস্তিষ্ক মোহিত ও সুগন্ধিময় হবে।

আর খারাপ ও অসৎ সাহচর্যের উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে– যেমন কামারের দোকান। কোন সময় লোহা গরম হয়ে ছিটকে পড়ে। এতে যদি কিছু নাও হয়, অন্তত কাপড়ে কালো দাগ লেগেই যাবে। লোহা পোড়ার দুর্গন্ধ নাকে লাগবেই। কোন না কোন খারাপ দুর্গন্ধ মন-মস্তিষ্কে নিয়ে আসবেন। কোন কালো দাগ

কিংবা ছাই কাপড়ে লেগেই যাবে।

অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে– অসৎ বা মন্দ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করলে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি মন্দ নাও হয়, অন্তত মন্দ ও খারাপ-এর খারাপীর প্রতি মন্দ অনুভূতি মন থেকে দূর হয়ে যাবে। পরবর্তীতে মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে পড়বে। আর কেউ যদি নেককারদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, তাহলে নেককার না হলেও দীন ও নেক আমলের প্রতি মহব্বত এবং ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদি তা-ও না হয়, অন্তত কোন সৎ বাক্য শোনার ফলে অন্তরের অসততা, খারাবী দূর হয়ে যাবে। যেমন- আরেফ রূমী বলেন–

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

আল্লাহ্‌র কোন ওলী, মকবুল বান্দা ও আপনজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসা, অতিবাহিত করা শত বছরের ইবাদত হতেও উত্তম।

এ কারণে যে, কিছুক্ষণ বসার ফলে অন্তরের বাঁধন এমনিভাবে আলগা হয়ে যায়। অন্তরে যেসব আবিলতা থাকে, তা বেরিয়ে যায়। কোন অবস্থায়ই তা ফায়দা ও উপকরণ হতে খালি নয়। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ করেছেন– প্রসিদ্ধ প্রবাদ– খরবুজা (এক প্রকার ফল) দেখে খরবুজ রঙ গ্রহণ করে। প্রত্যেক বস্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আপনি প্রতিদিন দু'চার ঘণ্টা নদীর তীরে প্রাতঃভ্রমণ করুন, আপনার মেজাজে আর্দ্রতা এসে যাবে। যেহেতু পানির নৈকট্য লাভ করেছেন। মাসখানেক আগুনের কাছে থাকুন। মেজাজে শুষ্কতা এসে যাবে, গরম সৃষ্টি হবে। আপনি মাটির ওপর বসে থাকুন, মেজাজ হয়ে যাবে রুক্ষ ও শুষ্ক। এ হলো মাটির প্রভাব, মাটির বিশেষত্ব।

এমন জিনিস যা প্রাণহীন, অনুভূতিহীন– এগুলোও যখন ক্রিয়াশীল তাহলে কোন প্রাণীর কাছে বসলে ক্রিয়া কেন হবে না? যার প্রাণ আছে, সে যদি জ্ঞানবান ও ঈমানদার হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ঈমানদারের কাছে যদি বসেন তাহলে কেন প্রতিক্রিয়া হবে না? তেমনিভাবে যদি কোন কাফেরের নিকট বসেন, কিংবা কোন ফাসেক-ফাজেরের কাছে বসেন, তাহলে আপনার অন্তরেও

ঐসব আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে যা তাদের অন্তরে রয়েছে। স্বভাব-চরিত্র গঠন এবং সংশোধন করার প্রকৃত ব্যবস্থা হচ্ছে সৎ ও নেক সাহচর্য, সালেহীনদের সোহবত হাসিল করা। এতে তাঁদের পূত-পবিত্র স্বভাব-চরিত্রের প্রতিক্রিয়া নিজেদের অন্তরে পয়দা হবে। অল্প দিনের মধ্যে আপনিও পার্থক্য অনুভব করতে পারবেন। আপনার স্বভাব-চরিত্র সংশোধিত হতে শুরু করবে, হৃদয়ের হাল পরিবর্তন হয়ে যাবে। আপনার আত্মা সে পথেই পরিচালিত হতে শুরু করবে যে পথে ঐ নেককার সালেহ ব্যক্তিগণ চলছেন। তাই ইলম, মারেফত ও আখলাক হাসিল করার সর্বোত্তম উপায় হলো আহলুল্লাহ ও আহলে-দিল বুযুর্গদের সোহবত-সাহচর্য লাভ করা। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আদেশ করা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ ও সাহচর্য গ্রহণ কর। [তাওবা : ১১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর ভয় তোমাদের অন্তরে ততক্ষণ স্থায়ীভাবে থাকবে না, যতক্ষণ আল্লাহভীরুদের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ না কর। তাঁদের নিকট বস, যাতায়াত কর; তাহলে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া প্রভাব বিস্তার করবে অন্তরের অন্তঃস্থলে।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে প্রকৃত দীন অর্জিত হয়

আসল কথা হচ্ছে– দীন কেবলমাত্র কিতাবের পৃষ্ঠা দিয়ে সৃষ্টি হয় না, আহলুল্লাহদের আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ দ্বারা পয়দা হয়। কেউ যদি লক্ষ কিতাব পড়ে নেয় আর সোহবত লাভ না হয়, তাহলে দীন অন্তরে ক্রিয়া করবে না, অন্তরকে প্রভাবিত করবে না, অন্তরে দীনের রঙ পয়দা হবে না। আহলে-দিলের কাছে বসলেই কেবল দিলে ক্রিয়া হবে, আছর হবে। প্রখ্যাত কবি আকবর এলাহাবাদী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– তিনি তাদের প্রতি কটাক্ষও করেছেন, আবার বুঝাতেও চেষ্টা করেছেন–

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

আল্লাহওয়ালাদের নজর পড়লেই দীন আসতে শুরু করে, কিতাবের মাধ্যমে আসে না, কলেজের দরজা দিয়ে আসে না, আহলে-দিলের দিল হতে আসে।

از دل خیزد بر دل ریزد

অন্তর থেকে কথা বের হয়, অন্তরকেই আন্দোলিত করে।

তাই দীন ও দীনি আখলাক অর্জন করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সোহবত ও সাহচর্যের ফয়েয লাভ করা। উলামায়ে রাব্বানী বা খাঁটি ওলী-দরবেশদের সাহচর্য লাভ করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত কোন নেক ব্যক্তির সোহবত লাভ করাও ভাল। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নেককার আল্লাহভীরু রয়েছেন। ব্যবসায়ীদের মাঝেও আছেন। প্রত্যেক সমাজে আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা আছেন, আপনি বাছাই করে নিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দা– তার মকবুলিয়াত প্রমাণ হবে আমলের কষ্টিপাথরে। এমনকি অনেক সময় আকার-আকৃতি দেখেও বুঝা যায়, লোকটি মকবুল বান্দা। তাঁর কপালে এ কথা লেখা থাকে না– তবে দিল ও অন্তর তা বুঝে নেয় যে, এই লোক কোন আল্লাহওয়ালা হবেন। তাঁর চেহারায় ঈমানের আভা, নম্রতা, সরলতা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভরসার ছাপ স্পষ্ট থাকে। তাঁর চেহারায় ধূর্তামি, প্রতারণা প্রকাশ পায় না; বরং সততা, সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়। বলা হয়েছে–

المؤ من غر كريم والمنافق خب لئيم

মুমিনের অবস্থা হলো এমন– সে সাদাসিধে, সত্য-সরল হয়।

সরলতা মানে বোকা নয়। সরলতা অন্য জিনিস। সরলতার মানে হলো– তার মাঝে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোকাবাজি নেই; কথাবার্তা সহজ-সরল। আর বোকামি অন্য জিনিস। মুমিন বোকা বা বেওকুফ হন না। যে স্তরের ঈমান হবে, সে স্তরের বুদ্ধি-বিবেচনা হবে। দুর্বল ঈমান হলে বুদ্ধি-বিবেচনাও দুর্বল হয়। ঈমান সবল ও শক্তিশালী হলে বিবেক-বুদ্ধিও তেমনি শক্তিশালী হবে। মুমিনের মধ্যে সরলতা থাকে, ধোকা-প্রতারণা থাকে না। অন্তরে যা মুখেও তা-ই। আবার মুখে যা অন্তরেও তাই। এ ধরনের মানুষের চেহারাই বলে দিবে, মানুষটি সৎ সত্যবাদী।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন হিন্দুস্থানে আগমন করেন, তখন সর্বপ্রথম সিন্ধু প্রদেশে এসেছিলেন। সিন্ধু হয়ে পাঞ্জাব

এবং পাঞ্জাব হয়ে হিন্দুস্থান পৌঁছেন। সাহাবীগণ যখন সিন্ধুর বাজারের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হাজার হাজার মানুষ তাঁদের নূরানী চেহারা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর বলেছিল– মিথ্যাবাদীর চেহারা এমন হতে পারে না। এসব চেহারা থেকে সততা ও সত্যবাদিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁদের চেহারাই প্রমাণ করে, নিশ্চয়ই ইসলাম সত্য ধর্ম। তাঁদের চেহারা থেকে ইসলাম প্রকাশিত হচ্ছিল।

আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) অনেক বড় আলেম, আরেফ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর চেহারায় নূর ও জ্যোতি চমকাত। মুজাফফরনগরে আর্যদের সঙ্গে মুসলমানদের মুনাযার (তর্কযুদ্ধ) হলো। একদিকে হিন্দু আর্যরা, অন্যদিকে মুসলমান। হযরত শাহ সাহেব মঞ্চের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে মুনাযারা করেননি, করেছেন অন্যান্য আলেম-উলামা। তিনি সভাপতি হিসেবে ছিলেন। তাঁকে দেখে আর্য মুনাযারাকারী একজন বলল– যদি কারো জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে ইসলাম গ্রহণ করা হতো তাহলে আমি ঐ লোকটি (শাহ সাহেব)কে দেখে ইসলাম গ্রহণ করতাম। তাঁর চেহারা থেকে যেন নূর ও জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর চেহারা থেকে ঈমান ঠিকরে পড়ছে। বুঝা যায়, এ মানুষটির অন্তর ঈমান, ইলম ও কামাল (মহৎ গুণাবলী) দ্বারা পরিপূর্ণ।

জনৈক কবি বলেন–

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

সত্যবাদী-সৎপন্থী, সততা ও সত্যবাদিতা চেহারায় ফুটে ওঠে।

চোগলখোরের অন্তরে যা থাকে তা তার চেহারাই বলে দেয়। তার চেহারাই প্রকাশ করে দেয় যে, তার অন্তরে খারাপ জিনিস রয়েছে। আবার চেহারা বলে দেয়, এ লোক সত্যবাদী। প্রকাশ্য ও গোপন– সব বিষয়ই চেহারাতে প্রকাশ পেয়ে যায়। যদি কারো অন্তরে ভয়ভীতি থাকে, তাহলে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, হাবভাবে পেরেশানীর চিহ্ন ফুটে ওঠবে। দেখামাত্র আপনি বলবেন– ভাই! তুমি ভয় পাচ্ছ? অথচ ভয়ভীতি চেহারায় নয়; অন্তরে থাকে। তবু অন্তরের কার্যকলাপ চেহারায় প্রকাশ পায়। চেহারা হলো অন্তরের আয়না। মনের গোপন

বিষয়গুলো চেহারায় ধরা পড়ে। আপনার অন্তরে যদি আনন্দ-ফুর্তি থাকে, কোন ব্যাপারে যদি আনন্দিত হোন, আপনার চেহারা তখন ঝলমল করতে থাকবে। মানুষ আপনাকে দেখে বলবে– ভাই! আপনাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি? অথচ আনন্দ তো আছে অন্তরে। তবু চেহারা বলে দিচ্ছে, অন্তরে আনন্দ আছে। অন্তরে যদি দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা থাকে তাহলে চেহারায় উদাসীন ও পেরেশানীর ভাব দেখা দেবে। মানুষ বলবে– ভাই! ব্যাপার কি, আপনাকে পেরেশান দেখাচ্ছে? অথচ পেরেশানী থাকে অন্তরে, চেহারায় নয়। অতএব, চেহারা হলো আয়না। অন্তরে যা থাকে, চেহারায় তা দৃশ্যমান হয়। অন্তরে যখন ঈমানের জ্যোতি ঝলমল করতে থাকে, তখন এর আলোর দীপ্তি চেহারায় প্রকাশ পায়। আর অন্তরে যদি কুফর থাকে, তাহলে চেহারায় ফাসাদী ভাব ও হৃদয়ের কঠোরতা প্রকাশিত হয়। মোট কথা, ঈমানের নূর ও দীপ্তি চেহারায় প্রকাশ পায়।

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

দীপ্তি চেহারায় প্রকাশ পায় যা মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনে নিতে পারে। সার কথা–

الظاهر عنوان الباطن -

যাহের হলো বাতেনের শিরোনাম।

অন্তরে যা গোপন থাকে, যাহের তা প্রকাশ করে দেয়। হযরত সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় ঈমানের নূর ও জ্যোতি চমকাতো। হাজার হাজার মানুষ তাঁদের চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে যেতেন আর বলতেন– এসব চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত সালমান ফরাসী (রা.) খবর পান যে, আরবে এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি যেহেতু পূর্বের কিতাবাদিতে তাঁর কথা পড়েছিলেন এবং দুনিয়াবাসীও সে নবীর আগমন অপেক্ষায় ছিল আর ভাবছিল– এ যুগে তাঁর আবির্ভাব হবে। নবী আগমনের লক্ষণসমূহও প্রকাশ পাচ্ছিল। ফলে খবর শোনামাত্র তিনি রওনা হয়ে পড়লেন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদের মাঝে

উপবিষ্ট। সালমান তখনও নিকটে পৌছতে পারেননি। দূর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন–

والله ليس هذا الوجه وجه كذاب-

আল্লাহর কসম! এমন চেহারা কোন মিথ্যুকের হতে পারে না।

চেহারা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ ব্যক্তির ওপর সততা বর্ষিত হচ্ছে। এ ব্যক্তির চেহারার নূরই বলে দিচ্ছে, তাঁর অন্তর নূরে-নবুওয়ত (নবুওয়তের জ্যোতি) দ্বারা পরিপূর্ণ।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো– সোহবত ও সাহচর্য দ্বারা ঐ নূর অন্যদের অন্তরে ঢুকে। তাই দীনি কামাল ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহওয়ালা উলামা ও আকাবিরের সোহবত ও সাহচর্য। কেবল কিতাব পড়ে তা অর্জন হয় না; বরং অন্তর থেকে হাসিল হয়। হয়তো আপনি কিতাবের বিষয়বস্তু নিজে নিজে পাঠ করে বুঝতে পারবেন। তবে কোন অভিজ্ঞ উস্তাদ যদি কিতাবের বিষয়বস্তু ও অর্থ সঠিকভাবে আপনাকে বুঝিয়ে না দেন তাহলে সে অর্থ আপনার নিজ মর্জি মতো হবে, প্রকৃত অর্থ হবে না। কিতাব লেখকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থ হবে না; আল্লাহর দেয়া অর্থ হবে না। তখনই লেখকের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে আসবে, যখন লেখক স্বয়ং ব্যাখ্যা করে দেন কিংবা কাউকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বলে দিয়ে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের অর্থ তাঁর রাসূলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর রাসূল তাঁর সোহবতের মাধ্যমে সাহাবীগণকে বুঝিয়েছেন। সাহাবীগণ সোহবত দ্বারা তাঁদের শাগরেদদের বুঝিয়েছেন। শুধু কিতাবে কাজ হবে না যতক্ষণ না যথার্থ শিক্ষকের সাহচর্য লাভ হবে। অতএব উত্তম পথ ও পন্থা হচ্ছে, সোহবত– যার মাধ্যমে দীন ও দীনি আখলাক সৃষ্টি হবে।

ইলম ও আখলাক লাভের দ্বিতীয় পথ : আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

সোহবতের ফয়যই সবচে' উত্তম বিষয়। তবে আপনি যদি এমনটা বলেন– হযরত! আমরা এমন এক জনপদের বাসিন্দা, যেখানে তেমন কোন নেক মানুষ নেই, যার সোহবত আমরা লাভ করব, সেখানে যাতায়াত করব। আমাদের

এলাকায় না আছেন কোন আলেম, না আছেন কোন ওলী-দরবেশ। আমরা তো সকলে মোটামুটি ভাল মানুষ। আমরা কার কাছে যাতায়াত করব? আমরাও তো ভাল। অন্য এমন কেউ নেই যার কাছে বসা যায়। তবে কি আমাদের নিরাশ হতে হবে? আমাদের আখলাক, আমাদের স্বভাব-চরিত্র কি সংশোধিত হবে না? যেহেতু আপনি বলেছেন– ইলম ও আখলাকের পূর্ণতার জন্য সোহবতই হচ্ছে প্রকৃত ও উত্তম জিনিস। অথচ আমাদের কাছে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই, যাঁর সোহবতের ফয়েয আমরা গ্রহণ করে দীন ও আখলাক অর্জন করব। তাহলে আমাদের ইসলাহ ও সংশোধনের কোন উপায় ও পথই যে রইল না। তাহলে কি আমরা নিরাশ হয়ে যাব? তাই আমি বলছি, আমাদের জন্য আরও এক পথ রয়েছে। যদি নেক সোহবত ও সাহচর্য পাওয়া না যায়, তাহলে অন্য আরেকটি উপায় রয়েছে– যার মাধ্যমে আপনি আপনার দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে নিতে পারেন, সঠিক আখলাক ও চরিত্র গঠন করতে পারেন, সত্য ও সঠিক পথের পথিক হতে পারেন। পথটা হচ্ছে– আপনি কারো সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। তবে বন্ধুত্ব হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। উভয়ে অঙ্গীকার করে নেবেন, আমরা পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করছি এ কারণে যে, একে অন্যের দীনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করব। উভয়ে উভয়ের প্রতি কড়া নজর রাখব। কেউ যদি নামাযে অমনোযোগী হই, অলসতা করি, কান ধরে মসজিদে নিয়ে যেতে হবে। যদি কেউ অসৎ পথে পরিচালিত হয়ে যাই তাহলে জোর করে তাকে বিরত রাখব। আমরা পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করছি এ কারণেই। এ জাতীয় বন্ধুত্বের দ্বারা উভয়েরই দীনের হেফাযত হয়ে যাবে।

আপনারা ভেবে দেখুন, কারও সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং একে অন্যকে মন্দকাজ হতে বিরত রাখতে শুরু করেন, তাহলে এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সাধারণ নিয়ম হলো– মানুষ নিজের দোষ দেখতে পায় না। অন্যের সাথে থেকে বুঝতে পারে, কোন কাজ মন্দ আর কোনটা ভাল। প্রসিদ্ধ প্রবাদে আছে– 'অন্যের চোখের খড়কণাও শহতীর মতো দেখায় আর নিজের চোখের শহতীরও খড়কণা মনে হয়।' নিজের দোষ মানুষ অনুভব করতে পারে না। অথচ অন্য লোক তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে একাজ মন্দ-দূষণীয়। নিজের প্রতি মানুষের খুবই সুধারণা থাকে। সে মনে করে, আমি খুব ভাল মানুষ। আমার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। এ ধারণা নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা করে, তখন প্রত্যেকটি কাজ তার ভালই মনে হয়। একথা বুঝতেই পারে না যে, সে কোন মন্দ ও গর্হিত কাজ করেছে। তবে অন্য লোকের এমন সুধারণা থাকে না। তাই সে লক্ষ্য রাখে এবং বুঝতেও পারে, একাজ মন্দ এবং বন্ধুত্বের খাতিরে সে তৎক্ষণাৎ সতর্কও

করবে। বন্ধু হিসেবে বলবে, এ কাজটি দূষণীয়, এটা ত্যাগ করুন, বর্জন করুন। এ জাতীয় বন্ধুত্বকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআখাত' বলা হয়। অর্থাৎ দীন রক্ষার্থে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা। বন্ধু কোন ভাল কাজ কিংবা ভাল স্থানে গেলে বন্ধুকে নিয়ে যাবে। আর মন্দকাজে একে অন্যকে সতর্ক করবে, বিরত রাখবে। সার কথা হলো, একে অন্যের দীনের হেফাযত করবে। কেবল এ কারণেই তারা ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এটাকে বলে 'মুআকাত ফিল্লাহ'।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নীতির ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন। হিজরত করে যখন তিনি মদীনাতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন একজন মুহাজির ও একজন আনসারকে মিলিয়ে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়ে দিলেন। সবাইকে ভাই ভাই করে দিয়েছিলেন। একে অপরের দীনি ভাই। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) বাকী থাকলেন। এদিকে আনসারীদের সংখ্যা শেষ। সকল মুহাজিরের বন্ধুত্ব হলো। যখন হযরত আলী (রা.)-এর নাম আসল, তখন কোন আনসারী আর অবশিষ্ট নেই, যার সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা যাবে। হযরত আলী (রা.) চিন্তিত ও দুঃখিত হলেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

انا اخوك فى الله

আমি তোমার দীনি ভাই হয়ে গেলাম।

তুমি আমার সঙ্গে চুক্তি কর। হযরত আলী (রা.) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনি ভাই হয়ে গেলেন। একে বলা হয় 'মুআখাত ফিল্লাহ'– আল্লাহর জন্য সুভ্রাতৃত্ব। আপনারা যদি এভাবে কাজ করেন তাহলে চল্লিশ দিন পর অনুভব করতে পারবেন কত মন্দকাজ পরিত্যাগ করা হয়েছে। যেহেতু আপনার ঐ বন্ধু মন্দকাজ দেখে দেখে আপনাকে সাবধান করবে, সতর্ক করবে। ফলে আপনিও সতর্ক হবেন, অনেক দূষণীয় কাজ হতে বিরত থাকবেন। আপনার সংশোধন হবে, মন্দ স্বভাব দূর হবে। আপনারও উপকার হবে, আপনার বন্ধুরও উপকার হবে। বন্ধুত্বের মাধ্যমে আপনি ধন অর্জন করে নিলেন যা কোন শায়খের খেদমতে গিয়ে লাভ করতেন, কোন আলেমে রব্বানীর সোহবতে থেকে অর্জন করতেন অথবা কোন ওলী-দরবেশের সাহচর্যে হাসিল করতেন। এখন আর এই অসুবিধা নেই যে, এলাকায় কোন আলেম নেই, কোন ওলী-দরবেশ নেই। সত্যিকার কোন রাহনুমা নেই। সুতরাং স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে মুআখাত। এর মাধ্যমে নিজের

চরিত্র ও স্বভাব সংশোধন করে নাও। এ পদ্ধতিতে যদি চল্লিশ দিন আমল করা হয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর পার্থক্য বোঝা যাবে। আর এভাবে এক বছর পার হয়ে গেলে আপনি ওলী হয়ে যাবেন। তবে আসল পথ হচ্ছে সোহবত আর দ্বিতীয় হলো মুআখাত।

ইলম ও আখলাক লাভের তৃতীয় পথ : অন্যের উপদেশ গ্রহণ

এবার যদি আপনি বলেন– হযরত! আমি এমন এক জনপদে বাস করি, যেখানে এমন কোন নেক ও সৎ মানুষ নেই যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করব এবং তার থেকে দীনি ও ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্য নিব। এখানে কেবল মন্দ ও অসৎ লোকেরই বাস। যদিও একথা জ্ঞান ও যুক্তিবিরুদ্ধ যে, এমন জনপদ রয়েছে যেখানে কোন নেক ও সৎলোকের বাস নেই। অসম্ভব ব্যাপার! যেখানে মুসলমানদের বসতি আছে, শতাধিক জনসংখ্যা থাকে– উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– যে জায়গায় চল্লিশজন মুসলমান একত্রিত হয়ে যান, তাদের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন ব্যক্তি আল্লাহর মকবুল বান্দা থাকেন। সুতরাং জনপদ থাকবে আর সেখানে আল্লাহর মকবুল বান্দা থাকবেন না, তা হতে পারে না। তবু আমি কিছু সময়ের জন্য মেনে নিলাম, ঐ জনপদে কোন ভাল মানুষ নেই, সৎ ও নেক মানুষ নেই। তারা আপনার বন্ধু না হয়ে সবাই শত্রু, চরম শত্রু। আপনার ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট। এমন কোন নেককার মানুষ নেই, যার সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবেন।

আমি এ ধরনের লোকের জন্য তৃতীয় একটা পথ বর্ণনা করছি। এসব শত্রু থেকে আপনি উপকৃত হোন, লাভবান হোন। কেমন করে উপকৃত হবেন? এটাকে বলা হয় 'ইত্তিআজ বিল গাযর'– অর্থাৎ অন্যদের অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণ করা, সাবধান হয়ে যাওয়া এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন করে নেয়া। এই পথ হচ্ছে এমন– আপনি লক্ষ করুন, শত্রুরা আপনার সম্পর্কে কিরূপ মন্তব্য করে। একথা স্পষ্ট যে, শত্রুরা আপনার সৎগুণাবলী বলে বেড়াবে না। তারা বেছে বেছে আপনার দোষ-ত্রুটিগুলো প্রচার করবে যে, অমুকের মধ্যে এ দোষ রয়েছে, ঐ ত্রুটি রয়েছে। যদি আপনার গুণাবলী প্রচার করতে শুরু করে দেয় তাহলে সে কেমন শত্রু? সে শত্রু নয় বরং সে আপনার প্রকৃত বন্ধু হয়ে গেল। শত্রু ও দুশমনের কাজই হলো তালাশ করে মন্দ জিনিসগুলো প্রচার করবে। প্রচার করবে এবং সর্বদা চেষ্টা করবে আপনাকে সমাজে বদনামী ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, আপনাকে অপদস্থ-অপমানিত করার জন্য। এ শত্রুকে

আপনি আপনার পীর ও শায়খ বানিয়ে নিন। এভাবে যে, আপনি লক্ষ করে শুনবেন, আপনার সম্পর্কে আপনার শত্রুরা কি বলছে; কিরূপ মন্তব্য করছে। তারা আপনার সম্পর্কে যা বলে, আপনি সেসব কাজ বর্জন করতে থাকুন। যত মন্দ কথা আপনার সম্পর্কে তারা প্রচার করে, আপনি ভেবে-চিন্তে ঐ মন্দ ও গর্হিত কাজগুলো এক এক করে ত্যাগ করুন, বর্জন করুন। চল্লিশ দিন এভাবে আপনি আমল করে দেখুন। দেখবেন অনেক মন্দকাজ, মন্দ স্বভাব শেষ হয়ে গেছে। শত্রুদের থেকে আপনি এমনভাবে উপকৃত হলেন, কাজ হাসিল করলেন, যা থেকে উদ্ধার পেতে চান, উপকৃত হতে চান। দেখা গেল, শত্রু থেকেও কাজ হাসিল করতে পারেন, উপকৃত হতে পারেন।

প্রথম তো হলো, সোহবত ও সাহচর্যের ফয়েয লাভ করা। দ্বিতীয় 'মুয়াখাত ফিল্লাহ'– আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা। তৃতীয় হচ্ছে 'ইত্তিআজ বিল গায়র'– অন্যদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। শত্রু থেকেও আপনি কামেল পীর ও শায়খের ফায়দা নিলেন। যদি কেউ তার জীবন দুরস্ত করতে চায়, নিজেকে দীনদান বানাতে চায়, তাহলে পথ রুদ্ধ নয়; বরং খোলাই আছে।

ইলম ও আখলাক লাভের চতুর্থ পথ : মুহাসাবায়ে নফস

এবার যদি আপনি একথা বলেন যে, আমি এমন জায়গায় বসবাস করি যেখানে কোন আলেম, আরেফ বা শত্রু-মিত্র কেউ-ই নেই। একথা যদিও অযৌক্তিক; বন্ধু ও মিত্র না হলেও অন্তত শত্রু হবে অনেক। শত্রু তো সহজলভ্য। এক পয়সায় মণ বিক্রি হয়। আর বন্ধু? প্রকৃত বন্ধু কোটি টাকা ব্যয়েও একজন পাওয়া যায় না। শত্রু তো বিনা পয়সায়ও পাওয়া যায়। মানুষ অশিক্ষিত হলে তার মূর্খতার কারণে অন্যদের সঙ্গে শত্রুতাই পোষণ করবে। প্রকৃতপক্ষে ইলম ও আখলাক দ্বারাই দোস্তি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ইলম ও আখলাক যদি না থাকে তাহলে মানুষ পরস্পর হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। অন্যের জন্য মঙ্গল চিন্তা না করে অমঙ্গল ও অকল্যাণ কামনা করে। যদি আপনি বলেন, আমি একাকী নির্জনে বাস করি, আমার স্বভাব-চরিত্র সংশোধনের পথ কি? টাকা-পয়সা ব্যয় করে ভ্রমণ করার সামর্থ আমার নেই। কারণ, আমার নিকট টাকা-পয়সা নেই; আমি কপর্দক শূন্য। আমার কিছে কোন আলেম, কোন দরবেশ নেই। আমার সমাজ ও আশপাশে আমার কোন শত্রু-মিত্র নেই। সুতরাং আমার ইলম ও স্বভাব-চরিত্র গঠনের পথ কি? নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পথ ও পন্থা কি

কিছুই আমার থাকবে না?

এবার আমি চতুর্থ পথ ও উপায় বলছি শুনুন! আর এ উপায়ে আপনার আমল ও আখলাক গঠন করুন, দুরস্ত করুন এবং সংশোধন করুন। আমি যা বলছি তা কাল্পনিক নয়; তা বাস্তব পন্থাই বলছি। এ তরীকা ও পদ্ধতির নাম হচ্ছে মুহাসাবায়ে নফস। নিয়ম হলো– আপনি প্রতিদিন ইশার নামাযের পর এ কাজের জন্য দশ মিনিট সময় নির্ধারণ করে রাখুন। এ সময়ে এ কথা চিন্তা করুন, আজকের দিনে আপনি কয়টি নেক ও পুণ্যের কাজ করেছেন আর কতটি মন্দ ও গুনাহর কাজ করেছেন। সমগ্র জীবনের ভাল-মন্দ স্মরণ থাকবে না; তবে রোজানা আমল ও কাজকর্ম মনে থাকবে। আজকে কার উপকার করেছেন, কাকে দান করেছেন, কার নিন্দা করেছেন, কার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছেন, কার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, কার অর্থ-সম্পদ হরণ করেছেন, কার প্রাপ্য অসৎ উদ্দেশ্যে হজম করেছেন, পকেট মেরেছেন। মোট কথা, দিনের বেলা যেসব অপকর্ম করেছেন রাতের বেলা তা অবশ্যই স্মরণ থাকবে। এতটা স্মরণশক্তি ও মেধাহীন কেউ থাকে না যে, দিনের কথা ইশার সময় ভুলে যায়। সুতরাং হিসাব করে দেখে নিন যে, আমি দশটি নেকী ও দশটি গুনাহ করেছি। দশটি নেকীর জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর শুকর আদায় করবেন– হে আল্লাহ! নেকী ও পুণ্য অর্জনের আমি যোগ্য নই। এটা তোমার দান, তোমার করুণা। আমাকে তুমিই নেকী হাসিল করে দিয়েছ। তা না হলে আমার মধ্যে কোন যোগ্যতা ছিল না। আর যদি আমার ইচ্ছায়ই নেকী করে থাকি, তাহলে সে ইচ্ছাও তো তুমিই সৃষ্টি করেছ। ফলে নেকী আমি করেছি বটে, তবে যদি আমল করার উপায়-উপকরণ না হতো, তাহলে কেমন করে আমল করা হতো? এসব তো তুমিই দান করেছ। তাওফিক তুমিই দান করেছ, শরীরে শক্তি-সামর্থ তোমারই দান, তোমার দয়া ও মেহেরবানীর মাধ্যমেই নেকী অর্জন হয়। আমি শুকর আদায় করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন–

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

যে নেয়ামতের ওপর তোমরা শুকর আদায় করবে, সে নেয়ামত আমি বাড়িয়ে দেব, উন্নত করে দেব। [ইবরাহীম : ৭]

সুতরাং আপনি যখন নেকী করে শুকর আদায় করবেন, আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক নেকী বাড়তে শুরু করবে। মাল-সম্পদের প্রতি শুকর আদায় করলে

মাল-সম্পদ বেড়ে যাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি শুকর আদায় করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, শক্তি-সামর্থ্যের শুকর আদায় করলে শক্তি-সামর্থ্যের উন্নতি হবে। দীন ও ধর্মের ব্যাপারে শুকর আদায় করলে দীন উন্নত হবে, নেক আমলের ওপর শুকর আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে নেক আমলে উন্নতি হবে। আয়াতটি যেহেতু আম (ব্যাপক অর্থবোধক)। একথা বলা হয়নি যে, যদি ধন-সম্পদের শুকর আদায় করে তাহলে ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দেব। অন্য কিছুর সঙ্গে এ ধরনের ওয়াদা নেই, এমন শর্তারোপ করা হয়নি; বরং শর্তহীনভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং সকল বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি যখন নেকী ও পুণ্যের ব্যাপারে শুকর আদায় করবেন, তখন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা মোতাবেক নেকী ও পুণ্য অর্জন বেড়ে যাবে।

আর যদি দশটি মন্দকর্ম স্মরণ হয়, যেমন- গীবত করেছিলাম, কুৎসা রটনা করেছিলাম, এটা করেছিলাম, সেটা করেছিলাম, কারো সম্পদ হরণ করেছিলাম, ওজনে কম দিয়েছিলাম, পূর্ণ মূল্য নিয়ে গ্রাহককে মাল কম দিয়েছিলাম, খারাপ মাল দিয়েছিলাম– এসবের মধ্যে যা হকূকুল ইবাদ বা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, তা তাওবা দ্বারা মাফ হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে-হক (প্রাপক)-এর কাছ থেকে মাফ না করাবেন। আর যেগুলো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলো সঠিকভাবে তাওবা করা হলে আশা করা যায়, মাফ হয়ে যাবে। গুনাহর কথা যখন মনে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নিবেন। যদি দশটি গুনাহ হয়ে থাকে তাহলে দশবার তাওবা করার দরকার নেই। একবার তাওবা করে নিন, দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন–

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেন সে গুনাহই করেনি।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে। আপনি নেককাজের ব্যাপারে শুকর আদায় করলেন তো সেগুলো বাড়তে লাগল, গুনাহর ব্যাপারে তাওবা করলেন তো সেগুলো নিঃশেষ হয়ে গেল। চল্লিশ দিন ধরে যদি আপনি এ আমল রোজ করতে থাকেন, আর প্রতিদিন যদি দশটি করে গুনাহ মাফ হয় তাহলে চল্লিশ দিনের তাওবায় চারশ গুনাহ মাফ হয়ে গেল। অথচ আপনি চারশ' গুনাহ করবেন না। আর করে থাকলেও শায়খ এগুলো মিটাতে পারবেন না। আপনি নিজের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তা করে নিলেন। এভাবে আপনার চরিত্র গঠন ও সংশোধন করে নিলেন। এরপর তো কারও জন্য কোন বাধা-বিপত্তি থাকল

যে, এলাকায় কোন শায়খ নেই, কোন আলেম নেই, কোন বন্ধু নেই, কোন শত্রু-মিত্র নেই। আল্লাহ তায়ালা যদি জিজ্ঞেন করেন– তোমার আখলাক, তোমার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করোনি কেন? বলে দেব, 'আল্লাহ! চরিত্র সংশোধনের কোন উপায় ছিল না। আমি কেমন করে তা করব এবং আমার কাছে সফর করে কোন বুযুর্গের নিকট যাওয়ার মত টাকা-পয়সাও ছিল না। তাই আমি অসচ্চরিত্র রয়ে গেছি।'

আল্লাহ বলবেন– যদিও তুমি পাহাড়ে বসবাস করছিলে তবুও চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা ছিল। আর তা হলো মুহাসাবা। অর্থাৎ প্রতিদিন নিজের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ করে নেয়া। অথচ তা তুমি করোনি।

আপনি প্রতিদিন ইশার পর দশ মিনিট এভাবে করতে থাকেন। চল্লিশ দিন পর লক্ষ করুন, কি পরিমাণ চরিত্র গঠিত ও সংশোধিত হয়েছে, কত নেকী বৃদ্ধি পেয়েছে, কত গুনাহ ও বদী নিঃশেষ হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারবেন, একজন কামেল পীরের মাধ্যমে আপনি যে ফায়দা হাসিল করতেন, নিজের নফসকে পীর বানিয়েও তা-ই অর্জন করেছেন।

দৃঢ়-সংকল্প ছাড়া সংশোধন সম্ভব নয়

সুদীর্ঘ আলোচনার মূল কথা হলো– আপনি যদি চরিত্র সংশোধন করতে চান, তাহলে রাস্তা বন্ধ নয়। আর যদি চরিত্র সংশোধন করতে না চান– তাহলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও অনেক মানুষ ছিল যারা নিজেদের সংশোধন করেনি। করতে যখন চেয়েছে, উদ্যোগ নিয়েছে, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি ইচ্ছা না করে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশেও সংশোধিত হয় না। যারা সংশোধিত হওয়ার জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেছিল, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়েছেন, তাঁর কথার ওপর আমল করেছেন। ফলে কেউ হয়েছেন জিন্নুরাইন, কেউ আলী মুর্তজা। আর যারা সংশোধিত হতে চায়নি, তাদের কেউ আবু জাহল, কেউ আবু লাহাব আবার কেউ মুসায়লামা কাযযাব হয়েছে। সার কথা, তারা ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। যেহেতু তাদের অন্তরে সংশোধনের ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী পাওয়ার পরও তাদের সংশোধন হয়নি।

تونی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

যখন নিজের সংশোধন নিজেরই কাম্য নয়, তখন কথা তো নানাভাবে বলা যাবেই।

তবে আল্লাহর দরবারে কথার মারপ্যাঁচ কোন কাজে আসবে না। দুনিয়াবাসীকে আপনি ধোকা দিতে পারেন, প্রতারিত করতে পারেন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধনের পথ বান্দাদের স্পষ্টভাবে বাতলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং বান্দা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, চরিত্র গঠন ও সংশোধনের পথ খোলা রয়েছে। শত্রু-মিত্র থাকা অবস্থায়, সমাজচ্যুত– এমনকি নির্জনবাসেও।

এ কারণে আমি এসব কথা বলছি– প্রতিটি জিনিসের মূলে মন্দ ও খারাবী রয়েছে। আর তা গুণাগুণসহ পরিশ্রম ও মেহনত করে অর্জন করতে হয়। মানব-সন্তান জন্মগতভাবে মন্দের আকর অর্থাৎ মন্দে পূর্ণ থাকে। চেষ্টা ও পরিশ্রম করে যদি সংশোধন না করে, তাহলে তার মধ্যে কোন গুণই সৃষ্টি হবে না। জন্মগত মূর্খতা ও অজ্ঞতা ততক্ষণ দূর হবে না যে পর্যন্ত কোন চরিত্রবানের সাহচর্য গ্রহণ না করবে কিংবা নিজের রোজানা হিসাব-নিকাশ না মিলাবে।

ادمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا

মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ হতে পারল না।

মানুষ নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আকাঙ্ক্ষী না হবে, কেউ তার সংশোধন করতে পারবে না। নিজের আগ্রহে যখন মানুষ সংশোধনের জন্য অগ্রসর হয়-তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বছেন–

انما انت منذر من یخشا ها

হে নবী! আপনি ঐ ব্যক্তির অন্তরে কেয়ামতের ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিতে পারবেন, যার অন্তরে ভয়ভীতির জ্ঞান রয়েছে– ভয়-ভীতির যোগ্যতা রয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি সংকল্প করে নিয়েছে যে, যাই ঘটুক তাতে ভীত বা আতঙ্কিত হলে চলবে না– তাকে কেউ আতঙ্কগ্রস্ত করতে পারবে না। যখন সে কবরে প্রবেশ করবে, তখনই তার ভয়-ভীতি সম্প্রসারিত হবে। দুনিয়াতে থাকাকালীন কেউ তাকে ভয়ার্ত করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিজে থেকে ইচ্ছা না করবে, সে পর্যন্ত সবচে' বড় আলেমও চেষ্টা করে তাকে সংশোধন করতে পারবে

না। তার অন্তরে ইলম প্রবেশ করবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী ও দরবেশও চেষ্টা করে তার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করতে পারবেন না– যদি তার আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ না থাকে। কিন্তু যদি নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে তাহলে কোন সাহায্যকারী না থাকলেও সে নিজে নিজেই সংশোধনের উপায় পেয়ে যাবে। আসল কথা হলো, আপনার ভেতর সংকল্প, সাহস, ধৈর্য ও উদ্যোগ থাকতে হবে। মাওলানা রূমী বলেন–

اب کم جو تشنگی اور بدست

অধিক পানির তালাশ না করে বরং নিজের মধ্যে তৃষ্ণা সৃষ্টি হতে দাও।

তৃষ্ণার্ত হলে পানির ব্যবস্থা হয়েই যাবে। তৃষ্ণার্ত না হলে পানির প্রয়োজন হয় না। ফলে পানি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, উদ্যোগ কিছুরই দরকার হয় না। তৃষ্ণা ছাড়া পানির তালাশ করবে– এ হয় না। পিপাসা মেটাতে উৎসাহ-উদ্যোগসহ যখন পানির খোঁজ করবে তখনই পানি পেয়ে যাবে।

কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলেন– অমুক অলংকারটা তৈরি করে দিন না! স্বামীর মনে যদি স্ত্রীর কথায় আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে প্রয়োজনে চুরি-ডাকাতি করে হলেও স্ত্রীর মন খুশি করার জন্য অলংকার তৈরি করে দিবে। কেননা অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি অন্তরে আবেগ-উদ্দীপনা পয়দা না হয় তাহলে কিছুই হবে না। আপনি যা-ই করুন না কেন, কাজ হয় আবেগ-উদ্দীপনা দ্বারা। অর্থহীন কথায় কাজ হয় না। দীন ও ঈমানের অবস্থাও তেমনি। যতই আপনি ওয়াজ-নসীহত করুন না কেন, যে পর্যন্ত শ্রোতা দৃঢ়-সংকল্প না হবে যে, আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে, সে পর্যন্ত কিছুই হবে না। আপনারা যদি ওয়াজের মাহফিলে এ উদ্দেশ্যে এসে থাকেন যে, দেখি কোন ওয়ায়েজ বা বক্তা কেমন ওয়াজ করেন– তাহলে তো আপনারা হলেন কেবল দর্শক। যেমন সাপ-বানরের নাচের প্রদর্শনী ছিল, আর আপনারা তা দেখে গেলেন। তারপর ওয়াজ সম্পর্কে আপন আপন মত ব্যক্ত করবেন। অমুক ভাল বলেছে, অমুক ভাল বলতে পারেনি, অমুক ভুল বলেছে ইত্যাদি– তাহলে কোনই উপকার হবে না। তবে আপনারা যদি এই উদ্দেশ্যে এসে থাকেন যে, দীনি কথাবার্তা শিখে নিয়ে নিজেদের জীবন পরিবর্তনে সচেষ্ট হবেন– তবে কোন অশিক্ষিত মূর্খ মানুষও যদি সত্য-সঠিক কথা বলে দেয়, তাহলে এর দ্বারাও আপনারা উপকৃত হবেন, সাবধান হয়ে যাবেন। নিজেই নিজের আত্মার

সংশোধন করে নিতে উদ্যোগী হবেন। অবশেষে ফলাফল নিজেদের ওপরই রয়ে গেল। নিজের অন্তরে সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি করেন, দৌলত আপনার হস্তগত হতে শুরু করবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলে আপনিও একাধিক পথ ও পন্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হবেন। যেমন দোকান করবেন, ক্ষেত-খামার করবেন, চাষাবাদ করবেন, শিল্প ও কারিগরি করবেন– ফলে হয়ত বা সম্পদশালী হয়ে ওঠবেন। আর অন্তরে যদি আগ্রহ না থাকে, অলস উদাসীন পড়ে থাকা আপনার অভ্যাস ও পছন্দ হয়, তাহলে খাটের ওপর শুয়ে থাকুন– কিছু হাসিল হওয়া লাগবে না।

এর উদাহরণ হচ্ছে– একজন কৃষক। বর্ষা মওসুমে, বর্ষা ঋতুর আগমন হচ্ছে, বৃষ্টিপাতও হচ্ছে– এ সময় বীজ বপন করা হলে ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ কৃষক বলতে শুরু করল– আহা! কেমন মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বরষার এ আরামদায়ক বাতাসে আমি আরামে ঘুমিয়ে নিই, একটু উপভোগ করে নিই। এ সময় ক্ষেত-খামারে সে খাটলো না, বীজ বপন করলো না, বর্ষার আরামদায়ক মওসুমে খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে পার করে দিলো। অবশেষে মওসুম শেষ হয়ে গেল। শুষ্ক হেমন্তের হাওয়া বইতে লাগল। মানুষ মাঠভরা পাকা ফসল কেটে কেটে গোলা ভর্তি করল। আর তার গোলা শূন্য। এখন সে অন্যদের অবস্থা উপলব্ধি করে বেদনাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল। আর বিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল– হায়! যদি আমিও বীজ বপন করতাম, তাহলে তো আমার ঘরেও ফসল উঠত। অথচ সে আরামের নিদ্রায় কাজের সময় কাটিয়েছে। সুতরাং এ অসময়ে তার আফসোস করা ছাড়া কিছুই থাকবে না। এখন যদি সে বীজ বপনও করে তাহলে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে। এ সময় বীজ বপনে কোন সার্থকতা নেই। ঐ অলস সময় কাটানোর দুঃখবোধ, হা-হুতাশ ও আক্ষেপ করা ছাড়া তাতে কোন কাজ হবে না, ফলোদয় হবে না। কারণ, বীজ বপনের উপযুক্ত সময় পার হয়ে গেছে। তেমনি একজন দীন-প্রত্যাশীর অন্তরে যদি সত্যিকারের চেষ্টা ও আগ্রহ না থাকে এবং পার্থিব জীবনকে খেলাধুলা ও হেলায় পার করে দেয় আর একথা মনে করে, এখন তো আমার কাছে পালঙ্ক রয়েছে, উন্নতমানের বিছানা রয়েছে, পানাহারের জন্য রকমারী দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে– অতএব নামায পড়তে যায় কে? রোযা কে রাখে? কেমন করে রাখবো? দীনের আগ্রহ ও খবর কে করবে? এমন মজা কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন মরণকাল এসে যাবে, বলা হবে–

اخرجوا انفسكم اليوم تجزون

তুমি তোমার জীবন সমর্পণ করে দাও। এ জীবন তোমার মালিকানাধীন বস্তু নয়। আজকে তোমাকে আযাব আস্বাদন করতে হবে। এখন লজ্জা, হায় হুতাশা প্রকাশে কোনো লাভ হবে না। সুতরাং এ সময় লজ্জিত হওয়ায়, হা-হুতাশ প্রকাশে না কোনো লাভ হবে, আর না তখন আমলের সময় হবে।

দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণু উপদেশদানকারী

হাদীস শরীফে এসেছে– কিছু কিছু লোক মরণকালে মালাকুল মওতকে বলবে, আমাকে কিছু সময় দাও, আমি তওবা করে আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে যাই। মালাকুল মওত বলবেন– তোমার কাছে কি আমার দূত পৌঁছেনি? সে কী তোমাকে মৃত্যুর পয়গাম দেয়নি– যে কারণে তুমি আজকে তওবার জন্য আমার কাছে সময় চাচ্ছ? তোমার মাথায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকাশ পায়নি? এ বার্ধক্য ছিল আমারই দূত এবং তোমাকে খবর দিচ্ছিল– আমার আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর পয়গাম এসে গেছে, মৃত্যু নিকটবর্তী– এসবই ছিল আমার দূত, আমার বার্তাবাহক। আরও বলা হবে– তোমার কি নাতি-নাতনী হয়নি? পৌত্র-পৌত্রী হয়নি? এরাই তো ছিলো আমার দূত। তোমার সময় নিকটবর্তী, তোমাকে সত্বর পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। সময় শেষ হয়ে আসছে। আমারই দূত ছিল এরা এবং তোমাকে পয়গাম দিচ্ছিল–

وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ

তোমার নিকট সতর্ককারী ভীতি প্রদর্শক আসেনি? [ফাতির : ৩৮]

এসবই তো আমার পক্ষ থেকে এসেছিল।

তারপর বলা হবে, দিন-রাতের আবর্তন লক্ষ্য করনি? পর্যায়ক্রমে তারা কি তোমাকে সাবধান করেনি? সূর্য উদয় হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে মধ্যাকাশে পৌঁছেছে। তারপর সে সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। আর তখন থেকে তার অস্তগমন শুরু হলো। অস্তগামী সূর্যের চোহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, রঙ হয়ে যায় ফ্যাকাশে। সর্বশেষ ডুবে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়, যেন তার মৃত্যু ঘটল। সকালে পুনরায় পূর্বাকাশে দৃশ্যমান হয় এবং পৃথিবীকে সারাদিন আলো দান করে অস্তগমন করে। এ যেন তার মৃত্যু। এত বিশাল একটা জিনিস প্রতিদিন উদিত হয়, আবার অস্তমিত হয়ে যায়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে বিনাশ ও ধ্বংস হতে হবে, মিলিয়ে যেতে হবে। সূর্য একটি ওয়ায়েজ বা সতর্ককারী।

সারাক্ষণ সাবধান-সতর্ক করছে অথচ কেউ যদি উপদেশের দৃষ্টিতে দেখে, তবেই না এ উপদেশ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। আর যদি তা গরু-মহিষের চোখে দেখে! তাহলে তো গরু-মহিষের চোখের সামনে সূর্য অস্ত যায় অথচ তারা এর থেকে কোনরূপ উপদেশ গ্রহণ করে না, সাবধান-সতর্ক হয় না। কারণ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। যদি মানবজাতিও দুনিয়ার ঘটনাবলীকে গরু-মহিষের চোখে দেখে, ঘটনার আকার-প্রকৃতি দেখে আর উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে মানবজাতি এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়! মানুষ ও জন্তুর মধ্যে পার্থক্য তো এটাই যে, পশু ঘটনার আকার-প্রকৃতি দেখে করে, আর মানুষ ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এ থেকে জ্ঞান ও উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তায়ালা অভিযোগের সঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَكَأَيِّن مِّن ءَايَةٍ فِى السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

> আমার কুদরত ও মহাশক্তির অসংখ্য নিদর্শন, যা মানবজাতির সামন দিয়ে চলে যাচ্ছে– মানুষ এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে চলে যায়। [হুদ : ১০৫]

এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সতর্কতা অবলম্বন করে না।

আরও বলেন– এমন মানুষও অনেক রয়েছে যাঁরা ঈমান এনেছে, তবু শিরকে লিপ্ত রয়েছে। মুমিন হয়েছে অথচ শিরক হতে পবিত্র হতে পারেনি। কারণ ঈমানের দাবি ছিল– সকল কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তায়ালার দিকে নিজেকে রুজু করা। প্রতিটি ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। অথচ তারা তাদের নফস ও প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার কাজে ব্যস্ত, সর্বদা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণে লিপ্ত। নিজের আরাম-আয়েশ ও ভোগের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন। তাদের না আছে পরকাল-ভাবনা, না আছে উপদেশ গ্রহণ ও সতর্ক-সাবধান হওয়ার মানসিকতা। সুতরাং তারা মুমিন আবার একই সঙ্গে মুশরিকও। মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে এটাই পার্থক্য। সূর্যের উদয়-অস্তের ঘটনা জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও ঘটে। মানুষ যেমন তা প্রত্যক্ষ করে, জীবজন্তুও তা করে, তবে কেবল আকার-আকৃতিটাই দেখে। আর মানুষ এর মূলে গিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুঝতে পারে, এত বিশাল জিনিসে যখন এত পরিবর্তন, তাহলে কোন অণু-পরমাণুই পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। বায়ু প্রবাহ, জমিনের সৃষ্টি ও ধ্বংস, মওসুমের পরিবর্তন, বিচিত্র ফল-ফুলের সমারোহ

এবং তাদের নিঃশেষ হওয়া প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুর প্রত্যেকটি কণা সর্বদা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ জগতের সকল সৃষ্টি জীবন-মরণের মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবন লাভ করছে, মৃত্যুও ঘটছে। সমৃদ্ধিও রয়েছে, অবনতিও আছে। সৃষ্টি হবে, আবার ধ্বংসও হবে। যেটা জন্মগ্রহণ করেছে, জীবন লাভ করেছে– সেটাকে মৃত্যু অবশ্যই গ্রাস করবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

لدوا للموت وابنوا للخراب

জন্মালে মরতে হবে– এটা চির সত্য। মৃত্যুকে সাথে নিয়েই সন্তান জন্মলাভ করে। ভবন নির্মিত হয়ে ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকে। যে দালান নির্মিত হবে, অবশ্যই তা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। প্রত্যেকটি নির্মাণের পেছনে ধ্বংসের উপস্থিতি অনিবার্য। অস্তিত্বের জন্য রয়েছে ফানা ও ধ্বংস, জীবনের জন্য মরণ, শুরুর জন্য শেষ। এমন কোন বস্তু নেই যার ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই, বিনাশ নেই।

আমাদের মুর্শিদ হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ইন্তেকালে শোকগাঁথা লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন– জগতের তাবৎ অণু-পরমাণুর প্রতি লক্ষ কর, তার পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রতি লক্ষ কর– প্রতিটি বস্তু ঘোষণা করছে–

فافهم - فافهم

লক্ষ কর, ধ্যান কর, এখনও বুঝ! আলস্য ও উদাসীনতার ধান্ধায় পড়ে আর কতকাল কাটাবে? হুঁশে আসো! এসব পরিবর্তন দেখে এখনও মনোযোগী হও। তোমার মাঝেও পরিবর্তন হবে, হওয়া অনিবার্য। যেহেতু তুমি এ জগতেরই একটা অংশ– দুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশে অহরহ যখন পরিবর্তন হচ্ছে তখন পরিবর্তন তোমারও হবে। আর পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে– ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া। তোমার মাঝেও পরিবর্তন হচ্ছে, তুমিও ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছ। মানুষের যেসব রোগ-ব্যাধি হয় এগুলো হলো লক্ষণ যে, স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত আসছে। এভাবে একদিন স্বাস্থ্যের অনুভূতি-কেন্দ্র আত্মার ওপরও প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। শৈশব থেকে ক্রমে শরীর সবল ও শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর এমন সময় আসে যখন শক্তি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সুস্থ মজবুত যন্ত্রে দেখা দেবে দুর্বলতা। তারপর এমন একদিন আসবে, লিভারও অকেজো হয়ে যাবে, পাকস্থলীতে কিছুই পরিপাক হবে না। যৌবনকালের কথা চিন্তা করুন। নব

যৌবনের প্রভাবে সারা দেহ ভরপুর। কত আনন্দ, কত উৎসাহ ভেসে ওঠে দেহমনে। অথচ পেছনে বার্ধক্যের আগমন কে রুখতে পারবে! একদিন এসে সে হাজির হবেই। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যখন শক্তিহীনতা-দুর্বলতা দেখা দেয়, তখন তার মূল সত্তা এমনি নড়বড়ে অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন হয় যে, মূল সত্তাও একদিন বিনাশ হয়ে যায়। যদি এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এসবই যেন উপদেশস্বরূপ ঘটে চলেছে। সবই মনে হবে যেন ওয়ায়েজ– সদা-সর্বদা যেন সবই উপদেশ দান করছে। আর অগণিত এতসব লক্ষণ ও নিদর্শন আপনাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আপনারা চেষ্টা-তালাশে ব্যস্ত রয়েছেন– কোন আলেমকে, কোনও ওয়ায়েজকে, কোন বুযুর্গকে দাওয়াত করে আনবেন। তাঁদের ওয়াজ-নসীহত শোনবেন। আমি শত সহস্র ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতার ঠিকানা বলে দিলাম, ঘরে বসে বসে ওয়াজ শুনতে থাকুন। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-পাতাল, বায়ু-প্রবাহ, বিশ্বজগতের বিবর্তন প্রভৃতি প্রতিটি অবস্থাই আমাদের জন্য ওয়ায়েজ। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসু হওয়া এবং উপদেশ গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণে উদ্যোগী হবে, সে প্রতিটি বালুকণা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে। যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণে উদ্যোগী হবে, সে প্রতিটি বালুকণা থেকেও উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে। আমাদের নিজ নিজ ঘরে ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতা রয়েছে, আমাদের শরীরেও উপদেশদাতা রয়েছে। আপন দেহের প্রতি লক্ষ করুন, দেহের প্রতিটি অংশ ধ্বংসের দিকে ধাবমান এবং দ্রুততার সঙ্গে সে পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিখ্যাত কবি ছিলেন উস্তাদ 'দাগ'। তিনি বলেছেন–

ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے

اب ہم بھی جانے والے ہیں ساماں تو گیا

> সামান চলে গেছে, এবার মুসাফিরও রওনা হচ্ছে– সাজ-সরঞ্জাম প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে চলে যাচ্ছে, অথচ আমরা সতর্ক হচ্ছি না যে, এমন এক সময় আসছে যখন আমাদেরকেও যেতে হবে।

শেখ সাদী (রহ.) তাঁর গুলিস্তায় নওশেরওয়াঁ বাদশাহর ঘটনা লিখতে গিয়ে কত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন–

خیرے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر

زاں پیشتر کہ بانگ برآید کہ فلاں نماند

হে আমার আপনজন! কিছু না কিছু খায়র-নেকী, সৎ আমল করে নাও। নিজের হায়াতের কদর কর, সঠিক মূল্যায়ন কর। জীবনের এ সীমিত দিনগুলো হলো মণি-মানিক্যের মতো। এ হচ্ছে অমূল্য রতন, যা আল্লাহ তায়ালা বিনামূল্যে দান করেছেন। এর জন্য কোন বিনিময় নেননি। তুমি কোন না কোন নেক আমল, খায়র ও কল্যাণকর কাজ কর। জীবনের মূল্য অনুধাবন কর– ঐ সময় আসার আগে যখন ঘোষণা দেয়া হবে– আজ অমুক বিদায় হয়েছেন, দুনিয়া থেকে চলে গেছেন– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমন ঘোষণার আগেই যা করার করে নিন।

কবরস্থানের পাশ দিয়ে আমরা চলে যাই। শত সহস্র মানুষ– যারা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ছিলেন, আজ তারা কবরের গর্তে পড়ে রয়েছেন, মাটির সাথে মিশে গেছেন। আমরা বলি– তারাও তো মানুষ ছিলেন অথচ আজ তারা নেই। আগামীকাল আমরাও চলে যাব। পথিকরা আমাদের কবরের পাশে এসব কথা বলে চলে যাবেন। এ লোকগুলো এক সময় পৃথিবীতে ছিলেন। আজ তাদের নাম-নিশানাও মিটে গেছে। আসলে আমরা সবাই এ পথেরই পথিক। সুতরাং এ পথ সম্পর্কে কিছু ভাবনা-চিন্তা করা উচিত।

শয়তানের প্রবঞ্চনা

মানুষের অন্তরে অনেক সময় এমন ধারণা আসে যে, আমি তো এখনও জওয়ান। এখনও আমার শরীরে প্রচুর বল ও শক্তি রয়েছে। বার্ধক্য যখন আসবে, তখন তাওবা করে নেব। এখন তো খানাপিনা, খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তি, আনন্দ-উৎসবের সময়। এখনও মৃত্যুর কোন লক্ষণ, কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। লক্ষণ যখন প্রকাশ পাবে, সময় ঘনিয়ে আসবে, বুঝতে পারব যে, মাত্র কয়েক দিন সময় আছে, তখন তাওবা করে নেব। এখন আরাম-আয়েশ করে নিই, মজা লুটে নিই। আসলে এসব কেবলই শয়তানের প্রতারণা, ধোকা। এ কারণে যে, মৃত্যুর জন্য বার্ধক্য, যৌবনকাল, রোগব্যাধি এসব কোন কিছুই শর্ত নয়। কোন রোগব্যাধি ছাড়াও সুস্থ-সবল মানুষ হঠাৎ চলে যায়। যুবক ও

বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর সকলেই মারা যায়। মৃত্যুর বাজার সবার জন্য সব সময় চালু রয়েছে। এমন ধারণা আপনি তখনই করতে পারতেন যদি বুড়ো হওয়ার আগে কেউই না মরতো। সে ক্ষেত্রে বলতে পারতেন, এখনও মরণের সময় আসেনি। অথচ বার্ধক্যের পূর্বেও যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন অন্তরে এমন ধারণা কেমন করে আসে যে, বার্ধক্য যখন আসবে তখন তাওবা করে নেব। বার্ধক্য আসবে কি আসবে না সে খবর কি আপনার জানা আছে? না, কখনও নয়। এ খবর কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমি তো এমন বলি যে, যুবকরাই বেশি মারা যান। বুড়োরা মারা যান কম সংখ্যায়। যৌবনকালে মৃত্যুহার অধিক থাকে, বৃদ্ধকালে তা হ্রাস পায় ও কমে আসে। এর প্রমাণ হলো– আপনি আপনার জনসমাবেশের প্রতি লক্ষ্য করুন। বৃদ্ধদের সংখ্যা কম দেখতে পাবেন। দেখবেন যুবকরা সংখ্যাধিক্য। আর প্রমাণ এটাই যে, যুবকরা অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে। কারণ, সবাই যদি বুড়ো হয়ে মারা যেত তাহলে দুনিয়াতে বুড়োদেরই সংখ্যাধিক্য হতো। সমাবেশে সাদা দাড়িই বেশি দেখা যেতো। এটাই প্রমাণ যে, বুড়ো হওয়ার আগেই মানুষ অধিক হারে বিদায় হয়ে যায়। সুতরাং মানুষ বৃদ্ধকালে কম ও যৌবনকালে অধিক মৃত্যুবরণ করে। এটা একটি ধোকা, একটি প্রতারণা যে, বৃদ্ধ হলে তাওবা করে নেব। মৃত্যুর জন্য বার্ধক্য শর্ত নয়। মায়ের পেটেও মৃত্যু হয়ে যায়। দুনিয়াতেই আসতে পারে না। মৃত্যুর জন্য কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ কারণের দরকার হয় না। তারপরও এই বলে প্রতারিত হওয়া যে, অমুক কাজ হলে পরে তাওবা করে নেব। আজ নয় কাল তাওবা করে নেব। যে ব্যক্তি 'আগামীকাল'-এ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সে 'আগামীকাল' আসলেও এ কথাই বলবে– 'আগামীকাল' করব। এভাবে করতেই থাকবে, 'আগামীকাল' আর জীবনে আসবে না; বরং মরণ এসে হাজির হবে। তাওবা নসীব হবে না। যিনি তাওবা করতে চান, আজই করে নিন। জীবন ও হায়াতকে মূল্যায়ন করে কাজে লাগান।

আমলের প্রকৃত সময় যৌবনকাল

খেয়াল করুন, আমল করার প্রকৃত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। আমলের প্রকৃত সময় বৃদ্ধকাল নয়। বৃদ্ধকাল হলো পেনশনের সময়, অবসর জীবন যাপনের সময়। আল্লাহ তায়ালাও পেনশন প্রদান করেন। সরকার যেমন বয়স পঞ্চান্ন হয়ে যাওয়ার পর পেনশন দিয়ে দেয়। সরকারের সম্পদ সীমিত, তাই বেতনের অর্ধেক পেনশান হিসাবে প্রদান করা হয়। দ্বিগুণ, তিনগুণ দিতে সরকার অক্ষম;

তাই অর্ধেক দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবসর জীবনেও পূর্ণ ভাতা দেয়া হবে।

হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি যৌবনকালে কোন আমলে অভ্যস্ত ছিল। এখন বার্ধক্যের কারণে শক্তি-সামর্থ্য লোপ পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে। সেভাবে সে আমল করতে পারছে না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলে দেন, তার আমলনামায় সর্বদা পূর্ণ সওয়াব লিখতে থাক। এ কারণে যে, সে আমল ত্যাগ করেনি। আমিই তাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছি। এতে তার কোন ত্রুটি নেই। তাই সওয়াব সবসময় এমনভাবে লিখতে থাক, যেন সে আমল করে চলেছে। কোন ব্যক্তি প্রতিদিন দশটি মাসআলা শিক্ষা করত, আজ তা পারছে না। তবুও দশটির সওয়াব লিখতে থাক। এ কারণে যে, তার ইচ্ছার মধ্যে ত্রুটি নেই। সুতরাং যৌবনকাল হলো আমলের জন্য, আর বৃদ্ধকাল হলো পেনশন ভোগের সময়। যে যা করছে, যৌবনকালেই করছে। ফলে যৌবনকালে এ ধরনের তাল-বাহানা করা যে, বার্ধক্য এসে যাক তখন তাওবা করে নেব– এটা তো উল্টো কারবার হলো। যখন অবসর জীবন যাপনের সময় আসবে, তখন বলবে– আমি কাজ করব, আমল করব। যেমন- কোন লোক সরকারকে বলল– এখন আমার বয়স পনের বছর। এখন আমাকে চাকরি দিবেন না। আমি যখন ষাট বছরের হয়ে যাব, তখন চাকরি দেবেন, তখন আমি চাকরি করব। সরকার বলবে– তুমি পাগল নাকি হে? আরে, চাকরির সময় হলো যৌবনকাল। বার্ধক্য হলো চাকরি ত্যাগ করে অবসর জীবনযাপন ও পেনশন লাভের সময়। আর তুমি একে কাজ ও আমলের সময় মনে করছ? বার্ধক্য হলো কেবল সওয়াব জমা করার সময়। জনৈক কবি খুবই সুন্দর বলেছেন–

من تی گویم کہ زیاں کن یا بیند سود باش

اے زفرصت خبر در ہر چہ باشی زود باش

আমি এ কথা বলছি না যে, কোন উপকার বা অপকারের কাজ কর। আমি একথা বলছি– যা করার তাড়াতাড়ি কর; কেননা সময় খুবই কম রয়েছে।

এটাই হলো আমলের সময়। যিনি আমল করতে চান, তাওবা করতে চান আজই করে নিন। আগামীকালের জন্য রেখে দেবেন না। তাই বলি, ওয়াজ শুনে, বিশ্বের অণু-পরমাণুর ওয়াজ শুনে, সব কিছু দেখে কিছু করার উৎসাহ-উদ্যোগ

যদি সৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে করে নাও। হতে পারে, এ আবেগ কাল অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে।

নেক কাজের জন্য পরামর্শের দরকার নেই

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন– কারো অন্তরে যদি এ আবেগ সৃষ্টি হয় যে, আমি একটি পয়সা আল্লাহর রাহে সদকা করব, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে করে দিক। নয়তো হতে পারে, এক ঘণ্টা পর এ আবেগ-উদ্দীপনা নাও থাকতে পারে। অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে যে, এক পয়সা দিয়ে কি হবে, হাজার টাকা তো দিতে পারছি না। তখন সে এক পয়সাও দিতে পারবে না, হাজারও পারবে না। দান করার সওয়াব হতে মাহরূম ও বঞ্চিত থেকে যাবে। সুতরাং যখন কোন নেক কাজ করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে করে নাও। নেক কাজের জন্য পরামর্শের দরকার নেই কিংবা ইস্তেখারা করারও প্রয়োজন নেই। পরামর্শ ও ইস্তেখারা ঐসব কাজে করা হয়, যেগুলোতে সত্য অস্পষ্ট থাকে। পরামর্শ করা হয় সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য। যে কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন, এ কাজে আবার ইস্তেখারার দরকার কি? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নামায পড়। আপনি বললেন, আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে নিই, পড়ব কিনা! মানুষ তখন আপনাকে বোকা ও নির্বোধ বলবে। আল্লাহ তায়ালার আদেশের পর পরামর্শের কি প্রয়োজন! আল্লাহ বলেছেন, যাকাত আদায় কর। আপনি বললেন– আমি একটু ইস্তেখারা করে নিই। ইস্তেখারার অর্থ যদি হয় আল্লাহর কাছে জানতে চাওয়া, তাহলে তিনি নিজেই তো বলেছেন, যাকাত আদায় কর। পবিত্র কুরআনে আদেশ দিয়েছেন–

درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست

নেককাজে ইস্তেখারার প্রয়োজন নেই।

যে কাজে দ্বিধা-সংশয় থাকে, নেক বা সৎ তা স্পষ্ট হয় না, এমন কাজে ইস্তেখারা ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে– তা করে নাও।

আজকের এ বক্তব্য শোনে কোন নেক কাজের আবেগ-উৎসাহ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা করে নিন, কালকের জন্য রেখে দেবেন না। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা করে আমল করে নিন, পরে তা অভ্যাস হয়ে

যাবে। টাল-বাহানা করবেন না যে, কাল করব, পরশু করব। এটা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি– যাতে আপনার মনে আবেগ-উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে, ঢিলা হয়ে যায়। তারপর শয়তান কাবু করে নেবে। তাই খায়র ও নেকীর প্রতি, সৎ ও সত্যের প্রতি যখন আবেগ ও উৎসাহ পয়দা হয় তখন একে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ মনে করে কাজ করে নাও। যদি আত্মসংশোধনের সামান্যতম উৎসাহ-আবেগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে কাজে লেগে যাও! নিজের আত্মসংশোধনের জযবা ও আবেগ মুহাসাবায়ে নফসের মাধ্যমে হোক, মুয়াখাত ফিল্লাহর মাধ্যমে হোক, অন্যদের অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে হোক অথবা সৎ ও নেককারদের সোহবত ও সাহচর্য লাভের মাধ্যমে হোক– কাজ শুরু করে দাও। এই বাহানা কোন কাজে আসবে না যে, কোন ওলী-দরবেশ, কোন আলেম ও কামেল পীর পাওয়া যাচ্ছে না; কোন বন্ধু নেই, কোন শত্রু নেই– কোথায় যাব আমি? যদি কেউ না থাকে, আপনি নিজে তো রয়েছেন। নিজের নফসের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করে নিন।

আপনাদের সামনে আমি একটি ব্যবস্থাপত্র পেশ করলাম, যার মধ্যে চার ধরনের ওষুধ রয়েছে– এক. নেক ও সৎ লোকের সোহবত, দুই. মুয়াখাত ফিল্লাহ– আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন, তিন. ইত্তেআজ বিল গায়ের– অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ এবং চার. মুসাবায়ে নফস– প্রতিদিন নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ। এর থেকে যেটাই পেয়ে যান, করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। কোন কোন ব্যবস্থাপত্র এমনও থাকে যে, এর একটি ওষুধও যদি পাওয়া যায়, তবে স্বাস্থ্যের জন্য তা-ই উপকারী। আর যদি চারটি একত্রিত করে ব্যবহার করা হয় তাহলে তো সুবহানাল্লাহ! কতই না উপকারী হবে! সজ্জনের সাহচর্য, মুয়াখাত ফিল্লাহ, দীনী ভাই-বন্ধু, শত্রুদের থেকে উপদেশ গ্রহণ, প্রতিদিন নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ। এসব খুবই উপকারী ও শক্তিশালী হবে। যে ব্যবস্থাপত্রের একটি অংশই রোগমুক্তির কারণ হয়, সে ব্যবস্থাপত্রের সব ওষুধ যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো অনেক বেশি ফলপ্রসূ ও অব্যর্থ হবে।

ফলে আমি এ কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করলাম যাতে এগুলোর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা হয়, সাবধান-সতর্ক হওয়া যায়। নিজের মধ্যে আত্মসংশোধনের আবেগ-উৎসাহ পয়দা হয়। এর মাধ্যমে নিজের স্বভাব-চরিত্র গঠন ও সংশোধিত হবে। মানুষ যেন একথা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করে নেয় যে, আমার মধ্যে কোন গুণই নেই। আমি যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করব, সে মোতাবেক গুণাগুণ পয়দা হবে। মন্দ-স্বভাব কষ্ট ও সাধনা দ্বারা অর্জন করতে হয় না, তা

সবার মধ্যে জন্মগতভাবেই রয়েছে। এটা দূর করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এটাকে দূর করতে চারটি পথ রয়েছে যা আমি বর্ণনা করলাম।

এ কয়টি কথাই আমি বললাম যা আমার বলার ছিল। সময় অনেক হয়েছে। এখন দোয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আত্মসংশোধনের আমল ও আখলাক, সংশোধন ও চরিত্র গঠন, আপন আপন আকীদাগুলো সত্য-সঠিক করানোর তাওফিক দান করুন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করুন। তাঁর মর্জিমতো পরিচালিত করুন। আমাদের দীন ও দুনিয়াকে দুরস্ত করে দিন। আমাদের পরকাল দুরস্ত করে দিন, আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিন। আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি দিন। শত্রুদের থেকে আমাদের হেফাযত করুন, আপদ-বিপদ থেকে আসান করে দিন। আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم – وارنا منا سكنا وتب
علينا انك انت التواب الرحيم – واخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمين–

বয়ান : ৫

আহলে হক বা সত্য দলের পরিচয়

বুদ্ধির সীমা বস্তুজগত পর্যন্ত। অদৃশ্য জগতে সে পৌঁছতে পারে না। সে ইলম ও জ্ঞানকে আবিষ্কার করতে পারে না। সে কেবল যথার্থতা নির্ণয় করতে পারে। ইলম সাহায্যের জন্য। তার সামনে যদি কিছু এসে যায় তাহলে তা থেকে কিছু মৌলনীতি নির্ধারণ করতে পারে। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মাধ্যমে মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাই বলে নিজে মৌলনীতি কিংবা আংশিক নীতি তৈরি করে দিবে, তা হয় না। বিবেক-বুদ্ধি মূল ঘটনা তৈরি করতে পারে না। সংঘটিত ঘটনায় চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَـٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۞

আর আমি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব আপনাকে দিয়েছি তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব কিছু জানেন দেখেন। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণ ও খায়রের পথে অগ্রগামী রয়েছে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ। [ফাতির : ৩১-৩২]

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এমন বরকতময় ও খায়র সমাবেশে যেখানে অনেক নূরানী, আলোকোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় চেহারা মঞ্চে এবং মঞ্চের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের মধ্যে অনেক

লোক এমনও রয়েছেন যাঁদের চেহারাতে দীন ও ঈমানের আভা প্রকাশ পাচ্ছে। দীনের চিহ্ন ও লক্ষণ স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে। তাঁদের দেখে বুঝা যায়, যেন তাঁরা ভেতরে-বাইরে সর্বতোভাবে দীনের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এসব মনীষীর মধ্যে এমন মানুষও থাকতে পারেন, থাকা সম্ভব, যাঁরা আমাদের সম্পর্কে নেক ও সুধারণা পোষণ করেন। তাঁদের ধ্যান-ধারণার বিপরীতও কিছুটা হতে পারে। তাই আমার পরিচয় আমি ব্যক্ত করতে চাচ্ছি যাতে কোন ধরনের সংশয় না থাকে। যাঁরা আমার কথাবার্তা শুনতে ও মানতে আগ্রহী তাঁরা যেন বুঝে শুনে মান্য বা অমান্য করতে পারেন। আমাদের পক্ষ হতে যেন কোন ধরনের দীনি সন্দেহ-সংশয় না থাকে।

পঠিত কবিতা ও অভিনন্দনপত্রে কিংবা হযরত আল্লামার পক্ষ থেকে আমার পরিচিতি সম্পর্কে যেসব উপাধি বলা হয়েছে, আসলে এসব আমার পরিচিতি নয়; বরং তাঁরা তাঁদের নিজেদের পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। এ অধমের প্রতি তাঁদের ভদ্রতা, শরাফত, নম্রতা, ক্ষুদ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে তাঁদেরই পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এসব আমার পরিচিতি নয়। আমার পরিচয় আমি নিজেই বর্ণনা করতে প্রয়াস পাচ্ছি।

আহলে হকের পরিচয়ের মাপকাঠি

পরিচয় বলার আগে এটা জেনে নেয়া উচিত যে, পরিচিতির জন্য এমন একটি কষ্টিপাথর থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে বিচার করা যায়, যাচাই-বাছাই করা যায়। বিচার করা যায়– এ লোক যা বলছে তা সত্য-সঠিক, না ভুল প্রমাদপূর্ণ। আমাদের কাছে এমন কোন দাঁড়িপাল্লা থাকা উচিত– যার মাধ্যমে আমরা যাচাই করতে পারি, অমুকের কথা সত্য, না মিথ্যা।

প্রথম বিষয় হচ্ছে পরিচিতি। আর পরিচিতির আগে দরকার কষ্টিপাথর দিয়ে তা যাচাই-বাছাই করে নেয়া। এজন্য আমি এ আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে হক ও বাতেল, সত্য ও অসত্যের মানদণ্ড ও কষ্টিপাথরের বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে যাচাই করা যাবে, কার কথা ও বক্তব্য সত্য, সঠিক এবং কার বক্তব্য ভুল ও প্রমাদপূর্ণ। তাই আমি সবর আগে এ আয়াতের অর্থ আপনাদের সামনে পেশ করতে চাচ্ছি, তারপর এর কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পাব।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَـٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ✡

হে নবী! আল্লাহই ঐ মহান যাত যিনি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন, সন্দেহমুক্ত দ্বিধা-সংশয়হীন ইলম দান করেছেন এবং তাঁর মহান কিতাব আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ কিতাবরূপে যে ওহী প্রেরণ করেছেন একমাত্র তাই হলো সত্য-সঠিক।

এ হলো হক ও বাতেল, সত্য ও অসত্য যাচাইয়ের মানদণ্ড, কষ্টিপাথর। মানুষ চোখের সামনে হাজির থাকুক কিংবা অনুপস্থিত– তাদের যদি যাচাই করতে হয় তাহলে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার আলোকে যেন যাচাই-বাছাই না করা হয়; বরং ঐ কষ্টিপাথর ও মানদণ্ড দিয়ে করা কর্তব্য– যা আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

এ হলো আমার কিতাব যা হক, সত্য ও সঠিক। তোমাদের সম্মুখের, তোমাদের আশপাশের অবস্থাসমূহের সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ডও বটে।

অতঃপর বলেন– কিতাব এসে গেছে রাসূলও তাশরিফ এনেছেন। খাতামুন নাবীয়্যিনের আগমনের পর আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শিক্ষা দিয়ে বলে দিয়েছেন– দীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আরও বলেছেন–

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ـ

আমি এখানেই সমাপ্ত করিনি; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এমন মানুষকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানিয়েছি যারা উত্তরাধিকার সূত্রে এ কিতাব লাভ করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে এ সত্যকে লাভ কররে। আর যারা এ সত্য গ্রহণ করেছেন তাঁরা কোন নির্দিষ্ট কাল ও যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত নন; বরং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবেন বলে ওয়াদা করা হয়েছে। তাঁরা সবসময় আসতে থাকবেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين -

সবসময় পূর্বসুরীদের পর উত্তরসুরীগণ দাঁড়িয়ে যাবেন– যারা ইলম গ্রহণ করতে থাকবেন যা মহান পূর্বসুরীগণ নিয়ে এসেছিলেন এবং ইলমের আলো দ্বারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বাড়াবাড়ি তছনছ করে শেষ করে দিবেন। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যার অবসান ঘটাবেন। জাহেল-মূর্খদের ভুল অর্থ বর্ণনা এবং অপব্যাখ্যা শেষ করে দিবেন– আর এ দীন কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রকৃত রূপ নিয়ে বিরাজমান থাকবে, চালু থাকবে।

অন্যত্র হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দিচ্ছেন–

ان الله يبعث لهذه الامة على أس كل مأة سنة من يجدد لها دينها -

প্রতিটি যুগের পর যখন দ্বিতীয় যুগ শুরু হবে তখন আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষ প্রেরণ করবেন যিনি দীনের সংস্কার সাধন করবেন। দীনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল রূপে প্রকাশ করবেন। যেসব ভ্রান্তিপূর্ণ অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল সেগুলো চিহ্নিত করে নিক্ষেপ করে দিবেন; তারপর দীন পুনরায় তার নিষ্কলুষ চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রত্যেক যুগে এমন মানুষের আগমন হবে, যাদের নাম মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।

কাল-এর শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে যে, সাধারণত কাল বলা হয় শতাব্দীকে। আর গত হওয়া একটা কালে বা শতকে এক জেনারেশন শেষ হয়ে যায়। আর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় নতুন জেনারেশন। পরবর্তী বংশধরগণ এসে যায়। নতুন জেনারেশন থেকে কিছু নতুন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিরও উদ্ভব হয়। নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। নিত্যনতুন ঘটনাবলী এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। ফলে মানুষ নানা মতবাদের শিকারে পতিত হয়। অবস্থা তখন এতটা সঙ্গীন হয়ে যায় যে, মনে হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দীন ও ধর্ম হয়তো পরাজিত হয়ে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথবা দীনের রূপরেখা অস্পষ্ট ও ঘোলাটে হয়ে যাবে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক যুগের জন্য একজন মুজাদ্দিদ রেখেছেন– যিনি এসে নতুন চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের মধ্যে দীনের প্রকৃত ও উজ্জ্বল চেহারা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন এবং এসব মতবাদের প্রেক্ষিতে এমন সব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবেন যাতে দীন পুনরায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের কোনরূপ প্রভাব দীনের ওপর আর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না

করে। একই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন–

لاتزال طائفة من التى منصورين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى ياتى امر الله -

আমার উম্মতের মধ্যে সবসময় এমন একটি দল অবশিষ্ট থাকবে যারা ঐ কথাই বলবে যা আমি বলেছি, এমন কাজ ও আমল করবে যেমন আমি করেছি। তাদের কেউ অপদস্থ ও লজ্জিত করতে পারবে না– সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ এসে যাবে। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে দীন তার সঠিক রূপসহ শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য এ অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, একটি সত্যপন্থী দল বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক যুগেই মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। তাছাড়া যুগের মধ্যে পূর্বসুরীদের জায়গায় উত্তরসুরীদের আগমন ঘটবে। যারা ইলম ও জ্ঞান অন্বেষণ, গ্রহণ ও বিতরণ করতে থাকবেন। ফলে ইলম ও জ্ঞানের এ সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ثم اورثنا الذين اصفينا من عبادنا

নবীর আগমন ও পরিপূর্ণ কিতাবের অবতরণের পর আমি এমন জাতি ও এমন ব্যক্তিগণকে এর উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করব, যাদের আমি নিজেই নির্বাচন করব, নিজেই পছন্দ করব। গণভোটে তা নির্ধারণ করা হবে না যে, অমুক মুজাদ্দিদ, অমুক মু'আলেম (শিক্ষক)। আমি সরাসরি মানুষের হৃদয়ে ঢেলে দিব যে, এ দল সত্যবাদী; ন্যায় ও সত্যের পতাকাবাহী।

দীন জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত এবং আবিষ্কৃত নয়

এ পর্যন্ত বলা কথায় এটা জানা হয়েছে যে, দীন কোনো অকৃত্রিম ও রেওয়ায়তী জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত বা আবিষ্কারের নাম নয়। অর্থাৎ দীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত কোন দল বা সংগঠনের প্রস্তাবিত বিষয় নয়; বরং এ দীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে এসেছে। জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত আবিষ্কারাদি দীনের ভিত্তি ও মূল হতে পারে না। রেওয়ায়ত– বর্ণনাই হলো দীনের মূল ভিত্তি। ফলে যখনই দীনের কোন কথা কোন বিষয় সামনে এসে যাবে, তখন প্রথমেই এ দাবি করা হবে না যে, তুমি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এ বিষয়ে কি

বুঝ, তোমার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা দ্বারা কি উপলব্ধি করছ? আল্লাহ তায়ালার ওহীর সামনে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, সীমিত এবং এ দিয়ে দীন যাচাই করা যাবে না। বরং দীন হলো মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর– যার মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে– এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ না ত্রুটিপূর্ণ, তাতে কৃত্রিমতা রয়েছে, না এটি মুক্ত। দীন হবে মানদণ্ড, বিবেক-বুদ্ধি মানদণ্ড হবে না। বুদ্ধিকে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী ও দীনের দাসত্ব করতে হবে। এতে বোঝা গেল, দীন রেওয়ায়তী– উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত বিবেকপ্রসূত বা আবিষ্কৃত নয়। দীন হলো রেওয়ায়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত; বিবেক-বুদ্ধির প্রস্তাব অনুযায়ী দীন গঠিত হয়নি।

দীন হলো গায়েবী হাকীকত : বুদ্ধিমত্তা এর আবিষ্কারক নয়

কারণ হলো– দীন বলা হয়– الطريق الموصل الى الله –ঐ রাস্তাকে যা বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। খোলাসা কথা, বান্দা যখন আল্লাহর দিকে রওনা হবে তখন রাস্তা এত দীর্ঘ ও কঠিন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা রাস্তা বলে না দিবেন– এ হলো আমার রাস্তা– ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ রাস্তা বুঝতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর রাস্তা বলে দিয়েছেন যে, এই হলো আমার রাস্তা–

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۞

এ হলো আমার সরল সোজা পথ; এর অনুসরণ কর এবং পরবর্তীতে জ্ঞানপ্রসূত যেসব নতুন রাস্তা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর অনুসরণ কর না। তাহলে বিশৃঙ্খলা, দলাদলি-পার্টিবাজী ও সংকীর্ণতায় পতিত হবে। [আনআম : ১৫৩]

সঠিক দীন অনুসন্ধান কর। সুতরাং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার যে রাস্তা হবে– সেটা আল্লাহ তায়ালা যখন বলে দিবেন, তখন তাঁর মর্জি ও পছন্দনীয় কার্যাবলী জানা হয়ে যাবে। শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর মর্জি জানা যাবে না। আমরা চিন্তা করে বলতে পারব না– আল্লাহ কোন জিনিসে সন্তুষ্ট আর কোন জিনিসে অসন্তুষ্ট হন।

যদি দু'জন সহোদর ভাইও হন– যারা একই মায়ের গর্ভে অবস্থান করেছেন। তারা যদি বুকে বুক মিলিয়ে বসে পড়েন তবু একজনের মনের কথা অপরজনের মনে যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা প্রকাশ না করবে যে, আমার অন্তরে এ কথা গোপন রয়েছে। দু'টি মানুষ একই জাত, একই প্রকার, একই মূলের দুটি শাখা, একই মায়ের গর্ভে অবস্থান করে এসেছেন– অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন তার অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ না করবে, ততক্ষণ অন্যজন গোপন কথার কিছুই বুঝতে পারবে না। অথচ আল্লাহ তায়ালার অন্তর থেকে যে জিনিস এসেছে তা দূরে বসে বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝে নেব? তা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা প্রকাশ না করবেন। সুতরাং তাঁর মর্জি ও না-মর্জি, পছন্দ ও অপছন্দ ঐ কালাম দ্বারাই জানা যেতে পারে, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে তা জানা যাবে না। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আগুন-পানি তথা জড় পদার্থের মধ্যে কিছু কাজ করতে পারে। দৃশ্যমান বস্তুরাজির মধ্যে পৌঁছতে পারে। তবে তাতেও অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। যে বিবেক-বুদ্ধি দৃশ্যমান বস্তুসমূহে ভুল-ভ্রান্তি করে বসে, সে অদৃশ্য জগত ও অদৃশ্য জিনিস সম্পর্কে কেমন করে জ্ঞানী হতে পারে! এ জগত তার চিন্তা-সীমার বাইরে। তার সীমার ভেতর থেকেই কেবল সে কাজ করতে পারবে।

আপনার চোখ আকার-আকৃতি, রঙ ও রূপ দেখতে পারবে। কান আওয়াজ শুনতে পারবে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। এ তিনটি জিনিস অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কানের সীমানায় চোখ পা রাখতে পারবে না, হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কান আকার-আকৃতি, রঙ-রূপ দেখতে পারবে না। চোখ আওয়াজও শুনবে– তা হবে না। শোনার প্রয়োজন হলে কানের দ্বারস্থ হতে হবে। দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী হতে হবে। চোখ হলো দেখার জন্য, শোনার জন্য নয়। আপনি হাজার চেষ্টা-সাধনা করেও চোখ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না। টক ও মিষ্টির পার্থক্য বুঝতে পারবেন না। একই চেহারা ও একই পরিধির মধ্যে স্থিত অঙ্গগুলোও– যার সকল শক্তি একত্রিত– অথচ এক শক্তি অন্য শক্তির সীমানায় পা রাখতে পারছে না। যার কাছ থেকে যে কাজ পেতে ইচ্ছা করবেন তার দ্বারাই ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। বুদ্ধির স্থান হলো এসবের ঊর্ধ্বে। তবে আপনি যদি বুদ্ধির মাধ্যমে গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) বিষয় জানতে চান, তাহলে সেটা সম্ভব হবে না। বুদ্ধির সীমা বস্তুজগত পর্যন্ত। অদৃশ্য জগতে সে পৌঁছতে পারে না। সে ইলম ও জ্ঞানকে আবিষ্কার করতে পারে না। সে কেবল যথার্থতা নির্ণয় করতে পারে। ইলম সাহায্যের জন্য। তার সামনে যদি কিছু এসে যায় তাহলে তা থেকে কিছু মৌলনীতি নির্ধারণ করতে

পারে। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মাধ্যমে মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাই বলে নিজে মৌলনীতি কিংবা আংশিক নীতি তৈরি করে দিবে, তা হয় না। বিবেক-বুদ্ধি মূল ঘটনা তৈরি করতে পারে না। সংঘটিত ঘটনায় চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। এ মাধ্যমে করণীয় স্থির করতে পারে। দীন হলো আল্লাহ প্রেরিত বাণী ও গায়েবী হাকীকত– বুদ্ধি তা সৃষ্টি করতে পারবে না। আবিষ্কারও করতে পারবে না। বরং বুদ্ধিকে দীনের সঙ্গে থাকতে হবে। তার অধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার করতে হবে।

জ্ঞান-বুদ্ধি অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর অনুসরণ করবে

ইসলাম বিবেক-বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেনি। এটা খুবই উপকারী জিনিস। আল্লাহ তায়ালা বুদ্ধির অনেক ফযিলত ও গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

اول ما خلق الله العقل

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম 'আকল' সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বললেন– সামনে এসো। সে সামনে আসল। তারপর বললেন– পেছনে যাও; সে পিছনে চলে গেল। তারপর বললেন– তোমার মাধ্যমেই অনেক মানুষকে আমি সম্মানিত করব; আবার অনেককে অপদস্তও করব। সুতরাং 'আকল' কোন বেকার বা অসার বিষয় নয়। তবে আকল কাজ করবে তার সীমার মধ্যে। চোখ বেকার জিনিস নয়। তবে কাজ করবে আকার-আকৃতি, রঙ ও রূপ দেখতে। তাই বলে আওয়াজ শুনতে পারবে না। কান বেকার নয়। তবে ঘ্রাণ নিতে পারবে না– নিজের সীমানায় কাজ করবে। 'আকল'ও তার সীমার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকবে। আকলের ঊর্ধ্বের অদৃশ্য জগতের বিষয় যখন সামনে আসবে তখন ওহীর দিকে, আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করতে হবে। আল্লাহ গায়েব সম্পর্কে সকল বিষয় বলবেন, আর আমরা তা মানব। আপনার আকল পার্থিব জিনিস আবিষ্কার করতে পারবে, তবে এ কথা বলতে পারবে না– আরশে আজীম কেমন? এ কথা বলতে পারবে না– কুরসি কেমন? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন খবর দিয়েছে– জান্নাতের নেয়ামতসমূহ কি ও কেমন। জাহান্নামের সাজা-শাস্তির ধরন কেমন! এসব বিষয় জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দিয়ে জয় করতে চাওয়াটা হবে– যেন চোখ দিয়ে ঘ্রাণ নিতে চাওয়া, কান দিয়ে আকার-আকৃতি দেখতে চাওয়া। এমন করলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর মাতম

করা হবে। এভাবে ঐ সব মানুষের বুদ্ধির ওপরও বিলাপ করা হবে যারা অদৃশ্য জগতকে বিবেকের ঘোড়া ছুটিয়ে জয় করতে চায়। অথচ আকল-বুদ্ধি সে স্থানে পৌছতে পারবে না– একেবারেই অক্ষম। সুতরাং অদৃশ্য জগত সম্পর্কে আকল ও বুদ্ধিকে অবশ্যই শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। তাহলে শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে বুদ্ধি অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারবে। নানা ধরনের রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবে। তবে মৌলিক বস্তু বা বিষয় সৃষ্টি করবে, সেটা হবে না। প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির হয়ে যাওয়ার পর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবে। এর মধ্যে নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে পারবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন

আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– দীন বর্ণনামূলক ও অকৃত্রিম। তা এসেছে স্থান পরিবর্তন করে। এটা জ্ঞানপ্রসূত বা আবিষ্কৃত নয়। তাই দীন সম্পর্কে যখনই কেউ কোন দাবি করবে তখন সর্বপ্রথম সনদ এবং দলিল-প্রমাণ চাওয়া হবে। এটা তার নিকট কিভাবে পৌছেছে? কোন্ পথ দিয়ে পৌছেছে? রেওয়ায়তকারী কে? তার স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, ইলম ও আমল কেমন ছিল?

পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম। তা সত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গুরুত্ব সহকারে এর সনদ বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলেননি যে, এ হলো আমার কালাম। আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা তোমাদেরকে বাধ্য করব এটাকে মানার জন্য। বরং প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক পবিত্র কুরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন। সনদসহ প্রমাণিত হওয়ার পর স্বীকৃত হবে যে, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম। একে মান্য কর। আর তখন এর অনুসরণ, অনুকরণ করা ফরয হয়ে যাবে। এসব না করে আগেই প্রভাব খাটিয়ে মানাতে বাধ্য করা হবে যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কালাম– সুতরাং তোমাদের তা মানতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– এমন প্রভাব বিস্তার আমি করব না। আমি প্রচলিত নিয়মে বুঝাব। পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর দরবার হতে আগমনের সনদে দু'টি পর্যায় রয়েছে। তা হলো– আল্লাহ হতে রাসূল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় হলো– রাসূল হতে আমাদের পর্যন্ত। সনদের এ দু'টি পর্যায়। উভয় পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। প্রথম সনদে মুত্তাসিলে (মিলিত

সনদ) এ কথা বুঝে নাও, এ হলো আমার কালাম। তারপর মানা অথবা না মানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। শুধু নিজের মতামত ও নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না। প্রথম সনদ আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে কালাম শুনলেন কে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যিনি নিয়ে আসলেন তিনি কে? এই সনদকে আল্লাহ তায়ালা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন এবং প্রচলিত রীতিনীতির আলোকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের যেসব গুণাবলী রয়েছে– যা দ্বারা তাদের বর্ণনা ও তাদের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয়। তাদের কাজকর্ম– যা দ্বারা তাদের সততা ও সত্যবাদিতা প্রমাণিত হয়– এসবই আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলেননি যে, এ হলো আমার কালাম। সুতরাং তোমরা তা মেনে নিতে বাধ্য। যেমন- ধরা যাক, হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন মাধ্যম– যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদের অন্যতম। সাইয়েদুল মালাইকা (ফেরেশতাদের সরদার) তাঁর উপাধি। তিনি হলেন মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালার এক নাম হলো আমীন, আর হযরত জিবরাঈলের উপাধি হলো আমীন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপাধি হলো আল-আমীন। কালাম (কুরআন শরীফ) আমীন-এর কাছ থেকে রওনা হলো, আমীনের মাধ্যমে আসল এবং আল-আমীনের ওপর অবতীর্ণ হলো। মধ্যবর্তী আমীনের গুণাবলী কি? আল্লাহ তায়ালা তা-ও প্রকাশ করেছেন। সূরা তাকবীরে তিনি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

হযরত জিবরীল (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন– এ (কুরআন) হলো একজন মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত কালাম। [তাকওয়ীর : ১৯]

প্রথমে ব্যবহার করলেন রাসূল শব্দ অর্থাৎ কালাম নিয়ে যিনি আসছেন তিনি আমার বিশেষ দূত, বার্তাবাহক। এটাই সত্য কথা যে, সরকার ঐ ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রদূত ও বার্তাবাহক নিয়োগ করেন যার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। তার মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার নাম-গন্ধও থাকবে না। সে সরকারের পলিসিকে অন্তর দিয়ে সমর্থন ও আনুগত্য করে, সরকারের নিকটও সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হয়। যদি সরকারের কাছে সামান্য সন্দেহও সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে অন্য দেশে পাঠানো হচ্ছে সে বিশ্বাসযোগ্য নয় অথবা তার মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বীজ রয়েছে– তাহলে তাকে কখনো রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে না। আল্লাহ তায়ালার সরকার দূত ও বার্তাবাহক এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন, যার

গুণাবলী স্বয়ং তিনিই বর্ণনা করেছেন এভাবে– এ ব্যক্তির চেয়ে অধিক আমীন ও আমানতদার আর কে হতে পারে! এ সম্পর্কে প্রথম এই শব্দ বললেন– এ কালাম হলো রাসূলের। অর্থই হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ। আল্লাহ তায়ালার বার্তাবাহকের অর্থই হলো পাক-পবিত্র। তাঁর মধ্যে দুষ্টুমি ও বিদ্রোহের বীজ অণু-পরমাণু পরিমাণও নেই। সুতরাং সর্বপ্রথম রাসূল.শব্দের ব্যবহারই তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ। যিনি আমার কুরআন নিয়ে আসছেন তিনি নিঃসন্দেহের বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

'রাসূল' শব্দের পর করিম শব্দ বলেছেন। করিম শব্দের অর্থ সম্মানিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কারামত ও বুযুর্গওয়ালা। চিন্তা করলে দেখা যাবে, রাসূল শব্দের মতই সমূহ বুযুর্গী ও গুণাবলী এসে গেছে। এরপর বললেন– 'করিম' অর্থাৎ সম্মানিত। দুটি গুণ বলা হলো। আল্লাহ তায়ালার দূত, তাঁর বার্তাবাহক স্বভাবজাত করিম অর্থাৎ সম্মানিত। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্রোহেরও কোন শঙ্কা নেই।

কেউ বলতে পারেন– তিনি রাসূল, তিনি বার্তাবাহক, তিনি স্বভাবগতভাবে করিম; তবে তিনি দুর্বল, সাহস নেই। কারণ, বার্তা নিয়ে যখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন তখন মানুষ বলতে লাগল– তুমি কী বলছ? নিজ দুর্বলতার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তখন তিনি বলে দিলেন– আমি এমন কথা বলিনি, আমি অন্যরূপ বলেছি। এজন্যে কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, জিবরাঈল (আ.) রাসূল ছিলেন। স্বভাবজাত করিম ছিলেন। তবে স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। হতে পারে এ কারণেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কালাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। এমন সন্দেহের অবসানকল্পে আরেকটি বাক্য সংযোজন করেছেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ

তিনি দুর্বল নন, অত্যন্ত শক্তিশালী ফেরেশতা তিনি।
[তাকওয়ীর : ১৯-২০]

কেউ তাকে প্রভাবিত করবে, ধমক দিবে, তার মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা বের করে নিবে– তা হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবজাত সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী রাসূলের (বহনকৃত) কালাম হচ্ছে কুআনুল করিম।

যেমন- হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজেই বলেছেন– হযরত লূত (আ.)-এর কওমের ওপর যখন আল্লাহর আযাব নাযিল হলো তখন আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং আমি তাদের সম্পূর্ণ জনবসতি হাতের তালুতে উঠিয়ে নিলাম এবং

উল্টিয়ে নিক্ষেপ করলাম। ফলে সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এই হলো এ ফেরেশতার শক্তি! যিনি এতটা বলবান তিনি দুর্বলতার কারণে প্রভাবিত হয়ে কালাম পরিবর্তন করতে পারেন? তা সম্ভব হতে পারে না। আর এটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। কোন কোন মানুষ সম্পর্কে এরূপ মশহুর আছে যে, কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কথা বলা। যেমন- কোন কোন মানুষ যারা নেককার ছিলেন বটে; তবে অত্যন্ত ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। তারা সত্য কথাই বলতেন, তবে অস্ত্রের মুখে কথা পাল্টে বলতেন– আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল। আত্মরক্ষার জন্য কথা বদলে দিতেন। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) এমন ছিলেন না। তবুও কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, হযরত জিবরাঈল রাসূল স্বভারজাত করিম, অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন– এসবই ঠিক! কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কালাম অনেক দূর থেকে শুনেছেন। জানা নেই সঠিক শুনেছেন না ভুল শুনেছেন। অর্থও সঠিক বুঝতে পেরেছেন নাকি ভুল বুঝেছেন। হয়ত কানে কোনো একটি অস্পষ্ট শব্দ এসেছে আর নিজে নিজেই হয়ত তার একটা অর্থ বুঝে নিয়েছেন। এমন রাবী ও বর্ণনাকারীর ওপর বিশ্বাস করা যায় কেমন করে? তিনি যতই নেক, পরহেযগার ও সালেহ হোন না কেন, যথেষ্ট দূরে থেকে কথা শুনেছেন। কে জানে, পরিপূর্ণ কালাম শুনেছেন কি-না। এমন সন্দেহের অবসানকল্পে আল্লাহ তায়ালা অপর একটি বাক্য সংযোজন করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ

তার স্থান আল্লাহর আরশের নিকটবর্তী, দূরে নয়।
[তাকওয়ীর : ২০]

তিনি আমার কালাম নিকটে থেকেই শুনেছেন। এতটা দূর থেকে নয় যে, আওয়াজের স্পষ্টতার ব্যতিক্রম হবে। যদি কোন ব্যক্তি (হাদীস) রেওয়ায়েত করে কিন্তু উস্তাদ ও শায়খের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়ে থাকে তাহলে তার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয় না। কিংবা যদি দেখা-সাক্ষাৎ হয়েও থাকে আর এত দূরে থেকে (হাদীস) শুনল যে, এতে বেশ সন্দেহ সৃষ্টি হলো, সঠিক আওয়াজ ও শব্দ শুনেছে কি-না। ফলে রাবীর জন্য উস্তাদের সাক্ষাৎ ও সহাবস্থান খুবই জরুরী। যাতে পরিপূর্ণ কথা শুনতে পারে এবং কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটিয়ে পরবর্তীতে রেওয়ায়েত করতে পারে। তবুও কোন লোক এ কথা বলতে পারেন যে, আমি মেনে নিলাম হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল, তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র। স্বভাবজাত করিম, ভদ্রতা ও শরাফত সন্দেহাতীত। তিনি খুব

শক্তিশালীও এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে বার্তা ও আল্লাহর কালাম দূর থেকে শুনেননি। কিন্তু তাঁর কোন পদমর্যাদা নেই। ফলে তাঁর সামাজিক কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই। সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখব কেমন করে?

হ্যাঁ, কথাবার্তার বর্ণনাকারীর সামাজিক পদমর্যাদারও দরকার আছে। একই কথা যদি আমি বলি এবং বিলেতের রানীও বলেন, তাহলে দু'জনের কথার প্রতিক্রিয়া দু'রকম হবে। বাদশাহ বা মন্ত্রী যদি কোন কথা বলেন তবে এর গুরুত্ব এতই বেশি যে, এর মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে বড় ধরনের আলোড়ন ও বিপ্লব সাধিত হতে পারে। এ কথার গুরুত্ব দেয়া হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। অথচ ঐ একই কথা যদি আমার মত কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বলে তাহলে তা সমাজে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। সবাই বলবে, একজন ভাল মানুষ, একটি ভাল কথা বলেছেন। সঠিক কথাই বলেছেন। একই কথা যদি কোন পদমর্যাদাশীল ব্যক্তি বলেন তাহলে এর ফলাফল অন্য রকম হবে। ফলে জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে যদি কেউ বলে– তাঁর তো কোন সামাজিক পদমর্যাদা নেই। হ্যাঁ, এ সন্দেহ দূর করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– مطاع তিনি সাইয়েদুল মালাইকা। সকল ফেরেশতা তাঁর অনুসরণকারী। সব আসমানে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনমান্য। সকল ফেরেশতা যাঁদের অবস্থা হলো এই– بل عباد مكرمون আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বান্দা– لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعلمون তাঁরা যারা আমল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার আদেশের অপেক্ষা করেন না; বরং আল্লাহর মর্জি ও মনশা দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াত ও আনুগত্য প্রকাশ করতে লেগে যান এবং لا يعصون الله ما امرهم وهم يفعلون ما يؤمرون - তাঁরা কখনও আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করেন না। যা-ই আদেশ করা হয় তাই করেন। নিজের থেকে কম-বেশি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেন না। সকল ফেরেশতা আমানত ও দিয়ানতে শীর্ষস্থানে রয়েছেন। এমন সকল ফেরেশতার নেতা ও সরদার হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। এ ধরনের পাক-পবিত্র বান্দারা ঐ ব্যক্তির নেতৃত্ব কী করে মেনে নেবেন যদি তাঁর মর্যাদা সবচে' শীর্ষস্থানে না থাকে! আপনি যদি একজন নেতা নির্বাচন করেন তাহলে তার গুণাবলী দেখে নেন। বাদশাহ ও রাষ্ট্রনায়কের কথা আরো ঊর্ধ্বে। আমি বলি, ইমামতির জন্যও আপনারা দেখে নেন। ইমাম কাকে বানাবেন। তাঁর গুণাবলী কি এবং কেমন? আপনি চেষ্টা করবেন, ইমামের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব থাকা উচিত, যাতে মুক্তাদিগণ তাঁর পেছনে নামায

আদায় করতে কোন ধরনের দ্বিধাবোধ না করেন।

এ সংক্রান্ত একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

يؤم القوم افرءهم ل كتاب الله

ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ কর যার কুরআন শিক্ষা রয়েছে চমৎকার।

فان كانوا فى القراة سواء যদি কুরআন শিক্ষা ও কেরাতে সবাই সমপর্যায়ের হন তাহলে فاعلم بالسنة যে ব্যক্তি হাদীস ও সুন্নতের জ্ঞান বেশি রাখেন তাকে ইমাম নিয়োগ কর। আর যদি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায়ও সবাই সমপর্যায়ের হন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম বানাও যে নামাযের মাসায়েল বেশি জানেন। উলামায়ে কেরাম এ কথাও লিখেছেন– যেসব বিষয়ে ইলম ও আখলাকে, স্বভাব-চরিত্রে যদি সবাই সমান হন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ কর, যে সর্বাধিক সুন্দর ও সুশ্রী হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে– যারা ইক্তেদা করবে তাদের অন্তরে যেন কোনরূপ সংকোচ বা দ্বিধা না জন্মে। সুতরাং যাকে আপনি নামাযের ইমাম নিয়োগ করবেন তাঁরও বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য করবেন। আর আপনি যদি কাউকে দেশ ও সমাজের নেতা ও নায়ক নির্বাচন করেন তাহলে কি তার বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে লক্ষ করবেন না? অবশ্যই করবেন এবং অনেক বেশি লক্ষ করবেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ.)কে সকল ফেরেশতার নেতা ও সরদার বানিয়েছেন। আর ফেরেশতারা হলেন নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ এবং পূত-পবিত্র, মর্যাদার শীর্ষে অবস্থানকারী জাত। যদি জিবরাঈল (আ.)-এর কোন বিশেষত্ব না-ই থাকত, তাহলে ফেরেশতাগণ তাঁর অনুসরণ করতেন না। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জিবরাঈল (আ.) অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। তাকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তায়ালা 'حطاع' বলেছেন। তিনি অবশ্য অনুসরণীয়। এমন কথা নয় যে, যাকে তাকে আমার দূত ও প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছি। সকল আকাশে তিনি অবশ্য অনুসরণীয়। তিনি সাইয়েদুল মালাইকা। অতএব, প্রমাণ হলো– জিবরাঈল (আ.) আমীন, রাসূল, কারীমুন নফস, শক্তিশালী, আরশের নিকটে অবস্থানকারী। অবশ্য এসবই অনস্বীকার্য। তারপরও কেউ আবার বলতে পারে– এসব কথা মেনে নিলাম। তবে আমানতদারীর গুণে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে তো সব গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্থহীন হয়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা ও দুর্বলতা। কোন কোন মানুষ নেক ও সালেহ হন। তবে তাদের পেট পাতলা থাকে। অর্থাৎ তাদের কাছে কোন গোপন কথা ও

রহস্য বলে ফেললে অল্পদিনের মধ্যেই দুনিয়ার সবার কাছে তা প্রকাশিত হয়ে যায়। তাদের নেকী ও বুযুর্গী তর্কের ঊর্ধ্বে হলেও পাতলা পেটের কারণে সব পণ্ড হয়ে যায়।

ধরা যাক, দারুল উলুম দেওবন্দের হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব– যিনি আমার আগে মুহতামিম ছিলেন। তাঁর ওফাতের দিন কয়েক আগে আমাকে অসিয়ত হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। এক বুযুর্গের নাম নিয়ে বলেছিলেন– অমুক খুবই মুত্তাকী-পরহেযগার। তাঁর স্বভাব-চরিত্রও পাক-পবিত্র। তবে গোপন কথা তাঁকে বলো না। যদি গোপন প্রকাশ ও প্রচার করতে চাও তাহলে বলো, আর যদি গোপন রাখতে চাও তবে সাবধান! কখনো তাঁর নিকট গোপন কথা বলো না। সকল গুণাবলীই ছিল তবে পেট হালকা ছিল। কোন কথা প্রকাশ করতে চাইলে তাঁকে বলে দাও। আগামীকাল সমগ্র বাজারে একথা আলোচিত হবে। সবার কাছে তিনি কথাটি বলে দিবেন। সার কথা, সকল গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও গোপনীয়তা রক্ষা করার ক্ষমতার অভাব থাকতে পারে। তাই এ ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা আর একটি বাক্যে বলেছেন– ثم امين তিনি আমানতের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ আমানতদার এবং অতি উচ্চমানের। মোট কথা, তিনি রাসূল, করিম, অবশ্য অনুসরণীয় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। তাছাড়া পূর্ণ আমানতদারও বটে। অধিকন্তু তাঁর উপাধিই হচ্ছে আমীন।

এবার কথা স্পষ্ট হলো– যে রাবীর (বর্ণনাকারীর) মধ্যে এমন সব গুণাবলী রয়েছে– রিসালাত, বুযুর্গী, তাকওয়া ও পরহেযগারী, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্তি প্রভৃতি– তাঁর রেওয়ায়েত গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করা হবে কেন? এতসবের পরও যদি কেউ অবিশ্বাস করে, প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই তাকে দংশন করবে, দোষারোপ করবে। কেননা তা হবে যুক্তি পরিপন্থী। রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে রাবীর আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র দেখা হয়। যখন তার কাজকর্ম, আমল শুদ্ধ-সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তখন তার রেওয়ায়েত গ্রহণ না করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত হলেন কালাম অবতীর্ণকারী। তাঁর পবিত্র সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি এবং আয়েব-খাতার ঊর্ধ্বে। সবচে' বেশি পাক-পবিত্র। সেখানে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির অবকাশ নেই। সকল খায়র ও বরকতের উৎস হচ্ছে তাঁর মহান যাত।

الخير كله منك واليك والشر ليس اليك

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হে আল্লাহ! খায়র ও বরকত সবই তোমার। তোমার নিকটই সব ফিরে যাবে। মন্দ ও শর তোমার কাছেও যেতে পারে না। তোমার যাত ও সত্তা পাক এবং পবিত্র। বাইরের মন্দ ও খারাবী তোমার ধারে কাছেও যেতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যে কালাম বলে দিবেন– তাতে কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয় ও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকে না। যদি থাকত তাহলে রাবী ও বর্ণনাকারীর কারণে থাকত যে, রাবীর মধ্যে এই দোষ এবং এসব ত্রুটি রয়েছে। তাই বর্ণনাকারীর গুণাবলী প্রচলিত নিয়মনীতি মোতাবেক বর্ণনা করে দিলাম। শুধু তাঁর রবুবিয়তের কারণে বাধ্য ও অপরাগ হয়ে মেনে নিও না। যাঁর মাধ্যমে কালাম প্রেরণ করা হয়েছে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী তাঁকে যাচাই-বাছাই করে দেখে নাও না, রাবীদের মানদণ্ডে তিনি পরিপূর্ণ রাবী হতে পারেন কি-না!

এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা তাঁর রেওয়ায়েত গ্রহণ করবে না, অথচ তাঁর মধ্যে সকল গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। আল্লাহ নিজেও আমীন, বাহক ও মাধ্যমও আমীন। তারপর হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল বলা হয় ঐ মহান ব্যক্তিত্বকে যিনি মাসুম হন– নিষ্পাপ হন। সকল মন্দ ও পাপাচার হতে পাক-পবিত্র, সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর প্রেমে নিমজ্জিত। আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, এমন মন্দ কাজের নাম-গন্ধও নেই তাঁদের মধ্যে। যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كان يذكر الله فى كل احيانه

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকরশূন্য ছিল না।

সবসময় তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ। মুখে আল্লাহর যিকর। কল্‌ব ও রূহ দ্বারা আলাদা আলাদা যিকর হচ্ছে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হচ্ছে। কোন মুহূর্তই আল্লাহ তায়ালার যিকরশূন্য ছিল না। সর্বক্ষণ আল্লাহর জালাল ও জামালের মোশাহাদায় ব্যস্ত। যে মহান যাত সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন তাঁর সম্পর্কে এমনটা কল্পনায়ও আসতে পারে না, মা'য়াযাল্লাহ! তিনি মিথ্যা ও ভুল কথা বলেছেন। আর তাও আবার আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে! বিবেক-বুদ্ধি তা মেনে নিতে পারে না। অবতীর্ণকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা। কালামের বাহক হলেন জিবরাঈল আমীন এবং যাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হচ্ছে তিনি পয়গম্বর। আর শুধু পয়গম্বরই নন; বরং শেষ পয়গম্বর। খাতামুন

নাবীয়্যিন, খাতামুন মুরসালিন। যার অর্থ হলো– নবুওয়তের যত কামালত ও গুণাবলী রয়েছে, সবই এ মহান সত্তার ওপর পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। নবুওয়তের কোন দরজা ও স্তর অবশিষ্ট থাকেনি, যা অন্য নবী প্রেরণ করে পূর্ণ করা হবে। সকল কামালত– ইল্‌মী, আমলী, আখলাকী– এসবেরই পরিসমাপ্তি এ মহান সত্তার মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে।

দিয়ানত ও আমানতদারী অসমাপ্তকারীর বর্ণনা অস্বীকার করা যায় না

এ কারণেই তাঁর নাম খাতিম। তিনি খাতিমুল আম্বিয়া, খাতিমুর রাসূল। খাতিমের অর্থ এ নয় যে, তিনি নবুওয়তকে খতম করে দিয়েছেন। নবুওয়ত বন্ধ হয়ে গেছে; বরং খাতিমের অর্থ হলো– এই নবুওয়তকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে যাতে নবুওয়তের এমন কোন দরজা, এমন কোন স্তর অবশিষ্ট থাকেনি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার ওপর পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়নি। খাতিমের অর্থ হলো– কামালত ও গুণাবলীর চরম পূর্ণতা সাধন। এর ওপরই কামালত তার পূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্য খাতিমে নবুওয়তের অর্থ নবুওয়তের নিঃশেষ ও বিচ্ছেদকারী নয়। যে নবুওয়তের ধারাকে কেটে দিয়েছেন; বরং খাতিমের অর্থ হলো পূর্ণতা সাধনকারী। এক মহান সত্তার ওপর নবুওয়তের সকল স্তর, সকল মর্যাদা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এখন এ মহান নূর কেয়ামত পর্যন্ত আলোময় আলোকোজ্জ্বল থাকবে। এমন কোন স্তর বাকী নেই যাতে অন্য কোন নবী, চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি বা অন্য কোন গ্রহের প্রায়োজন আছে। আলো বিকিরণের জন্য আমিই যথেষ্ট। সুতরাং খাতিমের অর্থ পূর্ণতা সাধনকারী, বিচ্ছিন্নকারী নয়। খাতিমুল আনওয়ারের অর্থ কাতিউল আনওয়ার নয়। আলো বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়া তার কাজ নয়; বরং এর অর্থ পূর্ণতা সাধন করা, পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পাওয়া।

এটি একটি মৌলিক কথা– যে জ্ঞান কোন ব্যক্তির ওপর শেষ হয়ে যায়, শুরুটাও সেখান থেকেই হয়। তিনিই আরম্ভকারী এবং সমাপ্তকারীও তিনিই। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনি সূর্যকে খাতিমুল আনওয়ার বললেন। অর্থাৎ সকল নূর ও জ্যোতি এখানে শেষ হয়ে গেছে। তাহলে নূর ও জ্যোতির শুরুটাও সূর্যতে; সূর্যের আলোতেই তারকামণ্ডল আলোকিত এবং তা ঝলমল করছে। সব জ্যোতির্বিদ একমত যে, চন্দ্র ও তারকারাজির নিজস্ব কোন আলো ও জ্যোতি

নেই। সূর্যের আলো এসে পড়ে, আর এর দ্বারাই চাঁদ-তারা ঝলমল করে ওঠে, আলোকময় হয়ে যায়। নিজস্ব ও সত্তাগত আলো ও জ্যোতি আছে সূর্যের। ফলে সূর্য যেমন নূর ও আলোর পরিসমাপ্তিকারী, তেমনি নূর ও জ্যোতির উৎস এবং কেন্দ্রও বটে। নূরের শুরুটা সূর্য থেকে শেষও সূর্যতেই। এখন যদি আপনি বলেন– হযরত আদম (আ.) খাতিমুল আবা। অর্থাৎ পিতৃত্বের সমাপ্তকারী। তিনি আপনারও পিতা, আপনার পিতারও পিতা, তার পিতারও পিতা। এক দীর্ঘ সিলসিলায় সকলের সকল পিতার পিতৃত্ব হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তাঁর পর অন্য কোন পিতা নেই। তাহলে যিনি পিতৃত্বের সমাপ্তিকারী তিনি ফাতেহ ও সূচনাকারীও হন। পিতৃত্বের ধারা সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। তিনি না হলে পরবর্তীরাও পিতা হতেন না, পিতৃত্বের মর্যাদা পেতেন না। সুতরাং কোন বিশেষ জ্ঞান ও সিফতের সমাপ্তকারী যিনি হবেন, সূচনাকারীও হবেন তিনিই।

আপনি এভাবে বলতে পারেন– আল্লাহ তায়ালা হলেন খাতিমুল ওজুদ অর্থাৎ অস্তিত্বের উৎস। আসমান-জমিন বা আকাশ-পাতাল সকলের অস্তিত্ব আল্লাহর পরম সত্তা (যাত)-এর ওপর গিয়ে শেষ হয়। আল্লাহর পর আর কিছুই নেই। অস্তিত্বের সকল সিলসিলা, সকল ধারা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অস্তিত্ব ও ওজুদের সূচনাই তিনি। তাঁর থেকে অস্তিত্ব শুরু হয়ে আমি আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছি। আল্লাহ তায়ালাই যদি না থাকতেন তাহলে আমি-আপনি– সকলে অস্তিত্ব লাভ করতাম কোথা থেকে? কি করে আমাদেরকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত বলা হতো?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'খাতামুন নবুওয়ত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ নবুওয়তের সকল কামালত, সকল গুণাবলী তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ ও সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে। সার কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন খাতিম, পূর্ণ ও সমাপ্তকারী তেমনি ফাতেহও বটেন। নবুওয়তের সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে, যা তিনি নিজেই বলেছেন– خلقا واخرهم بعثا সৃষ্টি হিসাবে আমি সর্বপ্রথম এবং দুনিয়াতে প্রেরণ হিসেবে সর্বশেষ। আমার পর অন্য কোন নবী আসবেন না। এজন্য তিনি খাতামুন নবুওয়ত আবার তিনিই ফাতহুন নবুওয়ত।

সার কথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান সত্তার ওপর নবুওয়তের সকল মরতবা, সকল কামালত ও গুণাবলী পূর্ণাঙ্গ ও সমাপ্ত করা হয়েছে। ফলে নতুন কোন নবী আসবেন না, প্রয়োজনও নেই। এমন কোন

দরজা ও মরতবা বাকী থাকেনি যা নতুন নবী প্রেরণ করে পূর্ণ করা হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান সত্তা সবার জন্যই যথেষ্ট।

এটাও পরিষ্কার যে, নবুওয়তের গুণাবলীর মধ্যে আমানত, দিয়ানত, সত্যবাদিতা, সততা, চারিত্রিক পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, পাপাচারের অনুপস্থিতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাতিমুন নবুওয়ত তখন তিনি খাতিমুল হায়াও বটেন। লজ্জা-শরমের সকল স্তর তাঁর ওপর সমাপ্ত হয়েছে। তিনিই ছিলেন খাতিমুল শুজাআ (বীরত্বের সমাপ্তকারী)। বীরত্বের সকল স্তর, সকল মরতবা তাঁর ওপর নিঃশেষ হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতিমুস সাখাওয়াত (দানশীল)ও ছিলেন। দানশীলতার সকল স্তর, সকল মরতবা তাঁর কাছে এসে শেষ হয়েছে। তিনি সমাপনকারী– সকল পবিত্র কামালত ও গুণাবলীর শেষ স্তরে ছিলেন। তাই যখনই তাঁকে খতিমুন নবুওয়ত বলা হয়েছে, তখনই খাতিমুল আমানতও বলা হয়েছে। তাঁর চেয়ে অধিক আমানতদার আর কেউ নেই, হতে পারে না। আর এ কারণেই তাঁর পরম শত্রু মক্কার কাফের-মুশরেকরাও তাকে 'আল-আমীন' বলে ডাকত। এবার দেখুন, কালাম ও ওহী আমীনের পক্ষ থেকে আসল। যিনি বহন করে নিয়ে আসলেন তিনিও আমীন, আর যাঁর ওপর অবতীর্ণ হলো তিনিও আমীন। একটি বার্তা তিনজন আমীনের মধ্যে রয়েছে। এরপরও একে অমান্য করার কোন কারণ বা যুক্তি কি থাকতে পারে? অস্বীকার করার কি কারণ ও যুক্তি থাকতে পারে– অথচ পৃথিবীর মানুষ এমনসব কথা ও খবর মেনে নিচ্ছে, যার বিশ্বস্ততার কোন সনদ নেই। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে কখন এসেছে, কি নিয়ে এসেছে, কে লিপিবদ্ধ করেছে, কোথায় পৌছিয়েছে– সবই বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কালামে। যে কালামের সনদ আল্লাহ তায়ালা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল (মিলিত) রয়েছে। ফলে তা বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া উচিত। পরবর্তীতে সনদের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তা তো এমন নয় যে, দু'একজন মানুষ কুরআন পাঠ করেছেন; বরং তাঁদের সংখ্যা হবে লাখ লাখ– যারা পবিত্র কুরআন তাঁদের বুকে ধারণ করে রেখেছেন। কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষিত। এক একটি হরকতও শুমারিকৃত। এক একটি তাশদীদ, জযম, জবর, জের এবং পেশ– এভাবে রুকু, সূরা শুমার করে রাখা আছে। এতে কোন ধরনের ভুল নেই, ভুলের আশঙ্কাও নেই।

হেফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা

কোথায়, কিভাবে একে আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করেছেন তা ভাবনার বিষয়। তিনি কেবল কাগজ কালিতে একে হেফাযত ব্যবস্থা করেননি। কাগজ সাগরে ফেলে দিলে লেখা মুছে যাবে, কাগজও নষ্ট হয়ে যাবে। কাগজকে মাটিতে পুঁতে ফেললে মাটি তা খেয়ে ফেলবে। কাগজ ও অক্ষর সাধারণভাবে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। কাগজের ক্ষেত্রে এসব আপদ-বিপদ রয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা কেবল কাগজের দ্বারা এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা করেননি; বরং তিনি ইরশাদ করেছেন–

بل هو ايام بيناد فى صدور الذين اوتوا العلم -

এ আয়াতগুলো এমন, যেগুলোকে আমি আহলে ইলমের বক্ষে সংরক্ষিত করেছি। কাগজ সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে আলেম ও মুমিনের অন্তরকে কাগজের ন্যায় সহজে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন আশঙ্কা নেই। কাগজ ধ্বংসশীল, মুমিনের অন্তর তা নয়। সুতরাং কুরআন শরীফকে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। কারণ স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ

আমিই এ কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণের জিম্মাদার। [হিজর : ৯]

আগে অবতীর্ণ কিতাবাদি সংরক্ষণের জিম্মা ও দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নেননি; বরং সে সমাজ ও সম্প্রদায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآ

তাওরাত আমি অবতীর্ণ করেছি, আহবার ও রাহবার (আলেম-উলামা ও সাধু সন্ন্যাসী) পয়দা করেছি। তাদের তাওরাত শিক্ষা দিয়েছি এবং আহবার ও রাহবারগণকে এর

সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছি। বলে দিয়েছি, তোমরা একে হেফাযত করো। [মায়িদা : ৪৪]

তবে তারা তা করতে পারেনি। ফলে সঠিক ও অবিকৃত তাওরাতও ভূপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকেনি। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এমন বলেননি। কারণ, এ হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব, এরপর অন্য কোন কিতাব অবতীর্ণ হবে না। ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ দীন, এরপর অন্য কোন দীন আসবে না, আসতে দেয়া হবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। তাই এ কুরআনের হেফাযত ও সরক্ষণ যদি আমাদের দায়িত্বে দেয়া হতো, তাহলে অবস্থা তো তা-ই হতো, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ যা করেছেন। পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন হতো– অবিকল সংরক্ষিত থাকত না। সর্বশেষ কিতাবের হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন, বলেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। [হিজর : ৯]

আল্লাহ তায়ালা এ দায়িত্ব কেমন বিস্ময়করভাবে পালন করেছেন। অর্থাৎ সাধারণত কুরআন হেফাযতকারীগণ কচি ছেলেরাই হয়ে থাকে। বয়স্ক মানুষ সাধারণত হেফাযত করেন না। তাদের জন্য তা কঠিনও। যদি কোন বয়স্ক লোক হেফাযত করেনও তবে হেফাযত পাকাপোক্ত হয় না। কচি ছেলেদের হেফাযত খুবই পাকাপোক্ত হয়। তাতে কোন ধরনের ত্রুটি থাকে না।

সার কথা হলো, বয়স্ক বৃদ্ধগণ যদি হেফাযত করতেন, তাহলে বলা যেত যে, বয়স্ক লোককে পবিত্র কুরআন হেফাযত ও সংরক্ষণ করার জন্য দেয়া হয়েছে– এটা ঠিকই হয়েছে। কারণ, বয়স্ক বৃদ্ধ বুদ্ধিমানগণ এ দায়িত্বের মূল্য ও গুরুত্ব বুঝবেন। তারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। ফলে কুরআনের হেফায়ত যথার্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআনের হেফাযতের সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সাথে হতো না। নিসবত ও সম্পর্ক করা হতো মানুষের দিকে। আর এর জন্য বড় বড় আলেম-উলামা, মাশায়েখ মকতবে বসে বসে কুরআন হেফাযত করতে থাকতেন। অথচ কোন মকতবে একজন বৃদ্ধকেও পাওয়া যাবে না। সেখানে দেখবেন পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা ছেলেরা হেফয করছে। দশ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন হেফয করে

নিয়েছে। তারা এ কথা জানেও না যে, পবিত্র কুরআন কী জিনিস। তারা এ কথারও খবর রাখে না যে, পবিত্র কুরআন হেফাযত করা প্রয়োজন। তাহলে তাদের মাধ্যমে যে হেফাযত ও সরক্ষণ করানো হচ্ছে, এটাকে আল্লাহ্ তায়ালারই হেফাযত বলতে হবে। যদি বয়স্ক বৃদ্ধগণ হেফাযত করতেন, তাহলে হেফাযতের নিসবত ও সম্পর্ক তাদের দিকেই করা হতো। তাছাড়া কচি ছেলেদের মাধ্যমে করানো হয়েছে। ফলে আল্লাহর হেফাযতই বলা হবে। এদিকেও লক্ষ করুন, প্রত্যেক যুগে লাখ লাখ হাফেয ছিলেন এবং আছেন। কেউ যদি কুরআনের সকল কপি ক্রয় করে (আল্লাহ না করুন) সাগরেও নিক্ষেপ করে দেয়, ডুবিয়ে দেয় তবুও কুরআন ধ্বংস হবে না, খতম হবে না। একদিনও লাগবে না পুনরায় তা লিপিবদ্ধ করে দিতে। কুরআনে হাফেযদের বুকের পাতায় লেখা রয়েছে তা। বরং লিখিত কুরআন দিয়ে আমাদের হেফাযতকৃত কুরআনকে হেফাযত করি। হিফযে কোন ভুল দেখা দিলে হাফেয সাহেব লিখিত কুরআন বের করে দেখে নেন। তবে হেফাযতের দরেমাদার লেখার ওপর নয়। হাফেয ও আলেমগণের অন্তরই হেফাযতের কেন্দ্র, হেফাযতের মাদার।

এরপর রেওয়ায়েত হলো তাওয়াতুরের সঙ্গে, আবার তাওয়াতুরও হলো তাওয়াতুর তবকা। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রত্যেক যুগে যদি তিন ব্যক্তি রেওয়ায়েত করতেন তবুও তাওয়াতুর বলা হতো। বর্তমানে তিনশ' বা তিন সহস্র নন; বরং প্রত্যেক যুগে লাখ লাখ মানুষ রেওয়ায়েত করেছেন। যুগে যুগে লাখ লাখ হাফেয বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং এ কালাম পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। কিংবা তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়াও সম্ভব নয়। আসল কথা, পবিত্র কুরআন বিস্ময়করভাবে হেফাযত করা হয়েছে। এটা অবতীর্ণকারী স্বয়ং হেফাযত করছেন।

আল্লাহর উদ্দেশ্য আকল দিয়ে বিচার করা যাবে না

সাফ কথা, পবিত্র কুরআন হলো মৌলিক ও আদর্শ সংবিধান। তাতে মূলনীতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। আনুষঙ্গিক এবং তার শাখা-প্রশাখা সকল বিষয়াদি এতে বর্ণিত হয়নি। বর্ণিত মৌলিক-নীতিগুলোর মাধ্যমে আনুষঙ্গিক বিষয়াদির মীমাংসা করে নেয়া হবে। এসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণকারী। আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করে দেয়, নির্ধারণ করে

দেয়। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বলে না দেন– আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই। এর কারণ হচ্ছে– পবিত্র কুরআন শব্দ গ্রহণ করেছে আরবি ভাষা থেকে। শব্দের আভিধানিক অর্থ রয়েছে এক রকম। অথচ পবিত্র কুরআন এ শব্দকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছে। আর ঐ অর্থই উদ্দেশ্য হবে, আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। যেমন- সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া করা, প্রার্থনা করা। তাহলে আপনি ঘরে বসে দোয়া করে নিন, আভিধানিক সালাত হয়ে যাবে। শরীয়ত সালাত শব্দ গ্রহণ করেছে আরবি অভিধান থেকে। তবে অর্থ দিয়েছে নিজের থেকে। এভাবে নিয়ত কর, এভাবে হাত বেঁধে রাখ, এভাবে দাঁড়াও, এভাবে রুকু-সেজদা কর– এই হলো সালাত। আভিধানিক সালাত কেবল দোয়া করা। আর শরীয়তের সালাত হলো ঐ সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম, যা আল্লাহর রাসূল বর্ণনা করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজে বর্ণনা না করতেন যে, সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, তোমরা অভিধানে যে অর্থ পড়েছো তা উদ্দেশ্য নয়– তাহলে আমরা সালাতের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ কেমন করে বুঝতে পারতাম? আমরা তো ঐ অর্থই বুঝে নিতাম যা অভিধানে লেখা রয়েছে।

আবার ধরুন, অভিধানে হজের অর্থ লেখা আছে ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। আপনি ঘরে বসে ইচ্ছা ও সংকল্প করে নিলেন। ব্যস, হাজী সাহেব (আভিধানিক অর্থে) হয়ে গেলন। তাহলে তো হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা, বিমানে চড়ে মক্কায় যাওয়া, আরাফাত ময়দানে গমন ও অবস্থান সবই অর্থহীন হয়ে পড়বে। শরীয়ত যখন আরবী ভাষা থেকে শব্দটি গ্রহণ করেছে, তখন অন্য আরেকটি অর্থ ঠিক করেছে। আর ঐ অর্থই হলো শরীয়তের উদ্দেশ্য। এভাবে ইহরাম বাঁধতে হবে, এভাবে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতে হবে। আরাফাতের ময়দানে গমন করতে হবে। মুজদালিফায় যেতে হবে। কুরবানী করতে হবে। এ সব কাজের সমষ্টিকে বলা হয়েছে হজ– যা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য। এখন যদি কেউ অভিধান দেখে হজ সম্পাদন করতে লেগে যায় এবং হাদীস ত্যাগ করে বসে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার আসল উদ্দেশ্য কি, তা সে কখনো বুঝতে ও জানতে পারবে না। সে যা করবে, তা হবে তার মর্জিমাফিক। আল্লাহর মর্জি মত নয়। আর পৃথিবীবাসীকে এই বলে প্রতারিত করছে, আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালার দেয়া শব্দ উচ্চারণ করছে ঠিকই, তবে এর অর্থ নিজের মনগড়া মত করছে। এটা ধোকাবাজি-প্রতারণা। এতে প্রতারিত হচ্ছে দুনিয়া। কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

ওপর যখন কুরআন নাযিল হতো, তখন তিনি কখনো এ কথা বলতেন না যে, এ আয়াতের এক অর্থ হবে এটা, আর অন্য অর্থ হবে এটা এবং যুগোপযোগী অর্থ হচ্ছে এই। ফলে এ-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে শব্দ নাযিল করেছেন, তেমনিভাবে তিনিই এর অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং সঠিক ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কল্‌ব মুবারকের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অর্থ ও উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– যখন ওহী আসত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জপ করতে থাকতেন, যাতে আল্লাহর দেয়া শব্দগুলো তাঁর হৃদয়ে পাকাপোক্তভাবে গেঁথে যায়, যেন ভুলে না যান। আল্লাহ তায়ালা এ কাজে বাধা প্রদান করলেন। ইরশাদ করলেন–

لا تحرك به لسانك

হে নবী! নিজের জিহ্বাকে নড়াচড়া করবেন না। তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াহুড়া করছেন কেন?

আরো বললেন–

ان علينا جمعه وقرانه

আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও কষ্ট করবেন না।

এটা আমার দায়িত্ব যে, আপনার অন্তরে আমার বাণী সংরক্ষিত করে দেব। আপনার জবান দিয়ে পাঠ তা করিয়ে দেব।

فاذا قرانه فاتبع قرانه

যখন পাঠ করে আপনাকে শুনানো হয় তখন আপনার কাজ হলো আপনি শুনতে থাকবেন।

আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা, মুখ দিয়ে পড়িয়ে দেয়া এসব আমার দায়িত্ব। এর মাধ্যমে জানা গেল, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে শব্দ অবতীর্ণ করেছেন, এর হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। এভাবে বলে দেবার দায়িত্বও তাঁর। আর তিনি তা নিজেই গ্রহণ করেছেন। নবীর অন্তরে অর্থও তিনিই নাযিল করেন। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে–

ثم ايعا لينا بيانه

তারপর আমারই দায়িত্ব এ আয়াতকে পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়া, ব্যাখ্যা করে দেয়া।

কেরাআত শব্দের অর্থ হলো পাঠ করা। পাঠের সম্পর্ক মুখের সাথে। আর 'বয়ান' বলা হয় খুলে দেয়াকে। এর সম্পর্ক অন্তর ও হৃদয়ের সাথে। সুতরাং শব্দ মুখে পাঠ করা হবে, আর অর্থ অন্তর ও হৃদয় দ্বারা অনুভব করা হবে; হৃদয়ঙ্গম করা হবে। আল্লাহ তায়ালা শব্দের হেফাযত সম্পর্কে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে–

ان علينا جمعه

আমারই দায়িত্ব আমিই এগুলোকে হেফাযত ও সংরক্ষণ করব।

তারপর অর্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ শব্দই ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

ثم ان علينا بيانه

তারপর আমারই দায়িত্ব একে খুলে দেয়া, একে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

হে নবী! আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, এ আয়াত এবং এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এই উদ্দেশ্য। [নাহল : ৪৪]

ওহী ও আয়াতের উদ্দেশ্য ও অর্থ যখন নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন এতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা কর। নতুন নতুন ইলম মা'আরিফের দরজা উন্মুক্ত হতে থাকবে। উদ্দেশ্য নির্ধারণ– যা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত– তা জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণা দ্বারা নির্ধারণ করা হবে না। আল্লাহর উদ্দেশ্য কি, তা নির্ধারণ করবেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর জ্ঞান-বুদ্ধি

দ্বারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকুন। এর মাধ্যমে নতুন নতুন ইলম ও জ্ঞান লাভ হবে। আর এগুলোকে কুরআনের ইলম বলা হবে। তবে আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তা হবে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য; আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। আভিধানিক উদ্দেশ্য হবে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হবে না। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও সুন্নত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়।

তাই হযরত আলী (রা.) যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে খারেজীদের মোকাবেলায় প্রেরণ করলেন তখন বলে দিলেন– যাও, তাদের সাথে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) কর। সে সময় এ উপদেশও দিয়েছিলেন যে, খারেজীদের মোকাবেলায় পবিত্র কুরআনের কোন প্রমাণ পেশ করো না। হাদীস ও সুন্নত দ্বারা তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরয করলেন– হে আমিরুল মুমিনীন! আমার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন–

اللهم علمه الكتاب والحكمة

হে আল্লাহ্! ইবন আব্বাসকে কিতাব (কুরআন)-এর ইলম ও হেকমত দান করুন।

কুরআনুল করিমের ইলমে আমার বিশেষত্ব রয়েছে। তবুও আপনি এ থেকে বাধা প্রদান করলেন– আমি যেন কুরআন থেকে কোন প্রমাণ পেশ না করি এবং হাদীস ও সুন্নত থেকে প্রমাণ পেশ করি। এর কারণ কি?

উত্তরে তিনি বললেন–

القران ذو وجوه

কুরআনের অর্থ ও ভাব অত্যন্ত গভীর।

এক একটি বাক্যের একাধিক অর্থ হতে পারে। খারেজীদের মোকাবেলায় একটি আয়াত থেকে অন্য অর্থ বর্ণনা করবে আর তা তারা প্রমাণস্বরূপ তোমার বিপক্ষে দাঁড় করাবে। ফলে সাধারণ মানুষ বলবে– এরা কুরআন থেকে বলছে, ওরাও কুরআন থেকে বলছে। তারা সন্দেহে পড়ে যাবে। হাই হক ও বাতেল, সত্য-মিথা প্রকাশ পাবে না, স্পষ্ট হবে না। আর যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজ হাদীস ও সুন্নত পেশ করা হবে, তখন

এতে অন্য কোন জিনিসের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকে না। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। আসলে সুন্নতে নববী আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকেই নির্ধারণ করে দেয় যে– এই হলো উদ্দেশ্য।

আর রাসূলের সুন্নতও যদি ব্যাপক অর্থবোধক হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন ফিকহ দ্বারা ইমাম-মুজতাহিদগণ। তাঁরা আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেন এবং এসব থেকে এমন সব মাসআলা-মাসায়েল বের করেন– আমাদের ইলম ও জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি যে পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। ইলমের মধ্যেও যেহেতু অনেক দরজা ও স্তর রয়েছে–

والذين اوتوا العلم درجات

সকল আলেম একই স্তর, একই মর্যাদার হন না; কেউ সাধারণ, কেউ মধ্যম, কেউ উচ্চস্তরের হন। আম্বিয়া (আ.)গণের মধ্যেও দরজা ও স্তরবিন্যাস রয়েছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

কোন কোন রাসূলকে আমি অন্যদের ওপর মর্যাদা দান করেছি। *[বাকারা : ২৫৩]*

আলেমগণ হলেন পরবর্তী স্তরের। তাঁদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। কেউ সাধারণ, কেউ মধ্যম, আবার কেউ রয়েছেন উচ্চস্থানীয়। উঁচুস্তরের আলেমগণ কুরআন থেকে যেসব তত্ত্ব ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবেন, মধ্যম স্তরের আলেমগণ তা করতে পারবেন না। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইজতিহাদের শক্তি দান করেছেন তাঁরা এসবের ঊর্ধ্বে। তাঁরা যা বুঝবেন, কুরআন হতে যেসব সূক্ষ্ম মাসায়েল উদ্ধার করবেন, সাধারণ আলেমগণ তা করতে পারবেন না। তবে যখন ফিকহের কোন মাসআলা সামনে আসবে, তখন আমরাও বুঝতে পারবো যে, সত্যিই এ আয়াত থেকে এ মাসাআলা বের হয়। তাই এসব মাসায়েল শরীয়ত থেকে পৃথক নয়। পবিত্র কুরআনের উদাহরণ হলো এমন– যেমন একটি পানির কূপ, তাতে পানি রয়েছে। আর ইজতিহাদ হলো যেমন ডোল, বালতি ও রশি। আপনি বালতি দিয়ে পানি ওঠাবেন। তখন বালতির মধ্যে যে পানি আসছে, তা আলাদা কোন পানি নয়; বরং ঐ কূপ হতেই আসছে। বালতি হলো মাধ্যম মাত্র। এভাবে ইমাম-মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও গবেষণা কুরআনের অভ্যন্তরে রক্ষিত গভীর জ্ঞান ও ইলম আহরণকে প্রকাশ করে মাত্র। এমনটা নয় যে, তাঁরা কুরআনে থাকা ইলম ও জ্ঞানকে বৃদ্ধি

করেছেন। কারণ, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার কারো নেই।

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

القياس مظهر لا مثبت

ইজতিহাদ কোন মাসআলা প্রমাণ ও সাব্যস্ত করে না; বরং প্রমাণিত মাসআলা স্পষ্ট করে প্রকাশ করে মাত্র।

'কুরআনের গভীরে যা লুকায়িত ছিল'– মুজতাহিদ তা বের করে উম্মতের সামনে তুলে ধরেন। সার কথা, প্রথম হলো আল্লাহ তায়ালার কিতাব কুরআন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। সুন্নতের পর মুজতাহিদদের ইজতিহাদ। তারপর উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য।

যে মাসআলাই আমরা দেখব– প্রথমে কুরআনে তালাশ করব, তারপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে তালাশ করব। তারপর হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 'ফিকহে' তালাশ করব। তারপর দেখব উম্মতের আমল কি ছিল। সাহাবা, তাবিঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাজিদীনের আমল কি ছিল– আমরা তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারি না। যেখানে একদিকে ইলমের বৃত্ত দেয়া রয়েছে, যা শুধুমাত্র শব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে এর সঙ্গে আমল করার বৃত্ত বিদ্যমান– যা পূর্ব জমানার সকল বুযুর্গানে-দীন একমত হয়ে আমল করেছেন এবং তাঁরা সকলেই একই অর্থ বুঝেছেন। সুতরাং উম্মতের ঐকমত্যের আমলকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে মেনে নেয়া হবে। তবে উম্মতের আমলের অর্থ জায়েদ, আমর, বকর এবং আমার-আপনার আমল নয়; বরং ঐ উলামায়ে রব্বানী ও মাশায়েখে হক্কানীর আমল– যাঁরা কুরআন-হাদীসকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানিয়েছিলেন। তাঁদের চাদর তোষকের মত অর্থাৎ সার্বক্ষণিক তাঁরা কুরআন-হাদীস অনুশীলন ও চর্চা করতেন। সাহাবা, তাবিঈন, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন ও ফকীহগণের আমল ও ঐকমত্যের সার্থকতা হচ্ছে– তাঁরা যদি একমত হয়ে আমলের প্রচলন করে যান, তাহলে এ আমলের উৎস নিশ্চয়ই কুরআন ও হাদীস হবে। আমরা যদি তাঁদের অনুসরণ করি, তাহলেই ঐ মূল উৎস পেয়ে যাব। তাঁদের আমলের অনুসরণ এই অর্থে নয় যে, তাঁদের আমল কুরআন-হাদীস থেকে আলাদা কোন বিষয়।

দীনি মাসআলায় সনদ দাবী করা এ উম্মতের বিশেষত্ব

সার কথা, এ আলোচনার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে– একদিকে পবিত্র কুরআন সনদে মুতাওয়াতির অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ একে রেওয়ায়েত করেছেন– যাঁদের মিথ্যা-অমূলক কোন কথার ওপর ঐকমত্য হয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অপরদিকে রাসূলের কালাম হাদীসও সনদে মুতাওয়াতিরে বর্ণিত। এই উম্মত কুরআন ও হাদীসকে এমনভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করে আসছেন যে, অন্যান্য জাতি তাদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম এভাবে হেফাযত করতে পারেননি। এই উম্মত হাদীসের এক একটি শব্দ ও রাবীগণের পূর্ণাঙ্গ সনদ বর্ণনা করেন, করতে সক্ষম। حدثنا فلان আমাকে অমুক বলেছেন তাঁকে অমুক, তাঁকে অমুক শেষ পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ পৌঁছে যায়। একটি ক্ষুদ্রতম বাক্যের জন্যও এই নিয়ম। প্রতিটি হাদীসের সনদ মাহফুয এবং সংরক্ষিত। তাছাড়া মুসলমানগণ পঞ্চাশ হাজার রাবীর জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং জ্ঞান ও ইলমের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফন ও বিষয় আবিষ্কার করেছেন এবং বানিয়েছেন– যাকে আসমাউর রিয়াগল বলা হয়। এ সকল মানুষের নাম এবং তাঁদের কারদার বা কর্মনৈপুণ্য লিখে রেখেছেন। হাদীসের রাবী যাঁরা তাঁদের স্মরণশক্তি যেমন ছিল, বংশগত ও পারিবারিক অবস্থা ও মর্যাদাও তেমনি ছিল। প্রতিটি জিনিস লিখে রেখেছেন এবং এ সত্য বিষয়কে ইতিহাসের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সুতরাং পবিত্র কুরআনের সনদ যেমন মুতাওয়াতির এবং কোন হাদীসও সনদবিহীন নয়– তাছাড়া ইলমে ফিকহও এ নীতি কার্যকর। অর্থাৎ উম্মত তা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে যে, সনদবিহীন কোন কথাই তারা মানবে না। যেমন- ফিকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়া' দীর্ঘকাল ধরে সকল মাদরাসায় পাঠ্য কিতাবরূপে বিবেচিত। এরও সনদ বর্ণনা করা হয়– হিদায়ার প্রণেতার কাছ থেকে যাঁরা হিদায়ার রেওয়ায়েত করেছেন। জেনে নেয়া হয়, সনদের ধারাবাহিকতা আমাদের সনদপ্রণেতার সঙ্গে মিল আছে কি-না। এমনকি তাসাওউফে যাঁরা বিশেষজ্ঞ আছেন এবং কিতাবাদি লিখেছেন, তাসাওউফের মাসআলা বর্ণনা করেছেন– সেখানেও তাঁরা সনদ বর্ণনা করেছেন। যেভাবে হাদীসের সনদ বর্ণনা করা হয়। তাঁরাও মাসাইল সনদ পেশ করেছেন। আসলে পবিত্র কুরআন এ উম্মতের অভ্যাস ও মেজাজ এমন পর্যায়ে উপনীত করেছে যে, তারা দীন সম্পর্কিত কোন কথা সনদবিহীন মেনে নেবেন না। কেউ যদি কোন

দীনি মাসাআলা পেশ করে তাহলে সর্বপ্রথম তার নিকট এই বলে দাবি পেশ করা হবে– ভাই! তুমি যা বলেছ, কুরআন-হাদীস, ফিকাহ বা উম্মতের আমলে তা আছে কি-না। সাহাবা (রা.) এবং তাবেঈগণ এ আমল করেছেন কিনা? তাঁদের কারো মধ্যে যদি এ আমল পাওয়া না যায়; তাহলে এ কথা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই নতশিরে, অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করা হবে।

সঠিক সনদে প্রমাণিত হলে অনুসরণ করা ফরয

এতে আরও একটি বিষয় জানা গেল, সকল মানুষ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও পূর্বসুরীদের সনদের জন্য মুহ্তায বা মুখাপেক্ষী। বিষয়টি ছোট কি বড় তা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে তাঁরাও প্রত্যেক ব্যাপারে সনদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এতে এটাই তো প্রমাণ করে যে, তাঁদের মহব্বত ও ভালোবাসার মূল জড়িত আল্লাহর সঙ্গে, তারপর তাঁদের প্রমাণের সম্পর্ক মহব্বত ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে। এরপর এই মহব্বত ও আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সঙ্গে। মহব্বত ও ভালোবাসার এ ধারাবাহিকতা সজীব ও চালু রয়েছে এবং থাকবে। যদি ইমামগণ এ ধারাকে মাহফুয (সুরক্ষিত) না রাখতেন, তাহলে ছোটখাট মাসায়েলে মানুষ তাদের দিকে রাজী হতেন না। শায়েখ-মাশায়েখগণ যদি প্রিয় না হতেন, তাহলে মানুষ তাঁদের কোন কথাই রেওয়ায়েত করতেন না। অথচ তাঁদের কথা নতশিরে মেনে নেয়া হয়, সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হয়। আর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যদি প্রিয় না হতেন, তাহলে তাঁদের ইজতিহাদ কেউ কখনো গ্রহণ করতেন না। এজন্য বলি, আল্লাহ তায়ালার মহব্বত, রাসূলের মহব্বত, ইমামগণের মহব্বত, ফকীহগণের মহব্বত, শায়খ ও মাশায়েখের মহব্বত প্রতিটি মুমিনের অন্তরে জাগরূক রয়েছে। সকলেরই মহব্বত ও প্রেমে তাঁরা আসক্ত। যদি কেউ তাঁদের সম্পর্কে বলে, এদের অন্তরে বুযুর্গানে-দীনের মহব্বত ও ভালোবাসা নেই, তাহলে এরচেয়ে বড় প্রতারক আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁদের অগাধ মহব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে। উলামা-মুজতাহিদীনের সঙ্গে, ফকীহগণের সঙ্গে, মাশায়েখের সঙ্গে মহব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁদের কথাবার্তা পেশ করা হয়। আমরা যখন বলি যে, হযরত জুনায়েদ (রহ.) এমনটা বলেছেন, হযরত শিবলী (রহ.) এ কথা বলেছেন– তাঁরা সকলেই আমাদের বরণীয়, আমাদের পথপ্রদর্শক। সনদের

মাধ্যমে যদি কোন কথা প্রমাণিত হয়, আমরা মাথা পেতে মেনে নিই। তাসাওউফ, হাদীস, তাফসীর সবই তাঁদের শিরোধার্যে। সকলের প্রেমে তাঁরা বন্দী, সকলের মহব্বত ও ভালোবাসায় তারা নিমজ্জিত। সার কথা, দীনের প্রথম চাওয়া হচ্ছে সনদ। সনদের পর যে স্তর, তা হচ্ছে ইত্তেবা ও অনুসরণ। সহীহ সনদে যখন কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন আমাদের কর্তব্য ও ফরয হলো ইত্তিবা করা, অনুসরণ করা। ধর্মীয় ব্যাপারে মত প্রদান, নিজ মতামতের ভিত্তিতে কোন মাসআলা বর্ণনা করা কোনক্রমেই ঠিক হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

কোন মুসলমানের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (পক্ষ হতে) হুক এসে যাওয়ার পর নিজের মত ব্যক্ত করবে; আল্লাহর আদেশ এসে যাওয়ার পর এ অধিকার রহিত হয়ে গেছে। [আহযাব : ৩৬]

এই অধিকার আর থাকেনি। তাই তাদের করণীয় কাজ কেবল একটিই। আর তা হলো অনুকরণ ও আনুগত্য। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর নিজের মত প্রকাশ করার সুযোগ থাকে না। অবশিষ্ট থাকে কেবল আমল করে যাওয়া। ফুকাহায়ে কেরাম এবং উম্মতের আমল প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর টালবাহানা করার সুযোগ নেই। তখন কেবল আমল করা, শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা, প্রস্তাব ও সাজেশন দেয়ার জন্য নয়। প্রস্তাব তো আল্লাহ তায়ালাই করেছেন। আমাদের কাজ প্রস্তাব দেয়া নয়; বরং আমাদের কাজ তাহবীয। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা যা-ই বলেন তা শিরোধার্য মনে করা। এতেই আছে উভয় জগতের কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তি। এর মাধ্যমে দলাদলি পার্টিবাজি, বিভেদ-বিচ্ছেদের মূল উৎপাটন হয়ে যায়। কুরআন-হাদীস দিয়ে কখনও দলাদলি হয় না, হয় বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ানোর কারণে। দলাদলি সৃষ্টি হয় মনগড়া বিষয়াদির দ্বারা। যদি পরিষ্কার হাদীস কিংবা ফিকাহ'র মাসআলা বিদ্যমান থাকে এবং উম্মতের আমলও যুক্ত থাকে, তাহলে ইখতেলাফ বা মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকে না।

কোন কোন সময় অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে অভিমত প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোন বুযুর্গের সঙ্গে কারও আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসা থাকায় সে তার কোন কাজকে শরীয়তের বিধান হিসেবে সমাজে উপস্থাপন করল। আবার কারও সঙ্গে কারও শত্রুতা আছে। ফলে তার কোন কথা শুনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে দিল। এ জাতীয় বিধান গ্রহণ ও বর্জন সীমাহীন মহব্বতের কারণে অথবা শত্রুতার কারণে হয়। কোন কোন সময় অসৎ বুদ্ধির কারণে কিংবা মন্দ নিয়তের কারণেও এমন হয়ে থাকে। নিয়ত যেখানে খারাপ, সেখানে দীনের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে শরীয়তের পরিষ্কার আদেশ সামনে এসে গেলে এসব বিতর্কিত বিষয়ের কোন অস্তিত্বই থাকে না, তা অকর্মণ্য হয়ে যায়। দীনের ব্যাপারে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার কোন সুযোগ নেই। দীন এমন একটি মহাসম্পদ– আমাদের নিকট এক মহাসত্তার কাছ থেকে যার আগমন হয়েছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হলো, এর সামনে মাথানত করে দেয়া, অবনত মস্তকে মেনে নেয়া।

সার কথা– এ-ই হলো দীনের মানদণ্ড বা মাপকাঠি। আমি বলছিলাম– আমার পরিচিতি আমিই বর্ণনা করব। আসলে 'আমি' কোন কিছু নই। আমি আলেম, ফাযেল কিছুই নই। উলামায়ে কেরামের জুতা ঠিক রাখার কাজ করেছি শুধু। আর এতেই তাঁদের সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক হয়ে গেছে। যাঁদেরকে আকাবিরে দেওবন্দ বলা হয়, তাঁদের চালচলন, রীতিনীতি আমি দেখেছি। প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কিতাব পবিত্র কুরআন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত, হানাফী ফিকাহ কিংবা যে ফিকাহর অনুসারী (হাম্বলী, শাফেঈ ফিকাহ), উম্মতের আমল এবং উম্মতের সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা– কোন পথে উম্মত চলছে আর কোন পথের ওপর পূর্বসুরী বুযুর্গানে-দীন চলেছেন– এসবই ছিল তাঁদের আদর্শ, এটাই ছিল তাঁদের মাসলক (ধর্মীয় পথ)। আর এর মধ্যেই কুরআন হাদীস, ফিকাহ-তাসাওউফ, শরীয়ত-তরীকত সবই রয়েছে। এটারই অনুসরণ করতে হবে। আমি কোন আলেম, ফাযেল নই। দারুল উলুম দেওবন্দের একজন সাধারণ তালেবে-ইলম। তবে ঐ বুযুর্গানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে বালুকণার। যদিও বালুকণা ছোট ও তুচ্ছ জিনিস। সূর্যের আলো যখন তার ওপর পড়ে তখন এ ক্ষুদ্র বালুকণা এমনভাবে ঝলমল করে ওঠে, চমকাতে থাকে যে, মনে হয় যেন হীরা চমকাচ্ছে। অথচ এ তার নিজস্ব চমক নয়। এ চমক হচ্ছে সূর্যের। সূর্যের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক থাকার কারণে ঝলমল করে চমকাচ্ছে। তাই বলছিলাম, সম্মানিত মেজবান! অভিনন্দন-পত্রে যেভাবে আমার পরিচয় প্রদান করেছেন, পরিচিতি বর্ণনা করেছেন, তা আমার পরিচিতি নয়; বরং

তাঁরা তাঁদের নিজেদের পরিচিতিই বর্ণনা করেছেন। যেহেতু তাঁরা উদার ও উচ্চমনা। ফলে আমাদের ন্যায় ছোটকেও বড় বানাতে, সম্মান দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমাকে বড় করে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁদেরই উচ্চমান, উন্নত নৈতিকতা এবং উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। আমার পরিচয় কেবল এটুকুই– আমি কিছুই না। তবে সম্মানিতদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক রয়েছে–

گرچہ خوردیم نس تی است بزرگ درزافتابے تابانیم

আমি যদিও তুচ্ছ হীন কিন্তু আমার সম্পর্ক ও মহব্বত সম্মানিত বুযুর্গানের সঙ্গে রয়েছে। তাঁরা সকলেই বুযুর্গ ছিলেন। আমাদের নাম তাঁদের বরকতেই উচ্চারিত হয়, আমাদের আদর-যত্ন করা হয়। তা না হলে আমাদের মধ্যে অন্য আর কি-ই বা রয়েছে? মোট কথা, আমাদের সামনে মূল বিষয় হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালার কিতাব পবিত্র কুরআন, সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মতের আমল, ইসলামী ফিকাহ (আইনশাস্ত্র), শরীয়ত ও তরীকতের পথে মর্যাদাবান পূর্বসুরীদের মহব্বত এবং ভালোবাসা, তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। এসব এমন জিনিস, যার ওপর প্রকৃতপক্ষে দীন ও শরীয়তের দারমদার নির্ভরশীল।

দীনের মূলভিত্তি হলো সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ

দীনের ভিত্তি আদব, শ্রদ্ধা ও সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেয়াদবী ও গোস্তাখির ওপর নয়–

بے ادب محروم ماند از فضل رب

ধর্মীয় ব্যাপারে যে আস্থাহীন, নির্বিকার, ভীতিশূন্য– পরকালে তার জন্য কিছুই থাকবে না; আল্লাহওয়ালাদের আস্থাভাজন হতে পারবে না। যেমন- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

হে ঈমানদারগণ! নবীর মজলিসে বসে নবীর আওয়াজের থেকে নিজের আওয়াজ উঁচু করো না। [হুজুরাত : ২]

যেন এমন না হয় যে, এ দুঃসাহসের কারণে তোমাদের সকল আমল ধ্বংস না

হয়ে যায়! এটা হচ্ছে রাসূলের আদব ও সম্মান। আদব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে–

لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ

তোমরা পাক-সাফ বা অযু না করে কুরআন শরীফ স্পর্শ করো না। [ওয়াকিয়া : ৭৯]

মসজিদের আদব সম্পর্কে বলা হয়েছে– যখন মসজিদে গমন কর তখন ধীরস্থির আদবের সাথে যাও।

لا تأ توها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون

মসজিদে দৌড়ে এসো না, যেমন ছেলেরা দৌড়ে আসে। এটা হীনকর; বরং গাম্ভীর্য, শান্ত, ধীরস্থিরভাবে আস। এটাও বলা হয়েছে– মসজিদের ভেতরে পার্থিব কথাবার্তা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করো না। আল্লাহর যিকির ও নামাযে ব্যস্ত হয়ে যাও। দরূদ শরীফ পাঠ কর। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত কর। ঝগড়া-ফ্যাসাদ পেছনে ফেলে রেখে যাও। মসজিদে এসব নিয়ে যেও না। এটা মসজিদের আদব, মসজিদের সম্মান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ط أُوْلَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ

আল্লাহ তায়ালা বলেন– ঐ ব্যক্তি হতে দুর্ভাগা, অত্যাচারী আর কে হাতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়; মসজিদের এক হলো আকার-আকৃতি আর এক হলো তার হাকীকত ও মাহাত্ম্য। [বাকারা : ১১৪]

আকার-আকৃতি তৈরি হয় ইট-পাথরে। এগুলো নষ্ট-নিশ্চিহ্ন করে দেয়া মানে মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়া। অন্যটি হলো– এই ইটগুলো খুলে ফেলা হয় না বটে তবে পার্থিব কথাবার্তা বেহুদা অনর্থক বাতচিত এত উচ্চৈঃস্বরে করা হয় যে, এর দ্বারা যিকিরকারীগণের যিকিরে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। নামাযীদের নামাযে, তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াতে অসুবিধা হয়। ফুকাহাগণ এসব করতে নিষেধ করেছেন। বরং তেলাওয়াতও এত উচ্চৈঃস্বরে করো না যাতে অন্যদের

যিকিরে অসুবিধা হয়। এটা হচ্ছে মসজিদের হাকীকত ও মর্যাদা ধ্বংস করে দেয়া। কারণ মসজিদের হাকীকত হচ্ছে যিকরুল্লাহ। আল্লাহর যিকিরে যখন তুমি বাধা হয়ে দাঁড়ালে, অন্যকে বাধা প্রদান করলে তখন মসজিদের আকার-আকৃতিকে ধ্বংস করোনি ঠিক; তবে মসজিদের মূল হাকীকতকে ধ্বংস করে দিয়েছ।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে অনাবশ্যক দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা এতটাই দূষণীয়, যেন মসজিদে শূকর জবাই করা। অর্থাৎ মসজিদ অপবিত্র করে দেয়ার শামিল। তাই মসজিদ, বাইতুল্লাহ, হারাম শরীফ, আম্বিয়া (আ.), আওলিয়া, আসমানী কিতাবাদি এসবের আদব ও সম্মান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সমগ্র দীনের ভিত্তি আদব, শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)– যাঁর আলোচনা আপনারা অল্পক্ষণ আগেও শুনেছেন– তিনিই দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি রেখেছিলেন। তিনি চিশতিয়া সিলসিলার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। আমাদের এ সিলসিলা হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, আজমিরী (রহ.), হযরত খাজা সাবির কালইরী (রহ.)-এর মধ্য দিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। এসব বুযুর্গের মধ্যে চিশতিয়াতের প্রাধান্য ছিল। যদিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কাদেরিয়া, সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া, নকশবন্দিয়া তরীকায়। ঐসব তরীকার যিকির-আযকারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যার যেমন যোগ্যতা, সে মোতাবেক তার তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের নিকট চারটি সিলসিলা থাকলেও প্রাধান্য ছিলো চিশতিয়া তরীকার।

হযরত মাওলানা কাসেম (রহ.) বছর, দু'বছরের মধ্যে অন্তত একবার হযরত সাবির কালিরীর মাজারে উপস্থিত হতেন। আর অবশ্যই রুড়কি থেকে নদীর তীর ঘেঁষে যে রাস্তাটা গেছে, সেটাই কলির গেছে। প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরত্ব হবে। তিনি সেখানে পৌঁছার পর জুতা খুলে হাতে নিতেন। পাঁচ-ছয় মাইল পথ জুতাবিহীন অবস্থায় অতিক্রম করতেন। কেন এমন করেছিলেন? এটা হচ্ছে মাশায়েখে তরীকতের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন। যাঁদের জুতার বরকতে আমরা আখলাক শিখেছি, যাঁদের কারণে আমাদের নফ্‌স ও প্রবৃত্তি পাক-সাফ হয়েছে, তাঁদের দান ও ইহসানকে আমরা কেমন করে ভুলে যাব? তাঁদেরকে মাথায় স্থান দেব না কেন? তাই তিনি পাঁচ-ছয় মাইলের দূরত্ব খালি পায়ে অতিক্রম করতেন!

হজ করতে তিনি যে কাফেলার সঙ্গে যান, সে কাফেলায় বহু উঁচুস্তরের বুযুর্গ

ছিলেন। সেই কাফেলায় হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) প্রমুখ ছিলেন। এসব বুযুর্গ একসঙ্গে গিয়েছেন। মদীনার নিকটবর্তী এক মনযিলের নাম বীরে আলী। উট যখন সেখানে পৌঁছে, তখন মদীনা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়। এ যুগের যানবাহন তো হচ্ছে মোটর, কার প্রভৃতি। সে সময় যানবাহন ছিল উট। তাঁরা উটের পিঠে আরোহণ করে রওনা হলেন মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে। মক্কা থেকে রওনা হয়ে এগার দিনে তাঁরা মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। রাস্তায় এগার রাত কাটাতে হলো। বীরে আলী নামক স্থানে এ কাফেলা যখন পৌঁছে তখন মদীনা মুনাওয়ারা দৃষ্টিগোচর হলো। এ সময় হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব উটের পিঠ হতে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেলেন এবং জুতা খুলে খালি পায়ে কংকরময় পথে হেঁটে চললেন। কংকরগুলো সূচের মত পায়ে বিঁধতে লাগল। এমন জায়গায় খালি পায়ে চলাও সম্ভব নয়। দেখা গেল, তাঁকে অনুকরণ করে অনেকেই উট থেকে নেমে পড়লেন। উদ্দেশ্য, তাঁরাও পায়ে হেঁটে যাবেন। মাওলানা গাংগুহী বললেন– মাওলানা কাসেম সাহেবের মধ্যে নবী-প্রেমের আধিক্য রয়েছে। তাই সূঁচালো কংকরের ব্যাপারেও তাঁর কোন খেয়াল নেই। পায়ে বিঁধছে তবুও তিনি ভ্রূক্ষেপ করছেন না। আর যাঁরা তাঁকে অনুকরণ করছে তারা আর কতক্ষণ চলতে পারবে? হলোও তা-ই। দেখা গেল তাদের কেউ একশ' কেউ দেড়শ' কদমের বেশি চলতে পারেননি। পুনরায় উটের ওপর আরোহণ করেছেন। আর মাওলানা সাহেব ছিলেন নবী-প্রেমে বিভোর। ফলে তিনি চলছেন তো চলছেন। পা তাঁর রক্তাক্ত হয়ে গেছে, তবুও কোন খেয়াল নেই। তিনি এক ধ্যানে হেঁটে চলেছেন।

আদবের অবস্থা ছিল এই! হারাম শরীফের মিনার দেখার পর উটের পিঠে বসে থাকার সাহস তাঁর হয়নি। নগ্ন পায়ে কংকরময় পথ চলেছেন। এসব বুযুর্গের অন্তরে শরীয়তের আদব-সম্মান কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এসব ঘটনার মাধ্যমে অনুমান করা যায়। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)– যিনি এ জামায়াতের শায়খ ও মুর্শিদ ছিলেন। তিনি ইংরেজদের রাজত্বকালে ভারত থেকে হিজরত করে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি কালো রঙের জুতা ব্যবহার করতেন না। অনেকের ধারণা জন্মে– হয়তো অবচেতনভাবেই এটা হচ্ছে। কিন্তু একজন তাঁকে হাদিয়াস্বরূপ একদিন কালো রঙের এক জোড়া জুতা পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। তিনি লাল কিংবা সবুজ রঙের জুতা ব্যবহার করতেন। হাদিয়াস্বরূপ পেশকৃত কালো রঙের জুতা গ্রহণ না করায় মানুষ বুঝতে পারল যে, এ তাঁর ইচ্ছাকৃত, অবচেতনের কাজ নয়। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– কালো জুতা ব্যবহার করা কি নিষিদ্ধ? তিনি

বললেন– না।

: তাহলে আপনি কেন ব্যবহার করেন না?

তিনি বললেন– আদবের পরিপন্থী, তাই! যে রঙ বাইতুল্লাহর গিলাফে রয়েছে আমি তা পায়ে ব্যবহার করি কেমন করে? তা হতে পারে না। যদিও শরীয়তে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে যখন আদবের প্রশ্ন থাকে, তখন মানুষ আইনের ঊর্ধ্বে উঠে আদব মতো আমল করে, করতে বাধ্য হয়।

আদবের জন্য নিয়মের বাইরে আমল কোন আইন নয়

তবে মনে রাখবেন! আইনের ঊর্ধ্বে আমলকারীর এ কাজ কোন আইন বা নিয়ম নয় যে, আপনি মানুষের মধ্যে তাবলীগ করে বেড়াবেন। তাদের উৎসাহিত করবেন এই বলে যে, কালো রঙের জুতা ব্যবহার করা ছেড়ে দাও। তোমরাও খালি পায়ে চলো। এটা তো হলো ব্যক্তি বিশেষের ব্যবস্থা। সে অবস্থা যদি আপনার মধ্যেও সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে আপনি এ কাজ অবশ্যই করবেন। আপনাকে কেউ বাধা দিবে না। তবে যদি অনুকরণ ও অনুসরণ করেন, তাহলে পয়গাম্বর (সা.)-এর অনুকরণ করতে হবে; অন্যদের অনুকরণ করা ঠিক নয়। অন্তরের অবস্থার চাপে পড়ে কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজ করে, তাহলে সেটা আলাদা বিষয়। আর যে লোক ভাঁড়ামি করে– সেটাও আলাদা। তাকে বলা হবে, এমন করো না। শরীয়তের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের নকল করো, অনুশীলন কর। এসব সবার জন্য অবশ্য পালনীয়। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, তরীকত হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত অবস্থাবিশেষ। এটা এমন কোন বিধান নয় যে, মানুষ এর অনুসরণ করবে। তরীকতের করণীয় আমল ও কাজকর্ম বলে দেয়া হবে। এগুলোর ওপর সর্বদা আমল করে কেউ যদি বিশেষ স্তর ও অবস্থানে পৌঁছে যায় তাহলে সেটা তার জন্য মুবারক হোক। তিনি তাঁর অবস্থা মোতাবেক আমল করবেন। তাঁকে দোষারোপ করার, মন্দ বলার অধিকার কারো থাকবে না। তবে তাঁর এ আমল কখনোই আইন-বিধান বলে গণ্য হবে না, স্বীকৃতি পাবে না। পৃথিবীবাসীকে এ আমলের জন্য আহ্বান করা যাবে না। মনসুরের উপর হাল ও অবস্থার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন 'আনাল হক'– আমিই সত্য। এ কথার অর্থ এটা ছিল না যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করছেন। আনাল হকের অর্থ ছিল এমন– তিনি তাঁর মধ্যে কেবল আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে বিরাজমান পাচ্ছিলেন, হকের তাজাল্লিই

প্রত্যক্ষ করতে পারছিলেন; তাঁর সত্তা বা কোন বস্তু নয়। সবখানে তিনি কেবল আল্লাহ ও আল্লাহর অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছিলেন। 'আনাল হক'-এর অর্থ হচ্ছে- নিজের মধ্যে হকের আধিক্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তখন নিজের অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকে না, সবই হারিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ– আপনি কিছুক্ষণ সূর্যের দিকে অপলক চেয়ে থাকুন। যখন সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নিবেন এবং অন্যদিকে তাকাবেন তখন সবখানে আপনি সূর্যের গোলককে লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রঙের দেখতে পাবেন। আর সব জিনিস অদৃশ্য হয়ে যাবে। দেখবেন চারদিকে শুধু সূর্যই দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি নিজের শরীরের দিকে তাকান, দেখবেন- সেখানে শরীরের পরিবর্তে সূর্যই দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় কেউ যদি বলে বসে, আপনিই সূর্য– তাহলে এর অর্থ এটা হবে না যে, আপনি সত্যি সত্যিই সূর্য হয়ে গেছেন। বরং অর্থ দাঁড়াবে– আপনার মধ্যে সূর্য এই পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সূর্য ছাড়া আর কিছু আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

মনসুরের মধ্যে ফানা (নিজেকে বিলীন করে দেয়া) এতটা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, আল্লাহ তায়ালার আনওয়ার ও তাজাল্লী এতই প্রবল ও গভীরভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, নিজের দিকে যখন তাকাতেন তখন সেখানেও আল্লাহ তায়ালার নূর ও তাজাল্লী তাঁর নিকট দৃশ্যমান হতো। এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও আল্লাহর সুন্দর তাজাল্লীই কেবল দেখতে পেয়েছেন। মোট কথা, মনসুরের যথাযথ অবস্থা ছিল, সেমতে তিনি 'আনাল হক' বলেছেন। তবে এটা কোন আইন ও বিধান নয় যে, আপনি মানুষকে এ ব্যাপারে আহ্বান করবেন। বলবেন– তোমরাও 'আনাল হক' বলতে শুরু কর। লোকজনও যদি এ কথা বলতে শুরু করে দেয়, তাহলে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হবে, তাদের হত্যা করা হবে। এ কথা বলার সুযোগ কাউকে দেয়া যাবে না যে, মনসুরও তো 'আনাল হক' বলেছেন, তাই আমরাও বলব। তাহলে কথা দাঁড়াল, প্রথমে মনসুরের অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। সে অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন নিজেকে আপন গণ্ডির মধ্যে রেখে সেরূপ কাজ করবে। কথা হলো শরীয়তের নিয়ম ও বিধান অনুকরণ-অনুসরণ ও জনসমাজে প্রচলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে ব্যক্তি বিশেষের হাল-বিশেষকে নিয়ম ও বিধানের মর্যাদা হিসেবে চালু করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেমন কোন পীর ও শায়খ পীড়িত হওয়ার ফলে তাঁর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও লোপ পেলো। ফলে তিনি বসে বসে নামায আদায় করলেন। তাঁর মুরীদরা ছিলেন শায়খের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-পীড়ায় আক্রান্ত। তা দেখে তারা গিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে, শায়খ বসে বসে নামায আদায় করেছেন। ফলে সবাই বসে বসে নামায

আদায়ের হাকীকত অনুধাবন না করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ত্যাগ করল। কারণ, শায়খ বসে বসে নামায আদায় করেছেন। এ অবস্থায় তাদের বলা হবে, শায়খ পীড়িত হওয়ার কারণে তাঁর যে অবস্থা হয়েছে, সে অবস্থা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি কর, তাহলে তোমরাও বসে বসে নামায আদায় করার অনুমতি পেয়ে যাবে। এখন তো তোমাদের সে অবস্থা হয়নি। কিন্তু শায়খের অন্ধ অনুকরণে তোমরা মেতে উঠেছ। এসব তোমাদের ভাঁড়ামি ছাড়া কিছু নয়। যখন প্রকৃত হাল কারো মধ্যে সৃষ্টি হয় তখন এসব সাধারণ বিধি-বিধান বহির্ভূত কাজকর্ম আপনা-আপনিই সাময়িকভাবে ঘটে যায়। আপনার মধ্যে তাঁদের মত প্রেমের আবেগ-আবেদন, উন্মাদনা কিছুই নেই। অথচ তাঁদের অবস্থা নিয়ে ভাঁড়ামি করেছেন, এটা খুবই জঘন্য কর্ম। অনুকরণ করুন শরীয়ত ও তার নির্দেশাবলীর। এসব হাল ও হালওয়ালাদের সম্মান কর তবে কানুন ও বিধানরূপে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে উপস্থাপন করা যাবে না।

তরীকতের মাশায়েখের অবস্থাসমূহকে সাধারণ নিয়ম বানানো ঠিক নয়

কোন মাশায়েখের বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ সঠিকভাবে তিনিই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। যাঁর অন্তরে মারেফতের নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি রয়েছে, হককে সঠিক এবং যথাযথভাবে চিনতে ও বুঝতে পেরেছেন, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে পেরেছেন– তিনিই কেবল কর্মের স্তরভেদ পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন যে, কোন পর্যন্ত তাঁর নিজের করণীয় আর কোন পর্যন্ত তাঁর সীমা ও শক্তি-বহির্ভূত। কারো ব্যক্তিগত অবস্থাকে কানুন ও বিধানরূপে উপস্থাপন বা চালু করার প্রচেষ্টা সমাজে বিবাদ সৃষ্টি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সূচনা করে। শরীয়তের বিপরীত কোন কাজ দেখলে অবশ্যই বলবেন– এটা নাজায়েয, অবৈধ। আবার আর একদল বলবে যে, বুর্যগানে দীনের (আমলের) পরিপন্থী কথাবার্তা ও মতামত যারা প্রকাশ করেছেন, তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। এ নিয়ে চলবে কথা কাটাকাটি, সৃষ্টি হবে রেষারেষি ও সমাজে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা। আসলে বুযুর্গদের ব্যক্তিগত অবস্থা আইন নয়, হতে পারে না। তাঁরা শরীয়তের বিধি-বিধানের ওপর আমল করেই এ অবস্থায় পৌঁছেছেন। যারা ঐসব বুযুর্গের সঙ্গে থেকে, তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের বিশেষ স্তরে পৌঁছে নিতে পারছেন, তাঁদেরকে দোষারূপ করব না– বরং মাথা নত করে দেব তাঁদের সামনে; তবে আপনারা যদি অযথা পাগলামী করেন,

তাহলে শরীয়তের বিধানসমূহের সাথে ভাঁড়ামি করা হবে। কারো ব্যক্তিগত বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজ করা যাবে না। কোন কোন বিশেষ অবস্থা একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে থাকে। এগুলো আইন হতে পারে না, আইনের মর্যাদা পায় না। হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (রহ.) শীর্ষস্থানীয় ওলীদের একজন ছিলেন। মাওলানা নিজামুদ্দীন (রহ.) নামে অন্য এক ব্যক্তি তাঁর মুরীদ ছিলেন। তিনি শায়খের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন– হযরত! আমার মন চায়– স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালাকে দেখি– তদবীর বলে দিন। তিনি বললেন, 'ফরয নামায' আদায় করা ছেড়ে দাও।

তা শুনে এই ভেবে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন যে, ফরয নামায ত্যাগ করলে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভ হবে না। দূরে নিক্ষিপ্ত করলে, দূরে সরে গেলে নৈকট্য লাভ হবে না– আর ত্যাগ করলে দূরে যেতে হয়– এটাই তো নিয়ম। আর হযরত বলছেন, ফরয নামায ছেড়ে দাও। আল্লাহর দর্শন লাভ হয়ে যাবে। আদবের কারণে কিছু বলতেও পারছি না। এদিকে নামায ত্যাগ করার সাহসও পাচ্ছি না। কারণ, নামায ত্যাগ করা তো সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী কাজ। এদিকে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার জিয়ারত লাভের আবেগ-স্পৃহা পরিপূর্ণ বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন মতে আল্লাহর দিদার ও জিয়ারত লাভ হয়ে যাবেই– এ আমার আকাঙ্ক্ষা। তিন চার দিন পর আবার তিনি শায়খের দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন– হযরত! আমার প্রাণ স্বপ্নযোগে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ ও দিদার লাভে ধন্য হতে খুবই অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়েছে। কোন তদবীর বা পথ বলে দিতে মর্জি করুন!

শায়খ আবারও বললেন– আরে বোকা! বলে তো দিয়েছি, ফরয নামায ছেড়ে দাও!

বেচারা আবারও নীরব হয়ে গেলেন আর ভাবতে লাগলেন– কেমন করে শায়খ এ কথা বলছেন! এ কথা বলার তাঁর সাহসই বা হলো কী করে যে, ফরয নামায ছেড়ে দাও!

বেশ কিছু দিন পর এসে তৃতীয়বার আবার একই কথা বললেন।

শায়খ বললেন– তুমি খুবই বোকা! বারবার আমার সময় নষ্ট করছ। তদবীর তো বলে দিয়েছি যে, ফরয নামায ছেড়ে দাও!

এরপরও তার এতটা সাহস হলো না যে, ফরয নামায ছেড়ে দিবে। ফরযতো পড়ে নিলেন তবে সুন্নত নামায ছেড়ে দিলেন। রাতে স্বপ্নে হযরত রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিয়ারত হলো। তিনি বলেছেন– ভাই! আমি কি অপরাধ ও ত্রুটি করেছি যে, আমার সুন্নত ছেড়ে দিলে?

'রাহে ইতিদাল ওয়ায'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এ ঘটনা মাওলানা ফখরুদ্দীন নিজামীর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এটা দেখে বেচারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সুন্নত পড়ে নিলেন। সকালে শায়খের খেদমতে হাজির হলেন এবং গত রাতে যা ঘটেছে তা আরয করলেন। তিনি বললেন– যদি ফরয নামায ছেড়ে দিতে তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নামায পড়াতেন। তুমি তো কেবল সুন্নত ছেড়ে দেয়াকে যথেষ্ট মনে করেছ।

মুহাক্কিকগণই শরীয়ত ও তরীকত একসঙ্গে চালাতে পারেন

এটি এমন একটি বিষয় যার দু'টি দিক রয়েছে। এক হলো বেয়াদবী আর অন্যটি হলো চরম ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতার দিক হলো এই– মাওলানা শায়খ নিজামুদ্দীন ফরয নামায ত্যাগের কথা বলে মারাত্মক ভুল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন আর তিনি বলেছেন ছেড়ে দাও। আমরা তাঁর কথা মানব না, মানতে পারি না। তাঁর কথা আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করব। এটাও ধ্বংসের একটি পথ। কারণ যুগের শায়খ ও পীরের সঙ্গে গোস্তাখি করা হলো।

অপর রাস্তাটি হচ্ছে, আমাদের জানা নেই কুরআন-হাদীসে কি রয়েছে। নামায কি-না–

پے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید-

কামেল পীর যদি বলেন তবে শরাব দিয়ে মুসল্লা লালে লাল করে দাও।

'শায়খে ওয়াক্ত' বা যুগের কামেল পীর হলেন ناطق (কুরআনের ব্যাখ্যাকারী)। আমরা তাঁর কথা ও নির্দেশের ওপর আমল করব। আমরা জানি না কুরআন-হাদীসে কি রয়েছে। এটাও ধ্বংসের পথ যে, শায়খের কথা উপর কুরআন-হাদীস ত্যাগ ও বর্জন করে দেয়া কিংবা কুরআন-হাদীসের নাম নিয়ে মাশায়েখের তরীকা ত্যাগ ও বর্জন করা। উভয় পথই ধ্বংসের। কুরআন-হাদীসের সাথে বেয়াদবী ও গোস্তাখি যেমন নাজায়েয-অবৈধ, তেমনি শীর্ষস্থানীয় ওলীগণের সঙ্গে

বেয়াদবী ও গোস্তাখি করাও নাজায়েয। হক ও মধ্যম পথ এবং পন্থা হচ্ছে– এক হাতে থাকবে পবিত্র কুরআন, অন্য হাতে থাকবে বুযুর্গানের দামন (আঁচল) এবং উভয়কেন্দ্রিক পথে চলবে। তবে এ পথ মুহাক্কিক বুঝতে পারলেও গায়ের-মুহাক্কিকের সামর্থ্য বহির্ভূত। এ ঘটনা আমাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন– হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর খেদমতে ঘটনাটি পেশ করা হয়েছিলো। তখন সেখানে উপস্থিত কেউ কেউ বলে ফেললেন– আমরা এ কথা মানি না। এটা কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী! এই বলে তা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার কেউ কেউ বললেন– আমরা এ কথা গ্রহণ করি। কারণ কাগজে লিপিবদ্ধ কুরআন-হাদীস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। হাজী সাহেব বললেন– এ উভয় পথই ধ্বংসের পথ। হক ও মধ্যমপন্থা হচ্ছে– উভয়ের সম্মান ও মর্যাদা বহাল থাকবে এবং মানুষ মধ্যপথ দিয়ে চলবে। জানতে চাওয়া হলো– ঐ মধ্যপথ কি? উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা বাস্তবিকই। প্রকৃত ও সঠিক কথাই ছিলেন। বলছিলেন– প্রথমে একটি কথা বুঝে নাও। দেখবে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। কথাটা হচ্ছে– আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে দু'টি শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণী হলেন, ঐ সকল বুযুর্গ যারা নিজেদের রিয়াজত-মুজাহাদা, চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা কোন উচ্চ মাকাম ও মর্যাদায় পৌঁছেছেন, কুতুব হয়েছেন, গাওস হয়েছেন। তাঁরা পরিশ্রম করে উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আরেক শ্রেণীর ওলী হলেন– ঐ সকল মহান ব্যক্তি, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজেই ইচ্ছা করেছেন যে, তাঁদেরকে ঐ স্থান ও মর্যাদায় পৌঁছাবেন। তাঁরা যদি যেতে নাও চান, তবুও এমন সব অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে, তাঁরা ঐ স্থানে পৌঁছে যেতে বাধ্য হবেন। এর উদাহরণ ঠিক এমন– মনে করুন, এক লোক নিজের পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতার মাধ্যমে উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমে পুলিশে সে কনস্টেবল পদে নিয়োগ পেয়েছিল। তারপর সততার সাথে কর্তব্য পালন করে প্রমোশন পেয়ে এ বিভাগের সর্বোচ্চ পদ আইজি হয়ে গেল। এরপর আরো বেশি পরিশ্রম করে কাজ করল এবং অত্যন্ত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিল। তার কাজ দেখে সরকার তাকে স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী নিয়োগ করে দিল। এবার সর্বোচ্চ পদে পৌঁছে গেল। আরেকজন হলো ঐ ব্যক্তি যে রাজ-পরিবারের একজন সদস্য। সরকারের ইচ্ছা হলো একে পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করা। তাই তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সরকারই করেছিল। এখন যদি সে পালিয়েও যায়, তবুও তাকে ধরে আনা হবে। কারণ, তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তার হাতে দেশ ও রাজ্য

সোপর্দ করতে হবে। ওলীদের মধ্যে উভয় প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। কেউ কেউ নিজের সাধনা, রিয়াজত ও মুজাহাদার মাধ্যমে মাকামাত পার হয়ে উচ্চ মাকামে পৌঁছে যান। আবার কেউ কেউ থাকেন নির্ধারিত। তাঁরা এ পথে আসতে না চাইলেও জোর করে বাধ্য করে তাঁদেরকে এ পথে আনা হবে। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে উপবিষ্ট আছেন। হঠাৎ মুচকি হাসি দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন– হযরত! কোন বিষয় আপনাকে হাসিয়েছে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি কিছুসংখ্যক মানুষ বেহেশতে যেতে চাচ্ছে না। তাদের পায়ে শিকল পরিয়ে বেহেশতে নিয়ে যেতে টানা-হেঁচড়া করা হচ্ছে। এরা ঐ সকল লোক যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে।

সুফীগণের পরিভাষায়– যাঁরা নিজ চেষ্টা-সাধনা, রিয়াজত ও মুজাহাদার মাধ্যমে মাকামাত পার হয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করেন, তাঁদের মুরীদ বলা হয়। আর যাঁরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্বাচিত, তাঁদের বলা হয় মুরাদ (উদ্দেশ্য)। একদল হলেন মুরীদ– যারা তাদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করেছেন। আরেক দল হলেন মুরাদ– যাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁরা যেতে ইচ্ছুক না হলে বলপূর্বক নেয়া হবে এবং উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়া হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা হবে মর্যাদাবান হিসেবে।

পবিত্র কুরআনেও এ দুই মাকামের বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কুরআনের পরিভাষা আলাদা। যারা পরিশ্রম করে এগিয়ে যান, তাদেরকে কুরআনে মুনীব বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দিকে ইনাবত ও রুজু করে, ঐ পথে শ্রম-সাধনা করে উন্নতি করেন এবং যথাস্থানে পৌঁছে যান। আর যারা নির্বাচিত, তাদের বলা হয় 'মুজতবা' (মনোনীত)। ইরশাদ করা হয়েছে–

الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত ও নির্বাচিত করে নেন, তাকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেন। আর যে হেদায়াত ইনাবত এবং মেহনতের পথ গ্রহণ করে তাকেও গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেন, উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন। একদল হলেন 'মুজতবা' আরেক দল মুনিব।

আর সুফীগণের পরিভাষায় মুরীদ ও মুরাদ। একথা বলে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বললেন– এ-ই হলো মধ্যপথ। মাওলানা নিজামুদ্দীনের সঙ্গেও বেয়াদবী

হবে না, কুরআন-হাদীসের সঙ্গেও না। হাজী সাহেব বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখার দরখাস্ত করেছিল, তার সম্পর্কে মাওলানা নিজামুদ্দীন জানতে পেরেছিলেন– এ লোক মুরীদের দলভুক্ত নয়; বরং সে মুরাদগণের দলভুক্ত। যদি সে নামায ছেড়ে দেয় তাকে বলপূর্বক নামায পড়ানো হবে। যেহেতু আল্লাহর মনোনীত। এ কারণেই তাকে এই তদবীর বলেছিলেন যে, 'ফরয নামায ছেড়ে দাও।' তাঁর জানা ছিল, এ লোক ফরয ছাড়তে পারবে না। আল্লাহ তায়ালাই তাকে নামায পড়াবেন। তাহলে জিয়ারতও হয়ে যাবে। এবার দেখুন, এ বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর সম্মান ও মর্যাদা যথাযথ ঠিক থাকল; আবার মহান পূর্বসুরীদের সম্মান ও মর্যাদাও পরিপূর্ণভাবে রক্ষা পেল।

সোহবত ও তরবিয়ত ব্যতীত মুহাক্কিক হওয়া যায় না

মুহাক্কিক ব্যক্তিগণ এসব কথা বুঝতে পারবেন। যারা অমুহাক্কিক, তারা পারবেন না। অমুহাক্কিক ব্যক্তি মাওলানা নিজামুদ্দীনকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। তার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখাবে। অথবা কুরআন-সুন্নাহ ত্যাগ করে বসবে। আর এ উভয় পথই ধ্বংসের পথ। মুক্তি ও নাজাতের পথ হলো– কুরআনের দামন যেমন হাতছাড়া করবে না, তেমনি ওলী-দরবেশদের দামনও (আঁচল) হাতছাড়া করবে না। উভয়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। তবে এর জন্য দরকার তারবিয়ত ও সাহচর্য। যখন মুহাক্কিকগণের সাহচর্য নসীব হবে, কামেল ওলীদের জিয়ারতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেয়া ব্যবস্থা মোতাবেক আমল করা নসীব হবে, তখন সে মুহাক্কিক হয়ে যাবে। কেবল কিতাব পড়ে এবং বুযুর্গদের ওয়াজ শুনে মুহাক্কিক হওয়া যায় না– যতক্ষণ পরিশ্রম করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করা হয়। যেমন- কবি খুবই সুন্দর বলেছেন–

ماہا بابا باید تا یک پنبہ دانہ بعد کشت

جامہ گردد شاہدے رایا شہیدے راکفن

মাসের পর মাস ধরে একটি তুলার দানা (বীজ) মাটির গভীরে যাবে, নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিবে। তারপর তা থেকে গাছ সৃষ্টি হবে এবং সেই গাছ থেকে তুলা বের হবে। তুলা থেকে সুতা আর সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হবে। তারপর প্রিয়জনের পরিধেয় বস্ত্র হবে। পৃথিবীর মানুষ একে মূল্য দিবে। বীজ যদি নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে তুলা আকারে নিজেকে পেশ না করত,

তাহলে মৃতের জন্য কাফনের বস্ত্র পাওয়া যেত না। পরার জন্য কাপড় মিলত না। এরপর বলেছেন–

قرنہا باید تا یک سنگ خارا زآفتاب

لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن

মাটি জাতীয় পাথরের একটি টুকরা– সূর্যের তাপ সহ্য করে করে কয়েক শতাব্দী পর মহামূল্যবান বদখ্শানী ও ইয়েমেনী আকিকের মর্যাদা লাভ করে আর বাজারে এর মূল্য হয় লাখ লাখ টাকা। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ পাথরের টুকরা নিজেকে সোপর্দ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বদখশানী হতে পারেনি, ইয়েমেনী আকিকও হতে পারেনি।

কবি আরও বলেছেন–

سالہا باید یک کودک از درس علم

عالمے گردد نکو یا شاعر شیریں سخن

বছরের পর বছরের পরিশ্রম-সাধনা দরকার– তবেই কেবল একটি মূর্খ শিশু দীর্ঘদিনের কঠোর শ্রম-সাধনার বিনিময়ে একজন আলেম অথবা মিষ্টভাষী কবি হতে পারবে। বিনাশ্রমে ঘরে বসে ইলম ও জ্ঞান নামক সম্পদ অর্জন হয় না। বিনা পরিশ্রমে শুধু গল্প দিয়ে জ্ঞান ও ইলম পাওয়া যাবে না। কঠোর পরিশ্রমের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে। এরপরই কেবল ঐ উচ্চ মাকামে পৌঁছতে পারবে।

হৃদয়ের বাদশাহ

میسر حقیر گدایان عشق را کیں قوم

شہان بے کمر و خسروان بے کلاہ اند

এসব মোল্লা ও দরবেশকে হেয়, তুচ্ছ ও অশ্রদ্ধার পাত্র মনে করো না। এঁরা হলেন বাদশাহর বাদশাহ। যদিও তাঁদের মাথায় মুকুট নেই, কোমরে স্বর্ণের

কটিবন্ধ নেই। তবুও তাঁদের সামনে রাজা-বাদশাহগণ মাথা নত করে থাকেন। এই দরবেশগণ বাদশাহদের সামনে মাথা নত করেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এক মহাসম্পদ ও দৌলত দান করেছেন– যাকে বাতেনী সম্পদ বলা হয়। দৃশ্যমান জড়বাদী বিত্তবানদের জানা নেই যে, এসব দরবেশের কাছে কি সম্পদ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) বিখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেম ও ইমামতের মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। কোন মাসআলার সমাধান যখন বের হতো তখন তিনি আনন্দে নেচে উঠতেন। খুশিতে আত্মহারা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন–

اين ابناء اعلوك من هذه النعمة

বাদশাহজাদাগণ কোথায়, তারা আমাদের এ সম্পদ দেখে যাক। কিন্তু তারা তো অন্ধ; এ সম্পদ তারা দেখতে পাবে কেমন করে!

এতে ভালই হয়েছে। এ সম্পদের মূল্য যদি তারা বুঝত, তাহলে হয়তো তারা এ সম্পদ ছিনিয়ে নিতে তলোয়ার নিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ত, কিন্তু তাদের চোখ বন্ধ। তাই আমাদের আমাদের সম্পদ সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব, এক শ্রেণী বাতেনী সম্পদের আরেক শ্রেণী যাহেরী সম্পদের বাদশাহ। যাহেরী সম্পদের অধিকারীরা বাতেনী সম্পদের অধিকারীদের সম্পর্কে মাথানত করে থাকে। এর শর্ত হলো, আসলেই তা বাতেনী সম্পদ হতে হবে এবং এর অধিকারীরাও বাতেনী শ্রেণীর লোক হতে হবে, পেটপূজারী নয়। শুধুই পেটের বান্দা হবে না, শুধু পানাহারই যাদের কাজ। যাহেরী সম্পদের অধিকারীরা বাতেনী শক্তির অধিকারীদের সামনে মাথা ঝুঁকাবেই।

দুনিয়া মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে করতে আল্লাহওয়ালাদের পায়ে এসে পড়ে

হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.) নকশবন্দী তরীকার বড় শায়খদের একজন। তাঁর কাছে দুবেলাই প্রায় হাজার দেড় হাজার মেহমানের ভিড় লেগে থাকত। টোংকের শাসক নবাব মীর খাঁ ছিলেন তাঁর মুরীদ। মীর খাঁর মনে ভাবনা জাগল, আমার শায়খের ওখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মেহমান থাকে। এতে হয়তো তিনি খুবই পেরেশান হয়ে থাকবেন। তাঁর তো সহায়-সম্পদ, ব্যবসা, চাকরি

কোনোটাই নেই। মেহমানদের খাবার সংস্থানে তিনি হয়তো খুবই পেরেশান থাকেন। এরকম ভেবে তিনি টোংক রাজ্যের পুরো একটি জেলার মালিকানা পিতলের পাতে লিখে হযরত শায়খের খেদমতে পেশ করেন, যাতে হাজার দেড় হাজার লোকের মেহমানদারীতে তাঁর কোনো কষ্ট না হয়। এ জেলার আয় ছিলো বছরে কয়েক লাখ টাকা। হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.) মীর খাঁর পিতলের দানপত্রের উপরই এক আজব জবাব লিখে পাঠান।

ماآبروئے فقر وقناعت کل برہم - بامر خاں بگوئے کہ روزی

مقدراست

আমি আমার দারিদ্র্য ও অল্পে-তুষ্টির সম্মান খোয়াতে চাই না। মীর খাঁকে বলে দাও, রিযিক নির্ধারিত হয়েই আছে। আমার রিযিক অনবরতই আসমান থেকে আসছে। সুতরাং তোমার দানকৃত জেলার কোনো দরকার নেই।

এঁরা হলেন সেসব লোক যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির সাথে টক্কর দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রশক্তি তাঁদের পেছনে পেছনে ঘুরেছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা ও মাকামকে হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন– যারা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয়ে যায় ان الدنيا وهى راغيه দুনিয়ার মাথায় মাটি মেখে দেয়, তাদের পায়ে দুনিয়া লুটিয়ে পড়ে। তাঁরা অবজ্ঞার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। দুনিয়া স্বেচ্ছায় তাঁদেরকে ধরা দিতে চাইলেও তাঁরা সরেই দাঁড়ান। আর দুনিয়াপূজারীরা দুনিয়ার পায়ে মাথা কুটে মরছে। অন্যদিকে দুনিয়াও তাদেরকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– আল্লাহর ওলীগণ দুনিয়া লাভ করেন– তবে বেনিয়াজ বা অমুখাপেক্ষী হয়ে, আর দুনিয়াদাররা দুনিয়া উপার্জন করেন মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী হয়ে। একজন আল্লাহর দিকে মুহ্তাজ, অপরজন দুনিয়ার দিকে মুহ্তাজ। আল্লাহর ফকীরও দুনিয়া থেকে বঞ্চিত থাকেন না।

দুনিয়ার প্রয়োজন হলো– এর মাধ্যমে মানুষ জীবনধারণের জন্য থাকা-খাওয়া ও পরিধানের ব্যবস্থা করে। এসবের অবশ্যই প্রয়োজন। এমন কোন আল্লাহওয়ালা কি দেখেছেন যাঁর খাবার জুটছে না? তাঁরা প্রাসাদোপম বাসস্থাপনের অধিকারী না হলেও– সেটা তো তাঁরা প্রত্যাশীও নন; তাঁরা কখনো তা চাননি– তাঁরা ঝোপ-ঝাড়ে, কুঁড়েঘরে বাস করাকে অধিক শ্রেয় মনে করেন। তাঁরা যদি আপনাদের সুরম্য প্রাসাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি হানতেন, তবে না হয় আপনারা

এ কথা বলতেন। এ অবস্থায়ও আপনারা তাঁদেরকে লোভী বলুন! আসলে তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি কোন ধরনের মোহ বা লোভ-লালসা নেই।

আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়াবিমুখ

আসলে তাঁরা হলেন স্বেচ্ছায় দুনিয়া-বর্জনকারী। দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তা তাঁরা বর্জন করেন। যার হাতে দুনিয়া নেই, সে যদি বলে আমি দুনিয়া বর্জন করলাম, সে প্রকৃত বর্জনকারী নয়; বরং সে দুনিয়া কর্তৃক উপেক্ষিত। দুনিয়াই তাকে বর্জন করেছে; সে দুনিয়াকে বর্জন করেনি। সে আন্তরিকভাবে দুনিয়া কামনা করেছে অথচ দুনিয়া তাকে ধরা দেয়নি। ইসলাম মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি দিয়েছে, দুনিয়াদার বানায়নি। একজন মুসলমান দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় এনে তার মোহগ্রস্ত হয়নি। ইসলাম একথা বলে না যে, তুমি বিত্তবান ও সম্পদশালী না হয়ে ভিক্ষুক হয়ে থাক। মুসলমান দুনিয়াতে ভিক্ষুক হওয়ার জন্য আসেনি; বরং দুনিয়াকে দিতে এসেছে। দুনিয়ার কাছে চাইতে আসেনি। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জন করবে।

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

তবে পাক-পবিত্র ও হালাল পথে উপার্জন কর। এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয, অবশ্য করণীয়। উপার্জনে যদি আল্লাহ বরকত দান করেন, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং তা নিজ প্রয়োজন মনে কর। সম্পদশালী হয়ে যাও। আল্লাহ যদি কোটিপতি বানিয়ে দেন, বনে যাও। অপব্যয় করে সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস করো না। আরেকটা দিক খেয়াল রাখতে হবে– আত্মা ও হৃদয়ের সম্পর্ক যেন এর সঙ্গে না থাকে। সব সময় আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আত্মার নিবিড় সম্পর্ক থাকবে। আর হাত-পায়ের সম্পর্ক থাকবে দুনিয়ার সঙ্গে। ইসলাম দুনিয়াকে বর্জন করতে বলেনি যে, দুনিয়া বর্জন করে ভিক্ষুক সেজে যাও; বরং দুনিয়াকে অন্তর থেকে সম্পর্কহীন রাখতে শিক্ষা দিয়েছে। মুসলমানদের অবস্থা হবে এমন– دست بكار دل بيا অর্থাৎ হাত-পা থাকবে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত, আর আত্মা আপন মালিকের সান্নিধ্য রক্ষার্থে ব্যস্ত। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ শিক্ষা ইসলাম দেয়নি যে, তোমরা দুনিয়া ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে চলে যাও। সেখানে বসবাস কর। একে বলা

হয় রুহবানিয়ত-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদ। ইসলামে গুহাগিরি বা নির্জনবাস নেই। দুনিয়াবী ধন-সম্পদ উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহ যদি কোটিপতিও বানিয়ে দেন তাহলে এরও কদর কর, সম্মান ও শ্রদ্ধা কর। আপন প্রয়োজনে সৎপন্থায় ব্যয় কর; তবে আত্মার সম্পর্ক রাখ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে। এ নীতিই ছিল আওলিয়া-দরবেশগণের। এ-ই ছিল তাঁদের কর্মপদ্ধতি। তাঁরা হলেন উলামায়ে দেওবন্দ, যাঁরা ঐসব পূর্বসুরী মহান বুযুর্গের সার্থক উত্তরসুরী। যেমন- হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ গোলাম আলী, মির্জা মাজহার জানেজানাঁ, হযরত জুনায়েদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) সবসময় আনুমানিক দু'হাজার আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) সঙ্গে রাখতেন। কোন কোন সময় এসব মুদ্রা নিয়ে মজলিসে খেলাধুলা করতেন। মানুষ জিজ্ঞেস করত– হযরত! আপনার মত ওলীর কাছে এত স্বর্ণমুদ্রা! আবার তা নিয়ে খেলাধুলা করছেন– এ কেমন ব্যাপার? উত্তরে তিনি বলতেন–

لولا هذه الدنا نير لتمند لى بنا هؤ لاء الملرك

এসব টাকা-পয়সা দিরহাম-দিনার যদি আমাদের হাতে না থাকে, তাহলে ঐ সকল শাহজাদা আমাদেরকে নাক মোছার রুমালের মতো তুচ্ছ বানিয়ে নেবে। আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি– তোমাদের কাছে যা আছে, তা আমাদের কাছেও আছে। আমরা তোমাদের মুখাপেক্ষী নই। আমাদের কাছে যে মহামূল্যবান সম্পদ রয়েছে, তা তোমাদের নিকট নেই। তোমরা সর্বাবস্থায় পরমুখাপেক্ষী। সত্যিকার সম্পদশালী কে, তা আমাদের কাছ থেকে শিখে নাও।

অতএব, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য দরিদ্র-ভিক্ষুক বানানো নয়; বরং প্রকৃত ধনী ও বিত্তবান বানানোই এর উদ্দেশ্য।

خير الغنى غنى النفس

ঐ ব্যক্তিই সম্পদশালী যার অন্তর ঐশ্বর্যশালী। হাতে লাখ লাখ টাকা থাক বা না থাক।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে একেক দিন নিজ হাতে লাখ লাখ টাকা বণ্টন করেছেন। মুসলমানদের এ অবস্থা ও শান বলা হয়েছে যে, অর্থ উপার্জন কর। করতলগত করে রাখ তবে হৃদয় ও অন্তর থেকে একে দূরে সরিয়ে রাখ। আর যদি দুনিয়া না পেয়েও প্রচার করে বেড়াও

যে, আমি দুনিয়া বর্জন করেছি, তাহলে তুমি বর্জনকারী নও; বরং তুমি পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত– দুনিয়া তোমাকে ত্যাগ ও বর্জন করেছে। যেমন- কোন পুরুষত্বহীন ব্যক্তি বলে– আমি খুবই পাক-পবিত্র। আমি কোন মহিলার গায়ে হাত দেইনি। মহিলার কাছেও যাইনি। তখন মানুষ বলবে– নারীর কাছে যাওয়ার শক্তি তোমার কোথায়? তুমি কেমন করে কিভাবে মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে গেলে! মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মহিলার কাছে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না যায়। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সে আতঙ্কিত ও কম্পমান থাকে। পুরুষত্বহীন হওয়ার নাম মুত্তাকী নয়। সার কথা, তারিকে দুনিয়া ঐ লোককে বলা হবে, যার হাতে দুনিয়া নেই। আসলে সে দুনিয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানছে। অথচ মানুষকে এই বলে প্রতারিত করছে যে, আমি দুনিয়াত্যাগী, দুনিয়াবিমুখ।

আদব ও আজমতের বাহকগণ
আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত ওয়ারিস

আসলে আমার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ দীনের ভিত্তি হলো আদব ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতি। শরীয়তের আজমত ও সম্মান, আওলিয়া-উলামা, আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবাদি, বাইতুল্লাহ, দীনি মাদরাসা, খানকাসমূহ সব কিছুর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করার ওপর। বেয়াদবী ও গোস্তাখির দ্বারা মানুষের দীন বরবাদ হয়ে যায়।

আদবের পর হচ্ছে ইত্তিবা– অনুকরণ ও অনুসরণ করা। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের অনুসরণ করা। এরপর ঐ যওক ও অনুভূতির অনুসরণ– যার ওপর উম্মতের সকল আলেম-উলামা চলেন। এ পথ ত্যাগ করে নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন রাস্তা তৈরি করে নেয়া– ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এসব দীন নয়। দীন হচ্ছে সঠিক রেওয়ায়েতকে সুস্থ-সবল মন-মানসিকতাসহ ইত্তেবা এবং অনুসরণের মনোবৃত্তি ও আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনে নিচের আয়াতে কথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি এবং মানদণ্ড হচ্ছে–

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَـٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

হে পয়গম্বর! আমি আপনার নিকট যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, তা-ই একমাত্র সত্য। এটাই হলো সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি। [ফাতির : ৩১]

এর গ্রহণ-বর্জন দ্বারাই মানুষের সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হবে। এরপর বলেছেন–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

আমি একটি জামায়াত ও দলকে আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। [ফাতির : ৩২]

তাদেরকেই আমি উত্তরাধিকারী বানিয়েছি– যাদের আমি আগেই মনোনীত ও পছন্দ করেছিলাম। এই উদ্দেশ্যে যে, এদের দ্বারা আমি দীনের কাজ চালিয়ে নিব। দীনের খেদমত করিয়ে নেব।

পরিষ্কার কথা, উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি পাওয়া যায় পিতার কাছ থেকে। ওয়ারাসাত কেউ সৃষ্টি করে না। সৃষ্ট উপার্জনকেও ওয়ারাসাত বলে না। ওয়ারাসাত হলো, পিতার ত্যাজ্য সম্পদ যদি থাকে আর তা পাওয়া যায়। কখন ওয়ারাসাত পাওয়া যাবে? যখন নসব বা বংশ প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ পিতার সন্তান বলে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হবে। কেবল তখনই ওয়ারাসাত পাওয়া যাবে। আর যদি এ কথা প্রমাণিত না হয় যে, এ লোক মৃত ব্যক্তির পুত্র, তাহলে তো অনাত্মীয় ও অপরিচিত কেউ ওয়ারিশ হবে না।

আম্বিয়ায়ে কেরামে রূহানী সম্পদ হচ্ছে ইলম ও কামাল। এ সম্পদের ওয়ারিশ তখনই হওয়া যাবে, যদি রূহানী নসবনামা বা বংশ-তালিকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। আমার পীর ও শায়খ অমুক, তাঁর শায়খ অমুক, তাঁর শায়খ অমুক– এভাবেই সিলসিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছবে। তখনই প্রমাণিত হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানী সন্তান, রূহানী আওলাদ। আর তখন ত্যাজ্য সম্পত্তির ভাগ পাওয়া যাবে। মাঝখানে যদি কোথাও বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, বংশ তালিকার ধারা বজায় না থাকে– তাহলে অবস্থা এমন হবে যে, সে অজ্ঞাত বাপের সন্তান। পিতৃপরিচয় নেই। ফলে উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই। ইলম ও জ্ঞানের এ ওয়ারাসাত নিসবত ও সম্পর্ক দ্বারা পাওয়া যাবে। যেমন- মাল-সম্পদের ওয়ারাসাত নসব ও বংশ দ্বারা পাওয়া যায়। পার্থিব সম্পদের নসব হচ্ছে মাদ্দি বা দৈহিক (জড় পদার্থ জাতীয়), আর ইলম ও জ্ঞানের নসব হচ্ছে রূহানী বা আধ্যাত্মিক। তাই নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

অতঃপর আমি আল্লাহর কিতাব ও ইলমের উত্তরাধিকারী ঐসব মানুষকে নির্ধারিত করেছি, যাঁদেরকে আমি এ কাজের জন্য অভিপ্রেত করে রেখেছিলাম।

তারপর বলেছেন- مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ -তাদের মধ্যে কিছু নষ্ট হয়ে গেলো; তারা হয়তো কিতাবুল্লাহকে পেছনে নিক্ষেপ করে দিল বা আল্লাহর কিতাব আল্ কুরআনকে নিজের মর্জি মতো লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করে দিল কিংবা এদিক সেদিক করে অর্থের পরিবর্তন করে নিল। এরা তাঁদের জ্ঞানের ওপরই জুলুম করল। এরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। তারপর বলেছেন- وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ -তাদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এদিক সেদিক সরে যাচ্ছেন না। সঠিক পথ পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে চাচ্ছেন না। তারাও মুক্তি ও নাজাত পেয়ে যাবেন। তারপর বলেন- وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ -কোন মানুষ এমনও আছেন যারা ঐ পথে দ্রুততার সঙ্গে চলছে। দীনের ছোটখাট কোন বিষয় ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত নন। সর্বাবস্থায় দীনকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। দীনের শক্তি হাতে নিয়ে মর্মর-ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁরা খায়র ও কল্যাণের দিকে দ্রুততার প্রতিযোগিতামূলক দৌড়াচ্ছেন। যেমন- ঘোড়া দৌড়ের মাঠে প্রতিযোগিতার সময় একে অন্যকে পেছনে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাঁরাও আধ্যাত্মিক মাঠে অগ্রগামী হওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট এবং দৌড়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এ হলো আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করুণা যে, এ রাস্তায় তাঁদের লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ লাফিয়ে চলছে, কেউ বা সাধারণ গতিতে চলছে। কেউ আবার এদিক সেদিক হয়ে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ছে। এতে সে সঠিক গন্তব্য থেকে দূরে সরে পড়ছে। আর এ-ই হলো মানুষের স্তর। আমাদের জন্য আবশ্যক হলো- আমরা কুরআনের প্রকৃত ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী হব। ঐসব অর্থই গ্রহণ করব যা ধারাবাহিকভাবে রেওয়ায়েত হয়ে আসছে। যার মধ্যে পূর্বসুরীদের আমল ও জওক রয়েছে। যাতে ঐ ধর্মীয় অনুভূতিও রয়েছে যা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে ছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলো কেবল বর্ণিত বা মনকুল হয়নি, অর্থও বর্ণিত হয়েছে। আর শুধু অর্থই

বর্ণিত হয়নি; বরং তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের অনুভবও অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে। সে অনুভবের ওপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এবং আমলের নমুনাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ নমুনা মতোই আমাদের আমল করতে হবে। ফলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে– তাঁর চারটি শান ও অবস্থা ছিল– يتلوا عليهم اياته –আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলো পূর্ণ আমানতদারীর সঙ্গে যথাযথভাবে মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ويعلمهم الكتاب –তালীমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। والحكمة এরপর আমলী নমুনা ও আদর্শ পেশ করেছেন। বলেছেন– এভাবে আমল কর। এই হলো আমলের নমুনা যা আমি করে দেখিয়েছি। তারপর বলেন– ويزكيهم –আত্মাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে এর মধ্যে দৃঢ়তা পয়দা করা; বক্রতা ও গুমরাহী দূর করো। এসব রিয়াজত-মুজাহাদা, চেষ্টা-সাধনার পর দীনের ওপর দৃঢ়তা নসীব হয়ে থাকে। এমন নয় যে, কেউ কিতাবুল্লাহর কয়েকটি অক্ষর দেখে নিল। কারো কথাবার্তা শুনে কিছু নিয়ে নিল এবং এর ওপরই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দিল। এ তো হলো বোকামী ও হীনতা– এটা কোন জ্ঞান-বুদ্ধির কথা নয়। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তাতে মতামত দেয়া উচিত নয়। যেমন- কারও সামনে যদি স্বর্ণকারের বিষয়টি আসে আর সে আপনার কাছে অলংকার বানানোর পরামর্শ চায়, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার অজ্ঞতার কারণে আপনি তাকে স্বর্ণকারের শরণাপন্ন হওয়ারই পরামর্শ দিবেন। কর্মকারের কাজ হলে কর্মকারের কাছে যেতে বলবেন। যেহেতু কামারের কাজ আপনার জানা নেই। আর এ অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতেও আপনি লজ্জাবোধ করবেন না। কোন প্রয়োজনে যদি লোহা কাটতে হয়, তাহলে কামারের কাছে যাবেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যখন দীনের কথা আসে তখন 'জানি না' বলতে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে মানুষ লজ্জাবোধ করে। না জেনেও নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লেগে যায়। দীন যেন একটি খেলনা যে, যার ইচ্ছা সে-ই এ নিয়ে খেলতে শুরু করবে!

তাই আমি বলছিলাম– জুযী বা আংশিক বিষয়াদি বর্ণনা করার সুযোগ নেই। আমারও সময় কম, আপনাদেরও তাই। ফলে আমি মূলনীতি বর্ণনা করে দিলাম, একটি মানদণ্ড নির্দেশ করে দিলাম। এর মাধ্যমে আপনার আংশিক ও শাখা-প্রশাখাকে সারা জীবন যাচাই করতে থাকুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকুন। অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় পেশ করা উদ্দেশ্য ছিল, তাই আমি পেশ করলাম। অনেক সময়ও নিলাম। সত্যি বলছি, আমার ভেতর এত শক্তি ও

সাহস ছিল না। তবে বুযুর্গানে-দীন আধ্যাত্মিকভাবে আমাকে শক্তি দিয়েছেন, যে কারণে বয়ান করতে পারলাম। নতুবা নিজের মধ্যে শক্তি ছিলই না। যা হোক, আমি এখন শেষ করছি। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইলম ও আমলের তাওফিক দান করুন। সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করুন। ভুল ও বাঁকা পথ থেকে আমাদের হেফাযত করুন এবং এদিক সেদিক ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা থেকে হেফাযত করুন। আর তাঁর ঐ পথের পথিক বানিয়ে দিন, যা সহীহ্ সনদসহ মন্‌কুল বা বর্ণিত হয়ে আসছে। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم – وارنا مناسكنا انك انت التواب الرحيم - واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

বয়ান : ৬

তিনটি ফিত্‌রী সওয়াল বা স্বভাবজাত জিজ্ঞাসা

ইহুদীদের সালাম আঙ্গুলের ইশারায়, খৃষ্টানদের সালাম করমর্দনের মাধ্যমে, আর মুসলমানদের সালাম হলো 'আসসালমু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। ইহুদী ও নাসারাদের সালাম হলো সম্মানজনক ইশারা মাত্র। আর মুসলমানদের সালাম হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দোয়া, যার অর্থ– আল্লাহ তোমাকে শন্তি, করুণা ও রহমত দান করুন, নিরাপদে রাখুন, বরকত নাযিল করুন। সালামের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের জন্য দোয়া করেন। এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনা ও মহব্বত, ভালোবাসা প্রকাশ পায়। ফলে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد -

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনাদের সামনে আমার এক প্রিয়ভাজন এইমাত্র কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত। কোথা থেকে আমরা এসেছি, কোথায় যাব এবং এ আসা-যাওয়ার মাঝখানের জিন্দেগী আমরা কিভাবে যাপন করবো– এ তিনটি প্রশ্নের শান্তি ও সান্ত্বনাদায়ক উত্তর যতক্ষণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ মানুষের মনে অস্থিরতা থাকবেই। মনে শান্তি আসবে না। অথচ তা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, এ তিনটি প্রশ্ন সব মানুষের অন্তরে একইভাবে উদিত হয়। মানুষ এর সান্ত্বনাদায়ক জবাব জানতে চায়। অল্পক্ষণ আগেই শ্রদ্ধেয় কারী সাহেব পবিত্র কুরআনের যে রুকু তেলাওয়াত করে আমাদের শোনালেন, ঐ রুকুতে এ তিনটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে– সাধারণ নিয়মে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়, তারপর উত্তর দেয়া হয়। এখানে এমন হয়েছে যে, প্রথমে প্রশ্নের উত্তর পাঠ করে শুনানো হয়েছে এবং পরে প্রশ্ন করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় কারী সাহেবের তেলাওয়াতকৃত রুকুর মধ্যে দশটি হুকুম ও বিষয় রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা দশটি হেদায়েত দান করেছেন। তারপর একেকটি হেদায়েতের ভেতর অনেক বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সামষ্টিকভাবে

অনেক জিনিস এসে যায়। তবে মৌলনীতি হিসেবে দশটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঐ প্রশ্নাবলীর জবাবই হলো এ দশটি কথা। কিভাবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে, তার মূলনীতি ও বিধান কি এবং কাকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের জীবন অতিবাহিত করব? যেখান থেকে আমাদের উৎপত্তি ও সূচনা হয়েছে– সে উৎসটি কি? এর পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফল বা কি হবে? এ রুকুতে এর পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

মাযহাবের উদ্দেশের বুনিয়াদ তিন জিনিস

এক. মাব্‌দা বা উৎপত্তিস্থল, দুই. মা'আদ বা পরলোকে প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং চার. মি'আদ বা নির্ধারিত সময়। মাব্‌দার অর্থ হলো– শুরুটা কোথা থেকে হয়েছে। মা'আদের অর্থ হলো পুনরায় কোথায় যাব, আর মি'আদের অর্থ– মধ্যবর্তী জীবন কিভাবে অতিবাহিত হবে। এ রুকুতে মাব্‌দার আলোচনায় বলা হয়েছে, কোন্ সে মহান সত্তা যা তোমাদের উৎস? মা'আদের বর্ণনায় আছে তোমাদের পরিণতি কি হবে। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, মধ্যবর্তী জীবন কিভাবে অতিবাহিত করতে হবে। সুতরাং অন্য কোন বয়ানের দরকার নেই; বরং প্রয়োজন তাফসীরের। ঐ রুকুর তাফসীর, তরজমা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেই বয়ান হয়ে যাবে।

মানুষের মাব্‌দ

تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً

অত্যন্ত বরকতময় ঐ সত্তা যিনি আকাশে বুরূজ অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি স্থাপন করেছেন এবং এদের আপন আপন কক্ষপথে পরিচালিত করেছেন। তারা আবহমানকাল থেকে নিজ নিজ পথে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাতে দিন-রাতের সৃষ্টি হচ্ছে। মওসুমে পরিবর্তন ঘটছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আসে, আবার যায়।

এটা সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা। প্রকৃত সূচনা যে সত্তা হতে তাঁরই কুদরত

আসমান-জমিনেও কাজ করে চলেছে। আসমান সৃষ্টি করে দিয়েছেন, চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোতে চলার শক্তি সঞ্চারিত করেছেন।

দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের চালচলন

উপর্যুক্ত আয়াত বর্ণনার পর আরও দশটি আহকাম বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করবে–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

এখানে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের দুনিয়াতে থাকাকালীন চালচলন, রীতিনীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলেছেন। অভিধান ও শরীয়তের পরিভাষায় রহমান বলা হয় ঐ মহান সত্তাকে যিনি যাবতীয় নেয়ামতের একক মালিক, করুণার আধার। জাহেরী ও বাতেনী, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সব রকমের নেয়ামত দান করার শক্তি ও সামর্থ্য কেবল তাঁরই রয়েছে। সকল নেয়ামত তাঁর অধীন, তাঁর আয়ত্বে। সকল নেয়ামতের কর্তা এবং সকল সময়ের মালিক তিনিই। এ রহমানের বান্দাগণের চালচলন, রীতিনীতি এমন হওয়া উচিত– যখন তারা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবে, তখন নম্র ও বিনয়াবনত হয়ে চলাফেরা করবে। এ করে এ হেদায়াত দেয়া হলো যে, জীবন-যাপনের ভিত্তি বিনয় ও নম্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গর্ব-গরিমা আর অহংকারের ওপর যেন জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা না হয়। অহংকার করা, নিজেকে মহাশক্তিধর বলে প্রকাশ না করা; বরং চালচলনের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহর কোন বিশেষ বান্দা যাচ্ছেন। এটা যেন প্রকাশ না পায় যে, কোন অহংকারী, মহাশক্তিশালী কেউ পথ চলছে। এমনটা মানুষের শান নয়। এটা মানুষের বৈশিষ্ট্যও নয়। আর এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كلهم بنو ادم وادم من تراب -

তোমরা সকলেই আদমের বংশধর। আর আদমকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

মাটির কাজ এটা নয় যে, গর্বভরে ওপরে উঠে যাবে। মাটি যতক্ষণ পর্যন্ত নিচে থাকবে, পদদলিত হবে, ততক্ষণ তার মূল্য ও মর্যাদা থাকবে। মাটিকে জুতা

দিয়ে দলিত-মথিত করা হয়। অথচ সে কোন প্রতিবাদ করে না। তাই তার মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। যেভাবে আমরা তাকে ব্যবহার করব, সে তা মেনে নিবে বিনা বাক্য ব্যয়ে। মাটি যদি ওপরে উড়তে শুরু করে, কারো চোখে পতিত হয় তাহলে সে ব্যক্তি মাটিকে পীড়াদায়ক ভেবে অভিশাপ দিবে। কারো কাপড়ে, পোশাক-পরিচ্ছদে লাগলে সে পোশাক-পরিচ্ছদ ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলবে– হতভাগা মাটি কোথা হতে আসলো! মাটি একটু ওপরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের ঝড় শুরু হয়ে যায়। তাই যে মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মাটির তৈরি মানুষ যদি গর্ব করে, অহংকার করে, গরিমা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করতে থাকে, তাহলে প্রতিটি মানষ এ-কে মন্দ বলবে। আর যদি তাওয়াজ্জু, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, মাটির মত নিরহংকার হয়ে থাকে, তাহলে সবাই তাকে শ্রদ্ধাভরে মাথায় স্থান দিবে। বলবে– এ তো একজন মহামনীষী। কোন মজলিসে, জনসমাবেশে যে ব্যক্তি গর্বভরে কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে সাজা পেয়ে যায়; মানহানিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। আর যে ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বলে, সকলেই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নিয়ম হলো : হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন মানুষ যদি ইবাদত করে এ কথা বলে যে, হে আল্লাহ! আমি কিছুই করতে পারিনি, আমার শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নেই। তোমার দান, তোমার দয়া! তুমিই এ কাজ আমার দ্বারা করিয়েছ। আমার মধ্যে এ কাজের শক্তি-সামর্থ্য কিছুই ছিল না। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– না না, তুমিই আমল করেছিলে। মসজিদের দিকে হেঁটে হেঁটে তুমিই গিয়েছিলে। হজ সম্পাদনের জন্য বাইতুল্লাহর পথে তুমিই ভ্রমণ করেছিলে। সব কিছু তুমিই করেছিলে। আর যদি গর্ব-গৌরবের সাথে অহংকারের সঙ্গে কেউ এ কথা বলে– হে আল্লাহ্! আমিই নামায পড়েছি, আমি ইবাদত করেছি, আমি এ কাজ করেছি, ও কাজ করেছি- তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন– হতভাগা! তুই কি করছিস! ইচ্ছাশক্তি তো আমিই দিয়েছিলাম। শরীর, আত্মা, শক্তি-সামর্থ্য সব আমিই দিয়েছি। তুই কি করেছিস? সত্য এটাই যে, যে নিজে দাবি করে, আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। আর যিনি নিজের দাবি ও অহংকার ত্যাগ করে বলে– আমি তো কিছুই করিনি; তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন– তুমিই সব করেছো। আল্লাহর নিয়মই হচ্ছে– যে বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করে, দাসত্ব ও বন্দেগীর শান প্রকাশ করে তাকে সম্মানিত করে দেন, তাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যে অহংকার করে, লাফালাফি করে তাকে মাটির ওপর নিক্ষিপ্ত করেন। জনৈক কবি কত

চমৎকারই বলেছেন–

پستی سے ہو سربلند اور سرکشی سے پست

اسراہ کے عجیب نشیب و فراز ہے

নিচ থেকে উপরে, উপর থেকে নিচে– এ পথে বিস্ময়কর অসমতা রয়েছে।

এমনভাবে মানুষের স্বভাব গঠন করা হয়েছে যে, তার সামনে মাটি যদি গর্বভরে একটু ওপরে উঠে যায়, তাহলে অভিশপ্ত হয়। আর যদি পায়ের তলায় অবস্থান করে, তাহলে সম্মানিত থাকে। মানুষ যে জিনিস হতে সৃষ্ট, স্বভাব-প্রকৃতিও সে অনুযায়ীই হওয়া উচিত। মাটির মতো নম্র ও বিনয়ী হলে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং যতই গর্ব-অহংকার করবে ততই সে অপদস্থ হবে। প্রথম কথা হচ্ছে– এই রহমানের বান্দাদের জীবন-যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি 'কি ও কেন'– তা বলা হয়েছে। ঘর থেকে যখন বের হবে, চলাফেরা করবে তখন জমিনের ওপর ধীরস্থির ও নম্রভাবে চলবে। গর্ব-অহংকারের সঙ্গে চলবে না। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে–

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

তোমরা চালচলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। অত্যধিক উঁচু গলায় কথা বলো না; তবে প্রয়োজনানুসারে বলতে পার। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কথা বলা অহংকার ও গর্বের পরিচায়ক। [লুকমান : ১৯]

তবে কেউ যদি এমন থাকে যে, জন্মগতভাবেই তার আওয়াজ মোটা ও উচ্চ হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে চিৎকার করে কথা বলবে, এটা মনে করে যে, অন্যদের ওপর আমার কথা ও আওয়াজ প্রভাব বিস্তার করুক– সেটা নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আবশ্যক পরিমাণ আওয়াজ উচ্চ করতে পারবে। চাল-চলনে, কথাবার্তায় সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ চলার নীতি ছিল এমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে–

يمشى كانما يتقلع

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে পথ চলতেন যা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চলার সময় তাঁর মাথা ঝুঁকানো থাকতো সামনের দিকে– যাকে বিনয়ের চলা বলা হয়। পদযুগলে তাঁর শক্তি ছিল যথেষ্ট। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুত ও এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন, তাতে মনে হতো যেন তাঁর পদভারে ভূমি খণ্ডিত হয়ে পড়বে এবং ভূমির ভেতরে ঢুকে পড়বেন। শক্তি, বীরত্ব, সাহস, নম্রতা, বিনয়, সম্মান– সবই বজায় থাকবে। রোগীদের মতো চলবে না। দেখলে মনে হয়, সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হলেই যেন ধরাশায়ী হয়ে যাবে। আর গর্ব-অহংকারের সঙ্গেও না যে, দেখলে মনে হয় কোন অহংকারী যাচ্ছে। মধ্যম চালে চলবে। যাতে বিনয়, নম্রতা, আত্মমর্যাদা সবই প্রকাশ পায়।

يمشون على الارض هونا

এর অর্থ এ নয় যে, ধীরে ধীরে চলবে; বরং বিনয়ের সঙ্গে চলবে এবং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলবে। প্রথমে এ নকশা ও পদ্ধতি দেয়া হলো। যখন ঘর হতে বের হবে, এভাবে চলো। কারণ, মুসলমানকে চিন্তা-ভাবনাহীন প্রাণীরূপে সৃষ্টি করা হয়নি যে ইচ্ছামাফিক চলবে; বরং চলাকালে দৃষ্টি থাকবে পায়ের ওপর। যেহেতু মুমিনের এ বিশ্বাস রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র হাজির ও বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُو

তোমরা তিনজন নির্জনে বসে চুপি চুপি কানাঘুষা কর, তাহলে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ হাজির থাকেন। এমন নয় যে, তোমাদের কথার শ্রবণকারী অন্য কেউ নেই। তোমরা চারজন হলে আল্লাহ পঞ্চমজন হবেন। তোমরা অধিক হলে আল্লাহও তোমাদের সঙ্গে আছেন। কমসংখ্যক হলেও আল্লাহ আছেন। [মুজাদালা : ৭]

আল্লাহ তায়ালা যখন সদা-সর্বত্র বিরাজমান, বিদ্যমান তখন মানুষকে সকল স্থানে আদবের সাথে চলাফেরা করা কর্তব্য। বেয়াদবী ঐ ব্যক্তি করবে, যার

আকীদা রয়েছে যে, আল্লাহ কেবল মসজিদেই রয়েছেন, সেখানেই আমি আদব করে চলব। রাস্তাঘাটে যেহেতু আল্লাহ নেই, তাই আমার মনের চাহিদা অনুযায়ী চলব। আল্লাহ এখানে ওখানে সর্বত্র রয়েছেন। সুতরাং বিনয় ও নম্রতা অভ্যাস করতে হবে। জীবন যাপনের প্রথম মূলনীতি হলো– আমরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষ নজর রাখব যে, আমাদের চালচলন কেমন হচ্ছে।

দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের কথাবার্তা

এরপর বলা হয়েছে– পথ চলতে চলতে নানা ধরনের লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে ভাল মানুষও থাকেন মন্দও থাকেন। কেউ কেউ অত্যন্ত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হন। আপনি সালাম করলেন তো তিনিও জবাব দান করলেন। আপনার শুকরিয়া আদায় করলেন। আপনিও তাকে শুকরিয়া জানালেন। তাতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হলে গেল। আবার এমন মানুষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে, যারা ফাসাদ ও ঝগড়ার কথাবার্তা উত্থাপন করবে। কারো প্রতি অশোভন নজর দিবে, কারো প্রতি বিদ্রূপাত্মক বা উপহাসমূলক কথা বলে দেবে। এ অবস্থায় কেমন করে আমাদের ভাবমূর্তি তৈরি হবে? এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما

মূর্খের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আর সে মূর্খতাপূর্ণ কাজকর্ম করে, মূর্খের ন্যায় কথাবার্তা বলে, তাহলে তুমি তার মতো মূর্খ হয়ো না। কেউ যদি তোমার সঙ্গে অজ্ঞান ও মূর্খের মতো কথাবার্তা বলে, তাহলে তুমি তাকে বলে দাও– ভাই, আমার সালাম! আমি এসব কথাবার্তা জানি না। তোমার জন্যও এমন করা ও বলা শোভনীয় নয়। আমার জন্যও নয়। আর যদি তুমি ঝগড়া শুরু করে দাও, তাহলে (শেষ পর্যন্ত) অস্ত্রধারণের দরকার হতে পারে। ঝগড়া-ফাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ লাগানো খুবই সহজ কাজ। তবে এর অবসান ঘটানো খুবই কঠিন। তাই সহ্য ও ধৈর্যধারণ করতে হবে। এজন্য বলা হয়েছে, যখন চলাফেরা করো, বিনয় ও নম্রতার সাথে করো। তবে প্রত্যেকটি মানুষ স্নেহ ও মমতার চোখে তোমাকে দেখবে। তোমার সঙ্গে কেউ ঝগড়া করবে না। তখন ঝগড়া হবে, যখন তুমি অহংকার ও গর্বের সঙ্গে চলবে। যদি বিনয় ও তাওয়াজ্জুর সঙ্গে চলাফেরা কর, তাহলে সকলে তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। অগত্যা যদি কোন বোকা মূর্খতার কারণে তোমাকে কোন কটু কথা বলেও ফেলে, তাহলে

তুমি বলে দাও– ভাই সালাম! এসব কথা আমি জানি না, এসব করা উচিত নয়। এ কাজ মানুষের জন্য নয়। এখন কি করা না করা তুমিই ভাল জান।

সালামের আদব ও বরকত

এ কথা আমরা জানতে পেরেছি যে, 'সালাম' এমন এক মহান বিষয় যা বিবাদ, বিসম্বাদ মিটিয়ে দেয়। কোন মানুষ যদি সালাম না করে, তাহলে তাকে মন্দ বলা হয়। আর আপনি যদি সালাম করেন তাহলে গণ্ডমূর্খও নরম হয়ে যাবে। ঝুঁকে যাবে; বলবে– লোকটি অত্যন্ত মহৎ। সে সালাম করছিল।

এ কারণে বলা হয়েছে, যদি পরস্পর দুশমনি ও শত্রুতাও হয়, শত্রুকে যদি আপনি সালাম করেন তাহলে শত্রুতা ক্রমেই হ্রাস পাবে, দুশমনও 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে বাধ্য হবে। যার অর্থ হচ্ছে– তোমার জন্যও শান্তি ও নিরাপত্তা হোক। শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া যখন করবে, তখন ঝগড়া করবে কেমন করে? সে তো নিজেই বলেছে– আল্লাহ তোমাকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন। দোয়া করবে, আবার ঝগড়াও করবে? সালামের মাধ্যমে সকল শত্রুতার অবসান হয়ে যায়। ফলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

افشوا السلان على من عرفت ومن لم تعمرف

চলার পথে প্রত্যেকের সঙ্গে সালাম করার অভ্যাস করো; পরিচিত ব্যক্তি হোক বা না-ই হোক।

এ যুগের ভদ্রতা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি পরিচয় করিয়ে না দেয়, সালাম-কালাম কথাবার্তা কিছুই হবে না। এটা অহংকারীদের তমদ্দুন। ইসলামের তমদ্দুন ও সামাজিক রীতিনীতি এটা নয়। ইসলামের রীতি হচ্ছে– যখন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান আছে, ইসলামী আত্মীয়তা আছে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার কি? আগে থেকেই আমাদের পরিচয় রয়েছে যে, আমরা দীনি ভাই। মুসলমান ভাই। তাঁর ও আমার মাঝে ঈমান ও ইসলাম রয়েছে।

তার নিকট আমার পরিচয়ও রয়েছে। তার জানা আছে আমি মুসলমান। উভয়ের মধ্যে যখন একটা আত্মীয়তা রয়েছে তখন তৃতীয়জনের পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। যদি এক পরিবারে দু'জন সহোদর থাকে, তাহলে কি তারা বলে যে, তৃতীয় কোন ব্যক্তি এসে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিক? বলুক, ইনি হলেন

আপনার সহোদর ভাই। আর ইনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। এরপর দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা। আপনার নিজেরই জানা আছে যে, তার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা ও সম্পর্ক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় কাউকে ডেকে আনার দরকার হবে না। এটা কেবল লৌকিকতা বা লোক দেখানো কাজ। বংশগত সম্পর্ক থেকে ইসলামের সম্পর্ক অনেক বেশি শক্তিশালী ও গভীর। দু'জন সহোদর এতটা কাছাকাছি আসতে পারেন না, যতটা কাছাকাছি হন ধর্মীয় বন্ধন ও আত্মীয়তার মাধ্যমে। ফলে তৃতীয়, চতুর্থ কোন ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তবে বর্তমান যুগে একটা বিপদ দেখা দিয়েছে যে, আমরা আকার-আকৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পারি না যে, লোকটি মুসলমান নাকি অমুসলিম? কোন কোন সময় সালাম করতে মন চায়, তবে ভাবনায় পড়ে যাই– এ লোক মুসলমান, না খৃষ্টান, ইহুদী না অন্য কিছু। বুঝা গেল, নিজের আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এমন হবে যে দেখলেই বুঝা যায়– ইনি একজন মুসলমান। তাই তার সঙ্গে সালাম-কালামে কোন অসুবিধা ও বাধা নেই।

সার কথা, এ হাদীসে হেদায়েত করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরিচয়প্রাপ্তদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করবে না। কারণ পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, শুধু বড়লোকের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত থাকে। তবে যদি কোন মানুষ হীন অবস্থায় থাকে তাহলে তার পরিচয় করানো হয় না। এর অর্থ দাঁড়াবে– আপনার সালাম হবে বড়লোকের জন্য, নগণ্যদের জন্য নয়। এটাও এক ধরনের অহংকার যে, সাধারণের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। অথচ বড়লোকদের কাছে মাথা নত করে দিবেন।

এ কারণেই ফকীহগণ লিখেছেন– কোন লোক যদি যানবাহনে গমন করে, আর মানুষ রাস্তার পাশে বসা থাকে তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ওপরই ফরয, সে বসা লোকদের সালাম জানিয়ে নিজেদের মধ্যে বিনয়ের গুণ পয়দা করবে। এমন ভাবভঙ্গি যাতে সৃষ্টি না হয় যে, দেখে মনে হয় যেন সে অপেক্ষা করছে মানুষ তাকে সালাম করুক। যেহেতু নিজেকে সে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছে। এই ছোট-বড় কোথা থেকে এলো? মানুষ সবাই ছোট। বড় হলেন আল্লাহ জাল্লাশানুহু। সর্বোত্তম ও সর্বমহান সত্তা তিনিই। তাঁর সামনে সবাই ছোট। প্রতিটি মানুষ নিজেকে মনে করবে সেই সবচে' ছোট। আল্লাহই একমাত্র বড় ও মহান– এ কথাটি যখন কেউ বিশ্বাস করবে, তখন সবার আগে সেই সালাম করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। তাই সালামের আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে– যখন দু'জনে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, তখন কেউ এ অপেক্ষায় থাকবে না যে, অপরজন আগে আমাকে সালাম করুক; বরং চেষ্টা করবে নিজেই আগে সালাম দেয়ার।

এটাই হলো সর্বোত্তম কাজ। অন্যে আগে আমাকে সালাম করুক– এ অপেক্ষা করবে না। এ কথাটিই বলা হয়েছে এভাবে–

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا

যখন দয়াময়ের বান্দাগণ চলার সময় বিনয়ের সঙ্গে চলবেন, তখন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া হবে। আর যদি খারাপ মানুষ হয় তাহলে বিদায়ের সালাম হবে যে, ভাই! আমার সালাম, আমি চলে যাচ্ছি। আমি কোন নিরর্থক কথাবার্তায় আত্মনিয়োগ করবো না। সর্বাবস্থায়ই সালাম উপকারী সাব্যস্ত হলো।

সালাম প্রদান এমন এক পবিত্র বিষয় যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

تحية اليهود بالاصابع وتحية النصارى بالاكف
وتحية المسلمين السلام عليكم -

ইহুদীদের সালাম আঙ্গুলের ইশারায়, খৃষ্টানদের সালাম করমর্দনের মাধ্যমে, আর মুসলমানদের সালাম হলো 'আসসালমু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। ইহুদী ও নাসারাদের সালাম হলো সম্মানজনক ইশারা মাত্র। আর মুসলমানদের সালাম হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দোয়া, যার অর্থ– আল্লাহ তোমাকে শান্তি, করুণা ও রহমত দান করুন, নিরাপদে রাখুন, বরকত নাযিল করুন। সালামের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের জন্য দোয়া করেন। এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনা ও মহব্বত, ভালোবাসা প্রকাশ পায়। ফলে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে। কোন এক ব্যক্তির সামনে এক জিন এসে হাজির। তার আশঙ্কা হলো জিন তাকে মেরে ফেলবে। সে এগিয়ে এসে বলল– মামা, সালাম! সে বলল– ভাগিনা! ওয়া আলাইকুমুস-সালাম। আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে মেরে ফেলব। কিন্তু তুমি মামা বলে সম্বোধন করেছ, সালাম করেছ; তাই আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়েছে। ফলে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এখন তুমি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

সালাম তাকে রক্ষা করল। এ অবস্থা শত্রুদের ক্ষেত্রেও। কারো সঙ্গে যদি চরম শত্রুতা থাকে আর আপনি তাকে বলেন– 'আসসালামু আলাইকুম!'– তাহলে তার দিল আপনার প্রতি নরম হয়ে যাবে। শত্রুতা শিথিল হয়ে যাবে। সুতরাং সালাম হচ্ছে মহা নেয়ামত, অনেক বড় বিরাট দোয়া।

জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রথম জিনিস হলো চাল-চলন। দ্বিতীয় হলো কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা। কথাবার্তায় থাকবে দোয়া। চাল-চলনে থাকবে বিনয় ও নম্রতা। ঝগড়াটে লোকের সাথে যখন কথাবার্তা হয়, তখন সালামের সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলো–

سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين

আমাদের শান্তি নিরাপত্তা হোক! আমরা গাফেল মূর্খদের কথায় জড়িয়ে পড়ব না, পড়তে চাই না।

ইসলামী শরীয়ত বসবাসের দু'টি প্রাথমিক নিয়ম বলে দিয়েছে। এক. জবানকে হেফাযতে রাখা, দুই. পদযুগল নিয়ন্ত্রণে রাখা। নীতিহীন চলাফেরা, কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ।

দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের নির্জনতা

সমাজ-জীবনের রীতি ও নিয়ম ছিল এটা। এবার সামনে যান। সামনে আসবে *মসজিদ*, নির্জনতা কিংবা রাত্রিকাল। মানুষজনের সাথে যেখানে মেলামেশা নেই। সেক্ষেত্রে করণীয় কি– এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে হেদায়াত করেছেন–

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً

দয়াময়ের বান্দাদের অবস্থা হলো এমন– যখন রাত যাপন করে তখন সেজদা ও রুকুর সাথে তা করে অর্থাৎ নিদ্রায়ও থাকে, সেজদায়ও থাকে। [ফুরকান : ৬৪]

কখনও বা কেয়াম ও রুকুতে লেগে থাকে। আল্লাহর যিকিরে লেগে থাকে। তাঁর *দরবারে* বিনম্র প্রার্থনা করে, কান্নাকাটি করে। মানুষের কাছে ভদ্র এবং আল্লাহর সামনে যখন আবেদ কিংবা দাস হিসেবে হাজির থাকে– এখানে দরকার ইবাদত ও দাসত্বের আর ওখানে প্রয়োজন দয়া ও মেহেরবানীর। দয়া ও মেহেরবানীর কর্ম হলো– সালাম করবে। আর ইবাদত ও দাসত্বের কাজ হলো– সেজদা করবে, রুকু করবে এবং আল্লাহর সামনে মাটির সাথে ঘষবে। এটা ছিল শারীরিক ইবাদত। যখন তোমরা তোমাদের ঘরে আস– মসজিদে এসে ইবাদত সবাই করে, এ কথা সকলেই জানে– তবে রাত যাপনের জন্য, আরাম করার জন্য ঘরে আসা হয় (মাবিত বলা হয় রাত যাপনকে); রাতের বেলা সকলে

একাকীই থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে সে একা। তার সঙ্গে কেউ নেই। জেগে থাকার সময় মজলিস-মাহফিল করে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে। আলাপ-আলোচনা করে। তবে নিদ্রা এসে গেলে যদি লাখ লাখ মানুষও একত্রিত থাকে আর তারা ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে সকলেই নিশ্চুপ। প্রত্যেকেই যার যার অবস্থায় একাকী ও নিঃসঙ্গ। আর তখন সকলেরই সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, বান্দার সঙ্গে নয়। তাই ঐ সময়ের আদব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– তোমরা যখন একাকী থাক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের সঙ্গে না থাকেন, সে সময় সেজদা, কেয়াম, রুকু এবং ইবাদত-বন্দেগীকে নিজেদের সঙ্গী করে নাও। যাতে তোমার বন্দেগী অধিক হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিনটি জিনিসের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর দরবারেও উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়।

افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس نيام -

আর সর্বপ্রথম জিনিস হলো, সালামের প্রচলন বাড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ মানুষকে সালাম করা। এতে মানুষের মর্যাদা বেড়ে পায়। আল্লাহ তায়ালার দরবারে যে মর্যাদা হবে তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে আখেরাতে যখন এ ব্যক্তি দেখতে ও জানতে পারবে, তখন বুঝবে। আর পার্থিব উপকার হলো এই– সালাম করার ফলে মানুষের অন্তরে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়টা হলো– اطعام الطعام দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের আহার করানো। এতে মিসকীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, মুসাফির, মেহমান সকলেই রয়েছেন। 'আহার করানো'– ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আহার করানোর ব্যাপারে হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– এতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এখন যদি কোন ভিক্ষুক বা মেহমান না আসে আর আপনি জানেন যে, অমুক লোক অভাবগ্রস্ত– তাহলে তো স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাকে আহার করাবেন। আর এতেও উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদা লাভ হবে। তৃতীয় জিনিস হলো– রাতের বেলা নামায পড়া। এ সময় সকলেই ঘুমিয়ে থাকে। চারদিকে নীরবতা বিরাজ করে। এ সময়ের নামায খুবই ইখলাসের সঙ্গে সাধিত হয়। এতে লোক দেখানোর কোন সুযোগ বা সুখ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কাকে দেখাবেন? সকলেই তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোন মানুষ এর খবরই রাখে না।

সে সময় যে ব্যক্তি নামায পড়বে, আল্লাহ তায়ালার মহব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুই তাকে জাগিয়ে রাখেনি। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই সে সন্তুষ্ট করতে চায়।

হযরাতে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– বুযুর্গানে-দীন যা কিছু পেয়েছেন রাতের নামাযের মাধ্যমেই পেয়েছেন। দুনিয়া যদি লাভ হয়ে থাকে, তাহলে সেটাও রাতের নামাযের কারণেই হয়েছে। আর পরকাল লাভও রাতের নামাযের মাধ্যমেই।

ان نا شئة الليل هى اشد وطأ واقوم قيلا

ইবাদতের জন্য রাতজাগা গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অতিশয় অনুকূল।

রাত হলো শান্তি ও আরামের সময়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– তাহাজ্জুদ নামায হলো নেককারদের পাথেয়। কারণ, দিনের বেলা লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের ধারণা হতে পারে। তবে রাতের নামাযে এসবের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নেই। সার কথা হলো, যে যা পেয়েছেন, রাতের নামাযের মাধ্যমেই পেয়েছেন।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যার কারণে আল্লাহও হাসেন। যেমন- হাসি তাঁর শানের উপযোগী। তাঁর হাসি এমন নয়, যেমনটা আমরা হেসে থাকি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আকার-আকৃতি থেকে পাক-পবিত্র। আমাদের বাহ্যিক হাসির হাকীকত হচ্ছে– মনে যখন কোন আনন্দ ও খুশি সৃষ্টি হয়, তখন হাসি আসে। মনে যদি দুঃখ-কষ্ট থাকে তাহলে কারও হাসি আসে না। কান্না হলো দুঃখের এবং হাসি আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দ ও খুশি হলো একটি অবস্থা। এটা প্রকাশ করার মাধ্যম হলো হাসি। এটা যেহেতু আমাদের দেহে রয়েছে তাই যখন অন্তরে খুশি আসে, তখন বাইরে হাসি হাসি ভাব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আকার-আকৃতি ও দেহ হতে পাক-পবিত্র সুতরাং যখন এ কথা বলা হবে যে, আল্লাহ হাসেন– তখন বলা হবে, তিনি হাসেন ঠিকই কিন্তু তাঁর হাসির অভিব্যক্তি আমাদের হাসির মত নয়।

হাদীসে এসেছে– তিন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হাসেন। এক. হজের সময়– যখন খালি মাথা, খালি পা, ধুলোবালি লাগানো শরীর, উস্কখুস্কু চুল, লম্বা-লম্বা নখ, গায়ে না আছে সুগন্ধি না আছে শোভা-সৌন্দর্য– এ অবস্থায় 'লাব্বায়েক, লাব্বায়েক' বলে ঘুরে বেড়ায়। বান্দাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তায়ালা

হাসেন– কোন জিনিস তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসেছে! স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে এসেছে, দেশ ত্যাগ করেছে! এমন অবস্থা গ্রহণ করল কেন? এটা কি কেবলই আমার প্রেম ও ভালোবাসার জন্যে নয়? নিশ্চয়ই তারা আমার জন্য পাগল হয়ে এমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের এ অবস্থা দেখে হাসতে থাকেন এবং ফেরেশতাদের বলেন– তোমরা সাক্ষী থাক, আমি একে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাদের ক্ষমা করে দেন। এ আনন্দ ও খুশিকে হাসি বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় হলো– মুকাব্বির যখন নামাযের জন্য তাকবীর বলতে থাকেন আর মানুষ প্রথম কাতারে জায়গা পেতে দৌড়ে আসতে থাকেন– সকলের মধ্যে যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতা– তা দেখে আল্লাহ তায়ালা হাসেন। তারা নিজেদের ঘর ছেড়ে আমার ঘরে সমবেত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এগিয়ে থাকতে প্রতিযোগিতা করছে। এখানে ভাত-রুটি বা মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও কেন তারা এসব করছে, দৌড়াদৌড়ি প্রতিযোগিতা করছে? তারা কেবলই আমার মহব্বত, আমার প্রেমে এসব করছে। তারা মসজিদকে আমার ঘর, আমার দরবার মনে করে এসেছে। তারা চায় তাদের প্রভুর নৈকট্য হাসিল করতে। তাদের জানা আছে, এতে প্রভুর নৈকট্য উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ হবে। এসব ঘটনা দেখে আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে হাসতে থাকেন আর সকলকে ক্ষমা করে দেন।

তৃতীয় হলো– স্বামী-স্ত্রী নিদ্রায় বিভোর। দুনিয়ার কোন খবর নেই। হঠাৎ স্বামী জেগে গেল। জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য মনস্থির করল, আর স্ত্রীকেও তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক করার জন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙালো। পানির ছিটা পেয়ে স্ত্রী হুড়মুড় করে জেগে উঠল। বলে– কী হলো! স্বামী বলল– উঠে দু'রাকাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে নাও। এখন তাহাজ্জুদের সময়। এই দৃশ্য দেখে আল্লাহ তায়ালা হাসতে থাকেন। স্ত্রী তার স্বামীর পরম প্রিয়া। তারই বাহু ডোরে সে শায়িত ছিল। মিষ্টি মধুর নিদ্রায় ছিল মগ্ন। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে জেগে ওঠে বলতে লাগল– বৃষ্টি এসে পড়ল নাকি ? স্বামী বলল– না না, বৃষ্টি আসেনি। দু'রাকাত নামায পড়ে নাও। স্ত্রী তখন উত্তর দেয়– শোকরিয়া, ধন্যবাদ! দু'রাকাত নামায পড়ার তাওফিক আমার হলো। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল এবং দু'রাকাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে নিল। অথবা স্ত্রী জাগ্রত হয়ে স্বামীর মুখে পানির ছিঁটা দিয়ে জাগিয়ে তুলল। সেও সচকিত হয়ে জেগে উঠল। এ সময়ও আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থা দেখে হাসেন।

এ তিনটি জিনিসই যেহেতু উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি

লাভের সময় ও সুযোগ তাই এদৃশ্যকে হাসির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما -

নীরব রাতে কেউ যখন একাকী থাকে, তখন সে কখনো বা রুকু কখনো সেজদা, কখনো বা তেলাওয়াত এসবে ব্যস্ত থাকে। এটা দেখেও আল্লাহ তায়ালা হাসতে থাকেন। এ সময় কেউ সামনে থাকে না যে, এ কথা বলার সুযোগ হবে– দেখো! আমি কত বড় আবেদ ও যাহেদ, দুনিয়াবিমুখ, আল্লাহ ভক্ত, পরহেযগার! কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে উঠেনি। এ একমাত্র আমাকে দেখানোর জন্য, আমাকে রাজী-খুশি ও সন্তুষ্ট করার জন্য উঠেছে। আমি পরম দানশীল! আমি দান করে থাকি, ক্ষমা করে থাকি– তাকেও ক্ষমা করে দিলাম।

এখানে তিনটি কথা হচ্ছে– ঘর থেকে বের হলে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলো। কথাবার্তা যদি বল, তাহলে শান্তি ও অভয়বাণী প্রচার কর। মন্দ কথা বলো না। মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলো না। একাকী রাত যাপন করো। যেখানে মানুষের কোন প্রবেশ নেই, সম্পর্ক নেই– তখন রুকু-সেজদা, কেয়াম ও আল্লাহ তায়ালার যিকির-ইবাদতে ব্যস্ত থেকো।

দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের মৌখিক ইবাদত

এটা হলো আমল। নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ল, রুকু, সেজদা করল; তবে মনের অবস্থা কি হবে, আবেগ-উৎসাহ কিরূপ হবে? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

> আল্লাহর ভয়-ভীতিতে অন্তর পরিপূর্ণ থাকাবস্থায় মুখ দিয়ে বলছে ও দোয়া করছে– হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব সরিয়ে নিন। [ফুরকান : ৬৫]

আমাদের থেকে দূরে রাখুন– إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا এ কারণে যে, যদি এটা আমার গলায় হারের মতো হয়ে যায়, তাহলে তা আলাদা করা খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার হয়ে যাবে। একে হটিয়ে দেয়ার মত শক্তি ও সামর্থ্য কারো থাকবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আযাব আসে, তখন আশ্রয় দিতে পারবে না কেউ। আখেরাত তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও যদি (আল্লাহ না করুন) আল্লাহ কাউকে

আযাবে পতিত করেন তাহলে কোথাও আশ্রয় পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আশ্রয় দান না করেন। যখন কোন সম্প্রদায়কে বিপদ চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে, তখন বেরিয়ে যাওয়ার, পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ তার থাকে না। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তার অন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা উদ্ধার হওয়ার কোন পথ করে না দেন, সে পর্যন্ত অন্য কোন পথ ও আশ্রয় তার থাকে না। আর পরকালে তো এ ব্যাপারে কোন উপায়-উপকরণই থাকবে না। ফলে সেখানে সব কিছুর একমাত্র মালিকানা সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার হাতেই থাকবে। সে জন্য আখেরাতের ভয়ই দুনিয়ার ভয় থেকে বেশি।

যদি দুনিয়াতে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে অন্তত এ ধারণা ও আশা পোষণ করতে পারে যে, কোন একটা উপায় ও পথ বের হয়ে যাবে– যা দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া সম্ভব হবে, বিপদ কেটে যাবে। তাতে হয়তো কিছুটা সময় চলে যাবে তবে মুক্তি পেয়েই যাব। আর পরকালে বিপদের সময় এমনটা কল্পনাও করা যাবে না। পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাসকারী মানুষ এটা চিন্তাও করতে পারে না। তার কৃত অপরাধের জন্য সেখানে কারাবন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। হাত-পা, জিহ্বা-অন্তর– সবই শক্তিহীন। সকলেই চরম বিপদে নিপতিত হবে। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, সাহায্যকারী নেই। এটা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি। এখানে ভাবনা-চিন্তা ও কল্পনা কোন কিছুরই সুযোগ নেই। এ কারণেই বলা হয়েছে– তোমরা শরীর দিয়ে ইবাদত করো। অর্থাৎ কেয়াম কুউদ, রুকু সেজদা করো এবং মুখ ও জবান দিয়ে এ দোয়া পড়–

ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ط ان عذابها كان غراما

সার কথা, প্রথমে বলা হয়েছে পা ঠিকভাবে ব্যবহার করো, সৎপথে পরিচালনা করো। তারপর শরীরকে ধরা হয়েছে। এটা রুকু, সেজদা, কেয়াম ও নামাযে লেগে যাক। তারপর বলা হয়েছে মুখের কথা। মুখে শান্তি ও নিরাপত্তা, খায়র ও কল্যাণের কথাবার্তা বলো। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করো–

انها ساءت مستقرا ومقاما -

কেননা, যাকে জাহান্নাম বলা হয়, তা খুবই নিকৃষ্টতম জায়গা ও আবাসস্থল। তা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নাজাত ও আশ্রয় দান করুন।

অর্থ-সম্পদ প্রসঙ্গে আল্লাহর বান্দাদের শান

তারপর হলো পার্থিব ধন-সম্পদ– যাকে অর্থনীতি বলা হয়। নগদ টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসবকে বলা হয় মাল-সম্পদ। আমরা যেমন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, আমাদের মাল-সম্পদও তেমনি তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং শরীর ও মন দিয়ে ইবাদত করবেন, মাল-সম্পদ দিয়ে করবেন না– এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না। ধন-সম্পদও তাঁরই দান। তিনিই আমাদেরকে দান করেছেন। এটা তাঁর দান ও দয়া। সত্যিকার মালিক তো তিনিই। তাই বলেছেন– অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রীতিনীতির বর্ণনা শেষ হলো– দেহের, হাতের, পায়ের, মুখের, জিহ্বার এবং নিদ্রা ও জাগরণের নিয়মনীতিও জানা হয়ে গেল। এখন একটি বিষয় অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে, আর তা হলো অর্থ ও অর্থনীতি। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

দয়াময়ের বান্দাদের বিশেষত্ব হলো এই– আল্লাহ যখন তাদেরকে মাল-সম্পদ দান করেন তখন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। কৃপণও হয় না, অপব্যয়ীও হয় না। [ফুরকান : ৬৭]

অপব্যয় মানে হলো– অযথা যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সে কেবল নিজের প্রবৃত্তিকে খুশি করতে যা ইচ্ছা ব্যয় করে থাকে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবেন। অপব্যয় করবেন না, আবার প্রয়োজনে খরচ করতে পিছপাও হবেন না। অপব্যয় করাকে বলা হয় ইসরাফ, আর ধরে রাখা বা কার্পণ্য করাকে বলা হয় তাফতীর। যেমন- অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً

তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। [বনি ইসরাইল : ২৯]

অর্থাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। দানও কর, নিজের প্রয়োজনে সঞ্চয়ও করো। অর্থাৎ এ কথা জেনে নাও, কোথায় ব্যয় করা জায়েয আর কোথায় নাজায়েয।

কোথায় ব্যয় করা উচিত, কোথায় অনুচিত। কোথায় দান করা ভাল, কোথায় মন্দ। খেলাধুলা, নাচগান, অনর্থক আমোদ-ফুর্তি এসব বাজেকর্মে অর্থ ব্যয় করো না। এ অবস্থায় কৃপণ হয়ে যাও। এটাই হলো উত্তম। আর যদি খায়র ও নেকীর কাজ হয়, তাহলে তাতে মুক্তহস্তে দান করা উত্তম। খরচের ব্যাপারে মানুষ যখন মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, তখনই পথের পরিচয় জেনে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। কোথায় ব্যয় করবে আর কোথায় ব্যয় করবে না– তা জেনে নেয়ার দরকার হবে।

সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই হচ্ছে ইসলামের নীতি। আমলেও এর ব্যতিক্রম হবে না। যদি হয়, তাহলে এটাও অপব্যয় বলে গণ্য হবে। যেমন- নফল নামায পড়তে শুরু হয়ে গেল আর সারারাত জেগে নফল নামায পড়তেই থাকল। আবার যখন ত্যাগ করল তখন ফরয নামাযেরও কোন খবর নেই। এমন করা ভাল কাজ নয়। ইবাদত কর, নফল পড়। তবে এভাবে– যেন সারা জীবন করে যেতে পার। ফরযগুলো আদায় করো। নফল পড়বে, তবে আজীবন তা জারি রাখার মতো পড়বে। একেই বলা হয়েছে– خير الامور ما ديم عليه মানুষের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে যা সবসময় করতে পারে, করতে থাকে। প্রবাদ রয়েছে– দৌড়ে চলো না, ধাক্কা খেয়ে পড়ো না। চলো তো মানুষের মত চলো। দৌড়াবে না এবং নেহায়েত কমজোর ও দুর্বল হয়েও চলবে না। মধ্যম চালে চলবে। এটাকেই বলা হয়েছে– নফল নামায, তেলাওয়াত, যিকির প্রভৃতি সব বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মন চায় প্রতিদিন পবিত্র কুরআন একবার খতম করি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– কখনো না। কারণ, এভাবে সবসময় করতে পারবে না। আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! দু'দিনে এক খতম করব? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না। এমনও করতে পারবে না। আবার আরয করলেন– আমি প্রতিদিন দশ পারা কুরআন তেলাওয়াত করতে চাই– যাতে প্রতি তৃতীয় দিন এক খতম হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না, এভাবে সদা-সর্বদা করতে পারবে না। আবার আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! দৈনিক এক মন্‌যিল তেলাওয়াত করব? এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। তবে আনন্দের সঙ্গে নয়; বরং বারবার বলার কারণে, আবেদন-নিবেদন করার কারণে বললেন– আচ্ছা, ঠিক আছে।

এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন– আমার যখন বার্ধক্য দেখা দিল তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার মূল্য মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলাম। এ সময় রোজ পাঁচ পারাও তেলাওয়াত করতে পারছিলাম না। আমি তখন বলতাম– আহা! যদি প্রতিদিন এক খতম তেলাওয়াত করতাম তাহলে এখন তা ত্যাগ করে বসে পড়তে হতো। ফলে তেলাওয়াত থেকে মাহরূম ও বঞ্চিত হতাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সত্য ও বাস্তব কথা বলেছেন, কত পাক-পবিত্র উপদেশ দান করেছেন! প্রতিদিন পাঁচ পারা তেলাওয়াত করাটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল– এমন আমল করা যা সবসময় আদায় করা যায়। প্রতিদিন পাঁচ পারা তেলাওয়াত করাই এখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মানুষ এ পরিমাণ আমল করবে যা সব সময় চালিয়ে যেতে পারে।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন সঙ্গিনী। তিনি মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরিফ আনলেন। দেখতে পেলেন, ছাদের সঙ্গে একটি রশি ঝুলানো রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন– এ রশি কেন ঝুলানো আছে?

বলা হলো– হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইবাদতের সময় যখন বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান, তখন এ রশির সাহায্যে নিজেকে বেঁধে রেখে পুনরায় ইবাদতে লেগে যান।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এমন করার প্রয়োজন কি! যখন ঘুম আসে, তখন ঘুমিয়ে থাক। ঘুম ভাঙলে মনে যখন আনন্দ ও প্রফুল্লতা আসে, তখন আল্লাহর যিকির কর ও ইবাদত কর। এতটা কষ্টের প্রয়োজন কি? নিদ্রা আসছে, তন্দ্রা আসছে। রশির আশ্রয়, দেয়ালের আশ্রয়– অযথা এসব করার প্রয়োজন নেই। আমল এতটুকু কর, যা সবসময় করতে পার। আমলের ব্যাপারেও 'ইকতেসাদ'– অর্থাৎ মধ্যপন্থা গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। শারীরিক ইবাদত হোক অথবা মাল-সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে হোক– সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

মহান আল্লাহর বান্দাদের কল্‌বী ইবাদত

এ পর্যন্ত হয়েছে আমলের বর্ণনা। তাতে রয়েছে চাল-চলন, সালাম-কালাম। হাত-পা, মুখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতের বর্ণনা। আর সামনে বলা হবে আধ্যাত্মিক ইবাদত সম্পর্কে। মাবদ ও মাআদ-এর মধ্যবর্তী সময় যে জীবন-যাপন করবে। এটা আন্তরিকতার সঙ্গে হওয়া উচিত। অন্তর ও আত্মার ইবাদত কি? মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

والذين لا يدعون مع الله الها اخر

> দয়াময়ের বান্দাদের অবস্থা হলো এমন– তারা যখন আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে, তখন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে না।

কাউকে আল্লাহর অংশীদার, সাহায্যকারী মনে করে না। না তাঁর সত্তার সঙ্গে, না গুণাবলীর সঙ্গে, আর না তাঁর কোন কাজকর্মের সঙ্গে। আল্লাহর সত্তা এক ও অদ্বিতীয়। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। সিফাত-কামালাত ও গুণাবলীতেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর কেউ তাঁর মত নেই। কাজকর্মেও তিনি একক। আর কেউ নেই তাঁর মতো। তাঁর যাত বা সত্তা অসীম। তাঁর কোন সীমা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু রয়েছে, সবই সীমিত। সর্বোত্তম ও সবচে' বড় সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তারও সীমা রয়েছে– দেড় গজ। আমরা একটা নির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছি। এর বাইরে কেউ নই। আমি আমার সীমায়, আপনি আপনার সীমায় কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী। সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্বের কোন সীমা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই যার অস্তিত্বের সীমা নেই। যার দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না কেন, সে-ই সীমিত, সীমাবদ্ধ। পাহাড়-পর্বত যত বিশালই হোক না কেন, তারও সীমা রয়েছে। সাগরেরও সীমা আছে। তীরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সাগরের সীমা শেষ। তারপর শুরু মূলভাগ। এমন নয় যে, সাগর রয়েছে সর্বত্র। আকাশে-পাতালে, মহাশূন্যেও রয়েছে– এমন নয়। সাগরও তার সীমার ভেতর রয়েছে। পৃথিবীও রয়েছে তার সীমার মধ্যে। সীমার বাইরে কেউই নেই, কিছুই নেই। আর আল্লাহ তায়ালার যাত-এর কোথাও কোন সীমা নেই। যে কোন আলমেই (জগত) যাওয়া যাক, সেখানেই আল্লাহর যাত বিদ্যমান। দ্বিতীয় কোন সত্তা তাঁর মত নেই– তিনি এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

একইভাবে তাঁর সিফাত এবং গুণাবলীও অদ্বিতীয়। ধরুন, আল্লাহ তায়ালার সিফাতে ইলম। আমার আপনার ইলম– ধরা যাক, একশ' মাসআলা শিখলাম

কিংবা এক হাজার। তারপর আর জানা নেই। সবই অজানা। অথচ আল্লাহ তায়ালার ইলম সীমাহীন। এমন কোন অণু-পরমাণু নেই– যার সম্পর্কে আল্লাহর ইলম নেই। এমনকি তাঁর সৃষ্ট গাছের পাতার স্পন্দনও তাঁর জ্ঞানের ও শক্তির বাইরে নয়। আমাদের সকলেরই শক্তি সীমিত। আমার সামনে যে মাইক সেটটি রাখা আছে, তা সরিয়ে নেয়া কোন কঠিন কাজ নয়। ইচ্ছা করলে মুসল্লাই উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তবে যদি বলা হয়, মসজিদটি উঠিয়ে স্থানান্তর করা হোক, তখন আমরা বলব– এ কাজ আমাদের শক্তির বাইরে। এ শক্তি আমাদের নেই। একটি জিন হয়ত মসজিদ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তবে যদি বলা হয়– পৃথিবীটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও! সে জবাব দিবে– এ শক্তি আমার নেই। ফেরেশতাগণ পৃথিবীর অংশবিশেষ উঠিয়ে নিক্ষেপ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত লূত (আ.)-এর কওমের সম্পূর্ণ জনবসতি উল্টে দিয়েছিলেন। তবে তাঁকে যদি বলা হয়, আকাশ উল্টে দিন– তিনি বলবেন, আমার এ শক্তি নেই। সার কথা, সবচে' বড় শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তিও সীমিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার শক্তির কোন সীমা-সরহদ নেই। তাঁর কুদরত (শক্তি) ইলম শোনা, দেখা প্রভৃতি সকল সিফতই সীমাহীন। তাঁর কার্যাবলীতেও তিনি একক, অদ্বিতীয়। কেউ আর তাঁর মত হতে পারে না। মাতৃগর্ভে তিনি সন্তান তৈরি করে দেন। চন্দ্র-সূর্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সে শক্তি নেই। বিশ্বের সকল বৈজ্ঞানিক একত্রিত হয়ে চাঁদ তো দূরের কথা, ভূভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশও তৈরি করে দিন না– যার মধ্যে ঐসব গুণ থাকবে যা আল্লাহর জমিনে রয়েছে। জমিনের বিভিন্ন খণ্ড বা অংশকে ভেঙেচুরে হয়তো একটা কিছু করে নিতে পারবেন, তবে সরাসরি জমিন তৈরির উপাদান সৃষ্টি করে নিবেন– তা হতে পারে না, একটুও না। সমগ্র দুনিয়ার সকল বৈজ্ঞানিক সমবেত হয়েও সূর্যের আলো সৃষ্টি করতে পারবে না– অথচ আল্লাহ তায়ালা সবই তৈরি করছেন। বুঝা গেল, আর কেউ তাঁর মত কোন কর্ম করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তায়ালার যাত, সিফাত, কার্যাবলী– সকল কিছু একক ও অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। সুতরাং মাথা যখন নত করব, তখন তাঁর কাছে তাঁর সামনেই তা করব। যদি আমরা তাঁর কোন অংশীদার, সাহায্যকারী মেনে নিই, তাহলে তা সঠিক হবে কেমন করে? কারণ, তাঁর যাত, সিফাত এবং কার্যাবলীতে যখন কেউ শরীক নেই, তখন ইবাদতে শরীক হবে কেমন করে? সুতরাং সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য। রুকু, সেজদা যেমন তাঁকেই একমাত্র মালিক হিসেবে করব; তেমনি অভাব-অভিযোগও একমাত্র তাঁর সামনেই পেশ করব। ধন-

সম্পদ, সন্তান-সন্ততিও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করব। আল্লাহ ছাড়া মালিক তো আর কেউ নেই। তাই দান করার ক্ষমতাও অন্য কারো নেই।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) মহান আল্লাহর পবিত্র বান্দা। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ, অনন্য। অথচ তাঁর আবদিয়ত ও দাসত্বের নমুনা হচ্ছে এমন, যে তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে–

قُلْ لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا

হে নবী! আপনি ঘোষণা করুন, আমি তোমাদের লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দের কিছুরই মালিক নই, অধিকারী নই। [মায়িদা : ৭৬]

আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يا فاطمة بنت محمد لا اغنى عنك من الله شيئا

হে ফাতেমা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা! আমার ক্ষমতাধীন কিছুই নেই। তোমার মধ্যে যদি ঈমান ও আমল থেকে থাকে তাহলে নাজাত পেয়ে যাবে। আমি নাজাত দিতে পারব না। এতে আমার কোন হাত নেই। না ইহকাল আমার ক্ষমতাধীন আছে আর না পরকাল। অর্থাৎ কিছুই নেই।

সাইয়েদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন যখন একথা বলেছেন যে, আমার ক্ষমতাধীন কিছুই নেই– তখন আমি আপনি কে? আমাদের মূল্যই বা কি? সমগ্র সৃষ্টিজগতে কারো ক্ষমতাধীন কিছুই নেই। সুতরাং ঐ সত্তাকে মান্য কর, সকল কিছু যাঁর ক্ষমতাধীন।

খলিফা হারুন-অর রশীদের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক গ্রাম্য লোক অভাবের তাড়নায় খলিফার কাছে আগমন করলো সাহায্যের জন্য আবেদন-নিবেদন করতে। সে মনে মনে স্থির করল, অনাহারে মৃত্যুর দুয়ারে তার ছেলেমেয়েরা পৌঁছে গেছে। তার এ দুরবস্থার কথা জানিয়ে বাদশাহকে বলবে রাজকীয় কোষাগার থেকে তাকে কিছু সাহায্য করার জন্য। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি সে হয়ে দেখতে পেল, বাদশাহ হারুন-অর রশীদ নামায আদায় করছেন। দারোয়ান ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ায় প্রবেশপথে সে থেমে গেল। খলিফা নামায পড়ছেন। গ্রাম্য লোকটি দরজায়

দাঁড়িয়ে রইল। বাদশাহ নামায ও মুনাজাত শেষ করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কেন এসেছেন?

লোকটি বললেন– কেন এসেছি তা পরে বলবো। আপনি আগে আমাকে এ কথা বলুন, আপনি এতক্ষণ কি কাজ করছিলেন?

খলিফা বললেন– আমি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছিলাম।

লোকটি বলল– আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার চেয়ে বড় আর কেউ আছে কি-না?

খলিফা বললেন– হ্যাঁ, আমার চেয়েও অনেক বড় আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন। তাঁর কাছেই তো আমি দোয়া করছিলাম, প্রার্থনা করছিলাম।

গ্রাম্য লোকটি ফিরে গেল। বলল, আমি ঐ যাতের নিকটই প্রার্থনা করব, চেয়ে নেবো। বাদশাহ হারুন-অর রশীদের কাছে চাওয়া ও ভিক্ষা করার কোন দরকার নেই। বাদশাহ যাঁর নিকট ভিক্ষা করবে, তাঁর নিকট আমিও চেয়ে নিব। তিনি যখন তাঁর মুখাপেক্ষী, তাহলে আমি কেন মুখাপেক্ষীর মুখাপেক্ষী হতে যাব? সার কথা হলো– সকলেই তাঁর সামনে শক্তিহীন, অভাবী, অসহায়। তিনি সকলের সব কিছু করেন। অন্য কেউ কিছু দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আল্লাহ *তায়ালাই* দিয়ে থাকেন, নেয়ার শক্তিও একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

মানুষ যদি কিছু পেতে চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক করে নিক। সব কিছু পেয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে যদি সম্পর্ক ভাল না থাকে, তাহলে কিছুই পাবে না। আগে যা পেয়েছিল, তা-ও ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে।

একদিন খলিফা হারুন-অর রশীদ সভাসদ নিয়ে উপবিষ্ট। রাজশক্তির গর্বভরে তিনি বলে ফেললেন– আজ যে যা চাইবে তাকে তা-ই দিয়ে দেয়া হবে। সবাই দাঁড়িয়ে গেল। কেউ বলল– আমাকে দশ লাখ টাকা দান করুন। দান করে দিলেন। কেউ বলল– আমাকে অমুক প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দিন, বানিয়ে দিলেন। কেউ বলল– আমাকে গভর্নর জেনারেল বানিয়ে দিন, বানিয়ে দিলেন। কেউ বলল– আমাকে একটি প্রাসাদ দিয়ে দিন, দেয়া হলো। মোট কথা, যে যা চাইল, তা তাকে দিয়ে দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন। এ সময় এক কৃতদাসী তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল। বাদশাহ মাথা ঘুরিয়ে বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কিছু চাইলে না? সকলেই তো যার যার ইচ্ছেমতো চেয়ে নিচ্ছে।

বাঁদী বলল– ওসব বোকাদের নিতে দিন। সবশেষ আমিও একটি জিনিস চাইব।

খলিফা বললেন, তাহলে কি আমার মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমরাহ সকলেই বোকা, পাগল এবং নির্বোধ? বাঁদীর কথাগুলো বাদশাহ হারুন-অর রশীদের খুবই অপছন্দ হলো। মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমরাহ সকলকে সে পাগল ও নির্বোধ বলায় সভাসদের সকলেই ঐ বাঁদীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তবে খলিফার খাস বাঁদী বলে কিছু বলতেও পারছেন না। যা হোক, বাঁদীর কথা হলো– বোকার দল নিয়ে নিক। তারপর সে তার দাবি বাদশাহর খেদমতে পেশ করবে।

উপস্থিত সকলে যখন তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস চেয়ে নিয়ে শেষ করলো, তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো, তখন বাদশাহ বাঁদীকে বললেন– এবার বল, তুমি কী চাও?

বাঁদী বলল– যা চাইব আপনি কি তা দিতে পারবেন?

খলিফা বললেন– হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিব। আমি দেয়ার জন্যই ঘোষণা করেছি।

বাঁদী তখন সাহস করে বাদশাহের পিঠে হাত রেখে বলল– আমি আপনাকে চাই। আর আপনি যখন আমার হয়ে যাবেন, আমার পাশে থাকবেন, তখন রাজত্ব, রাজপ্রাসাদ, ধনাগার, কোষাগার– সবই আমার হয়ে যাবে। এরা সকলে বোকা এজন্য যে, একজন কোষাগার চেয়েছে, সে তা পেয়ে গেছে। তারপর আর কিছুই তার পাওয়ার নেই। যে প্রাসাদ চেয়েছে, সেও তা পেয়ে গেছে- তারপর কিছুই পাওয়ার নেই। আবার কেউ গভর্নর হতে চেয়েছে। গভর্নর হয়ে গেছে, তারও প্রাপ্য শেষ হয়ে গেল। তারা সকলে একটি করে জিনিস চেয়েছে, তা তারা পেয়েও গেছে। আমি এমন জিনিস চেয়েছি যার মাধ্যমে সব জিনিসই আমার হয়ে যায়, আমার হাতে এসে যায়।

আহলে দুনিয়া ও আহলুল্লাহদের অবস্থা হলো এই। উদাহরণ হিসেবে মনে করুন, আহলে দুনিয়ারা দুনিয়া প্রত্যাশী। ফলে তারা নিবেদন করেন- হে আল্লাহ! আমাকে লাখপতি বানিয়ে দিন, কোটিপতি বানিয়ে দিন। (মনে করুন) তাদেরকে লাখপতি, কোটিপতি বানিয়ে দেয়া হলো। কেউ বলল– আমাকে জায়গীরদারী দান করুন। আল্লাহ তায়ালা জায়গীর দিয়ে দিলেন। তবে আল্লাহওয়ালাগণ বলেন– হে আল্লাহ! আপনি আমার হয়ে যান, তাহলে সব কিছুই আমার অধীন ও আয়ত্তে এসে যাবে। আহলে দুনিয়ারা হয়েছেন লাখপতি, কোটিপতি। কিন্তু সত্যিকার বুদ্ধিমানের কাজ হলো, মূল উৎস ও কেন্দ্র হস্তগত করা। তাহলে সবই হয়ে যাবে।

ফলে মানুষ যদি প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার নিকট করবে। যে

নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যের নিকট প্রার্থনাকারী– তার কাছে কি প্রার্থনা করবে? এ কারণেই বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰـهًا ءَاخَرَ

মহান প্রভুর বান্দাদের শান হলো– যখন তাঁরা আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা করতে বসেন তখন একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ তায়ালার দরবারেই পেশ করেন। একমাত্র তাঁকেই ডাকেন। তাঁর কাছেই করজোড়ে প্রার্থনা করেন। অন্য কাউকে তাঁর শরীক, অংশীদার ও সাহায্যকারী বলে কল্পনাও করেন না। আল্লাহর কোন সাহায্যকারী নেই। প্রয়োজনও নেই। তিনি যখন একটা একটা করে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন কাউকে বলেননি– তুমি এ পরিমাণ করে দাও, অবশিষ্ট অংশ আমি করে নিব। মাতৃগর্ভে যখন সন্তান তৈরি ও সৃষ্টি করেন, তখন কারো নিকট সাহায্য চান কি? বলেন কি– তুমি এসো, অংশীদার হয়ে যাও। একা আমাকে দিয়ে কাজ পূর্ণ হচ্ছে না। তুমি অংশীদারিত্ব গ্রহণ করলে কাজটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে! কোন কাজের শুরুতে, কোন বস্তুর সৃষ্টিতে যখন তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাহলে তাঁর জন্য নির্ধারিত ইবাদতে অন্যরা অংশীদার হয়ে গেল কেমন করে, কিভাবে? সৃষ্টিতে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন মাবুদ ও উপাস্য হবেন কেবল তিনিই। অন্য কেউ নয়।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

একমাত্র তোমার অদ্বিতীয় লা-শরীক যাতের ইবাদতই করব, অন্য কারো নিকট করব না। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ শান দান করেছেন। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথানত করে না। তার জিল্লত ও হীনতা সে প্রকাশ করবে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সামনে, তাঁর দরবারে। মানুষের সামনে মানুষ হীন-অপদস্থ হওয়ার জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়নি। এ কারণেই শরীয়ত ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করেছে। কারো সামনে কাউকে ভিক্ষার হাত বাড়াতে নিষেধ করেছেন। এ কারণে যে, ভিক্ষা করার চেয়ে হীনতম কাজ আর কিছু নেই। ভিক্ষা চাওয়ার অর্থ হলো– নিজেকে হীন করা, অপমানিত ও অসম্মানী করা। নিজেরই মত অন্য মানুষের সামনে নিজেকে অপদস্থ করার অধিকার মানুষের নেই।

হ্যাঁ, এক তো হলো বন্ধুত্বের কারণে যাওয়া। যেমন কারো সঙ্গে আপনার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব রয়েছে। তাকে বললেন– দোস্ত! আমাকে এ জিনিসটি দিয়ে

দাও। এটা হলো বন্ধুত্ব সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ ও মাধ্যম। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

আল্লাহ তায়ালা বলেন– এতে কোন প্রকার গুনাহ নেই। তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে যেভাবে তোমাদের মন চায়, ইচ্ছা ও খুশি হয়– আহার করতে পার। মায়ের ঘর থেকে চেয়ে খেতে পার। মায়ের কাছে না চাওয়া অহংকার এবং চাওয়া মহব্বতের পরিচায়ক। পিতা, সহোদর ভাইবোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা কিংবা ঐ সকল ঘর হতে– যেগুলোর চাবি অর্থাৎ চাওয়ার অধিকার তোমাদের হাতে এবং তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের কাছে চেয়ে মেগেও আহার করতে পার। এতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। [নূর : ৬১]

যদি কোন জিনিস তাদের থেকে চেয়ে নিয়ে যাও, তাহলে বুঝা যাবে, নিজের মনে করেই চেয়েছ। অন্য কারো নিকট হাত পাতনি, চাওনি। তেমনি বন্ধুত্বের কারণে যদি কোন জিনিস চেয়ে মেগে নিয়ে যাও, তাহলে অসম্মান হওয়ার পরিবর্তে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ কাজের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সমর্থন করা হয়েছে। আরেকটা হলো ভিক্ষা করা। অর্থাৎ সর্বহারা, অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে অন্যের সামনে নিজেকে এই বলে উপস্থাপন করা যে, তুমিই আমার কাজ করে দাও, দুঃখ ও অভাব মোচন করে দাও। আমি কিছুই করতে পারছি না। এমন অবমাননাকর অবস্থা প্রকাশ করা থেকে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, সম্মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চাওয়া-মাগায় কোন বাধা নেই।

সার কথা হলো, ভিক্ষা করা, চাওয়া-মাগা হলো জিল্লতের কাজ, অপমানের কাজ। এরূপ জিল্লতী, হীনতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সামনে পেশ করা যেতে পারে, অন্য কারো সামনে নয়। এ কারণেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চাইতে হয় তো আল্লাহ তায়ালার নিকট চাও, কাঁদো তো তাঁর নিকট কাঁদো, সন্তান-সম্পদ-স্বাস্থ্য– তাঁরই নিকট চাও সবকিছু। যেহেতু সব কিছুর উৎস, সবকিছুই তাঁর

হাতে সংরক্ষিত, তাঁর আয়ত্তাধীন। এ কারণেই বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰـهًا اٰخَرَ

রহমানের প্রকৃত বান্দা তারাই, যারা যখন ফরিয়াদ করে, নালিশ করে, তখন রহমান ছাড়া অন্য কারো নিকট করে না। কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করে না। শুধু তাঁকে ডাকে। [ফুরকান : ৩৮]

হক্কুল ইবাদ-এর ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের কর্মধারা

এখন পর্যন্ত চাল-চলন, কথাবার্তা, হাত-পা, ধন-সম্পদ এবং রূহ ও আত্মার সকল ইবাদতের বর্ণনা এসে গেছে। এবার অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার, কায়-কারবার, সামাজিকতা এবং একে অন্যের হক বর্ণনা করা হবে। এ সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা কি? ইরশাদ হয়েছে–

وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

তারাই দয়াময়ের বান্দা যারা অন্যায়ভাবে বা অকারণে নরহত্যা করে না, কাউকে প্রাণে বধ করে না, কারো শিরোশ্ছেদ করে না। [ফুরকান : ৬৮]

দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের শান এটা নয়, এ অবস্থা নয়। এসব হলো ফাসেক-ফাজেরের কাজ যে, অন্যদের কষ্ট দিবে, অন্যদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন করবে। নিজের বাহাদুরী দেখানো, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে অন্যদেরকে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করবে। কারবারে, আচরণে অন্যদের তুচ্ছ, হীন জ্ঞান করবে। এসব তো হলো অহংকারীদের শান। তাদের জন্য পরকালে কিছুই রাখা হয়নি। তারা দুনিয়ায় থাকাকালীন নিজেদের বিরাট একটা কিছু ভাবতে থাকবে। না জানি তারা কত বড় কিছু হয়ে গেছে। অথচ এ ধরনের মানুষকে পৃথিবীতে থাকাকালীনই চরম দুরবস্থায় পড়তে হতে হয়। তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়– যারা সর্বদা অন্যদের হেয়, হীন ও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় থাকে ব্যস্ত।

তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন, হত্যা করো, তাহলে হত্যা করা ফরয হয়ে যায়। যেমন- কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) গ্রহণের ক্ষেত্রে হত্যা

করা হয়। কেউ যদি অন্যায়ভাবে অন্য কাউকে হত্যা করে, তাহলে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা জায়েয। কিংবা কেউ যদি নিজের সত্য দীন বর্জন করে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকেও হত্যা করা জায়েয। অথবা কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকেও প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা জায়েয। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করো। সার কথা, ব্যভিচার ও খুনিদের থেকে পৃথিবীকে পূত-পবিত্র রাখার জন্য অথবা মুরতাদ– যারা দীনের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন না করে নিজের দীন পরিবর্তন করে ফেলে, এ ধরনের মানুষ থেকে পৃথিবীকে পূত-পবিত্র করার জন্য হত্যা করা জায়েয। ফলে এ ধরনের হত্যা বৈধ ও হক। নাহক ও অবৈধ হত্যা হলো সেটা– যেখানে হত্যা করার আইনানুগ কোন কারণ ছিল না। স্বার্থের জন্য ঝগড়া করে কিংবা লোভে পড়ে হত্যা করল অথবা ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্বামীকে হত্যা করল বা ঝগড়া-বিবাদ থেকে সৃষ্ট রাগ ও ক্রোধের বশে শুরু হওয়া মারামারি, কাটাকাটি, নরহত্যা– যার কোন আইনানুগ বৈধতা ছিল না। এ কথাটিই বলা হয়েছে যে, দয়াময়ের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক থাকবে, তারাও দয়ালু হবে। এসব কাজ তারা করবে না। এসব হলো ফাসেক-ফাজেরদের কাজ। গরু-মহিষ, জন্তু-জানোয়ারের মতো ঘোরাফেরা যার কাজ– যাকেই সামনে পেল কারণে অকারণে শিং মেরে দিল। বাঘ তৈরি হয়ে বসে আছে। সামন দিয়ে যে-ই যাবে তাকেই সে আক্রমণ করবে। কোন বিচার-বিবেচনা নেই। এক কথায়, এসব হলো চারপায়া জন্তু-জানোয়ারের কাজ, মানুষের কাজ নয়। প্রকৃত মু'মিন কে এবং তার লক্ষণ কি– এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم

প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্টতা হতে অন্য মানুষ নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ মনে করে।

মনে করা হয়, এ ব্যক্তি মুমিন– যার দ্বারা কারো প্রাণহানি হবে না। কারো মাল-সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস হবে না। কারো সম্মান সে ধুলায় লুটাবে না। এ অবস্থায় নিজেকে তার নিকট নিরাপদ মনে করে মানুষ অন্তরে সান্ত্বনা পায়। তাহলেই বুঝা যাবে, এ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন।

তারপর امنه الناس শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ নিরাপদ থাকে। সকলেই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পারে আর নিরাপত্তা অনুভব করে। বলবে যে, ভাই! এ ব্যক্তি মুমিন! তার কাজ এটা নয়। সে মারামারি করবে, মানুষের সম্মান নষ্ট করবে। মানুষ তার থেকে নিরাপদ

থাকবে– এমন ব্যক্তি নেক ও সালেহ। তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করে না। আর কারো অন্তরে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বদা এ আশঙ্কা থাকে যে, কখন সে ছুরি মেরে দিবে– তাহলে সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। সে পশুর মতো একটা জানোয়ার, বলদবিশেষ। রাস্তা দিয়ে যখন চলে, তখন হুঁশিয়ার ব্যক্তি যারা, তারা কাপড় সামলে রাখেন যাতে তার কৃত ময়লা থেকে বেঁচে থাকা যায়। ছিটাফোঁটা পড়ে না যায়। শিংয়ের আক্রমণ থেকে হেফাযতে থাকা যায়। এরূপ আশঙ্কা, ভয়ভীতি পশু থেকে ঘটতে পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুমিনদের থেকেও যদি মানুষকে এভাবে সাবধান, সতর্ক থাকতে হয়– ভাই, সাবধান! পকেট কেটে নিয়ে যাবে– তাহলে মুমিন হলো কি করে? মুমিনের কাজ তো এসব নয়।

এ কারণেই বলা হয়েছে, সেই হলো দয়াময় প্রভুর প্রকৃত বান্দা যে মানবীয় বাসনার অনুসরণ করে না, কাউকে হত্যা করে না, কারো ধন-সম্পদ, মান-সম্মান নষ্ট করে না। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ যদি এসে যায়, তাহলে আদেশ পালনার্থে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। তবে এ কর্ম তাদের পেশা নয়। এসব কাজ থেকে তারা অনেক অনেক দূরে অবস্থান করেন। কারো মান-সম্মান তারা নষ্ট করেন না। সবচে' বড় মানহানিকর কাজ হচ্ছে ব্যভিচার। এর মাধ্যমে কোন নারীর সতীত্ব নাশ করা হয়, অসম্মানী করা হয়। যার ফলে তার সারাটা জীবন কলঙ্কিত হয়ে যায়। সারা জীবনের জন্য কলঙ্কের কালি লেপন হয়ে যায়। এতে যদি কোন সন্তান প্রসব করে, সেটাও হয় ব্যভিচারের ফসল 'ওলাদুয-যিনা'। তখন অবৈধ সন্তানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে দেশ-খেশ কেউ রাজী হয় না। তার সাথে সামাজিক ওঠাবসা, লেনদেন করবে না। কত মারাত্মক ও বিরাট গুনাহ সে করল! একজন নারীর সারাটি জীবন ধ্বংস করে দিল। সমাজে তার জন্য কোন জায়গা থাকেনি। এমন লোককে হত্যা করা, তার শিরোচ্ছেদ করাই কর্তব্য।

এছাড়া মানসম্মান নষ্ট করল একজনের; সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সমাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দিল। তাতে করে অন্যরাও সাহস পাবে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার। এর মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত ও বিঘ্নিত হয় এবং দারুণভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়। ব্যভিচারের মাধ্যমে মান-সম্মান লুণ্ঠিত হয়, অন্যের সম্মানের হানি হয় এবং নিন্দনীয় এ কাজে সাহস বাড়িয়ে দেয়। এজন্যই আদেশ করা হয়েছে– ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা কর। শুধু তাই নয় যে, হত্যা করে দাও; বরং এর অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে রাখ এবং মানুষজন সমবেত হয়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে একে প্রাণে বধ করে

দাও। বাহ্যিক চোখে এ দণ্ড খুবই কঠোর মনে হয়। মানুষ বলে থাকে– এটা অমানবিক সাজা। কিন্তু আমি বলছি– পাপের ধরনটাও দেখ। একজনের মান-সম্মান নষ্ট করেছে, সমাজকে ধ্বংস করেছে। দুনিয়া থেকে নিরাপত্তা বিদায় করে দিয়েছে। এ ধরনের মানুষের সাজা এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এজন্যই বলা হয়েছে, দয়াময় প্রভুর বান্দাদের শান হচ্ছে– কারো প্রাণ সংহার করবে না। কারো মান-সম্মান নষ্ট করবে না; বরং জান-প্রাণ, মান-সম্মান এসব হেফাযত ও সংরক্ষণ করেন। ومن يفعل ذالك يلق اثاما এরপরও কেউ যদি এমন কাজ করে ফেলে, তাকে 'আসাম' নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– 'আসাম' হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা এবং জাহান্নামের বনভূমি। এখানে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। জাহান্নামের অন্য অংশ এর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। আর এখানেই হবে তার চির-আবাস। يضاعف له العذاب তার আযাব কেবল বাড়তে থাকবে। এ কারণে যে, পৃথিবীতে মানুষের মান-সম্মান তছনছ করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই শাস্তিও কঠোরভাবে প্রদান করা হবে, যেন কোন প্রকার সুখ-শান্তি সে না পায়। সেখানেও সে শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে না। ويخلد فيه مهانا এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে অপদস্থ, অপমানিত হয়ে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

তাওবাকারীদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার ব্যবহার

কেউ যদি সত্যিকার তাওবা করে নেয়, কেবল সেই রক্ষা পাবে। তার থেকে পরকালের শাস্তি রহিত করা হবে। পৃথিবীতে তো শাস্তি হয়েই গেছে, পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে; তবুও এ অবস্থায়ও অন্তর দিয়ে আখেরাতের জন্য তাওবার দ্বার খোলা রাখা হয়েছে। তাওবা যদি করে নেয়, তাহলে আখেরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে।

إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ

তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে নিবে এবং তাওবা করার পর নেক ও সৎপথ অনুসরণ করবে, গুনাহের কাজকর্ম ত্যাগ করবে– সে ব্যক্তির কেবল গুনাহই মাফ

হবে না; বরং তার নেকীগুলো গুনাহগুলোকে ধ্বংস করে দিবে, নিশ্চিহ্ন করে দিবে। আর তার নেকের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তার গুনাহকে নেকী দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। আর এ পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আখেরাতে প্রকাশ পাবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– জনৈক ব্যক্তি কেয়ামতের ময়দানে হাজির হবে আর আল্লাহ তায়ালা তাকে ডেকে নিবেন। হয়তো এ ব্যক্তি তাওবা করে গিয়েছেন, কিংবা তাওবা করেননি– আল্লাহর দয়া তার উপর বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহ *তায়ালা* তাকে বলবেন– কাছে আসো। সে কাছে যাবে। বলবেন– আরো কাছে আসো। লোকটি ভয়ে কাঁপতে থাকবে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন– আরো নিকটে আসো। সে আরো নিকটবর্তী হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– তার কানের কাছে আস্তে আস্তে কথাবার্তা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ছোট ছোট গুনাহগুলো স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং বলবেন– এ কাজ কেন করেছিলে? ভয়ে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। মনে মনে ভাববে, তার নাজাতের আর কোন উপায় নেই। এখনই হয়তো নির্দেশ দেয়া হবে– জাহান্নামে নিয়ে যাও! এখনও তো ছোট ছোট গুনাহের কথা বলা হচ্ছে। অথচ যেসব বড় বড় গুনাহ আমি করেছি, সেসব যখন পেশ করা হবে, তখন কী উপায় হবে? এগুলো তো ছোট ও সাধারণ গুনাহ ছিল। তাই এগুলোর জন্য কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওজর-আপত্তি পেশ করার মত কোন জিনিসও থাকবে না, কোন সুযোগও থাকবে না।

ভয়ে ভয়ে সে আরয করবে– হে আল্লাহ! আমার বদ-বখতী ও দুর্ভাগ্যের কারণে ওসব অপকর্ম করেছিলাম। অনেক গুনাহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বলবেন– ঐ পাপগুলোর বিনিময়ে আমি তোমাকে নেকী ও পুণ্য দান করলাম আর তোমার আমলনামায়ও তা লিখে দিলাম।

এবার সে হয়রান হয়ে যাবে আর চিন্তা করবে– এ তো দেখি অন্য ব্যাপার হচ্ছে! যে কারণে আমি ভয়ে আতঙ্কে কম্পমান ছিলাম। ভেবেছিলাম আমার ধ্বংস অনিবার্য– এখন দেখি আল্লাহ তায়ালা গুনাহর বিনিময়ে নেকী ও পুণ্য দান করছেন। তখন সে নিজেই বলবে– হে আল্লাহ্! বিরাট বিরাট পাপগুলো যা আমি করেছিলাম, সেগুলো সম্পর্কে তো আপনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না! আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন– কী সেগুলো? বান্দা আরয করবে– সেগুলো এমন এমন ছিল। আল্লাহ বলবেন– ঐসবের বিনিময়েও নেকী দিয়ে দিলাম। তারপর বান্দা আবার বলবে– ওগুলোর চেয়েও বড় ও মারাত্মক একটি গুনাহ রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন– সেটি আবার কি? সে বলবে– সে গুনাহ ছিল এই। আল্লাহ বলবেন– এর পরিবর্তেও নেকী দিয়ে দিলাম।

মোট কথা, আল্লাহ তায়ালার রহমত ও দয়া যদি বর্ষিত হয়ে যায়, তাহলে ধ্বংসের কোন সম্ভাবনা থাকে না। আল্লাহ না করুন, যদি গযব ও আযাব বর্ষিত হয় তাহলে নাজাত ও মুক্তির কোন উপায় নেই, পথ নেই। এরপর বলেন–

من تاب وعمل عملا صالحا فانه يتوب الى الله متابا -

এর আগে গুনাহগার পাপীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। এবার নীতি বর্ণনা করা হচ্ছে– কারো থেকে যদি কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে সে তাওবা করবে। আল্লাহর দিকে রুজু করবে। কারও জন্যেই তাওবার দরজা রুদ্ধ নয়; সর্বদা উন্মুক্ত। মুমিনের উচিত হলো, সে কখনো কোন অবস্থায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না। তাওবার দরজা তখনই বন্ধ হবে যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হবে এবং কেয়ামতের বড় বড় লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে। সে সময় পৃথিবীর ধ্বংস নিকটবর্তী হয়ে পড়বে। আর তখনই তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কেউ যদি দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে পাপাচারে লিপ্ত থাকার পর আন্তরিকতার সঙ্গে তাওবা করে নেয়, তবুও সে মুক্তি ও ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। তারপর তার অন্তরে লজ্জা ও অনুশোচনা দেখা দিল এবং সে হাত তুলে কেবল বলল– হে দয়াময় প্রভু আমার! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সে তখনও এ কথা বলেনি যে, আমাকে মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও– অথচ আল্লাহ তায়ালা এর আগেই 'আমার দয়াময় প্রভু' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাফ করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন–

ايعلم ان له ربا

অর্থাৎ সে জানতে পেরেছে যে, তারও কোন প্রভু এবং মালিক রয়েছেন, যিনি তাকে পাকড়াও করবেন। এ কথা সে জানতে পেরেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– কেউ যখন এ কথা জানতে ও বুঝতে পারে, তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

ক্ষমা প্রার্থনা করে যাওয়ার পরক্ষণে পুনরায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল, লজ্জিত হলো, আবার হাত উঠাল এবং বলল– হে আমার দয়াময় প্রভু! তখনও আল্লাহ তায়ালা বলবেন– আচ্ছা, সে জানতে পেরেছে, তার একজন রব রয়েছেন। এবারও তাকে ক্ষমা চাওয়ার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে লোক সকল! তোমরা গুনাহ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে ক্লান্ত হবেন না। তোমাদের গুনাহ সীমাবদ্ধ। আর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমত *সীমাহীন*, কোন সীমা-সরহদ নেই। তাই মূলনীতিস্বরূপ বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করে...।

তারপর বলেছেন–

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً

দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা হলো এই– যখন তাদের সঙ্গে কোন বিষয় ও ব্যাপার দেখা দিবে, তখন তারা মিথ্যা বলবে না। 'যুর' শব্দের অর্থ হলো 'মিথ্যা *সাক্ষ্য দেয়া*'। দয়াময়ের বান্দাগণ মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন না, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন না। যদি এমন সব মজলিসে যান বা তার পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে কোনো খায়র ও কল্যাণ নেই, অনর্থক বাজে কথাবার্তা হয়, তাহলে সরল-সহজ ও সততার সাথে চলে যান।

সবসময় তারা এ দোয়া করতে থাকবেন–

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

> হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে নেক ও সালেহ, পাক-পবিত্র স্ত্রী ও সন্তান দান করুন। আমাদেরকে নেক ও সালেহ, পাক পবিত্র মানুষের পেশওয়া (নেতা) বানান, আমরা নিজেরা যেন নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনকে সৎপথ দেখাতে পারি। [ফুরকান : ৭৪]

এরপর এ কথা বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

আর তাদের অন্তরে দীনি ইলম ও জ্ঞান এই পরিমাণ থাকে যে, যখন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন আত্মা নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত থাকার কারণে সঙ্গে সঙ্গে সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। দীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। দীনের ওপর সুদৃঢ় থাকার ফলে তাদের মধ্যে সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধি সৃষ্টি হয়। আয়াতগুলোকে তারা অন্ধ-বধিরদের ন্যায় গ্রহণ করে না; বরং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীজনদের ন্যায় দেখে শুনে গ্রহণ করে। তারা সে অর্থই বুঝতে সক্ষম হয় যে অর্থ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য।

দয়ালু আল্লাহর বান্দাদের সাআদ বা পরকাল

এরপর বলেন– اولئك يجزون الغرفة এসব মানুষই যাদের পরকালকে উত্তম হতে উত্তম প্রাসাদের উচ্চস্থান দান করা হবে। অর্থাৎ উত্তম হতে উত্তম প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা দান করা হবে। চিরস্থায়ী জীবন ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি তাদেরকে দান করা হবে। এই হলো পরকালে আমাদের বাসস্থান। আমাদের সেখানে যেতে হবে। আরেক স্থান হলো– যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র যাত, তাঁর হুকুম ও আদেশ। এ ছিল আমাদের মাব্‌দা- যেখান থেকে আমাদের শুরু ও চলার সূচনা হয়েছিল। আর এ পুরস্কার (সুউচ্চ প্রাসাদ) আমাদের মাআদ (পরকাল) হবে। আর মাঝখানের জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি হচ্ছে এই হাত, পা, জিহ্বা, রূহ, আত্মা। আর অর্থ-সম্পদেরও হেফাযত হবে। প্রতিটি জিনিস আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী হবে। নির্দেশ মতো করার আবেগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হবে। আর এ অবস্থা তখন হবে যখন শরীয়ত চোখের সামনে থাকবে এবং এর বিধি-বিধান ও শিক্ষা আমাদের সামনে থাকবে। যার মাধ্যমে আমরা আমাদের হাত, পা, রূহ বা আত্মা, মন-মস্তিষ্ককে ঐ পথে পরিচালিত করতে পারব।

শুরুতে বলা হয়েছিল– প্রশ্ন হচ্ছে তিনটা আর সেগুলো মানুষের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়। আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব, কিভাবে জীবন-যাপন করব। আমাদের শুরুটা যেখানে হয়েছে, তা হলো আল্লাহ তায়ালার বরকতময়

যাত ও সত্তা। তাঁর নির্দেশেই আমরা এসেছি। তাঁর ওযুদ ও অস্তিত্ব থেকেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি। তিনি আদেশ করেছেন 'হয়ে যাও'– আমরা হয়ে গেছি। মূল হলো আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যাবো কোথায়? এটা হলো 'মাআদ'– পুনরায় ঐ স্থানে প্রত্যাবর্তন করব। সেখানে গিয়েই পূর্ণাঙ্গ শান্তি পাওয়া যাবে। আর মধ্যবর্তী সময়ে আমরা তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করে যাব।

এখন প্রশ্ন হলো– তাঁর নির্দেশাবলী আমাদের কাছে আসবে কেমন করে? তাঁর 'রাসূলে পাক' তাঁর নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন। যাকে বলা হয়, 'সীরাতে মুস্তাকিম'– যার ওপর আমাদের চলতে হবে। তিনটি জিনিসের ওপর যখন আমরা এসে যাব, তখনই আমাদের আত্মা শান্তি পাবে। মানুষ যদি এই পরিমাণ অন্ধ থেকে যায় যে, যে পথ দিয়ে সে চলবে, সে পথ না পায়। যদি সে এ কথা না জানে– কোথা থেকে এসেছে, শুধু মনে করে যে, পৃথিবীতে সে আপনা-আপনি চলে এসেছে, তার কোন স্রষ্টা নেই; তাহলে তাঁর অন্তরে কখনো প্রশান্তি আসবে না, আসতে পারে না।

আবার কেউ যদি বলে– আমরা চলতে থাকব। তবে কেয়ামতও আসবে না, পরকালও আসবে না আর এ পৃথিবী ধ্বংসও হবে না। তাহলে তার মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বা দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, যে জিনিসের শুরু থাকে তার শেষও অবশ্যই থাকে। এ জগত যখন শুরু হয়েছে– এর প্রমাণ হলো, যখন জগতের প্রতিটি বস্তু ও প্রত্যেক অংশের শুরু আছে, তখন বস্তুসমষ্টির এবং পৃথিবীরও শুরু আছে– তখন শেষ থাকাটাও অনিবার্য। বিবেক তাকে বাধ্য করবে মেনে নিতে আর প্রবৃত্তি বাধ্য করবে অস্বীকার করতে। এ অবস্থায় সে না পাবে প্রশান্তি আর না পাবে সান্ত্বনা। তবে যদি মেনে নেয়, তাহলে আত্মার প্রশান্তি এসে যাবে। মানুষ যদি একটি পথের অনুসারী হয়ে পড়ে তাহলে তার অন্তরে সান্ত্বনা, প্রফুল্লতা এসে যায়। আত্মা চির প্রশান্তি লাভ করে।

এ কারণেই আমি এ রুকুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীর পেশ করলাম। এই হলো আমার বয়ান, এই হলো তাফসীর। এর মাধ্যমে আমি সে সকল প্রশ্নের উত্তরও পেশ করেছি, যার দ্বারা মানবাত্মার প্রশান্তি হতে পারে। আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জি মতো পরিচালিত করেন। তাঁর নির্দেশিত পথের ওপর লাগিয়ে দেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এবং সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুকরণ-অনুসরণ করা আমাদের নসীব করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শের ছাঁচে আমাদের জীবনকে গঠন করে দেন। আমাদের যাহের ও বাতেনকে এভাবে সুগঠিত করে দেন– যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রাজী ও খুশি থাকেন। আমাদের আত্মা ও হৃদয়ে প্রশান্তি এবং সান্ত্বনা দান করুন আর পরিণাম খায়র ও কল্যাণময় করুন। আমাদের আখেরাত শান্তিময় করুন এবং আমাদের ইহকাল আরামদায়ক ও উপযোগী করে দিন। সকল ধরনের বিপদাপদ দূর করে দিন। আমরা যেসব মুশকিল ও সমস্যায় জর্জরিত, সেসব থেকে আমাদের মুক্ত করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ـ

বয়ান : ৭

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের আদব

আল্লাহ্ তায়ালাকে আদব-সম্মান করা যখন জরুরী ও আবশ্যক তখন তাঁর কালামকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে, আদব করতে হবে। আর তা করা অত্যন্ত জরুরী। অথচ যে কুরআন শরীফ আমাদের কাছে রয়েছে তা কাগজে লিখিত অক্ষরসমূহের সমষ্টি। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহ লিখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ হলো কালামের চিহ্ন ও নিদর্শন। অর্থবোধক শব্দকে বলা হয় কালাম। যার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। এসব অক্ষর ও চিত্র যে কাগজে লেখা হয়েছে, সে কাগজও অযু বিহীন স্পর্শ করা নিষেধ। ঐ জাতীয় কাগজগুলোকে আঁঠা দিয়ে বাঁধাই করে কালামুল্লাহকে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হয়। কালামুল্লাহর কারণে সে লিখিত কাগজ, বাঁধাই করার বোর্ডও সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়ে গেল। আসলে এসব মাধ্যমে আল্লাহর কালামের আদব শেখানো হচ্ছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى -
اما بعد -

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আদব দীনের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক জিনিস। আদব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, মানুষের দীনদারী বা ধর্মপরায়ণতাও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। আর যে পরিমাণ বেয়াদবী, গোস্তাখী, দুঃসাহস, পাপকর্মের প্রতি নির্ভীক ও নির্ভয় হতে থাকবে, দীন থেকে মানুষ সে পরিমাণ দূরত্ব ও সম্পর্কহীন হতে থাকবে। ইলম, আমল প্রভৃতি সব বিষয়ে শরীয়ত আদবের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لاَ تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

হে ঈমানদারগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মজলিসে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলো না। নিজেদের আওয়াজ বা স্বরকে নিচু ও ক্ষীণ রেখো।

তোমাদের স্বর যেন এমন না হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বর থেকে উঁচু হয়ে যায়। তাহলে এর ফল দাঁড়াবে– তোমাদের সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা আমলের প্রতিদানে কোনরূপ সওয়াব ও প্রতিদান পাবে না। [হুজুরাত : ২]

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– হযরত উমর (রা.)-এর কণ্ঠস্বর জন্মগতভাবে বুলন্দ ও উচ্চ ছিল। তাঁর আওয়াজই এমন ছিল যে তিনি নিম্নস্বরে কথা বললেও মনে হতো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন। অথচ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর আওয়াজ এত ক্ষীণ ও নিচু হয়ে গিয়েছিল যে, কোন কোন সময় তাঁর কথা শোনার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শুনতে হতো। তিনি বলতেন– আমার ভয় হয় যে, অবচেতনভাবে আমার গলার স্বর না উঁচু হয়ে যায়!

এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আদবই সবচে' বড় বিষয়। আর সত্যিকার অর্থে আদব আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। তাই তাঁর দরবারে আদব, বিনয় ও নম্রতার প্রয়োজন। এরপর যেসব বুযুর্গানের আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিসবত ও সম্পর্ক স্থাপিত তাঁদেরকেও আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। যেমন- পবিত্র কুরআনে, আদব নির্ধারণ করে বলা হয়েছে– لا يمسه الا المطهرون নাপাক অবস্থায় মানুষ কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। আর অপবিত্রতার ব্যাপার যদি জানাবত পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে মৌখিক তেলাওয়াতও জায়েয নয়। মনে করা হয়, তাতে জিহ্বাও অপবিত্র হয়ে গেছে। এসব হলো কুরআন পাকের আদব, যা শেখানো হয়েছে। এ কারণে যে, এ কালামের নিসবত ও সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে। যাকে 'কালামুল্লাহ' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালাকে আদব-সম্মান করা যখন জরুরী ও আবশ্যক তখন তাঁর কালামকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে, আদব করতে হবে। আর তা করা অত্যন্ত জরুরী। অথচ যে কুরআন শরীফ আমাদের কাছে রয়েছে তা কাগজে লিখিত অক্ষরসমূহের সমষ্টি। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহ লিখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ হলো কালামের চিহ্ন ও নিদর্শন। অর্থবোধক শব্দকে বলা হয় কালাম। যার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। এসব অক্ষর ও চিত্র যে কাগজে লেখা হয়েছে, সে কাগজও অযু বিহীন স্পর্শ করা নিষেধ। ঐ জাতীয় কাগজগুলোকে আঁঠা দিয়ে বাঁধাই করে কালামুল্লাহকে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হয়। কালামুল্লাহর কারণে সে লিখিত কাগজ, বাঁধাই

করার বোর্ডও সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়ে গেল। আসলে এসব মাধ্যমে আল্লাহর কালামের আদব শেখানো হচ্ছে। একই সাথে এর সঙ্গে যেসব জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে সেসব জিনিসের সম্মান ও আদবও ওয়াজিব করা হয়েছে। কালামের কারণে অক্ষরগুলো, অক্ষরের কারণে কাগজ, কভার ও বোর্ড সবই স্তরবিশেষে সম্মানের পাত্র হয়েছে, সম্মান দেখানোকে জরুরী করা হয়েছে। এসব জিনিসের কোন একটির সঙ্গে সামান্যতম বেয়াদবী ও গোস্তাখী– সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কারণ, বেয়াদবী ও গোস্তাখীর সঙ্গে দীন কায়েম থাকতে পারে না।

এমনিভাবে আল্লাহ আয়ালার আদব করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের আদব করাও ওয়াজিব করা হয়েছে। 'আল্লাহর ঘর'– এ সম্পর্কে যখন এসে গেছে তখন আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্থান, কাল ও পাত্র থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। তবে তখনই সম্পর্ক হয়, যখন আল্লাহর তাজাল্লির কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়। তখন এ ঘরেরও সম্মান করা জরুরী হয়ে পড়ে। বাইতুল্লাহ শরীফের আদব করা, সম্মান প্রদর্শন করা যখন ওয়াজিব হয়ে গেলো, তখন বাইতুল্লাহ শরীফ যে মসজিদে হারামে অবস্থিত, সে মসজিদের আদব ও সম্মান ওয়াজিব হয়ে গেল। আর তা এ পরিমাণ বরকতময় হয়ে গেল যে, সেখানে যদি এক রাকাত নামায আদায় করা হয় তাহলে এক লাখ রাকাত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। এ হলো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিসবত বা সম্পর্কের বরকত।

মসজিদে হারাম যে জায়গায় রয়েছে, সে জায়গার নাম হলো মক্কা মুকাররমা। মসজিদে হারামের কারণে মক্কা মুকাররমাও পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়ে গেলো। এর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা, শ্রদ্ধা করা জরুরী হয়ে পড়ল। আর মক্কা মুকাররমা হলো হেজায প্রদেশের অংশবিশেষ। তাই হেজাযসহ সমগ্র আরব ভূমি সম্মানের পাত্র হয়ে গেল। সম্মান অবশ্যই দেখাতে হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

حب العرب من الايمان وبغض العرب من النفاق -

> আরবের সঙ্গে মহব্বত ও ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ, ঈমানের পরিচায়ক আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা নিফাক বা কপটতার লক্ষণ।

সার কথা, স্তর হিসেবে সবার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কোন

একটির প্রতিও যদি বেয়াদবী ও গোস্তাখী করা হয়, তাহলে দীন ঠিক থাকা অনেক কঠিন হয়ে পড়বে।

গায়ের ইখতেয়ারী কামালতের আদব

এ কারণেই শিষ্টাচার, শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনকে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে–

من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا -

যে লোক ছোটদের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করবে না এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তা পালন না করা হয়, তাহলে আমাদের জামায়াতের মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর এ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে ওয়াজিব করা হয়েছে। বয়ঃবৃদ্ধ কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইলমও বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইলমের কারণে তাঁকে আলাদাভাবে সম্মান করতে হবে। ইলমের সঙ্গে যদি যুহদ ও কিনাআত তথা দুনিয়াবিমুখতা, অল্পে তুষ্টির গুণ থাকে, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা থাকে, তাহলে এসবের প্রতিও পৃথকভাবে সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন প্রকার কামাল ও মহৎ গুণ না থাকে, তাহলে শুধুমাত্র বয়ঃবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকে ওয়াজিব করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– যে লোক কোন বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান করে, তাহলে সে মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এমন ছোটদেরকে সৃষ্টি না করবেন যারা তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– সাদা দাড়িওয়ালা কোন লোক যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কোন দোয়া ও প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন– এ হাতকে খালি ফিরিয়ে দিতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এ হলো আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার সাদা দাড়ির সম্মান ও মর্যাদা। কেবলমাত্র বার্ধক্যের কারণেই সে তা লাভ করেছে। এ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে যদি অন্যান্য মহৎ গুণাবলী– যেমন– ইলম, আখলাক একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে তার সম্মান আরও বেড়ে

যাবে। আর যদি কোন মহৎ গুণ না-ও থাকে, তবুও স্বভাবগত গুণের কারণেও তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে বলা হয়েছে। যেমন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

يؤم القوم اقرءهم لكتاب الله

ইমামতি করার অধিকার ঐ ব্যক্তির যে কুরআনুল করিম সর্বাধিক সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে সক্ষম; কুরআনের জ্ঞান ও ইলম বেশি রাখে।

فان كانوا فى القرءة سواء فاعلمهم بالسنه

যদি কুরআন পাঠ ও কুরআনের ইলমে সমপর্যায়ের হন তাহলে যে ব্যক্তি হাদীস ও সুন্নতের ইলম বেশি রাখে, তাকেই ইমামতের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আর যদি সুন্নতের ইলমেও তারা সমপর্যায়ের হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে যার মাসায়েল সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রয়েছে। এতেও যদি সমান হয়ে যায় তাহলে সে লোককে ইমামতি করতে দেয়া হবে যিনি সর্বাধিক সুন্দর ও সুশ্রী। যদি সবাই সমান সুন্দর ও সুশ্রী হয় তাহলে যে ব্যক্তির বংশ *মর্যাদা* উঁচু, তাকে ইমামতি করতে দাও।

অর্থাৎ এমন কোন বিশেষত্ব তার থাকতে হবে, যাতে তার ইমামতে মুক্তাদীগণ অপমান ও লজ্জাবোধ না করে। যদি একাধিক আহলে কামাল ব্যক্তি সমবেত থাকেন এবং কোন জাহেল মূর্খকে ঐ অবস্থায় ইমামত করার জন্য এগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা সকলেই তার পেছনে নামায পড়তে দ্বিধা করতে পারে। আর যদি সকলেই সুন্দর-সুশ্রী হয় আর ইমামতির জন্য কোন অন্ধ ও বধিরকে সামনে ঠেলে দেয়া হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ লোক কেমন করে আমাদের ইমাম হয়ে গেল?

সকল গুণে সমমানের হয়ে যাওয়ার পর সৌন্দর্যকে অগ্রাধিকারের বিষয় করা হয়েছে অথচ এটা কোন ইখতিয়ারী গুণ নয়। এ হলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও আল্লাহর দান। অথচ ইচ্ছা ও শক্তি-বহির্ভূত জিনিসও সময়বিশেষে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়ে যায়। অগ্রসর হওয়া বা করে দেয়ার জন্য আদব ও সম্মানের প্রয়োজন রয়েছে। আর সময়বিশেষ এসব আদবের মধ্যে প্রাকৃতিক জিনিসও ঢুকে পড়ে। যেমন- সৌন্দর্য, বয়স সবই আল্লাহ তায়ালার দান। মানুষের মর্জিমত নয়। অথচ তা সত্ত্বেও বলা হয়েছে– এসবের আদব ও সম্মান কর।

সুতরাং ফল দাঁড়াচ্ছে– কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের যোগ্যতা যদি থাকে– সেটা প্রাকৃতিক হোক কিংবা শরীয়ত নির্দেশিত হোক, ইচ্ছাধীন হোক কিংবা ইচ্ছাবহির্ভূত– তার যদি সম্মান করা না হয়, তাহলে বলা হয়েছে, এতে হয়তো তোমাদের দীন ও আমল আক্রান্ত হতে পারে।

নিসবত বা সম্পর্কের আদব

আদব সম্পর্কে এ পর্যন্ত শেখানো হয়েছে। নিসবতের ব্যাপারে ওলী-দরবেশগণ খুবই শ্রদ্ধাশীল থাকেন। আপন শায়খ, শায়খের সন্তান-সন্ততি ও আবাসভূমিকেও ঐ নিসবতের কারণে আদব ও সম্মান করে থাকেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

فاطمة بضعة منى من اذاها فقد اذانى

ফাতেমা (রা.) আমার কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।

এর মানে হলো– যে ব্যক্তি ফাতেমার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করল; অর্থাৎ ফাতেমা সাহাবী হওয়ার কারণে এ ভক্তি শ্রদ্ধার কথা বলা হয়নি। যদিও এমন কথা অন্য সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। বরং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তান হওয়ায় এবং তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক হওয়ায় যে সৌভাগ্য তাঁরা লাভ করেছেন, সে কারণে এখানে রক্ত সম্পর্কিত নিসবতের আদব শেখানো হয়েছে। আর এ কারণেই বলা হয়েছে– ফাতেমা (রা.) আমার কলিজার টুকরা। এ কথা বলা হয়নি যে, ফাতেমা আমার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে; আর তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অংশবিশেষ। যাঁর অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত থাকবে, তার অন্তরে আওলাদে রাসূলের প্রতিও অবশ্যই মহব্বত থাকবে।

আমার মুরব্বীদের কাছে আমি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) সম্পর্কে শুনেছি। তিনি আদবের প্রতি খুবই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সৈয়দ বংশের কোন বাচ্চা ছেলেও তাঁর নিকট উপস্থিত

হলে তিনি বিছানার শিয়রের দিক ছেড়ে দিয়ে পায়ের দিকে চলে যেতেন এবং ঐ ছেলেকে শিয়রের দিকে বসাতেন। আর বলতেন– বিশ্ববাসী এসব মখদুমজাদার সম্মান করে। এঁরা হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। এঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা বিশ্বাবাসীর ওপর ওয়াজিব। অথচ ছেলেটি নাবালেগ। তিনি বলতেন– এঁরা মখদুমজাদা। এরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদ, তাঁরই বংশধর।

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর একটি স্মরণীয় ঘটনা

হযরত নানুতবী (রহ.) একবার মুরাদাবাদে তাশরিফ নিলেন। তাঁর সফর আরও সামনে পর্যন্ত ছিল। মাঝপথে মুরাদাবাদ অবস্থান করলেন এবং এখানে মাত্র একদিন অবস্থানের প্রোগ্রাম ছিল। স্থানীয় লোকজন অনেক আবেদন-নিবেদন করলেন কিছু সময় বাড়ানোর জন্য, কিন্তু হযরত কিছুতেই রাজী হলেন না। সেখানকার উলামায়ে কেরাম সমবেত হয়ে আরো দু'একদিন অবস্থান করার জন্য জোর আবেদন পেশ করলেন। তবুও তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন, থাকা যাবে না বলে। এরপর আমীর-উমরাহগণ একত্রিত হয়ে হাজির হলেন। তাঁরাও সবিনয় আবেদন-নিবেদন করলেন। তাদেরকে জবাব দিলেন, উলামায়ে কেরামের আবেদনই যখন রাখতে পারলাম না, তখন আপনাদের আবেদন রাখবো কেমন করে? মুরাদাবাদবাসীও জেদ ধরলেন, যে কোনভাবে তাঁকে রাখতে হবে। একব্যক্তি তখন পরামর্শ করে দিল– তাঁকে আটকে রাখার একটিমাত্র উপায় আছে। অমুক অফিসে চৌদ্দ-পনর বছর বয়সের একটি ছেলে আছে। তাকে নিয়ে আসুন। সে তাঁকে রাখতে পারবে। ঐ ছেলেটি যখন আসল, তখন হযরত তাঁর আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিনয়ের সাথে ছেলেটির সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং নিজের আসনে বসালেন। অত্যন্ত আদবের সাথে তিনি ছেলেটির সামনে বসে পড়লেন। ছেলেটি বলল– হযরত! আমার ইচ্ছা ও আগ্রহ, আপনি কিছু দিন এখানে অবস্থান করুন। হযরত বললেন– বহুত আচ্ছা! এই বলে থেকে গেলেন এবং এক সপ্তাহ অবস্থান করলেন। মানুষ এটা ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল যে, হযরত হয়তো অবশিষ্ট সফরে যাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ছেলে যাওয়ার জন্য না বলবে। অবস্থা তাই হলো। ঐ ছেলে এসে তাঁকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলে হযরত বিদায় নিলেন।

এর কি কারণ ছিল? কারণ ছিল এই– হযরতের পীর ও শায়খ ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ.) এবং হাজী সাহেবের পীর ছিলেন হযরত শায়খ

মিয়াজী নূর মুহাম্মদ জাহান্ধানবী (রহ.)। আর এই ছেলে ছিল হযরত মিয়াজী (রহ.)-এর দৌহিত্র। এ কারণেই শায়খের নিসবত ও সম্পর্কের প্রতি তাঁর এতটা আদব ও সম্মান ছিল। এ ছেলের কথায় অবস্থান করলেন অথচ অন্য কারো কথা শুনেননি। এই ছিল নিসবতের আদব। তাও আবার সরাসরি শায়খের নয়, দাদা শায়খের দৌহিত্রের প্রতি এরূপ আদব তখনই হয়– যখন নিজ শায়খের প্রতি আদব ও ভক্তি অন্তরে থাকে। এ কারণেই শায়খের বাসস্থানের সঙ্গে তাঁরা 'শরীফ' শব্দ যোগ করেন। দেওবন্দ শরীফ, নানুতা শরীফ, মক্কা শরীফ। এ 'শরীফ' শব্দের সংযোজন আদব ও সম্মানের জন্যেই লাগানো হয়। নিসবতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন শরীয়তবিরোধী কোন বিষয় নয়।

ওলী-দরবেশগণ তাঁদের নিসবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তাঁরা শায়খের সন্তানগণ অশিক্ষিত ও গণ্ড-মূর্খ হলেও পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (রহ.), যিনি শীর্ষস্থানীয় চিশতি মাশায়েখ-এর অন্যতম। শাহ আবু সাঈদ ছিলেন তাঁর পৌত্র এবং চিশতি মাশায়েখদের অন্যতম। শাহ্ আবু সাঈদের প্রাথমিক জীবন ছিল খুবই বল্গাহীন-স্বাধীন। না ছিল নামাযের পাবন্দী, না ছিল রোযার প্রতি মনোযোগ। মূলবান ও উন্নত পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি ছিল আগ্রহী। সবসময় উন্নত পোশাকের প্রতি ঝুঁকে থাকতো– এটাই ছিল তার কাজ ও অভ্যাস। জ্ঞানার্জানের প্রতি যেমন কোন আগ্রহ ছিল না, তেমনি ছিল না আমল-আখলাক সংশোধনের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ। যৌবনকালেও তিনি আমোদ-ফুর্তিতেই কাটাতেন। একদিন তিনি গংগুহের কোন এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মেথরানী মলের মটকা ফেলছিল। ফলে ধুলোবালি ও ময়লা-আবর্জনা উড়ে এসে তার পোশাকে পড়ল। তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে বললেন– হারামজাদা নির্লজ্জ! তোর লাজ-লজ্জা নেই!? মেথরানী ছিল বয়সের ভারে ন্যুব্জ। সে হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস (রহ.)-এর যুগ দেখেছে। সেও রেগে গিয়ে বলল– অহংকার ও আস্ফালন করছ কেন? পিতামহের স্বভাব-চরিত্রের উত্তরাধিকার লাভ করেছ কি? এত গর্বভরে কথা কেন বলছ?

তখনই তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন এবং মাকে গিয়ে বললেন– আমি ততক্ষণ পর্যন্ত গংগুহ থেকে ফিরে আসব না, যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামহের অবদান নেকগুণাবলীর প্রকৃত অধিকারী হতে পারি! সাথে সাথে এ কথাও জিজ্ঞেস করলেন, পিতামহের খলিফাদের মধ্যে জীবিত আছেন কে কে? জানতে পারলেন– প্রধান খলিফাদের মধ্যে হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন বলখী রয়েছেন। তিনি খেলাফত লাভের পর বলখ চলে গিয়েছিলেন। তাকে আরো জানানো হলো, বলখে হযরত বলখীর

বিশাল খানকা রয়েছে। সেখানে লাখ লাখ মানুষের চরিত্র গঠন ও সংশোধিত হচ্ছে। তিনি শায়খ নিজামুদ্দীনকে সংবাদ দিলেন। আমি অমুক দিন আসছি। হযরত শায়খ সাহেবজাদার আগমনবার্তা জানলেন। সে যুগে মোটর কার বা আধুনিক যানবাহন ছিল না। মাস দু'মাস সফরের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার পর একদিন সাহেবজাদা সেখানে পৌঁছলেন। সাহেবজদা যদিও মূর্খ-জাহেল ছিল, ইলম ও জ্ঞান কিছুই তার মধ্যে ছিল না, তবুও হযরত শায়খ তখন হাজার হাজার ভক্ত-অনুরক্ত, মুরীদ-মুতাকিদ যারা তাঁর কাছে ইলম ও দীন হাসিল করেন ও শ্রদ্ধা জানান, তাদেরকে নিয়েই নিসবতের মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে কয়েক মাইল পথ এগিয়ে এসে ইস্তেকবাল করলেন। হযরত শায়খ যখন অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন, তখন আমীর-উমরাহ ও উলামাসহ শহরবাসী সকলেই অভ্যর্থনায় অংশ্রগহণের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এমনকি তৎকালের বলখের বাদশাহও বেরিয়ে আসলেন সাহেবজাদার সম্মানার্থে। দূর থেকে দেখা গেল সাহেবজাদা ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। হযরত নিজামুদ্দীন সামনে এগিয়ে এসে সাহেবজাদার ঘোড়ার জিনের এক পাশে রিকাব নিজ হাতে নিলেন। সাহেবজাদা অবতরণ করতে চাইলে হযরত শায়খ নিষেধ করলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকতে তাকে অনুরোধ করলেন। শায়খের কাণ্ড দেখে বাদশাহও অপর পাশের রিকাব ধরলেন। সাহেবজাদা খুবই শান-শওকতের সঙ্গে চলছেন। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার তিনি। এক রিকাব চরণে হযরত শায়খের হাত, আর অপর রিকাবে স্বয়ং বলখের বাদশাহর হাত। এভাবে বলখ শহরে তিনি পৌঁছলেন। উন্নত মেহমানদারী ও আতিথেয়তা চলতে লাগলো। শহরের উমরাহ, উলামাসহ সকলকে সাহেবজাদার সম্মানার্থে আপ্যায়ন করা হলো। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এদিকে শায়খের অবস্থা হলো– সাহেবজাদাকে নিজ আসনে বসিয়ে আদবের সঙ্গে দু'জানু হয়ে তাঁর সামনে বসে থাকেন। এরপর হযরত শায়খ সাহেবজাদাকে জিজ্ঞেস করলেন– সাহেবজাদা! এ দীর্ঘ সফরের আপনার উদ্দেশ্য কি? কোথায় হিন্দুস্থান আর কোথায় বলখ! এ দীর্ঘ সফরের কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আপনার?

সাহেবজাদা বললেন– পিতামহের মীরাস নিতে এসেছি। যা আপনি নিয়ে এসেছেন আর এ-ই হলো নিসবত ও 'তাআল্লুক মাআল্লাহ'-এর মীরাস।

হযরত শায়খ বললেন– আচ্ছা! আপনার উদ্দেশ্য কি তাহলে এ-ই? সাহেবজাদা আরয করলেন– হ্যাঁ এটাই।

শায়খ বললেন– তাহলে এ আসন ছেড়ে জুতা রাখার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ো।

এই বলে শায়খ নিজে আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। এখন আর তার প্রতি সে আদব, তাজিম ও সম্মান-শ্রদ্ধা কিছুই নেই। বায়আত গ্রহণ করে আত্মসংশোধনের কিছু আমল বলে দিলেন। আর কাজ দিলেন, মসজিদের মুসল্লিদের জন্য ইস্তেঞ্জার ঢেলা তৈরি করতে– যাতে নামাযীদের কোন অসুবিধা না হয়। এ অবস্থায় একটা বছর কেটে গেল। তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মতও কোন লোক ছিল না। একদিন বলখের বাদশাহর পায়ে হাত রেখে যিনি আগমন করেছিলেন এখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করারও কেউ নেই!

একটা যখন বছর এভাবে কেটে গেল, তখন শায়খ তাকে পরীক্ষা করার জন্যে মনস্থ করলেন যে, তার নফস ও প্রবৃত্তির সংশোধন কতটা হয়েছে। গর্ব-গরীমা ও অহংকার দূরীভূত হয়ছে কি না। তাওয়াজু-বিনয়, নম্রতা, লিল্লাহিয়ত দিলে পয়দা হয়েছে কি না। নফসানিয়ত ও আমিত্ব লোপ পেয়েছে কি না। এ কারণে এক মেথরানীকে তিনি আদেশ দিলেন যে, সে যেন তার মল ও আবর্জনার টুকরি এনে সাহেবজাদার সামনে এভাবেই নিক্ষেপ করে যাতে কিছু ধুলোবালি, আবর্জনা সাহেবজাদার গায়ের ওপর উড়ে এসে পতিত হয়। আর এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি সেসব কথা বলেন, তা যেন শায়খকে জানানো হয়।

নির্দেশ মতো মেথরানী ময়লার পাত্র এত জোরে নিক্ষেপ করল যে, সব ময়লা সাহেবজাদার ওপর গিয়ে পড়লো। সাহেবজাদা চোখ লাল করে বললেন– বেহায়া নির্লজ্জ! গংগুহ হলে তোকে শিখিয়ে দিতাম। মেথরানী এসে শায়খের কাছে সাহেবজাদার অবস্থা বর্ণনা করল। শায়খ বুঝতে পারলেন মীরাস পাওয়ার যোগ্যতা তার এখনো হাসিল হয়নি। এখনও তার মধ্যে নফসানিয়ত অবশিষ্ট রয়েছে। পর দিন সাহেবজাদার ওপর অতিরিক্ত আরো একটি আদেশ জারি হলো। আদেশটি হলো– ঢিলা যথারীতি তৈরি করতে থাক। সঙ্গে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে নামাযীগণ নামায শেষ করে যখন বের হন তখন তাদের জুতা সোজা করে দিবে। আর তাদের জুতার হেফাযত করবে।

তিনি যথারীতি শায়খের আদেশ পালন করে চললেন। এভাবে আরো এক বছর কেটে গেল। এবার মেথরানীকে পুনরায় আদেশ দিলেন, সামনে নয়; বরং সম্পূর্ণ ময়লা সাহেবজাদার মাথার ওপর নিক্ষেপ কর। মেথরানীও তাই করল। এ অবস্থায় সাহেবজাদার বললেন– আরে করলে কি? এসব ময়লা আমার ওপর ফেললে কেন? এসব ময়লা তো আমার চেয়ে খাঁটি। তুমি তো এসব আমার ওপর নিক্ষেপ করে এদেরকে হীন করে দিয়েছো! কারণ আমি এত অপবিত্র মানুষ যে, আমার ওপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য আমার সংস্পর্শে এসে যাওয়ার

কারণে এসব ময়লাও অপবিত্র হয়ে গেছে। আমি এসব ময়লার চেয়ে অধম, অপবিত্র। আমার মধ্যে কোন পবিত্রতা নেই, কোন গুণ নেই।

মেথরানী গিয়ে সব কথা শায়খকে জানাল। শায়খ বললেন– এখন তার পিতামহের মীরাস হাসিল করার যোগ্যতা হয়েছে। পর দিন শায়খ শিকার করতে যাবেন। সাহেবজাদাকেও সঙ্গে যেতে বলা হলো। শায়খ ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং তাকে আদেশ করলেন, রেকাব ধরে চলার জন্য। তিনি যখন বলখ আগমন করেছিলেন, তখন শায়খ তার রেকাব ধরে রেখেছিলেন আর এখন অবস্থা হলো– রিকাব ধরে প্রাণপণে শায়খের সঙ্গে দৌড়াচ্ছেন। ইট-পাথরের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। রক্ত ঝরছিল তবুও রিকাব ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা ও সাহস তার হলো না। শায়খের নির্দেশ অমান্য করা তার পক্ষে এখন অকল্পনীয় ব্যাপার; অসম্ভব ব্যাপার। এভাবেই দীর্ঘ পথ সফর করে বিকালবেলা তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ ঠিকানায়।

সাহেবজাদাকে শায়খ আদেশ করলেন– উত্তমরূপে গোসল করে এসো এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে নাও।

আদেশ পালিত হলো। তারপর সাহেবজাদাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে গেলেন এবং সাহেবজাদাকে দাঁড় করিয়ে তার হাতে জুতা দিলেন এবং তাকে বললেন– এ গোলাম হাজির। এ গোলামের মস্তক হাজির। এ অধম সবসময়ই গোলাম। আপনাদের চির গোলাম, বংশানুক্রমে দাস। এ রিয়াজত ও মেহনত, কষ্ট ও সাধনা ছাড়া পিতামহের মীরাস লাভ করার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব ছিল না। গর্ব-অহংকার এসব রিপুসমূহ দূরীভূত হতো না। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার আপনার জন্য পিতামহের মীরাস মুবারক হোক। এই বলে সাহেবজাদার মাথায় নিজ হাতে তিনি পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং খেলাফত দানে ধন্য ও ভূষিত করলেন।

এবার ভাবুন, এ পর্যন্ত যেসব আচরণ করা হয়েছে, তা বেয়াদবী ছিল না; বরং নফস ও প্রবৃত্তির সংশোধনের জন্য মুজাহাদা ও সাধনা ছিল। এছাড়া আত্মশুদ্ধি হতো না। রিয়াজত-মুজাহাদা করানোই হয় এ কারণে যে, আদবের অনুভূতি দিলে পয়দা হয়ে যাক। তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধা অন্তরে জাগ্রত থাকবে। প্রতিটি নেক ও মহৎ জিনিসের আদব কর। যার মধ্যেই কোন গুণ, কোন মহত্ত্ব দেখ তাকে সম্মান কর। এ কারণেই বলা হয়েছে–

من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا

যে ব্যক্তি বড়দেরকে শ্রদ্ধা না করে, ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও দয়া না দেখায়, আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, সে আমাদের নয়।

আদবের মধ্যে সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখা

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা– যা আমি আমার মুরব্বীদের কাছে শুনেছি। হযরত নানুতবী (রহ.) ও অন্যান্য দেওবন্দী আলেম কালীর শরীফ গিয়ে কোন বিদআতী উরস-এর কাছও ঘেঁষতেন না। তবে আল্লাহওয়ালাদের মাজারে যেতেন যা কালীর রুড়কী থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তা গেছে নদীর তীর ঘেঁষে। হযরত (রহ.) চলার সময় জুতা খুলে ফেলতেন। ছয় মাইল দীর্ঘ পথ জুতাবিহীন খালি পায়ে অতিক্রম করতেন। এ-ই ছিল আদবের শান! আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন– শরীয়তের বিধান অনুসারে এমন করা কি জরুরী? উত্তর হলো– এমনটা করা শরীয়তের বিধানে জরুরী নয়। কোন স্থানকে লক্ষ্য করে জুতা খুলে যাওয়ার আদেশ শরীয়তে দেয়া হয়নি। তবে আদবের শান ও প্রাধান্য যখন চিন্তায় আসে তখন এমন সব আশঙ্কা ও সংশয় দেখা দেয় যে, যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানে এসবের নাম-নিশানও নেই, তবুও নিজ আত্মা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ-ও আদবের অন্তর্ভুক্ত। এর ওপরও আমল করা দরকার। এ আমল আইনি বা বিধিবদ্ধ আমল নয়; বরং নৈতিক ও আখলাকী আমল। আইনের ভাষায় এগুলোকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব কোনটাই বলা যাবে না। তবে ভক্তি ও ভালোবাসার আইনে এসব বিষয় ওয়াজিবের মতোই।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) হিজরত করে মক্কা শরীফে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি সারা জীবন কালো রঙের জুতা ব্যবহার করেননি। অথচ কালো বা অন্য কোন রঙের জুতা ব্যবহার করা নিষেধ নয়। তবে বাইতুল্লাহর গিলাফের রঙ কালো। সুতরাং এ রঙের জুতা ব্যবহার করব কেমন করে? আর এ আদবের কারণেই কালো রঙের জুতা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কালো রঙের পাগড়ি ব্যবহার করতেন। মাথার পরিধান করা আদবের পরিচায়ক হলেও পায়ে ব্যবহার করা তো তা নয়।

আপনি যদি এখন প্রশ্ন করেন– এমন কথা কি কোন হাদীসে আছে? তাহলে বলা

হবে– হাদীস শরীফে আদব ও সম্মান করার কথা বলা হয়েছে, আদেশ করা হয়েছে। তবে আদব যখন মানব প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে হাল ও স্বভাবের রূপ পরিগ্রহ করে তখন ছোট থেকে ছোট জিনিসও আদবের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যায় এবং মানুষ তা পালনও করে। ফকীহগণ যেমন লিখেছেন– কোন কোন জিনিসের বৈধতার ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন, অনেক আশঙ্কা থাকলেও আদবের ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় ও দরকারী হয়ে পড়ে।

সার কথা, আদব এভাবে শেখানো হয়েছে। আদব ছাড়া দীনের হেফাযত ও সংরক্ষণ কঠিন ব্যাপার। যদি এসবের প্রতি অন্তরে সামান্যতম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার দীন নিরাপদ থাকতে পারে না। তাই অন্তরে আদবের গুরুত্ব, সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কুরআন-হাদীস এবং ঐ সকল ব্যক্তি– কুরআন-হাদীসের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে– তাঁদের আদব ও সম্মান করা খুবই দরকারী। এটা ছাড়া দীন নিরাপদ থাকতে পারে না।

আদবের পরাকাষ্ঠা হযরত গংগুহী (রহ.)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহ.)-এর ঘটনা। একবার হারাম শরীফে বন্যা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ হারাম শরীফ পানিতে ডুবে যায়। মাকামে ইবরাহীম (আ.) অর্থাৎ ঐ পাথর, যার ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা নির্মাণ করেছিলেন। এখনও এ পাথরটি সংরক্ষিত আছে। এ পাথরের ওপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন রয়েছে। সে পাথরের হেফাযতের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

واتخذوا من مقام ابرا هيم مصلى

তাওয়াফ শেষে যখন দু'রাকাত নামায আদায় করা হয়, তখন মাকামে ইবরাহীমকে মাঝখানে রেখে আদায় করা সুন্নত। যাক, বন্যার ফলে মাকামে ইবরাহীমের ওপর নির্মিত গম্বুজটি বিধ্বস্ত হলে এর ধ্বংসাবশেষ তৎকালীন শাসক শরীফ হোসাইনের রাজকীয় সংরক্ষণাগারে পৌঁছে দেয়া হলো। জিনিসটি ছিল পবিত্র ও বরকতময়। বাদশাহ শরীফ হোসাইনের শাসনামলে বিশেষ বিশেষ উলামা-মাশায়েখকে ঐ খণ্ডগুলো দেখার সুযোগ করে দেয়া হতো। আল্লাহ তায়ালাই জানেন, কিভাবে এর মধ্য থেকে একটি ছোট টুকরা ভেঙে বাদশাহ শরীফ হোসাইন হাদিয়াস্বরূপ মক্কায় কোন কোন উলামা ও মাশায়েখকে দিয়েছিলেন। হাত বদল হয়ে হয়ে একটি টুকরা হযরত গংগুহী (রহ.)-এর হাতে

এসে পৌঁছে। মাওলানার অভ্যাস ছিল– মাকামে ইবরাহীমের ঐ টুকরাটি বের করে পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন এবং ঐ পানি উপস্থিত সকলের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। সে খণ্ডটির কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। মাওলানা সে কণাগুলো তুলে সুরমার সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন। যখন চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন, তখন ঐ কণাগুলোও স্বাভাবিকভাবে সুরমার সঙ্গে চোখে চলে যেত। এটা ছিল আদব ও সম্মানের শান। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এমনটা করা অর্থাৎ মাটি বা পাথরকণা চোখে লাগানো দৃষ্টিশক্তির জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। চোখের জ্যোতির জন্যে খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু হযরত মাওলানা এ চিন্তা করেননি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করেননি। দৃষ্টিশক্তি কি জিনিস ঐ সম্মান ও মর্যাদার মোকাবেলায়, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংস্পর্শে লাভ হয়। সার কথা, দীনের বুনিয়াদ ও ভিত্তি হলো আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে। আল্লাহ এবং আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনাবলীর সম্মান তথা বাইতুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ, আহলুল্লাহ-এর আদব ও সম্মান; মোট কথা, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যে জিনিসেরই সম্পর্ক রয়েছে, তার সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হলো দীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ।

ইখতেলাফী রায় বা মতপার্থক্য

কোন লোক যদি কোন শায়খের হাতে বায়আত হয়ে থাকে এবং পীরকে সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ করতে দেখে আর তখনই ইচ্ছা করে যে, সুন্নতের পাবন্দ অন্য কোন পীরের হাতে বায়আত হবে– সে ক্ষেত্রে মাশায়েখগণ ঐকমত্য পোষণ করে লিখেছেন– সুন্নতের খেলাফ আমল প্রকাশ পায় এমন পীরের বায়আত ভঙ্গ করা উচিত। তবে তার সম্পর্কে বেয়াদবী ও গোস্তাখীপূর্ণ কোন বাক্য কখনো উচ্চারণ করা উচিত নয়, তার সঙ্গে বেয়াদবী করাও জায়েয নয়। তাতে তার ইজ্জত ও রূহানিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটাও ঐ আদবেরই বুনিয়াদ।

মনে করুন, কোন আলেমের সঙ্গে কোন মাসয়ালার ব্যাপারে আপনি দ্বিমত পোষণ করেন অথবা কোন আলেম আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে মাসয়ালার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিমত পোষণ করা জায়েয। নিজেকে আপনি সততার সঙ্গে সত্যান্বেষী বলে মনে করলে অন্যের সঙ্গে বেয়াদবী, অন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা জায়েয নয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা দীনের জন্য ক্ষতিকর এবং মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে দ্বিমত হয়ে যাওয়া দীনেরই অঙ্গ। দীন জায়েয তবে দীন নিয়ে বিরোধিতা করা জায়েয নয়। অবশ্য দ্বিমত পোষণের অধিকার আছে।

যেহেতু শরীয়ত সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভর করে না; তাই মতবিরোধ ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার যেমন নেই, তেমনি জায়েযও নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ✡

মুমিন নর-নারীর জন্য জায়েয নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ এসে যায় আর অতঃপর এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবে। আহকামে শরীয়াত রাসূল কর্তৃক পৌঁছে দেয়ার পর এ নিয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করাও জায়েয নয়। গ্রহণ করা ও না করার কোন প্রশ্নই উঠে না। [আহযাব : ৩৬]

হাদীস শরীফে হযরত বারীরা (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর দাসী ছিলেন। হযরত মুগীস (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর *বিয়ে* হয়েছিল। তিনিও সাহাবী ছিলেন। বারীরা (রা.) সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন এবং মুগীস (রা.) ছিলেন কালো, কুৎসিত। হযরত মুগীস (রা.) বারীরার প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। তবে তাঁর প্রতি বারীরা (রা.)-এর কোন আসক্তি ছিল না। এতে করে যে ঘটনা ঘটল তা হচ্ছে– হযরত আয়েশা (রা.) বারীরা (রা.)কে মুক্ত করে দিলেন। শরীয়তে এই বিধান রয়েছে যে, বিবাহিতা দাসী যদি আযাদ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বন্ধনকে বহাল রাখা না রাখা তার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। স্বামী যদি ক্রীতদাস হয় তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ইজাযত তার হয়ে যায় আর তা জায়েয। এবার হযরত মুগীস (রা.) তো পেরেশান! তিনি আন্তরিকভাবে বারীরার প্রতি আসক্ত অথচ বারীরার সঙ্গে মনের মিল হচ্ছে না। ভাগ্যক্রমে ক্ষমতা হযরত বারীরা (রা.)-এর হাতে চলে গেছে।

এ ঘটনায় হযরত মুগীস (রা.) পেরেশান হয়ে মদীনার পথে পথে পাগলপারা হয়ে ঘুরছিলেন আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। তাঁর দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সবার নিকট একই আবেদন, একই আর্তনাদ– আপনি একটু সুপারিশ করুন। বারীরা (রা.) যেন আমার সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে না দেয়। অবশেষে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে তিনি হাজির হলেন এবং আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বারীরাকে বলুন, সে যেন বিয়ে ভেঙ্গে না দেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ

আনলেন এবং বারীরাকে বললেন– হে বারীরা! বিয়ে ভেঙ্গে দিও না। মুগীসের এখন করুণ অবস্থা। সে তোমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। হযরত বারীরা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি শরীয়তের আদেশ, না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ হলো আমার পরামর্শ, শরীয়তের আদেশ নয়। হযরত বারীরা (রা.) আরয করলেন, তাহলে আমি আপনার পরামর্শ গ্রহণে অপারগ। আমি তা মেনে নিতে পারছি না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– অবশ্যই মানা না মানার অধিকার তোমার রয়েছে। এতে বুঝা গেল, আম্বিয়া (আ.)-এর নিতান্ত পরামর্শমূলক মতামতের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার রয়েছে। তবে আদব ও সম্মানের কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইশারা-ইঙ্গিতকেও আমরা শত আদেশের ঊর্ধ্বে স্থানে দেব। এখানে অবশ্য হযরত বারীরা (রা.) প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আল্লাহর নির্দেশ? ফলে আলেম ও ওলীগণের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, কোন বাধা নেই, কোন আপত্তি নেই। তবে বেয়াদবী করা এবং তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কোন আবস্থায়ই জায়েয নয়। এ কারণে যে, তাঁরা আলেমে-দীন, ধর্ম বিশেষজ্ঞ। তাঁদের সঙ্গে আপনি দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেন। তবে নায়েবে রাসূল হিসেবে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা উচিত, আর তা করা ওয়াজিবও। সেটা নষ্ট করা যাবে না।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহের অনুসরণ করি আমরা। হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) অনেক মাসয়ালায় তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাই বলে হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রতি আমাদের অন্তরে অণু-পরমাণু পরিমাণও বেয়াদবীর উদ্রেক হয় না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যেমন সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য, তেমনি ইমাম শাফেঈ (রহ.)ও সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। দু'জনই সমান মর্যাদার অধিকারী। উভয়ই বরকত ও নূর অর্জন করেছেন। তাঁদের প্রতি সামান্যতম বেয়াদবীও কোনভাবে জায়েয হবে না।

গোস্তাখী হচ্ছে মূর্খতার পরিচায়ক

গোস্তাখী ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হলো মূর্খতার পরিচায়ক। আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.) যখন কওমকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছিলেন– যদি একটি গাভী জবাই করে তার একটুকরা গোশত নিহত ব্যক্তির দেহে লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে

অমুক নিহত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়ে বলে দিবে তার হত্যাকারী কে। তা শুনে বনি ইসরাইল বলতে লাগল– اتخذنا هزوا আপনি কি আমাদের সঙ্গে মশকরা করছেন? মৃত ব্যক্তির জীবন লাভের সঙ্গে গোশত মেলানোর কি সম্পর্ক রয়েছে? হযরত মুসা (আ.) বললেন–

اعوذبالله ان اكون من الجاهلين -

আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জাহেল-মূর্খদের দলভুক্ত হয়ে যাওয়া থেকে।

অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-মশকরা করা হলো মূর্খ-জাহেলদের কাজ, আলেমদের জন্য তা শোভনীয় নয়। এ কারণে যে, হাসি-তামশা করা হলো আদব ও শ্রদ্ধার পরিপন্থী। যাক, এটা হচ্ছে মতের অমিল, আর অন্যটি হলো মাসলাকের ইখতিলাফ। আর বেয়াদবী গোস্তাখী হচ্ছে অন্য জিনিস। কোন অবস্থায়ই বেয়াদবী জায়েয নয়। ইখতেলাফ বা মতবিরোধ জায়েয।

মাওলানা থানবী (রহ.) এবং মাওলানা আহমদ রেযা খান

হযরত মাওলানা থানবী (রহ.)কে আমি দেখেছি। মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। তাঁদের মধ্যে কিয়াম, মিলাদ, উরুস প্রভৃতি অনেক মাসয়ালায় মতবিরোধ ছিল। অথচ তাঁর মজলিসে যখন খান সাহেবের আলোচনা আসত, তখন তিনি আদবের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে বলতেন– আহমদ রেযা খান সাহেব। একবার মজলিসে এক লোক খান সাহেবের নাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করে বললেন– আহমদ রেযা খান। অর্থাৎ মাওলানা বলেননি। এ কারণে হযরত তাকে ধমকালেন, নারাজ হলেন এবং বললেন– যদিও আমার সঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে, তথাপি তিনি তো আলেম। তোমরা পদমর্যাদার অবমাননা করছ– এটা জায়েয হবে কেমন করে? মতের বিরোধ এক জিনিস আর তাঁকে ভুল ও ভ্রান্তির ওপর মনে করা অন্য জিনিস। তাই বলে তাঁকে অবমাননা করা, তাঁর সঙ্গে বেয়াদবী করা– এটা হতে পারে না।

হযরত থানবী (রহ.) খান সাহেবের নামের সঙ্গে 'মাওলানা' না বলাকে বেয়াদবী মনে করেছেন। অথচ হযরত থানবী (রহ.)-এর মোকাবেলায় তিনি অত্যন্ত বেয়াদবী ও গোস্তাখী করতেন। তবে মাওলানা থানবী (রহ.) আহলে ইলম

ছিলেন। তিনি কারও নাম উচ্চারণ করলে, তা আদবের সঙ্গে করা জরুরী মনে করতেন। যদিও ঐ ব্যক্তি তাঁর চরম শত্রু, চরম বিদ্বেষী হোন কেন। তিনি তাঁর সঙ্গে আদব বর্জন করেননি। সবসময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

কাফের ফতোয়াদানকারীর সঙ্গে নানুতবী (রহ.)-এর আচরণ

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরতের খাদেমগণের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন শাগরেদ সঙ্গে ছিলেন। শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান, হযরত মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী, হাজী আমির শাহ খান সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা আহমদ হাসান তাঁর সঙ্গীদের বললেন– লালকূপ মসজিদের যে ইমাম সাহেব রয়েছেন, তাঁর কেরাত খুবই মিষ্টি-মধুর। আগামীকাল ফজরের নামায তাঁর পেছনে পড়ে নিই। হযরত শায়খুল হিন্দ উত্তেজিত হয়ে বললেন– তোমার লাজ-লজ্জা নেই! সে আমাদের বুযুর্গ হযরতকে কাফের বলে, কি করে আমরা তাঁর পেছনে নামায পড়ব! তিনি কঠোর ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কথাগুলো হযরত নানুতবী (রহ.)-এর কর্ণগোচর হলো। আর পরদিন প্রত্যুষে তিনি সেসব সাগরিদকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ইমামের পেছনে নামায আদায় করার জন্য সে মসজিদে হাজির হলেন এবং ঐ ইমামের পেছনে নামায আদায় করলেন। ইমামসহ সকলে সালামের পর দেখলেন, অপরিচিত ও নবাগত কিছু মুসল্লি মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন। আর সবাইকে আলেম বলেই মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন– আপনারা কে? উত্তরে জানতে পারলেন– ইনি হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব, আর অন্যরা তাঁরই সাগরিদ। এঁরা হলেন শায়খুলহিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান, মাওলানা আহমদ হাসান মুহাদ্দিসে আমরুহী। ইমাম সাহেব তো বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আমি দিন-রাত তাঁদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে বেড়াই, আর তাঁরা আমার পেছনে নামায পড়ার জন্য এসেছেন! ইমাম সাহেব নিজেই এগিয়ে এসে মুসাফাহা করলেন এবং বললেন– হযরত! আপনাকে আমি কাফের বলে থাকি। আমি আজ খুবই লজ্জিত। আপনি আমার পেছনে নামায পড়েছেন অথচ আমি আপনাকে কাফের বলে থাকি। হযরত বললেন– এটা কিছু না। আমার অন্তরে আপনার বিবেক-বুদ্ধির মূল্য রয়েছে। তাই আপনার মর্যাদা আমার অন্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে যে, আপনি একথা শুনেছেন, আমি রাসূলের অবমাননা করি। রাসূলের অবমাননার প্রতি আপনার ঈমানের দাবি ঠিকই আদায়

করেছেন। তবে দুঃখ ও অভিযোগের বিষয় হলো, যে কোন কথা শুনার পর এর সত্যাসত্য যাচাই করে দেখার প্রয়োজন আপনার ছিল। যাই হোক, কাফের বলার কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা। যে কোন মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা করবে, তাকে কাফের বলা ওয়াজিব। ইসলামের গণ্ডি থেকে সে বহিষ্কৃত হয়ে পড়বে। আমার অন্তরে আপনার ঈমানী গয়রত-এর মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগও রয়েছে যে, অন্তত পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল– যে কথা আপনি শুনেছেন, তা সত্য না মিথ্যা। আমি নিজেও এমন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত মনে করি, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামান্যতম অবমাননা করে। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি আপনার হাতে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করছি–

اشهد ان لا اله الا الله

এ ঘটনায় বেচারা ইমাম সাহেব তো হযরতের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মাত্র এটুকু কথা ছিল যে, হযরতের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার বিনয় ছিল, আল্লাহর প্রতি আদব, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অন্তরে এই পরিমাণ ছিল, যাতে নফসায়িতের কোন কথাই ছিল না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো দূরের কথা, চরম শত্রু ও বিদ্বেষীরও তিনি অবমাননা করতেন না। বরং তাদের কথার তিনি যথাসম্ভব সঠিক অর্থ গ্রহণ করে বলতেন– তারা আমাদেরকে কাফের বলে। এ হলো তাদের সুদৃঢ় ঈমানের পরিচায়ক। তবে যাচাই করে দেখা উচিত ছিল, সত্যিই আমরা রাসূলের অবমাননা করি কি-না। এটা করা তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল। তাহকীক ও অনুসন্ধান না করে হুকুম দিয়ে দেয়া উচিত হয়নি। আমার দীর্ঘ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ কথাটি তুলে ধরা যে, আদব ও শ্রদ্ধাবোধ হচ্ছে দীনের ভিত্তি। এ সম্পর্কে আল্লামা রূমী (রহ.) যেমন বলেছেন–

از خدا جوئیم توفیق ادب

بے ادب محروم گشت از فضل رب

আদবের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওফিক প্রার্থনা করছি। বেয়াদব আল্লাহর ফযল ও দয়া থেকে বঞ্চিত। আল্লাহর দরবারে বেয়াদব ও গোস্তাখের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

বেয়াদবের ইলমী ফয়েয লাভ হয় না

আমার জানাশোনার মধ্যে এমন অনেক আলেম রয়েছেন, যাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দে সুনামের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করেছেন। অসাধারণ প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন তাঁরা। তবে শুধুমাত্র উস্তাদগণের সঙ্গে বেয়াদবী করার কারণে শিক্ষা শেষ করার পর ইলমের খেদমত থেকে তাঁরা বঞ্চিত রয়েছেন। এখন তাঁদের কেউ দোকানদারী করছেন, কেউ ড্রাইভারী করছেন। মুহাদ্দিস, মুফাসসির হওয়া তাঁদের ভাগ্যে জুটেনি। আবার আমার দেখা এমনও অনেকে রয়েছেন, যাঁদের মেধা ও প্রতিভা নিম্নমানের ছিল, অথচ আদব ও উস্তাদের খেদমতের বরকতে তাঁরা এমন উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন এবং দীনের এ পরিমাণ খেদমত করেছেন যা অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ফাযেলগণও করতে পারছেন না। কেবলমাত্র আদবের কারণে তাঁদের মকবুলিয়ত বহুগুণে বেড়ে গেছে।

আদব সম্পর্কে মাওলানা নানুতবী (রহ.)-এর অন্য একটি ঘটনা

একটি কিতাব রচনা করে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) তাঁরই মুরীদ মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)কে কপি করে দেয়ার জন্য দিলেন। কিতাবে একটি শব্দের বানান ভুল ছিল। আইনের জায়গায় ছিল হামযা। হযরত মাওলানা নিজে তা শুদ্ধ করেননি; বরং ঐ জায়গাটি খালি রেখে দিয়ে হাজী সাহেবের নিকট হাজির হয়ে বললেন, এ শব্দটি বুঝতে পারিনি, শব্দটি কি হবে? তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন, নিজে থেকে কিছু বলেননি। এভাবে বলার সাহস করেননি যে, এ শব্দটি ভুল হয়েছে। এভাবে বললেও বেয়াদবী হতো না বটে; তবে দৃশ্যত বেয়াদবীর মতো মনে হতো। এরপর হযরত হাজী সাহেব তা দেখে বললেন, এখানে আইনের জায়গায় হামযা হয়ে গেছে, ঠিক করে নাও।

আদবের প্রতি উদাসীনতার ভয়ানক পরিমাণ

সার কথা, দীনের ভিত্তি আদব-ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা শরীয়তের বিরাট এক অধ্যায়। যেখানে আহকাম আছে, সেখানে আদবও আছে। মানুষ যদি আদব রক্ষা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে সে মূল আহকাম থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়। এ কারণেই আদবের প্রয়োজন। হযরত শাহ

আবদুল আজীজ (রহ.) তাঁর তাফসীরে ফতহুল আজীজে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সম্পূর্ণ ইবারত স্মরণে না থাকলেও তা বর্ণনা করছি–

من تهاون فى الاداب حرم فى السنة ومن تهاون بالسنة حرم من الواجبات ومن تهاون بالواجبات حرم من الفرائض و من تهاون بالفرائض حرم من المعرفة ـ

যে ব্যক্তি আদব রক্ষায় আলস্য দেখায়, সে সুন্নত থেকে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি সুন্নতের ওপর আমল করা থেকে আলস্য করে, সে ওয়াজিব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ওয়াজিব আদায়ে আলস্য ও উদাসীন থাকবে, সে ফরয থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যে ফরয থেকে উদাসীন থাকবে, সে আল্লাহর মারেফত ও সঠিক পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

ফরয আমলসমূহ অব্যাহত থাকলে আল্লাহর সঙ্গে প্রেম ও ভালোবাসা বেড়ে যাবে। এ কারণেই সুন্নতকে ফরয আদায়ের প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সুন্নত ত্যাগ করে কেবলমাত্র ফরয আদায় করল, সে অচিরেই ফরয থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ফরযও আদায় করবে না– তার জন্য এমন দিন এসে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

গোস্তাখির মাধ্যমসমূহ বন্ধকরণ এবং তার উদাহরণ

শরীয়তের আহকামসমূহ দু'প্রকার– প্রথম হলো 'মামুরাত' অর্থাৎ করণীয় কার্যাবলী। এসবের জন্য অনুমোদিত অনেক আদব রয়েছে। যদি এগুলো পালিত হয়, তাহলে মামুরাতের ওপর আমল করার সৌভাগ্য হবে। দ্বিতীয় হলো 'মনহিয়াত' অর্থাৎ বর্জনীয় বিষয়াদি। এগুলোর মধ্যে 'মাকরূহ'ও (অপছন্দীয়) রয়েছে। যদি মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়, তাহলে হারাম থেকেও বেঁচে থাকা নসীব হবে। আর যদি মাকরূহ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে একদিন এমন সময় আসবে, যখন হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'সাদ্দে-জাবাঈ' উপাদান-উপকরণ ত্যাগ করা বলা হয়। অর্থাৎ উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে দাও, যাতে মানুষ কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছতে না পারে।

নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় কর্মকাণ্ডের উপায়-উপকরণ সরিয়ে রাখা হয় এ কারণে যে, যাতে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়, নিজেকে রক্ষা করা যায়। আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করতে হবে, যাতে ফরযের ওপর আমল করা নসীব হয়।

যেমন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

ما سكر كثيره فقليله حرام

যে জিনিসে অধিক পরিমাণে নেশা হয়, তা এক ফোঁটাও নয়। তবে তা এক ফোঁটা পান করাও তেমনি হারাম যেমন হারাম এক চুমুক পান করা।

অথচ হারাম হয় নেশার কারণে। আর এক ফোঁটায় তো নেশা হয় না। তবুও উপসর্গ বন্ধ করার জন্য এমন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এক ফোঁটা শরাব পান করবে, সে আগামীকাল এক চুমুক, পরশু এক পেয়ালা পান করবে এবং শারাবী বনে যাবে। শারাবী ও মদ্যপায়ী হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এক ফোঁটাকেও হারাম করা হয়েছে, যেন সে পর্যন্ত পৌঁছতেই না পারে। যেমন- হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

من اتى عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم -

যে ব্যক্তি কোন জাদুকর অথবা জ্যোতিষীর কাছে গেল, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের সঙ্গে কুফর করল।

অথচ জাদুকরের কাছে গেলেই তাওহিদ, রিসালাত, পরকাল, পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি হয় না। আকীদা ও বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয় না। তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে, সে শরীয়তের সঙ্গে কুফরী করল। এ কারণে যে, আজ সে জাদুকরের কাছে গিয়েছে। এতে তার অন্তরে জাদুর প্রতি যে ঘৃণা ছিল, তা লোপ পেল। আগামীকাল সে জাদুবিদ্যা শিখবে। পরশু সে নিজে একজন জাদুকর বনে যাবে। জাদুর কুফল থেকে রক্ষা করার জন্যই জাদুকরের নিকট গমনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর একেই বলা হয় 'সাদ্দে-জারাঈ'। প্রকৃত ও মূল কাজটিকে কবীরা (বড়) গুনাহ বলা হয় এবং কর্মটি সাধনের উপায়-উপকরণকে সগীরা (ছোট) গুনাহ বলা হয়। উপায়-উপকরণের ব্যাপারে বাধা প্রদান করা হয়, যাতে

কবীরা পর্যন্ত পৌঁছতেই না পারে।

উদাহরণস্বরূপ, চুরি করা কবীরা গুনাহ। কারও উপার্জিত পাক-পবিত্র মালকে তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে খারাপ ও গর্হিত কাজ। তবে এর জন্য কারো মালের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করা, ছিদ্রপথে বা দেয়ালের ওপর দিয়ে দেখা– এসবই সগীরা গুনাহ। আর তা এ কারণেই নিষিদ্ধ যে, যখন এসব করবে, করতে থাকবে তখন একদিন হয়তো মূল গুনাহ চুরিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অন্যের মালের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, কারও দেয়ালের ওপর দিয়ে বা ছিদ্রপথে তা দেখা নিষেধ নয়। তবে নিষেধ করা হয়েছে এ কারণে যে, এটা এক সময় পরিণামে চুরির কারণ হতে পারে।

যিনার বিষয়টি লক্ষ করুন! আসলে নিষিদ্ধ তো হলো ঐ হারাম ও জঘন্য কাজটা। কিন্তু তা থেকে রক্ষা পেতে পরনারীর সঙ্গে নির্জনে বসা, তার প্রতি কুদৃষ্টি করা, তার আওয়াজ ও কণ্ঠস্বর মনোযোগ সহকারে শোনা, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা– সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণে যে, এসব জিনিস মূল হারাম কাজের উপকরণ হিসেবে হয়ে থাকে। ফলে শরীয়ত মূল গুনাহ থেকে রক্ষা করার জন্যে তার উপায়-উপকরণ ও তার সহায়ক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জিনিসকেও নিষেধ করেছে। আর এসব হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত আদব।

ইবাদতের উপায় উপকরণ ও ইবাদত

'মামুরাত' (করণীয়)-এর মধ্যে নামায একটি ফরয। এই ফরয পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার জন্য আরো কিছু জিনিসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন- যখন আযান শোন তখন তার জবাব দান কর, যাতে আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে চেতনা এসে যায় যে, এখন আমাকে নামাযের জন্য যেতে হবে। তারপর অযু করার ব্যবস্থা কর। এর মাধ্যমে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মসজিদে গমন করলে প্রতি কদমে একটি নেকী প্রদান করা হবে, একটি গুনাহ মাফ করা হবে। অথচ পদক্ষেপ তার প্রকৃতিগত কোন ইবাদত নয় কিন্তু নামাযের জন্য পদক্ষেপকে ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। এ করণে যে, এ পদচারণা নামাযের উপকরণ হবে। ফলে আযানের জবাব দেয়া, নামাযের উদ্দেশ্যে পা ফেলা, অযু-ইস্তেঞ্জা, পবিত্রতা প্রভৃতির ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহওয়ালাদের নেকীর আকাঙ্ক্ষা

মুরব্বীদের মুখে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ বুযুর্গের ঘটনা শুনেছি। তাঁদের অবস্থা তো ছিল এমন যে, মসজিদে যাওয়ার দু'টি রাস্তা থাকলে যেটি দীর্ঘ, সেটি ব্যবহার করতেন আর বলতেন– কদম যত বেশি হবে, নেকীও তত বেশি পাওয়া যাবে; গুনাহ মাফ হবে। এ থেকে বঞ্চিত হবো কেন? এমনকি পা ঘন ঘন ফেলতেন অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে কম গতিতে হাঁটতেন। কারণ, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নেকীর ওয়াদা রয়েছে। যত ইচ্ছা পদচারণ করা যাবে। সুতরাং একশ' কদমে মসজিদে পৌঁছে যাওয়ার বদলে ধীরে ধীরে চলে দুইশ' কদম বানিয়ে নিলে সওয়াবের মাত্রা বেড়ে যাবে। এসব বুযুর্গের নেকীর প্রতি লোভ ছিল– দুনিয়াদারদের যেমন দুনিয়ার প্রতি লোভ থাকে। একজন দুনিয়াদার একশ' টাকা পেলে হাজার টাকা অর্জন করার লোভ করে। হাজার টাকা পেয়ে গেলে লাখ টাকার লোভ, লাখ টাকা পেয়ে গেলে কোটি টাকার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাগণ নেকীর জন্য লালায়িত থাকেন। সওয়াব একটা পেয়ে গেলে এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান না; বরং সওয়াব বৃদ্ধির আশায় তিনি সদা-সর্বদা উদগ্রীব ও সচেষ্ট থাকেন।

হযরত ইমাম আবু দাঊদ (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত ইমাম আবু দাঊদ (রহ.) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একদিন তিনি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখলেন, পানি-স্বল্পতার কারণে একটি জাহাজ নদীর তীর থেকে দু'তিনশ' কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তীরের নিকটবর্তী হতে পারছে না। জাহাজটিতে অবস্থানরত এক ব্যক্তি হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ বলছে। আর এত উচ্চৈঃস্বরে বলছে যে, তাঁর কানেও এ আওয়াজ এসে পৌঁছে গেল। ফিকাহর মাসয়ালা আছে– প্রতি-উত্তরে يرحمك الله বলা উচিত। তবে এ মাসয়ালা তো হলো এক মজলিসে অবস্থানকারীদের জন্য। এমন নয় যে, বাজারে কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে তোমাকে يرحمك الله বলার জন্য বাড়ি হতে বাজারে যেতে হবে। ইমাম আবু দাঊদের কানে ঐ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ পৌঁছল। তিনি ছিলেন মহৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত– যারা এসব নেকীর প্রতি লোভী হন। ফলে তিনি ক্ষুদ্রতম নেকী লাভের সম্ভাবনা থাকলে তা-ও ত্যাগ করতে তিনি রাজী নন। নেকী ও কল্যাণ হাসিলের আগ্রহ বেড়ে গেল তাঁর। জাহাজটি দূরে অবস্থিত। তাই তাঁর আওয়াজ সেখানে পৌঁছবে না। এটা ভেবে

তিন দিহরাম দিয়ে একটি ছোট নৌকা ভাড়া করে জাহাজে পৌঁছলেন এবং সেখানে গিয়ে বললেন– يرحمك الله - আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন– তখন গায়েব থেকে আওয়াজ আসল, হে আবু দাউদ! আজ তিন দিরহামের বিনিময়ে তুমি জান্নাত খরিদ করে নিলে। অথচ তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। কত হাদীস লিখেছেন, কত তাহাজ্জুদ পড়েছেন, কত জিহাদ করেছেন, অথচ জান্নাত কেনায় ঐসব বড় বড় আমলের কোন উল্লেখ নেই। উল্লেখ করা হলো একমাত্র يرحمك الله বলাকে। যা দৃশ্যত খুবই ছোট একটি আমল ছিল। তাহলে কেন উল্লেখ করা হলো? এজন্য যে, এত ইখলাসের সঙ্গে এ আমলটি করা হয়েছিল যে, এ ছোট আমলটিরই এত বেশি ওজন হয়ে গেল, যা বিরাট বিরাট আমলেও হয়নি। আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমলের আকার-আকৃতি দেখা হয় না, দেখা হয় ইখলাস। নৌকা ভাড়া করে জাহাজে গিয়ে يرحمك الله বলাটা ফরয বা ওয়াজিব কিছুই ছিল না। অথচ তিনি আদবের ওপর আমল করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাহলে বুঝা গেল, এমন ব্যক্তির ফরয আমলের মধ্যে অবশ্যই ত্রুটি হবে না। আল্লাহ তায়ালার নিকট আদবের এত গুরুত্ব, এত প্রয়োজন।

বর্তমানে বেয়াদবী ও গোস্তাখীর মানসিকতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে দলাদলি। একে অন্যের প্রতি দোষারোপ, কটূক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ কারণে আমি অনেক সময় ধরে আপনাদের বিরক্ত করছি। কোন আলেমের সঙ্গে যদি মতবিরোধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি যদি আলেম হন তবে আপনার জন্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য) অন্যজনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। আপনি যদি কারো অনুসারী হন, আপনার প্রতিপক্ষও কারো অনুসরণ করে, তাহলে আপনি আপনার মাননীয় ও বরণীয়জনের অনুসরণ করুন। তাই বলে অন্যজন সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা মোটেই জায়েয নয়; বরং আপনি এ তাবিল করে নিবেন যে, তার নিকটও দলীল-প্রমাণ রয়েছে যা আমার বোধগম্য হয়নি। সে যা বলেছে তাও আল্লাহর কাছে মকবুল। মুজতাহিদগণ ভুলও করেন, শুদ্ধও করেন। ভুল যদি হয়েও যায়, তবুও সওয়াবের অংশীদার হন। আর আপনি তার প্রতি আযাব ও গযব বর্ষণ করছেন। এ তো হলো আল্লাহর মোকাবেলা। আল্লাহ তায়ালার দরবারে ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেলে কোন প্রকার দোষারোপ ও তিরস্কার করা হয় না। অথচ বর্তমানে সামান্য মতবিরোধের কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সামান্য থাকে না। এসব দীনের পরিপন্থী। আপনি আপনার ইলম অনুযায়ী আমল করুন এবং

অন্যকে অপারগ মনে করুন। আদব ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কার্পণ্য মনে করবেন না। আর এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, বুদ্ধির পরিচায়ক।

আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের পারস্পরিক আচরণ

আইম্মায়ে মুজতাহিদীনেরও এমন নিয়ম ও রীতি ছিল যে, দৃশ্যত পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) যখন কুফায় তাশরিফ আনতেন এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাজারে উপস্থিত হতেন তখন ইমাম সাহেবের মাযহাবে নামাযে সূরা ফাতেহা শেষে 'আমীন' আস্তে বলা উত্তম এবং ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মাযহাবে উচ্চৈঃস্বরে বলা উত্তম। অথচ হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) যখন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাজারের কাছাকাছি মসজিদে নামায আদায় করতেন তখন সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে আমীন আস্তে পড়তেন আর বলতেন– এ মাজারে শায়িত বুযুর্গের কারণে আমি লজ্জাবোধ করছি যে, তাঁর মাজারের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর ইজতিহাদের বিরুদ্ধাচরণ করি। এ ছিল আদব ও শ্রদ্ধাবোধ। এ হলো হারাম ও হালাল, জায়েয ও নাজায়েযের পার্থক্য কিংবা একজন জায়েয অন্যজন হারাম ও নাজায়েয বলেছেন। এ অবস্থায় একজন অন্যজনের মাযহাবের ওপর আমল করতে পারবেন না। তবে যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মতপার্থক্য আছে, সেখানে আদব ও শ্রদ্ধার পরিচয় দেয়া যেতে পারে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) তাঁর মাযহাব অনুযায়ী উত্তমের ওপর আমল করা ত্যাগ করেছেন এবং আমল করেছেন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সম্মানার্থে তাঁর মাযহাবের ওপর। অথচ ইমাম সাহেব তখন চিরশয্যায় শয়িত, সামনে হাজিরও নন। তবুও আদব ও সম্মান প্রদর্শনের অবস্থা এমনই ছিল।

মাসায়েল ও প্রবৃত্তিগত আবেগ

হযরত সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও মতপার্থক্য ছিল। আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে ইজতেহাদী মাসয়ালার ক্ষেত্রে যেরূপ মতপার্থক্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও তেমনি ছিল। তবে তা সত্ত্বেও আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি করা মাসায়েলের কাজ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয়– যা আমাদের মধ্যে হয়ে থাকে; বরং ঝগড়া-ফাসাদ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবৃত্তির আবেগপ্রবণতার আধিক্যের

কারণে আমরা আমাদের প্রবণতা প্রকাশের জন্য মাসায়েলকে মাধ্যম ও বাহন করে নিয়েছি। যদি ঝগড়া-ফাসাদই মাসায়েলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হতো, তাহলে সবার আগে সাহাবায়ে কেরাম ঝগড়া-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতেন। মতপার্থক্য তো তাঁদের মাঝেও ছিল। এরপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে লাঠির মাধ্যমে ফয়সালা হতো, শক্তি পরীক্ষা হতো। অতঃপর উলামায়ে রাব্বানী পরস্পরে যুদ্ধ-লড়াইয়ে লিপ্ত হতেন। অথচ মতপার্থক্যও রয়েছে, আদব-সম্মানও যথাস্থানে রয়েছে। মূলত আমরা কিন্তু মতপার্থক্যের নামে নিজের প্রবৃত্তিগত আবেগ-উত্তেজনা প্রকাশ করি। আর আমি তো বলে থাকি– যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ ও উপাদানই হলো বিষয়-সম্পত্তি, বাসভবন, ক্ষেতখামার, জায়গীর। মুসলমানদের হাতে যখন এ সকল জিনিস অবশিষ্ট থাকেনি অর্থাৎ না আছে বিষয়-সম্পত্তি, না আছে দালান-কোঠা, না আছে রাজ্য ও রাজমুকুট; তখনই তারা ভেবেছে যে, দীনকেই তাহলে যুদ্ধ-বিগ্রহের হাতিয়ার বানিয়ে নিই। মাসায়েলকে হাতিয়াররূপে গ্রহণ করি। মাসায়েলের মধ্যে এসব ব্যাপারে বিশেষত্ব নেই। ইখতেলাফ করার সুযোগ ও অনুমতি রয়েছে। তাই বলে যুদ্ধ-লড়াই করার কোন বৈধতা নেই। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠে না।

মুসলমানদের মতপার্থক্য এবং খৃষ্টান জজের বিদ্রূপ

অনেক আগেকার কথা! একজন খৃষ্টান কালেক্টর ছিল। তার যুগে হানাফী ও লা-মাযহাবীদের মধ্যে 'আমীন' উচ্চারণ করার পদ্ধতি নিয়ে মারামারি হলো। লড়াইও হলো। হানাফীগণ আমীন আস্তে উচ্চারণ করেন আর লা-মাযহাবীগণ উচ্চৈঃস্বরে বলেন। এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হলো। অনেকের মাথা ফেটে গেল এবং মামলা দায়ের হলো কালেক্টরের কোর্টে। উভয়পক্ষের আইনজীবী বিষয়টি তাকে বুঝালেন। তখন সে বলল– ভাই! 'আমীন' কি কোন বিষয় সম্পত্তি না কোন বিল্ডিং যার জন্য লড়াই হয়ে গেল? আইনজীবীগণ বললেন– 'আমীন' একটি শব্দ যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। একপক্ষ বলছেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে, আমীন উচ্চৈঃস্বরে পড়ার। কালেক্টর বলল– তোমরা নিজ নিজ হাদীসের ওপর আমল করতে থাক। এ নিয়ে যুদ্ধ-লড়াই করছ কেন? কথাটি সে বুঝতে পারেনি, আর বুঝার মত কথাও ছিল না।

সার কথা, সে জজ জ্ঞানগর্ভ রায় প্রদান করে বলেছিল– আমি মোকদ্দমার প্রকৃতি ও উভয়পক্ষের কথাবার্তা শুনে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মুসলমানদের

নিকট তিন ধরনের 'আমীন' রয়েছে। 'আমীন বিল জিহর'– উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা। 'আমীন বিস্-সির'– আস্তে আস্তে আমীন বলা। 'আমীন বিশ-শর'– অর্থাৎ লড়াই ও যুদ্ধের জন্য আমীন বলা। প্রথমোক্ত দু'ধরনের স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে। এক প্রকারকে এক ইমাম অন্য প্রকারকে অন্য ইমাম গ্রহণ করেছেন। তাতে যুদ্ধ-লড়াইয়ের কোন কারণ নেই। এ যুদ্ধ হচ্ছে 'আমীন বিশ-শর'-এর যুদ্ধ। সুতরাং উভয় গ্রুপকে সাজা দেয়া হলো। সে আরও বলে দিল– মত-পার্থক্যের বিষয়াদি যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নয়, ঝগড়া-ফাসাদের জন্য নয়। এগুলো হলো দলীল ও প্রমাণের আলোকে সততার সঙ্গে মত প্রকাশের জন্য। এসব ঝগড়া-ফাসাদ, লড়াই-যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরের ফাসাদ। এসব মাসায়েলকে আমরা আবেগ প্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছি। ফলে দীনের মাসায়েলকে আমরা ঝগড়া-ফাসাদ ও দলাদলির জন্য বেছে নিয়েছি।

ইখতেলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সঠিক পথ

যদি মাসয়ালায় বিভিন্ন মত থাকে তাহলে তা বর্ণনা করা দোষের নয় বা বাধা নেই। তাই বলে যুদ্ধ-লড়াই কেন? যে যার সমাধিতে যাবে– তুমি তোমার সমাধিতে আর সে তার সমাধিতে। তুমি তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছ আর তার বা কি অধিকার রয়েছে তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার! তিনি মাসয়ালা বর্ণনা করে দিয়েছেন– 'আমর বিল-মারুফ'। ব্যস, এতটুকুতেই মুক্ত হয়েছে। পরিত্রাণ লাভ করেছে। এখন যদি কেউ না মানে, তাতে তোমার কি আসে যায়? তার নিকট কোন দলীল-প্রমাণ যদি থাকে সে আল্লাহ তায়ালার নিকট জবাবদিহি করবে। তুমি তো তার জন্য দায়ী ও দায়িত্বশীল নও। পরকালে তার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তার দীন ও দীনের মূলনীতি গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যায় না। আংশিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও বাধ্য করা যাবে না, করার দরকারও নেই। আসলে বর্তমান যুগে ছোট ছোট মতবিরোধের কারণে মানুষ ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। যার ফলে মুসলিম সমাজে বিভেদ-বিচ্ছেদ-বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। আর এতে মুসলমানদেরই শক্তি ক্ষয় ও ধ্বংস হয়।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মূল্যবান উপদেশ

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর এক মুরীদকে খেলাফত দানে ধন্য ও ভূষিত করলেন। তারপর বললেন– অমুক স্থানে গিয়ে দীনের তাবলীগ ও প্রচার করতে থাক। সেখানে যাত্রার আগে মুরীদ আরয করল– আমাকে উপদেশ দান করুন। হযরত শায়খ (রহ.) বললেন– তোমাকে দুটি উপদেশ দিচ্ছি– এলাহীত্বের দাবি করো না এবং নবুওয়তেরও দাবি করো না। মুরীদ তো হতভম্ব! বলল– হযরত! আমি অনেক বছর আপনার মহব্বত ও সাহচর্যে কাটিয়েছি। এরপরও কি এ ভয় ও আশঙ্কা রয়েছে যে, আমি আল্লাহ হওয়ার এবং নবী হওয়ার দাবি করে বসবো? এবার হযরত বললেন– খোদায়ী ও নবুওয়তের দাবি করার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে নাও, তারপর যা বলার বল। আল্লাহ তায়ালা ঐ যাত, ঐ সত্তা; তিনি যা বলবেন তাতে অটল থাকবে। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ ও মতবিরোধ হতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের মতকে এভাবে প্রকাশ করে যে, সে তার মতের ওপর অটল, অনড়– এর বাইরে কোন মত হতে পারে না; কোন মানুষ যদি স্বীয় মতের ওপর এভাবে অটল-অনড় থাকে, তাহলে এরচেয়ে অধিক খোদায়ীর দাবি আর কি হতে পারে? আর নবী হলেন ঐ যাত– তিনি যা বলেন তা সত্য, কখনো তা মিথ্যা হতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের বক্তব্য সম্পর্কে বলে– এ কথা এমনই সত্য যে, এর বিপরীত কিছু হতে পারে না। এটা যেন পর্দার আড়ালে নবুওয়তেরই দাবি যে, আমার কথা ভুল হতে পারে না। অথচ এটা তার ব্যক্তিগত মতামত মাত্র।

ফাসাদ নাকি সংশোধন

কোন লোক যদি নিজের গবেষণালব্ধ মতামতের ওপর অটল হয়ে পড়ে, কারো অপারগ অবস্থাও বুঝতে না চায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের সংশোধন করা যায় না; বরং তাদের মধ্যে ফাসাদ ছড়ানো হয়। সুতরাং একটি কথা বলে দেয়ার পর তার ঘোষণা ও প্রচার করে দেয়ার এবং বারংবার বলার প্রয়োজন নেই। যারা অনুসরণকারী, তাদের একবার বলাই যথেষ্ট। আর যারা মানবে না, তাদের জন্য তুমি দায়ী নও। তুমি খোদার ঠিকাদার নও যে, একটি মাসয়ালা বারবার প্রচার করতে থাকবে, জেদ করতে থাকবে। এর মাধ্যমে অকারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়। তুমি তো বলে চলে যাবে, আর বিপদে ফেলবে সাধারণ মুসলমানদেরকে।

তাবলীগী ও প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য

এর একটি হলো দীনের উসুল বা মৌলিক নীতি। যেমন নামায ফরয, রোযা ফরয, যাকাত দেয়া ফরয। আপনি তা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন– বারবার বলতে পারেন। তাই বলে আংশিক ও ইজতেহাদী (গবেষণালব্ধ) বিষয়ে আপনি শক্ত হবেন, জোরেশোরে প্রচার করবেন– তা হয় না। কেননা এসব তাবলীগী বা প্রচারযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

কোথা থেকে আপনি শক্তি ব্যয় করছেন? হানাফী মাযহাবের মাসয়ালাসমূহ থেকে? এসব মাযহাব প্রচারে কড়াকড়ি করা যাবে না। যেমন- আপনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবেন– ভাইসব! আপনারা হানাফী হয়ে যান, শাফেঈ হবেন না কিংবা শাফেঈ হয়ে যান হানাফী হবেন না। এসব মাযহাব হচ্ছে তারজিহী– যা একেক ইমাম একেকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন মাত্র। এগুলো তাবলীগী বা প্রচারযোগ্য বিষয় নয়। যেমন অমুক আমল ওয়াজিব অথবা শ্রেষ্ঠ, অমুক আমল তা নয়। সুতরাং তারজিহী মতামতকে তাবলীগী করবেন না। গবেষণালব্ধ বিষয়ের ব্যাপারে জেদ করা কোন আলেমেরই উচিত নয়।

বর্তমান সময়ে এসব বিষয়েরই প্রসার লাভ হয়ে গেছে। অনেক বেয়াদবী ও গোস্তাখী হচ্ছে! এ কারণেই এ বিষয়ে কয়েকটি কথা আরয করলাম। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে আমল তাওফিক দিন। আমীন!

اللهم افتح لنا بالخير واختم انا بالخير

বয়ান : ৮

আর্থিক অধিকারসমূহ

শরীরের জন্য জড় জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। আর রূহের জন্য দরকার রূহানী খাদ্যের। যেমন ইলম ও কামাল, জ্ঞান ও সদগুণাবলী। আল্লাহ তায়ালা এ সকল উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে আমরা, আমাদের প্রাণ, আমাদের মাল-সম্পদ সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট। আমরা আল্লাহ তায়ালার অধীন। আমরা তাঁরই মাখলুক। না আমাদের শরীর আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি আর না আমাদের আত্মা। আমরা এর রক্ষক ও আমানতদার মাত্র। মালিক ও প্রভুই এর স্রষ্টা।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَمَـٰوٰتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَـٰلَمِينَ ✡

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আদেশের অনুগামী, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। শুনে রাখ, তাঁরই সৃজন ও আদেশ। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগত এবং তার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। [আরাফ : ৫৪]

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমি এখন আপনাদের সামনে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করব না। কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আরয করব। ফলে এর জন্য কোন ভূমিকার দরকার নেই। ভূমিকা ছাড়াই যা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাই পেশ করব।

প্রতিটি মুসলমানই এটা জানেন যে, আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের দেহ ও শরীরকে, আমাদের রূহ ও আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং শরীর ও রূহের জন্য যে সকল উপকরণ ও সামানের প্রয়োজন, সেসব উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। শরীরের জন্য জড়পদার্থ জাতীয় খাবার ও আহার্য দরকার ছিল। ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত ঐ সকল উপকরণ ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। মাটিতে এমন শক্তি নিহিত রেখেছেন, যাতে আমাদের খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়। মাটিতে এ শক্তিও রেখে দিয়েছেন, যাতে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের উপকরণ সৃষ্টি হতে পারে। মাটিকে আল্লাহ তায়ালা খাদ্যসামগ্রীর গুদাম ও ভাণ্ডার বানিয়ে দিয়েছেন। গম, চানা, চাউল, ফল-মূল প্রভৃতি সবই এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে, বেরিয়ে আসছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান ও হেকমত দিয়ে মাটিকে এমনভাবে বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা এর ওপর দিয়ে যাতায়াত ও চলাফেরা করতে পারি। তারপর এ মাটির মধ্যেই আমাদের জন্য অতি দরকারী পানির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। নদী-নালা, ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। ভূমণ্ডলের ওপর বাতাস ছড়িয়ে রেখেছেন, যাতে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি। ফলে মাটি আমাদের জন্যে খাদ্যের গুদাম, পানির ট্যাংকি, পোশাক-পরিচ্ছদের উপকরণের সিন্ধুক। যেখান থেকে তুলা ও পশম বের হয়। শরীর ঢাকার প্রয়োজনাদি এ থেকে মেটানো হয়।

মানব দেহের জন্য আলোর প্রয়োজন রয়েছে। আর তাই প্রথম আকাশকে ছাদ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে চাঁদ, সূর্য এবং তারকারাজি আলোকোজ্জ্বল প্রদীপের মতো ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর খণ্ডকারী জিনিস দ্বারা নানাভাবে আমাদের প্রয়োজন পুরা করেছেন। সূর্য আমাদের আলো দান করছে, উষ্ণতার প্রয়োজনে তাপ দান করছে। তাছাড়া সময় নির্ধারণের প্রয়োজনে উন্নতমানের একটি ঘড়ির মতো কাজ করছে। এর মাধ্যমে আমরা সময় নির্ধারণ করতে পারি; জেনে নিতে পারি। وبا لنجم هم يهتدون তারকারাজির মাধ্যমে পথহারা পথিকগণ পথের সন্ধান লাভ করেন। সাগরের জাহাজচালকগণ পথের সন্ধান পান। যেখানে স্থলভাগের মতো মহাসড়ক তৈরি করা হয়নি সেখানে তারকারাজির মাধ্যমে দিক নির্ণয় করে চলতে হয়। তারকারাজি দিয়ে দিক ও পথ, সূর্যের মাধ্যমে আলো ও তাপ লাভ হয়। তাছাড়া তারকা ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা তৃণ-লতায় প্রকারভেদ ও কার্যকারিতার শক্তি সৃষ্টি হয়। হাড়ের ভেতর তেল ও চর্বি সৃষ্টি হয়।

সার কথা, মানুষের শরীর রক্ষার জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে, তার সবই জমিন ও আসমানের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেহেরও যেমন স্রষ্টা তেমনি শরীর রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণেরও স্রষ্টা ও খালেক।

আত্মা এবং আত্মার প্রয়োজনীয় উপকরণের স্রষ্টা

একইভাবে তিনি আমাদের রূহ ও তার প্রয়োজনাদির স্রষ্টা। দেহের যেমন প্রয়োজনাদি রয়েছে, শরীরের জন্য খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি আত্মারও খোরাক রয়েছে। পার্থক্য কেবল এইটুকুই। দেহের যেমন বিশ্রামের দরকার রয়েছে, তেমনি রূহের প্রয়োজন শক্তি ও সান্ত্বনার। পার্থক্য হচ্ছে– শরীর একটি জড় জাতীয় বস্তু। ফলে তার প্রয়োজনাদিও জড় জাতীয়। আর রূহ পাক-পবিত্র ও সূক্ষ্ম বস্তু। ফলে তার উপকরণও সূক্ষ্ম, পাক ও পবিত্র। রূহের গেযা (আহার্য) হলো ইলম, মারেফত, খোদায়ী স্বভাব ও গুণাবলী এবং মলাফিযাত বা ফেরেশতাদের গুণাবলী। নিজেদের মধ্যে এসবের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর মাধ্যমে আত্মা শান্তি লাভ করে। আত্মার অন্ন ও বস্ত্রের কোন দরকার নেই। তার বস্ত্র ও আহার তার অবস্থানুযায়ী। আর তা হলো ইলম, কালাম, দীন-দিয়ানত এবং উন্নত স্বভাব-চরিত্র। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا...

আমি এবং আমার ইলম ও কালাম, জ্ঞান ও গুণাবলীর তুলনা হলো এমন, যেমন শক্তিশালী মেঘমালা আকাশে উত্থিত হলো এবং তাতে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হলো। বৃষ্টিপাতের পর জমি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক হচ্ছে ঐ জমি, যা বৃষ্টির পানিকে আকর্ষণ করে চুষে নেয় এবং ফল-ফুল উৎপাদন করে বাগান ও উদ্যানকে সুশোভিত করে দেয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ জমি, যে ফল-ফুল পুষ্প উৎপন্ন করে না বটে, তবে তার তলদেশে পানি সঞ্চয় করে রেখে দেয়। মানুষ সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করে, ফসলাদিতে সেচ দেয়। ফলে তাতে জমির উর্বরতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। আর তৃতীয় প্রকার হলো ঐ জমি, যা অনাবাদী, কঙ্করময় মাঠ; যার মধ্যে না আছে উৎপাদন ক্ষমতা, না আছে পানি সঞ্চয় করে রাখার যোগ্যতা। বৃষ্টির পানি এসেছে, গড়িয়ে ভেসে গেছে। কিন্তু ঐ জমি পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারছে না, যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে।

কোন প্রকার ফল-ফুলও উৎপন্ন করতে পারছে না– যাতে করে তা থেকে অন্যরা উপকৃত হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– মানবাত্মাও তিন ধরনের রয়েছে–

এক. ঐসব হৃদয় ও আত্মা– তাঁদের ওপর যখন ওহীর পানি বর্ষিত হয়, তখন তা নিজের ভেতর চুষে নিয়ে যান এবং এর মাধ্যমে ইলম ও জ্ঞানের নানা ধরনের ফল-ফুল বের করে সমাজের সামনে পেশ করে। এতে তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের বাগানে বসন্তকাল এনে দেন। এঁরা হলেন ঐ সকল মনীষী– যেমন ফকীহগণ। দীন ও ইলমে-দীন তাঁদের অন্তরে পৌঁছেছে। তাঁরা গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল (কুরআন-হাদীসের আলোকে) বের করে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করেছেন, যাতে মানুষ সহজভাবে আমল করতে পারে।

দুই. ঐ জাতীয় আত্মা– যেগুলো ফল-ফুল উৎপন্ন করতে পারেনি বটে, তবে খুবই সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে ওহীর পানি সঞ্চয় ও জমিয়ে রেখেছেন। মানুষ তাঁদের কাছে আসেন। কেউ নিজে পান করেন, কেউ ক্ষেত-খামার ফল-ফসলকে পানিসিক্ত করেন। তাঁরা হলেন যেমন মুহাদ্দিসীন ও কুরআনের হাফেযগণ। ওহী অবতীর্ণ হয়েছে আর তাঁরা ওহীর পানিকে তাঁদের বক্ষে ধারণ করেছেন, সঞ্চয় করে রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে এ গুণ ও শক্তি নেই যে, ওহী থেকে গবেষণার মাধ্যমে মাসয়ালা-মাসায়েল বের করে দিবেন। তবে তাঁদের কাছে যারাই আসবে তাকে পানি দান করবেন। তাঁরা এ থেকে মাসায়েল বের করবেন।

তিন. আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ দল, যাদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। তারা হলেন ঐ দল, যাদের ওপর ওহীর পানি বর্ষিত হয়েছে অথচ তাদের অন্তরাত্মা এমন, যেন উঁচু ভূভাগ। বৃষ্টির পানি এসেছে আর গড়িয়ে চলেও গেছে। পানি সঞ্চিত হয়নি, ফল-ফুলও উৎপন্ন হয়নি।

জড়পদার্থ জাতীয় পানি অনুযায়ী জমি যেমন তিন প্রকার, তেমনি ওহীর পানি অনুযায়ী মানবাত্মাও তিন ধরনের। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো– শরীরের জন্য যেমন আহার্য ও খাদ্যসামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে, রূহ বা আত্মার জন্যও তেমনি গেযা বা আহার্য সৃষ্টি করা হয়েছে। শরীরের জন্য খাদ্যদ্রব্য যে কেউ অর্জন করতে পারে। কারো মধ্যে আবিষ্কারের যোগ্যতা রয়েছে। সে ভূগর্ভ হতে খনিজ দ্রব্য বের করবে, স্বর্ণ-রৌপ্য শিশা বের করে নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি

করবে। আরেক দল হলেন সকলে শ্রমিক– যাদের মধ্যে এ ধরনের যোগ্যতা নেই যে, তারা কোন কিছু আবিষ্কার করবে, তারা স্বর্ণ-রৌপ্য আহরণ করে দিবে। অন্যরা এ মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করবে। আরেক দল হলেন ঐসব শ্রমিক, যাদের মধ্যে না আছে বিবেক-বুদ্ধি, না আছে সাহস ও হিম্মত। আর তাঁদের মধ্যে না আছে কোন কিছু আবিষ্কার করার যোগ্যতা, না আছে কোন কিছু একত্রিত ও সঞ্চিত করে রাখার ক্ষমতা; বরং উভয় গুণ থেকে তারা শূন্য। মোট কথা, ওখানে যেমন তিন প্রকার রয়েছে, এখানেও তিন প্রকার রয়েছে।

আত্মা শরীরকে পবিত্র করে মালিকের কাছে সমর্পণ করে

শরীরের জন্য জড় জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। আর রূহের জন্য দরকার রূহানী খাদ্যের। যেমন ইলম ও কামাল, জ্ঞান ও সদগুণাবলী। আল্লাহ তায়ালা এ সকল উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে আমরা, আমাদের প্রাণ, আমাদের মাল-সম্পদ সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট। আমরা আল্লাহ তায়ালার অধীন। আমরা তাঁরই মাখলুক। না আমাদের শরীর আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি আর না আমাদের আত্মা। আমরা এর রক্ষক ও আমানতদার মাত্র। মালিক ও প্রভুই এর স্রষ্টা।

আমাদের ওপর ফরয হলো আমরা আমানতদারীর সঙ্গে তাঁর হাতে তাঁর অর্পিত সম্পদ অর্পণ করে দেব এবং পাক-পবিত্রতাসহ তা প্রত্যর্পণ করব। আমরা এ শরীরের প্রকৃত মালিক ও অধিপতি নই। এটা হচ্ছে মালিকের দেয়া মেশিন। সুতরাং আমাদের জন্য ফরয ও দায়িত্ব হলো আমরা এর যথাযথ হেফাযত ও সংরক্ষণ করবো।

এ কারণেই শরীরে কোন ধরনের রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে তার চিকিৎসা করা সুন্নত। শরীরকে হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। শরীর যদি আমাদের নিজস্ব সম্পদ হতো, তাহলে আমরা এটাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারতাম, ধ্বংস করে দিতে পারতাম। ইচ্ছে করলে আত্মহত্যাও করতে পারতাম। কিন্তু এটা আমানতদারীর সঙ্গে মালিকের হাতে সমর্পণ করাই আমাদের দায়িত্ব। তাই তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমরা এর মাধ্যমে কেবল কর্ম সম্পাদন করি। শরীর রোগগ্রস্ত হলে চিকিৎসা করি, ফোঁড়া-ক্ষত হলে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ লাগাই। ভেতরে ক্ষত দেখা দিলে অপারেশন করা হয়। ওষুধ সেবন করা হয়। যাতে স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যায় এবং আমরা সুস্থ হয়ে উঠি। তেমনিভাবে আত্মার মধ্যেও ফোঁড়া-ক্ষত হয়। রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। নৈতিক

ও চারিত্রিক অধঃপতন আত্মার ব্যাধি। নিজের মধ্যে যদি অসততা, চরিত্রহীনতা, মন্দস্বভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, শত্রুতা এবং আত্মগৌরব জন্ম নেয়, অপরকে কষ্ট দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এসবই হচ্ছে আত্মার ব্যাধি, আর তা ভয়ানক ব্যাধি। শরীরের চিকিৎসার জন্য যেভাবে ডাক্তার-কবিরাজের কাছে যেতে হয়, তেমনি রূহানী ও আধ্যাত্মিক রোগের জন্যও আত্মার চিকিৎসকদের কাছে যেতে হবে। এর চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত আছেন। কেবল তাঁরাই বলতে পারেন, কেমন করে অহংকারকে সমূলে উৎপাটন করা যাবে। কেমন করে লোভ-লালসা থেকে মুক্তিলাভ হবে। হিংসা-বিদ্বেষ কিভাবে ত্যাগ করবে। এসবের চিকিৎসক আছেন এবং ব্যবস্থাপত্রও রয়েছে। এ বিষয়ক অনেক কিতাবাদি রয়েছে– যা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। মোট কথা, আমরা না আমাদের দেহ ও শরীরের, না রূহ ও আত্মার মালিক। আমরা যেহেতু দেহ ও আত্মার মালিক নই, তাহলে কেমন করে আসমান-জমিনের মালিক হবো?

মালিকের বন্দেগী না করে দেহ ও আত্মার উপায় নেই

এর কারণ সুস্পষ্ট। আত্মা যদি কারো নিজের মালিকানায় থাকত, তাহলে কোন মানুষই মৃত্যুবরণ করতো না, কারো ইন্তেকালই হতো না। কেউ যদি হত্যা করতে উদ্যত হতো তাহলে তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন– এ আত্মা ও দেহের মালিক আমি নিজেই। আমার প্রাণ বধ করার অধিকার কার আছে? মৃত্যুর ফেরেশতার সঙ্গে কত যুদ্ধ-লড়াই হয়ে যেত। বলত, ফেরেশতা সাহেব! আপনার কী অধিকার, কোন অধিকার বলে আপনি আমার প্রাণ বধ করতে এসেছেন। প্রাণের মালিক তো আমি নিজেই। অথচ মৃত্যুকাল যখন এসে যায়, তখন এক মুহূর্তের জন্যও আপনি তাকে আটকে রাখতে পারেন না।

আপনার প্রাণ এতটুকুও বিলম্ব করতে পারে না। জন্মগ্রহণ যেমন বাধ্যতামূলক করতে হয়েছে, তেমনি মৃত্যুও হবে বাধ্যতামূলক। জীবন-মৃত্যু কোনটাই আপন ইচ্ছাধীন নয়। এটাই হলো প্রমাণ যে, আমার শরীর ও আত্মা– কোনটারই মালিক আমি নই। যদি দেহের ওপর আমাদের একচ্ছত্র অধিকার থাকত, তাহলে কখনো আমরা রোগাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হতাম না। নিজের শরীর নষ্ট হোক তা কেউ পছন্দ করত না। অথবা শরীর দুর্বল হোক তাও পছন্দ করত না। কিন্তু এমনই অবস্থা যে, যখনই রোগ-ব্যাধি আসে রোগাক্রান্ত হতে হয়। কোন বিপদ যখন আসে বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিতে হয়। এর প্রধান কারণ শরীর

আমার নয়, অন্যের। এভাবে এ দেহের ওপর নানা অবস্থা দেখা দেয়। আর সবই আসে অন্যের পক্ষ থেকে। আমরা তো এতটাই অসহায় যে, আমাদের আগমন ও বিদায় কোনটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যখন আমাদের সময় হয় তখন আসতে হয়; আবার যখন চলে যাওয়ার সময় হয়, তখন বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়। আমরা যেহেতু এতটুকুরই অধিকারী নই, তাহলে আসমান-জমিনের মালিক হবো কেমন করে? একইভাবে দিন-রাতের সম্পর্ক এবং তাদেরকে ছোট বড় করা আমাদের অধিকারে নয়। আমাদের এ শক্তি নেই। এ সবই হচ্ছে ঐ মহান সত্তার অধীন, যিনি এসব সৃষ্টি করছেন। সর্বাবস্থায় খালেক ও মালেক যখন তিনি, তখন তিনিই হবেন হাকিম ও নির্দেশদাতা। এটা কেমন করে হতে পারে যে, শরীরকে সৃষ্টি করবেন তিনি, আর আমরা ইবাদত করব অন্যের, আনুগত্য করব অপরের, মাথানত করব অন্যের সামনে! যে মহান সত্তা আমাদের মাথা সৃষ্টি করেছেন, আমাদের দেহ-আত্মা কেবল তাঁরই সামনে অবনত হবে। কেননা, তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন। মোট কথা, তিনি যখন মালিক আর আমরা তাঁর সৃষ্ট দাস, তখন দাসের কাজ হলো কোন প্রকার বাক্য ব্যয় না করে মালিকের নির্দেশের সামনে অনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর সামনে শির নত করে দেয়া। আর যদি অমান্য করি, অবাধ্য হই তাহলে দাস থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

আমি মানব ও জিনকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি– তারা আমার বন্দেগী করবে, দাসত্ব করবে। [যারিয়াত : ৫১]

কারণ, স্রষ্টা যেহেতু আমি, তখন আমিই হলাম মালিক। এ অবস্থায় কার উচিত হবে, আমার বন্দেগী ও দাসত্ব না করার। আমার সামনে মাথানত না করার!

স্বেচ্ছায় সব ইবাদত করা হলো বান্দার কাজ

ইচ্ছা আপনি করেন আর নাই করেন– ঝুঁকতে হবে, মাথা নত করতে হবে। মৃত্যু যখন আসবে, তখন আপনি মাথা নত করবেন, করতে হবে। এ কথা বলার সুযোগ নেই, আমি মৃত্যুকে গ্রহণ করব না; বরং বাধ্য হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে, আর বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ ও সহ্য করতে হবে। মালিকের সামনে মাথা নত করতেই হবে। মুহ্তাজ ও পরনির্ভরশীলের কাজ তো হলো বিত্তবানের সামনে মাথা নত করে দেয়া। আপনি যদি নিজে

বিত্তবান হন আর পরমুখাপেক্ষী না হন, তাহলে মাথা নত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি বিত্তবান হনও, কারো মুখাপেক্ষী না-ও হন, তবে মজবুর হলে বাধ্য হয়ে নত হতে হবে। সুতরাং অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে নত হওয়ার আগে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নত হয়ে যান, ঝুঁকে যান। আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত সবই তো বাধ্য হয়ে ঝুঁকছে। এটা হচ্ছে তাঁদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান। তাঁর বিধানের কাছে তারা অবনত। তবে মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। অন্যান্য জিনিস অনিচ্ছায় ঝুঁকছে। অপরাগ ও বাধ্য হয়ে ঝুঁকছে। মানুষের কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছায় ঝুঁকে পড়া, জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ঝুঁকবে এবং স্বেচ্ছায় ঝুঁকবে। আর এরই নাম হচ্ছে ইবাদত। বান্দার কাজ তো হলো বন্দেগী করা। আর বন্দেগীর মানে হলো চরম দীনতা ও হীনতার প্রকাশ। অর্থাৎ আপন মালিকের সামনে চরম হীনতা, দীনতা ও বাধ্যতার অবস্থা গ্রহণ করা। এ-ই হলো ইবাদত। কেনই বা তা গ্রহণ করবে না? আল্লাহ তায়ালা এত মহাসম্মানিত, যে সম্মান ও মর্যাদার এমন কোন স্তর নেই, যার অভাব তাঁর রয়েছে। সুতরাং মানুষও এমন চরম জিল্লতি পেশ করবে, হীনতা প্রকাশ করবে যে, এরপর জিল্লত ও হীনতার আর কোন স্তর বাকী থাকবে না। মানবদেহের সবচে' শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের জায়গা হচ্ছে তার পেশানী (ললাট) এবং তার নাক। নামাযের সময় এ দুটিকেই মাটিতে লাগানো হয়– হে আল্লাহ্! আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিত অঙ্গকে তোমার সামনে স্থাপন করে দলিত-মথিত করছি, চরমভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করছি। যেহেতু তোমার ইজ্জত ও সম্মান সর্বাধিক, সর্বোচ্চ, সীমাহীন।

সার কথা হলো, বান্দার কাজ হচ্ছে বন্দেগী করা, দাসত্ব করা। এ কাজ জীবন দিয়ে সজ্ঞানে করবে, মাল ও সম্পদ দিয়ে করবে। আর মান-সম্মান দিয়েও করবে। এ কারণে যে, যদি সম্মানের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা সেখান থেকেই আসবে, জানমাল অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হলে এসবও সেখান থেকেই আসবে। মানুষ তার জান-মাল, মান-সম্মান কিছুরই মালিক নয়। জান-মাল, মান-সম্মান, সহায়-সম্পদ সব কিছু দিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করবে, দাসত্ব করবে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ইবাদতসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। দৈহিক ইবাদত জানপ্রাণ ও দেহ দ্বারা আদায় করা হয়। যেমন- আপনারা নামায পড়েন। দেহ-আত্মা সবাইকে আল্লাহর সামনে নত করেন, ঝুঁকিয়ে দেন। আপনারা হজ করেন। হজের জন্য দীর্ঘ সফর করেন। আরেক প্রকার হলো আর্থিক ইবাদত। যেমন- দান-খয়রাত, সদকা-যাকাত প্রদান করেন। গরীব ও মিসকীনদের সেবাযত্ন করেন। তিন ধরনের ইবাদতই ফরয করা হয়েছে। বান্দার কাজ হলো

জান-মাল-সম্মান সব কিছুসহ নত হওয়া। জানপ্রাণ দিয়ে নামায, সম্পদ দিয়ে সদকা, যাকাত এবং মান-সম্মান দিয়ে হজ আদায় করা।

আব্রু-সম্ভ্রমের মাধ্যমে ইবাদত

দৃশ্যত মানসম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির যত উপায়-উপকরণ রয়েছে, সবকিছুকে বিলীন করে দিতে হয়, ধূলিসাৎ করে দিতে হয়। মানুষ নিজের দেশে, নিজ মাতৃভূমিতে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করে। দরকার হলে এসব প্রদর্শনও করে। ফলে দেশ ত্যাগ করলেন, দেশ ও মাতৃভূমির মান-সম্মান নিঃশেষ করলেন, ধূলোয় মিশিয়ে দিলেন। এখন মুসাফির হয়ে, পরদেশী হয়ে চললেন। এরপর আবার পোশাক-পরিচ্ছদে সম্মান-সম্ভ্রম সৃষ্টি হয়। নতুন পোশাক পরে দাম্ভিকতাপূর্ণ পদক্ষেপে চলে। এরপর হুকুম দেয়া হলো– পোশাক খুলে নাও! কাফন পরিধান কর, খোলা মাথায় থাক। মানুষ সাজসজ্জা করে চেহারাকে শোভন, সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সম্মান লাভ করতে চায়। এখানে আদেশ দেয়া হলো– যখন ইহ্‌রাম বেঁধেছ, তখন চুল, নখ এসবও কাটার অনুমতি নেই। শরীরে উকুন হয়ে গেলে, হত্যা করার, মেরে ফেলার অনুমতি নেই। শিকার করারও অনুমতি নেই। এ কারণে যে, বান্দা আল্লাহ তায়ালার প্রেমিক, আল্লাহর প্রতি আসক্ত হয়ে ছুটে এসেছে। প্রেমিকের আবার শোভা-সৌন্দর্যের প্রয়োজন কি? প্রেমিক যদি শোভা-সৌন্দর্য ও প্রসাধনীর পূজারী হয়, তাহলে মাহবুব ও প্রিয়জনের প্রতি মনোনিবেশ করবে কখন? তাহলে তো ঐ ব্যক্তি সত্যিকার প্রেমিক হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা হজের পূর্বক্ষণে এসব ত্যাগ ও বর্জন করিয়ে নিয়েছেন। তারপর প্রিয়জনের ঘরে পৌঁছে প্রজাপতির মতো চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রদক্ষিণ করছে। প্রিয়জন বলছেন– মিনায় যাও! তখন চলছে মিনায়। মাথা কামাও! সঙ্গে সঙ্গে মাথা কামিয়ে ফেলছে।

এছাড়া মানুষ চলার ভঙ্গি দ্বারা তাঁর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়। নানা ভঙ্গি করে চলাফেরা করে। কিন্তু যখন বাইতুল্লাহ শরীফের প্রদক্ষিণ করে তখন সকল মান-সম্মান, সম্ভ্রম ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাওয়াফের সাঈ করতে হয়। সাফা-মারওয়াতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এ তাওয়াফে রমল করা জরুরী। অর্থাৎ চার চক্করে দাম্ভিকতাপূর্ণ চালে চলতে হবে। একজন আলেম, দীর্ঘ দাড়ি– তিনি অবনত মস্তকে চলছিলেন। কিন্তু এবার আদেশ হলো– মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে দাম্ভিকতাপূর্ণ চালে চল। যেমন বীর-মহাবীরগণ চলেন। তারপর বলা হলো– রমলকালীন ইহ্‌রামের চাদরকে ডান কাঁধের নিচে এবং বাম কাঁধের ওপর

রাখ। সম্পূর্ণ শরীর খোলা রাখ। যারা নিজের শরীরকে খোলা রাখা সম্ভ্রমের পরিপন্থী মনে করে, এবার সে সম্মান-সম্ভ্রম শেষ হয়ে গেল। এরূপ সাফা-মারওয়াতে সাঈ করার সময়, দৌড়াদৌড়ি করার সময় মান-সম্মান শেষ হয়ে যায়। মোট কথা, সম্ভ্রমের যত বিষয় ছিল, এখন সব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজ আদায়কালে মান-সম্মান, সম্ভ্রম সব বিসর্জন করিয়ে বন্দেগী করানো হলো।

আবার নামাযের ব্যাপারটি এর বিপরীত। বাড়ি থেকে বের হয়ে ধীর পদক্ষেপে চল। বলা হয়েছে–

لا تاتو ها وانتم تصون واتو ها وانتم تمشون -

মসজিদে যখন যাও তখন ধীর পদক্ষেপে শান্তিময়ভাবে চলো। এমনভাবে দৌড়ে যেও না যেভাবে ছেলে-ছোকরারা দৌড়াদোড়ি করে। সেখানে নির্দেশ ছিল পোশাক খুলে ফেলা এবং কাফন পরিধান করা। অথচ এখানে বলা হলো পরিপূর্ণ পোশাক পরিধান করে ধীরস্থিরভাবে সম্ভ্রমের সাথে চল। মাথাও খোলা রাখা যাবে না। হজ সম্পর্কে বলেছেন– সাবধান! সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। অথচ নামায সম্পর্কে বলেছেন– নিজেও সুগন্ধি ব্যবহার কর, মসজিদকেও সুগন্ধিতে সুরভিত করে রাখ। ইবাদতদ্বয়ের অবস্থা পরস্পর বিরোধী। নামাযে জানপ্রাণ দিয়ে আর হজে মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু দিয়ে ইবাদত করানো হয়।

অর্থনৈতিক ইবাদত

অবশিষ্ট ছিল ধন-সম্পদ। ফলে যাকাত ও সদকার ইবাদত দেয়া হয়েছে। তোমাদের মাল-সম্পদ থেকে গরীব ও মিসকীনদের হক বের করে দাও। আগের যুগের উম্মতগণের প্রতি নির্দেশ ছিল– নিজের প্রয়োজনে খরচ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা সদকা করে দাও। একটি পয়সাও রেখে দেয়ার অনুমতি ছিল না। তোমরা যদি তা নিজেরা রেখে দাও, তাহলে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হবে না। চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হবে না। সুতরাং আহার করবে, পান করবে, পরিধান করবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদকা করে দিবে। আর যদি সদকা গ্রহণ করার কেউ না থাকে, তাহলে নির্দেশ ছিল– এ সম্পদে আগুন লাগিয়ে দাও। আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দাও। আর সদকা কবুল ও মঞ্জুর হওয়ার এটাই ছিল লক্ষণ।

তবে এই উম্মত হচ্ছে দুর্বল। ফলে তাঁদের প্রতি বিশেষ ছাড় ও অনুগ্রহ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– খাও, পান কর; অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে তাহলে এমন

নয় যে, সর্বস্ব বিলিয়ে দাও। বরং কিছু হক নির্ধারিত করে দেয়া হলো। এভাবে নিজের মাল ব্যয় কর। এতে সীমারেখা ঠিক করে দেয়া হয়েছে। যে মাল উপার্জনে মানুষকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়, তেমন মাল-সম্পদে আল্লাহ তায়ালা নিজের অংশ কমই রেখেছেন, যাতে আদায় করা সহজসাধ্য হয়। আর যে সম্পদ কম পরিশ্রমে লাভ হয়, তাতে নিজের অংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তা দান করা সহজ হবে। আবার যে সম্পদ লাভে মোটেই পরিশ্রম হয়নি, তাতে অংশ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। উপার্জন যেমন সহজ ছিল দান করাও তেমনি সহজ হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– কেউ যদি খনি বা গুপ্তধন পেয়ে যায়; যেমন লাখ দু'লাখ টাকার সম্পদ পেয়ে গেলো– এটা হলো বিনাশ্রমের সম্পদ, কোন কষ্ট-শ্রম ব্যয় করতে হয়নি। ভাগ্যচক্রে মাঠে, ময়দানে অনাবাদ ভূমিতে পেয়ে গেছে। জমি যখন খনন করছিল, হঠাৎ মাল ভর্তি বিরাট ডেগ পেয়ে গেল, বিনা পরিশ্রমে লাভ করল। এখানে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের জন্য এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন। যদি একশ' টাকার সম্পদ হয় তাহলে পঞ্চমাংশ– বিশ টাকা জাতীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। এ বিশ টাকা দরিদ্রদের হক– যার আশি টাকা প্রাপকের হক। একশ' টাকা থেকে বিশ টাকা দান করা কষ্টকর হবে না। আশি টাকাও যেহেতু বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে পাওয়া যাচ্ছে, তাই পরিশ্রম না থাকায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর অংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কোন লোক যদি ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে, তাহলে চাষাবাদে বিপুল কষ্ট ও পরিশ্রম রয়েছে, যা তাকে করতে হবে। ফলে আল্লাহ তায়ালাও নিজের অংশ কম করেছেন। গুপ্তধন ছিল পঞ্চমাংশ। এখানে বলা হয়েছে, দশমাংশ দিতে হবে। অর্থাৎ একশ' টাকা থেকে দশ টাকা দিতে হবে। এটা হলো জাতীয় কোষাগারের প্রাপ্য, যা অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করা হবে। নব্বই টাকা কৃষক নিজের জন্য রেখে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষেত-খামারে নিজের অংশ কম করে দিয়েছেন।

আর মানুষ যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাহলে ব্যবসায় অনেক পরিশ্রম করতে হয়। ব্যবসায়ীর বিবেক-বুদ্ধি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজে ব্যয় হতে থাকে। কারখানাও টিকিয়ে রাখতে হয়, আবার উৎপাদনও যাতে হ্রাস না পায়। এমন যেন না হয় যে, গ্রাহক আসল, আর মাল সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ পেল। ব্যবসায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেধা ব্যয় করতে হয়। ব্যবসায়ীকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এক জায়গা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ কর। অন্য জায়গা থেকে অমুক উপাদান সংগ্রহ কর। কোথাও বা বুকিং-এর প্রয়োজন দেখা দিবে। কোন কাঁচামালে কাস্টমস দিতে হবে। এক কথায় নানরূপ ঝামেলা

পোহাতে হয় তাকে। তারপর গ্রাহকগণকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, তাঁদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করতে হবে। গ্রাহক যদি কোন অন্যায় করে ফেলে, তাহলে ব্যবসায়ীর উচিত হলো, সদ্ব্যবহার করা। যদি অসদ্ব্যবহার করে, তাহলে গ্রাহক আসবে না। গ্রাহক চলে যাবে অন্যখানে।

সার কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করা লাগে। তাই আল্লাহ তায়ালাও তাঁর অংশ কম করে দিয়েছেন। পঞ্চমাংশ ও দশমাংশের পরিবর্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে বলেছেন। অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা দিতে বলেছেন। শতকরা আড়াই টাকা দান করা কোন কঠিন কাজ নয়। তারপর আরো সহজ করে দিয়েছেন। যেদিন একশ' টাকা জমা হবে, ঐ দিনই যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু আদায় করা ওয়াজিব নয়। যে পর্যন্ত না এক বছর অতিবাহিত হয়। এক বছর উপার্জন করতে থাকলে একশয়ের বেশি হয়ে যাবে। তখন আড়াই টাকা প্রদান করা মোটেই কঠিন হবে না। আল্লাহ তায়ালা কতই না সুবিধাজনক বিধান রেখেছেন। যে সম্পদ আহরণে মানুষের শ্রম ব্যয় হয়েছে, শ্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের অংশ হ্রাস করেছেন। শ্রম যত হ্রাস পায়, সে অনুপাতে নিজের অংশ বৃদ্ধি করেন। আদায় করতে যেন কোন অসুবিধা ও কষ্ট না হয়, লজ্জাবোধ না হয়। যাকাত হচ্ছে দরিদ্র-অসহায়দের হক। এর মানে দাঁড়াল এই– সম্পদ উপার্জনে যেমন আপনার নিজের প্রতি এবং নিজের সন্তানদের প্রতি লক্ষ ও দৃষ্টি রাখেন, তেমনি দরিদ্র-মিসকীনদের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন। তারাও আপনার সন্তান। আপনার সন্তানরা আপনার বংশগত সন্তান আর গরীব-অসহায় যারা তারা আপনার স্বীকৃত সন্তান। আপনি যদি এদেরকে দান না করেন তাহলে আপনার জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। গরীবরা যখন তাঁদের প্রাপ্য না পারে, তখন শ্রমিক ও মালিক, শ্রম ও পুঁজিপতির প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তারা সকলে আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-মুখর হয়ে ওঠবে। এসব পুঁজিপতিকে বিতাড়িত করার চেষ্টায় মেতে উঠবে। ফলে এতে সামাজিক অশান্তি ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

প্রায়ই আমি বলে থাকি– আল্লাহ তায়ালা শতকরা আড়াই টাকা রেখে ছিলেন। সে টাকা প্রদানেও যখন গড়িমসি শুরু করে দিল, যথারীতি আদায় না করল, তখন এত ভারী ট্যাক্স (কর) আরোপিত হলো যে, শতকরা আশি টাকা সরকারের এবং কুড়ি টাকা মালিকের। আড়াই টাকা যদি যথারীতি আদায় করতে থাকতেন, তাহলে সাড়ে সাতানব্বই টাকা নিজের থেকে যেত। অথচ একশ' টাকা উপার্জন করলে আশি টাকা সরকার রেখে দেবে; বিশ টাকা আপনার হাতে আসবে। নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়ন না করার ফলেই অশুভ

প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহর হক যদি যথারীতি পূর্ণভাবে আদায় করতে থাকতেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিধান দৃঢ়ভাবে মেনে চলতেন, তাহলে অন্য কিছু প্রাধান্য লাভ করতে পারত না। সার কথা, এ হলো শরীয়তের একটি বিধান। কষ্ট ও পরিশ্রম যত অধিকহারে বেড়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালা সে মোতাবেক নিজের হক হ্রাস করে দিবেন। আর যখন মানুষের কষ্ট ও শ্রম হ্রাস পাবে, তখন তাঁর হক বাড়িয়ে দিবেন। যেমন- বকরী যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে প্রতি চল্লিশটি বকরীর মধ্যে একটি বকরী দিতে হবে। গরু যদি গাভী হয়, তাহলে প্রতি বিশটা গাভীর জন্য একটি বাচ্চা দিতে হবে। দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা হ্রাস করে দেয়া হয়। আর যদি উট হয়, তাহলে পাঁচটি উট হলে একটি উটের বাচ্চা দিতে হবে। যেহেতু উটের শরীর গাভী থেকে তিন-চার গুণ বড়। দেহ বড় হওয়ায় সংখ্যা হ্রাস পেল। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা বিস্ময়কর নীতি ও বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আর্থিক ইবাদতের লক্ষ্য ধনী-গরীবের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা

আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনী-গরীবকে পরস্পর নিকটবর্তী করা। এমনটা যেন না হয় যে, বিত্তবান পুঁজিপতিরা আকাশে অবস্থান করবে আর গরীবরা অবস্থান করবে মাটিতে। আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিত্তবানদের কিছুটা নীচে নামানো হলো আর গরীবদেরকে কিছুটা ওপরে উঠানো হলো, যাতে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। শরীয়ত সমতা ও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ ও পছন্দ করেনি, উৎসাহিতও করেনি যে, একই ধরনের খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আয়-আমদানি সকলের হবে। জোরজবরদস্তি করে পুঁজিপতিরা সব আমদানি নিয়ে যাবে আর দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। তাতে ধনী–গরীব সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে যে, এ ব্যবস্থা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কারণ, একজনের মধ্যে এত বেশি বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মতৎপরতা রয়েছে যে, দুইশ' টাকা পুঁজি করে ব্যবসা শুরু করলে, হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করে। আর অন্যজন এমন অলস-নির্বোধ যে, হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও লাভ তো দূরের কথা, পুঁজি নষ্ট করে ঘরে ফিরে আসে। এ দু'জন সমান হবে কেমন করে? যে ব্যক্তি পরিশ্রম বেশি করবে, তার অধিকার ও প্রাপ্যও বেশি হবে। যে কম পরিশ্রম করবে, তার পাপ্যও কম হবে। শরীয়ত এ অনুমতি দেয়নি, এ কথা বলেনি যে, উভয়েই সমান সমান হবেন; বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ✡

আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমি আমার বান্দাদের মধ্যে জীবিকা ভাগ-বণ্টন করে দিয়েছি। একজনকে অপরজনের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছি। কেউ ওপরে কেউ নীচে, কেউ আমীর, কেউ গরীব, যেন একে অন্যের উপকারে আসতে পারে। [যুখরুফ : ৩২]

আর এর মাধ্যমে তমদ্দুন ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সবাই যদি একই পর্যায়ের হতেন, তাহলে আপনি দান-দক্ষিণা, সদকা-খয়রাত করতেন কেমন করে? যাকেই দান করতেন সেই বলত– আমার ঘরে অনেক পড়ে আছে; আমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন সাহায্য-সহযোগিতা, একে অন্যের সেবাযত্ন করার পথ বন্ধ হয়ে যেত। আর সবাই যদি ভিক্ষুক হয়ে যেতেন, তাহলে আপনি তাকে এবং সে আপনিতে সম্পর্কহীন থাকত। সকলেই দরিদ্র-ভিক্ষুক হলেও সমাজ ও তমদ্দুন গড়ে উঠতে পারত না। আবার যদি সকলে আমীর বা বিত্তশালী হয়ে যায়, তাহলেও তমদ্দুন গড়ে উঠবে না। কিছুসংখ্যক ধনী-বিত্তশালী, কিছুসংখ্যক দরিদ্র-বিত্তহীন থাকতে হবে। সমাজে আমীরেরও প্রয়োজন, গরীবেরও প্রয়োজন। আমীরত্বের কারণে অনেক কিছু আটকে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা এভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেন পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। আর এ কারণেই এ পার্থক্য। এ পার্থক্যকে বিলোপ করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। সুতরাং সম্পদের প্রভেদ ও বিভিন্নতা যদি বিলোপ করতে হয়, তাহলে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনার বিভিন্নতাও বিলোপ করতে হবে। এক ব্যক্তি অত্যন্ত হুঁশিয়ার, বুদ্ধিমান– তাকে বোকা ও নির্বোধ বানানোর জন্য চেষ্টা করুন আর যে ব্যক্তি নির্বোধ ও বোকা, তাকে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। অথচ এসব আপনার আয়ত্তাধীন নয়। বুদ্ধি ও অনুভূতিতে পার্থক্য আছে, রঙ ও রূপে বিভিন্নতা রয়েছে– কেউ কালো, নিগ্রো, কেউ সাদা। ভাষা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে প্রভেদ। কারো ভাষা আরবি, কারো ইংরেজি। ভাষা-সংস্কৃতি, আকার-আকৃতি, স্বভাব-চরিত্র এবং জ্ঞান-বুদ্ধির বিভিন্নতা রয়েছে। তাহলে বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধি দ্বারা যখন মাল উপার্জিত হবে, তাহলে তাতে বিভিন্নতা থাকবেই, থাকা অনিবার্য। কেউ উপার্জন করবে বেশি, কেউ করবে কম। এখন যদি কোন আমীরকে আপনি বাধ্য করেন আর বলেন– তোমার সকল উপার্জন দিয়ে দাও! তোমার হাতে যদি পাঁচ টাকা থাকে; তাহলে সেটাও সকলকে বণ্টন করে দাও– যাতে সবাই সমান হয়ে যেতে পারে। তাহলে এ

ব্যবস্থার মারাত্মক কুফল ও পরিণতি দাঁড়াবে এই– আমীর বা বিত্তবান এবং শ্রমিকদের মধ্যকার সম্পর্ক দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়বে।

সব ধরনের পরিশ্রম ও সমস্যার সমাধান করেছি আমি, আর জবরদস্তিমূলক সব কিছু তারা নিয়ে গেল! সকলে সমান হয়ে গেলাম! কোন পার্থক্য থাকল না? আমি দিন-রাত পরিশ্রম করব আর এর ফসল সব দিয়ে দিব– অথচ সে কোন পরিশ্রম করবে না! এমন হলে পরে ঐ ব্যক্তির পরিশ্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে না। এ হলো স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। অন্যদিকে গরীব শ্রমিকরা মনে করবে, বিনাপরিশ্রমে যখন আমি সমান অংশ পাচ্ছি, তাহলে পরিশ্রম করার দরকার কি? সেও অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। মোট কথা, আপনি যদি বলপ্রয়োগে জীবিকার অর্থ সকলকে সমান করে দিতে উদ্যোগী হন, তাহলে আমীরও যেমন থাকবেন না, দরিদ্র ও শ্রমিকও থাকবেন না। ফলে একে অন্যের কোন কাজে আসবে না। এ কারণেই সমান সমান করে দেয়া স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং একে অন্যের কাছাকাছি ও নিকটবর্তী করে দেয়া– যাতে এমন দূরত্ব ও ব্যবধান না থাকে যে, একজন অবস্থান করবে আকাশে আর অপরজন জমিনে। তাই আল্লাহ তায়ালা হুকুম ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন– আমীর কিছুটা নিচে অবতরণ করবে, আর গরীব কিছুটা উপরে আসবে। যাতে পরস্পরে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করুন, পবিত্র রমযান মাস আসল। আপনি এক লাখ টাকার মালিক। এ টাকার চল্লিশ ভাগের এক অংশ যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। এক লাখের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা। এ আড়াই হাজার টাকা হবে অসহায় গরীবদের জন্য। এতে গরীবরা মনে করবে– আমি গরীব ঠিকই, তবে আমার সাহায্যের জন্য এমন বিত্তবান ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি আমার সেবাযত্ন করবেন। সুতরাং আমি গরীব নই, আমিও বিত্তবান। আর সে শোকরিয়া আদায় করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে করবে, আমীর আপন সন্তানের মত তাকে লালন-পালন করছেন। তার অন্তরে আমীরের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা বেড়ে যাবে। আপনি যেমন রমযান শরীফে দশ হাজার টাকা বণ্টন করলেন, তেমনি অন্য দশ-বিশজনও এভাবে বণ্টন করলেন। দশ হাজার টাকা করে যখন লাখ দু'লাখ টাকা গরীবদের হাতে পৌঁছবে, তখন তাঁদের মনে কৃতজ্ঞতার মনোভাব সৃষ্টি হবে যে, বিত্তবানগণ আমাদের খবরদারী করছেন। আসলে যে সকল বিত্তবান আছেন তারা আমাদের পিতামাতার স্থলবর্তী এবং আমরা তাঁদের সন্তান তুল্য। তাই আমাকে তাঁদের মর্যাদা ও হক বুঝতে হবে।

এদিকে আমীরও মনে করবেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন, আমার মাধ্যমে তাঁদের খেদমত ও সেবা করিয়েছেন, আমার ইহকাল এবং পরকাল কল্যাণকর ও সুখময় হয়েছে। ফলে আমীরও গরীবের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। ভাববে, এসব গরীব-মিসকীন যদি না থাকত, তাহলে আমি সদকা-যাকাত কাকে দান করতাম? আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তা দান করিয়েছেন এবং আমার ইহ-পরকাল সুন্দর ও সুখময় হয়ে গেছে। আমীর তার জায়গায় আর গরীব তার জায়গায়– উভয়ই সুখী ও আনন্দিত। উভয়ের মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হলো। আর যদি গরীব ও দরিদ্ররা বিত্তবান আমীরের সব কিছু দখল করে নিতে চায়, হরণ করতে চায়, তাহলে আমীরের মনে কি মনোভাবের উদয় হবে? সে বলবে– আমি যদি নাও দেই তবুও পাপীষ্ঠরা জোর করে নিয়ে যাবে। গরীবদের মনে একথা আসবে যে, আমাদের দেয়া তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং তাঁদের শোকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন দরকার নেই। এতে ফল দাঁড়াবে এই– আমীর বলবে, আমার যদি সুযোগ হয় তাহলে গরীব সবক'টাকে জবাই করে ফেলব। উপার্জন আমার আর আনন্দ-ফূর্তি ও উপভোগ করছে তারা! অন্যদিকে গরীবরা মনেপ্রাণে চাইবে যে, সকল আমীর ও বিত্তবান ধ্বংস হয়ে যাক, ক্ষমতা আমাদের হাতে এসে যাক। আমি আজই সবাইকে শেষ করে দেব। যে দল ক্ষমতায় আসবে, অন্য দলকে নিঃশেষ করে দেয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থাকব। অথচ ইসলাম এমনই এক মধ্যপথ বলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে গরীব আমীরের বন্ধু বা ভক্ত হয়ে যাবে এবং আমীর গরীবদের প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান হয়ে যাবে। উভয়পক্ষ থেকে তখন সাহায্য-সহযোগিতা, তমদ্দুন গড়ে উঠবে। মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর বল প্রয়োগে ভাগ-বণ্টন ও সমতা আনার চেষ্টা করলে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হবে। এ কারণেই ইসলাম প্রথমে এই কাজ করেছে অর্থাৎ নীতি বর্ণনা করেছে যে, পরস্পরে মহব্বত-ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ধনী-গরীবকে দান করবে এবং নির্ধারিত একটি অংশ দান করা বাধ্য করেছে। চল্লিশ ভাগের একভাগ গরীব ভাইকে অবশ্যই দান করতে হবে; তা না হলে ভ্রাতৃত্বই থাকবে না। পরকালের উদ্দেশ্যে যদি দান করে, তাহলে মনেপ্রাণে আনন্দিত হবে। আমার পরকাল সুগঠিত হয়েছে, সুখময় হয়েছে। আর আপনি এ আশায়ই রমযানুল মুবারকে এমন দান করলেন।

এবার রমযান শেষ হয়ে গেলো আর ঈদুল ফিতর এসে হাজির। এবার শরীয়ত সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করে দিল। প্রতিটি কচি শিশু– যদিও সে ঈদের পূর্ব মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করে থাকুক– তার পক্ষ থেকেও এটা আদায় করতে হবে। এখন যদি একটি পরিবারে বারজন সদস্য থাকে, তাহলে মনে করুন এ পরিবার

থেকে বারো টাকা দেয়া হলো। পরিবারে একশ' সদস্য থাকলে একশ' টাকা দেয়া হলো। গরীবরা এবার বলবে– রমযান মুবারকে তারা আমাদের দান করেছেন, এখন ঈদ এসেছে, আবারও দান করছেন। তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সাহায্যকারী, কল্যাণকারী আমাদের নেই। আর এভাবে আমীরদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভক্তি আরও বেড়ে যাবে।

গরীবের সেবায় ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)

ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি অনেক বড় কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। দু'একটি দোকান মাত্র ছিল না; বরং অনেক স্থানে কাপড় তৈরির করখানা এবং সর্বত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। এত বিরাট পুঁজি ও দৌলত ছিল যে, যখন ইমাম সাহেবের ওফাত হলো, তখন অন্যদের রাখা আমানতসহ ছাপ্পান্ন কোটি টাকা তাঁর কোষাগারে গচ্ছিত ছিল– যা তিনি *রেখে গিয়েছিলেন*। এ ছাপ্পান্ন কোটি টাকার মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত মুনাফা গরীব-মিসকীনদের মাঝে ব্যয় করা হতো। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে– কুফা নগরীতে যত দরিদ্র, বিধবা ও এতীম ছিল, ইমাম সাহেবের কাছে তাঁদের নামের তালিকা ছিল। তাঁদের ঠিকানা, দৈহিক আকার-আকৃতি এবং বয়স লেখা ছিল। অমুকের বয়স এত বছর, অমুক ব্যক্তি যুবক, অমুক ব্যক্তি ছেলে-বয়সী। রমযান শরীফে প্রতিটি গরীব পরিবারের জন্য কাপড় তৈরি করা হতো। বড়দের জন্য বড় সাইজ, ছোটদের জন্য ছোট সাইজ এবং মহিলাদের জন্য তাঁদের উপযোগী। ঈদের দিন ভোরে সকল গরীবের ঘরে ঘরে কাপড় পৌঁছে যেত। গরীবরা তখন বলত– ইমাম সাহেব নিরাপদ ও সালামত থাকুন। ঈদ যেমন আমীরদের, তেমনি আমাদেরও। ছেলেমেয়েদের উন্নত মানের পোশাক লাভ হয়েছে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একটি পরিষদ গঠন করলেন। দেশের শীর্ষ আলেম ও ইমামগণ এখানে সমবেত ছিলেন। তাঁরা ফিকাহর প্রতিটি মাসয়ালা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা করতেন। আজ যাকে আপনারা হানাফী ফিকাহ বলে থাকেন। এ ফিকাহ হচ্ছে অনেক ইমামের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের নির্যাস। ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুহরী, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)সহ প্রখ্যাত ইমামদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ ছিল। এক একটি মাসয়ালার ওপর পুরো সপ্তাহ আলোচনা হতো। আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর যখন একটি বিষয় পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যেত, তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে বিশালাকার বিশ খণ্ডে হানাফী ফিকাহ সংকলিত হয়েছিল। এমনও হতো যে, হাজার হাজার মানুষ ইমাম সাহেবের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে

নিয়ে যেত। হাজারো লোকের কারবার এ ধারকৃত টাকাকে পুঁজি করে চলত। তারপর দান-দক্ষিণার প্রতি এত আগ্রহ ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন– এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিল। ফেরত দেয়ার তারিখ নির্ধারণ ছিল– এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দিবে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল। অথচ সে লোক তা পরিশোধ করতে পারেনি। কিংবা সে কার্পণ্য করছিল, তাই পরিশোধ করেনি। সময় পার হয়ে গেল, তবু সে পরিশোধ করল না। এবার সে ইমাম সাহেব থেকে পালিয়ে চলতে লাগল। কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে যাবে– এসব ভেবে লজ্জাবোধ করছিল। ইমাম সাহেবকে আসতে দেখলে, সে অন্য পথে আত্মগোপন করে চলে, যাতে ইমাম সাহেবের সঙ্গে তার দেখা না হয়। হয়তো ইমাম সাহেব তাকে মিথ্যাবাদী বা ওয়াদা খেলাপকারী বলবেন।

একদিন ইমাম সাহেবেরও কথাটি স্মরণ হলো। তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় ঐ ব্যক্তিও অপরদিক থেকে আসছিল। লোকটি ইমাম সাহেবকে দেখে অন্য এক গলিতে ঢুকে পড়ল। ইমাম সাহেবও সে গলিতে ঢুকে পড়লেন এবং পেছন থেকে তার পরনের কাপড় ধরে ফেললেন এবং বললেন– ভাই! তুমি সম্পর্ক নষ্ট করছো কেন? মনে হচ্ছে, তুমি বিশ হাজার টাকা নিয়েছিলে, দিতে পারছ না বলে লজ্জা পাচ্ছ! আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। সম্পর্ক অনেক মূল্যবান বস্তু, টাকা-পয়সা মুখ্য বস্তু নয়। তুমি একটি পয়সাও পরিশোধ করার জন্য চেষ্টা করো না! তবুও সম্পর্ককে নষ্ট করলে কেন? ইমাম সাহেব (রহ.) অনেক মানুষের এ জাতীয় ঋণ মাফ করেছেন। যখন দেখতেন সে দিতে পারছে না, তখনই তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

ব্যবসায় ইমাম আযমের তাকওয়া

এমনই ছিল ব্যবসায়ে তাকওয়ার অবস্থা। আসলে তিনি তো ছিলেন মুসলমানদের বরণীয় ইমাম। কাপড় তৈরি করে বিতরণ করেছেন। কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রি করার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে পাঠিয়েছেন। ব্যবসায়ী দেখলেন এই মুহূর্তে কাপড়ের দাম কমে গেছে। বাজার নিম্নমুখী। দু'মাস পর দাম আবার বেড়ে যাবে। ফলে কাপড় স্টক করে রাখলেন, যাতে এক লাখে দু'লাখ তথা দ্বিগুণ মুনাফা হয়। আর হলোও তাই।

বাজারের মন্দা সময় পার হয়ে গেল। কাপড়ের চাহিদা বেড়ে গেল। ব্যবসায়ীরাও দাম বাড়িয়ে দিল। এক লাখে উসুল হলো দু'লাখ। খুবই আনন্দের সঙ্গে টাকাগুলো ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। ইমাম সাহেব বললেন–

হিসাবে তো এক লাখ হওয়ার কথা, দু'লাখ হলো কেমন করে? উত্তর দিল– আমি মন্দা সিজনে দু'মাসের জন্য কাপড় মজুদ করে রেখেছিলাম। মতলব ছিল, মানুষের চাহিদা যখন বাড়বে, তখন বিক্রি করব। ইমাম সাহেব বললেন– মায়াযাল্লাহ! আল্লাহ রক্ষা করুন! একেই তো ইহতেকার (দাম বাড়ার আশায় গুদামজাতকরণ) বলা হয়। মানুষের অসামর্থতা ও অপারগতাকে পুঁজি করে মুনাফা অর্জন করা হয়। এই বলে রেগে গেলেন এবং বললেন– দু'লাখ টাকা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। এ টাকা আমার ব্যবহারযোগ্য নয়। এ টাকা উপার্জনে তুমি গরীব জনসাধারণের মজবুরীকে পুঁজি করে মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছ। যখন দরকারের সময় ছিল, তখনই তা বিক্রি করে দেয়া উচিত ছিল। ইমাম সাহেবের অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ তাকওয়া ছিল। আর ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দানশীলতা ছিল এ পরিমাণ!

আর এমন ধনবান ব্যক্তির সামনে গরীর-নিঃস্বগণ কেমন করে ভগ্ন-হৃদয় হবেন? প্রত্যেক গরীব ব্যক্তির একই কথা ছিল– ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সালামত ও নিরাপদ থাকুন। আমি গরীব অথচ আমার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন গরীব নয়। তাদের খাবার-খাদ্য যথাসময়ে আসছে। ইমাম সাহেব এভাবে শুকরগুজারী করতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তাওফিক দান করেছেন। তিনি গরীবদের সেবা ও খেদমত করতে পারছেন। তিনি বলতেন– আমি প্রতিদান পাব। আমার পরকাল সুন্দর ও সুখময় হবে। আর গরীবরা আনন্দিত হবে। এভাবে যে, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। ফলে নিঃস্ব ও গরীবরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রতি এ পরিমাণ আসক্ত ছিল যে, ইমাম সাহেবের কাজের জন্য তারা সর্বশক্তি ব্যয় করে সবসময় তৈরি থাকতেন। আসলে ইসলাম ব্যয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। খোলা মনে সন্তুষ্টচিত্তে করতে হবে। এতে কাউকে বাধ্য করেনি, জোর-জবরদস্তি করেনি। যেখানে জোর-জবরদস্তি ও বাধ্য করা হয়েছে, সেখানেই এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে ব্যয় করা কষ্টকর না হয়। শতকরা আড়াই টাকা। সেটাও আবার তাৎক্ষণিক নয়, এক বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। টাকা প্রদানে যাতে কোনরূপ কষ্ট ও অসুবিধা না হয়। বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলাম এমনিভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি বণ্টনের ওপর, সঞ্চয়ের ওপর নয়

অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব মৌলিক নীতির বিধান করেছে, তার মূল হচ্ছে বণ্টনের নীতি, সঞ্চয়ের নীতি নয়। অর্থাৎ টাকা ঘুরতে থাকবে। এক

জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে অলস পড়ে থাকবে না। যাকাতের সময় হলে যাকাত আদায় করতে হবে। তারপর রমযান শেষে সদকা-ফিতর আদায় করতে হবে। এরপর ঈদুল আযহা আসলে কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানীর মুস্তাহাব তরীকা হচ্ছে এক-চতুর্থাংশ গরীবদের জন্য সদকা কর। নিজেও খাও, নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও দান কর। আর এ উপলক্ষে গরীবের ঘরে গোশত পৌঁছে গেল। অন্যান্য জিনিসও পৌঁছল।

তারপর বলা হয়েছে–

ان فى المال حق سوى الزكوة

মানুষের মাল-সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরো কিছু হুকুম রয়েছে, যা প্রয়োজনের সময় ব্যয় করবে।

আর এ ধরনের ব্যয় করাকে ইসলাম সহজসাধ্য করে দিয়েছে এভাবে যে, প্রথমে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও নৈতিকতা উন্নত ও সুসংহত করেছে। তারপর বলেছে, দানশীলতা উত্তম গুণ এবং কৃপণতা আল্লাহর নিকট ঘৃণিত, অপছন্দনীয়।

এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

السخى حبيب الله قريب من الله والبخيل عدو الله بعيد من الله -

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, আল্লাহ থেকে দূরে অবস্থানকারী।

এ কারণে যে, সাখাওয়াত ও দানশীলতা আল্লাহ তায়ালার গুণ। আর বখিলী বা কার্পণ্য আল্লাহর গুণ নয়। শত্রু-মিত্র সবাই আল্লাহ তায়ালার দান উপভোগ করছে সমানভাবে। সূর্যকে উদিত করেন, তাতে শত্রুগণও এতে উপকৃত হচ্ছে, আবার মিত্রগণও। অর্থাৎ মুসলিম-অমুসলিম, মুমিন-কাফের সকলেই ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য হতে উপকৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শত্রু-মিত্র সকলেই সমান, সবাই অংশ পাচ্ছে। কোন প্রকার কার্পণ্য নেই। তবে মুমিনদের প্রতি বিশেষ রহমত ও দয়া রয়েছে। তাঁদেরকে পার্থিব ধন-দৌলতের সঙ্গে ঈমান, ইখলাস আর পরকালের বিশ্বাস দান করেছেন। এগুলো তাঁদের জন্য একটা বিশেষ দান, বিশেষ অনুকম্পা। তবে পার্থিব বিষয়াদিতে শত্রু-মিত্র, কাফের-মুসলিম সব সমান। দান-দক্ষিণা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ। তাঁর কোষাগার থেকে

দিনরাত অহরহ ব্যয় হচ্ছে। যে ব্যক্তি সুখী ও দানশীল সে যেন আল্লাহ তায়ালার গুণ নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছে। বখিলী ও কৃপণতা আল্লাহর সিফত বা গুণ নয়। কেউ যদি কৃপণ হয়ে যায়, তাহলে সে আল্লাহ তায়ালা থেকে দূর হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকলো না। এ কারণে শরীয়ত যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে সাখাওয়াত ও দানশীলতার মাহাত্ম্য ও মর্যাদাও বর্ণনা করেছে, যাতে দানশীলতায় উদ্যোগী ও উৎসাহী হয় এবং মন-মানসিকতায় কোন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়।

দানশীলতায় প্রথম যুগের মুসলমানদের উদ্দীপনা

দান করার ব্যাপারে এতটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তরে দানশীলতা এত বেশি প্রিয় হয়ে ওঠেছিল– সঞ্চয় করে রাখাটা ততটা প্রিয় ও পছন্দীয় ছিল না। তাঁদের যথাসর্বস্ব দিয়ে দেয়াকেই তারা অধিক পছন্দ করতেন।

সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত ও উন্নতি হওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। তাঁর ব্যবসার অবস্থা এমন ছিল যে, রোম, শাম, মিসর সবখানে মাল রপ্তানি করা হতো। আর মুনাফা যা আসত, তার পরিমাণ ছিল এমন যে, তা গাঁট বেঁধে দু'চার ব্যক্তির পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না; বরং উটের পিঠে করে টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-চান্দি নিয়ে আসা হতো। পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, যথা স্থানে যখন সংকুলান না হতো, তখন অপরাগ হয়ে বলতেন– ঘরের কোণে স্তূপ করে রেখে দাও। মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত টাকা-পয়সা ও আশরফীর (স্বর্ণমুদ্রা) স্তূপ হয়ে যেত। এ-ই ছিল তাঁর ধন-সম্পদের অবস্থা। কোটি কোটি টাকার মালিক তিনি ছিলেন। অথচ তাঁর আচরণ ছিল এমন– তিনি প্রশ্ন করেন : আমিসহ যাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মুবারকে বায়াত হয়েছিলেন, অঙ্গীকার করেছিলেন– তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? উপস্থিত লোকেরা আরয করল, চৌদ্দশত। তারপর একটি বিশেষ পাত্র আনা হতো। আর পাত্রটি ভর্তি করে টাকা-পয়সা-আশরফী সাহাবায়ে কেরামের বাড়ি বাড়ি পাঠানো হতো এবং বলা হতো– এগুলো আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া, আপনি তা কবুল করুন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন– বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা কত ছিল? বলা হতো– তিনশ' তের-জন। তারপর এই তিনশ' তের-জন

সাহাবীর নিকট আশরাফী পাঠানো হতো আর বলা হতো– এ হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া। দেখা যেত, যাঁদের কাছে পাঠাতেন তাঁরা বলতেন– এত টাকা নিয়ে আমরা কি করব? ফলে তাঁরাও গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। ফলে টাকা-পয়সা একদিক থেকে আসছে, আর অন্যদিক দিয়ে তা বেরিয়ে যাচ্ছে।

মহিলাদের অন্তরে অর্থ-সম্পদের মহব্বত সবচে' বেশি থাকে। তা সত্ত্বেও সে সময় তাঁদের অন্তরে দানশীলতার আবেগ-উদ্দীপনা এতটাই সৃষ্টি হয়েছিল যে, সঞ্চয় ও কৃপণতার বদলে বরং দানশীলতাই তাঁদের নিকট প্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)। তিনি তাঁর খেলাফতকালে একটা থলি ভর্তি আশরাফী তাঁর খালাম্মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। থলেটি যখন পৌঁছল, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন– এত বেশি আশরাফী দিয়ে আমি কি করব? খাদেমা (দাসী)কে নির্দেশ দিলেন, এসব আশরাফী গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দাও। খাদেমা বণ্টন করতে শুরু করল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বণ্টন করার পর থলিতে দেয়া আশরাফী শেষ হলো। খাদেমা বলল– উম্মুল মুমিনীন! আপনি তিন দিন যাবত ক্ষুধার্ত, উপবাস; খাদ্যদ্রব্য কিছুই যোগাড় হয়নি। আপনি কিছু রেখে দিলে ভাল হতো। জবাবে তিনি বললেন– আরে বোকা, নির্বোধ! আগে মনে করে দাওনি কেন! দু'চার টাকা আমিও রেখে দিতাম। এবার ভাবুন, এ কথাটিও স্মরণে ছিল না যে, তিনি অনাহারে আছেন। দিন চলছে না খেয়ে। তাঁর ঘরে কিছুই নেই। অন্তরে এই পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা ও সন্তুষ্টি ছিল যে, নিজের ঘরে কিছু আছে কি না তা ভাবারও সময় ছিল না। দান-দক্ষিণা ও সাখাওয়াতের এমন আবেগ ও অনুভূতি সেই পবিত্র শিক্ষারই ফসল ও বরকত, যে শিক্ষা ও সাহায্যের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের স্বভাব-চরিত্র গঠন ও সংশোধন করেছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি সাখাওয়াতের সুফল ও কৃপণতার কুফল বর্ণনা করেছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) যখন সিরিয়া দখল করলেন এবং খেলাফতের সকল দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হলো তখন হযরত হাসান (রা.) বললেন– মুসলমানদের মাঝে আমি রক্তারক্তি চাই না। যদিও খেলাফতের অগ্রাধিকার আমার রয়েছে তবুও আমি আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে তা অর্পণ করলাম। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) জানতেন, হযরত হাসান (রা.)-এর অন্তরে অসাধারণ সাখাওয়াত ও দানশীলতা রয়েছে। তাই তিনি একটি সাদা কাগজে নিজে দস্তখত করে হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর অনুরোধ করে জানতে চাইলেন– তিনি বার্ষিক বা মাসিক যে পরিমাণ ইচ্ছা আশরাফী লিখে দিবেন সে পরিমাণই তাঁকে

দেয়া হবে। হযরত হাসান (রা.) ঐ কাগজে লিখে দিলেন– বার্ষিক এক লাখ টাকা দেয়া হোক। আর সে মোতাবেক তাঁকে দেয়া হলো। অথচ যখন তাঁর হাতে টাকা আসত, সে সময় থেকে তিনদিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যেত। গরীব-মিসকীন এবং এতিমদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন, খুশি হতেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) একথা শুনে লিখে পাঠালেন–

لا خير فى الاسراف

অপব্যয়ে কোন খায়ের কল্যাণ নেই। নিয়ম মাফিক দান করা উচিত। এক লাখ টাকা পেলেন, আর দু'তিন দিনের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। নিজে যা ছিলেন, তাই রয়ে গেলেন!

জবাবে হযরত ইমাম হাসান (রা.) লিখলেন–

لا اسراف فى الخير

খায়র কল্যাণের কাজে কোন অপব্যয় নেই, তা হয়ও না। আল্লাহ তায়ালার নামে যখন দান করি, তখন এক লাখ, দু'লাখ সবই সমান। এতে কোন ধরনের অপব্যয় নেই। এ-ই ছিল তাঁদের অবস্থা! আর এই ছিল মহব্বত ও তালিমের ফয়য। ইসলাম দান করার ব্যাপারে যেমন বিধান তৈরি করে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের আবেগ ও উৎসাহও সৃষ্টি করে দিয়েছে।

দান-দক্ষিণা মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

আর এ কারণেই মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রে সাখাওয়াত বা দানশীলতা বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি কৃপণ হতে পারে, তবে মুসলিম জাতির মধ্যে সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি নেই; বরং ব্যয় করার মানসিকতাই অধিক। ধনী-গরীব সবার মাঝে ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান রয়েছে। দান করার মন-মানসিকতা এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সকলের মধ্যেই রয়েছে। অথচ সঞ্চয় করে রাখার মানসিকতা কারো মধ্যে দেখা যায় না।

বিশেষ কোন ঘটনা যদি ঘটে যায়, কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা দেখা দেয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে জাতি হিসেবে জাতীয় এ মেজাযে, চরিত্রে ও মন-মানসিকতায় দানশীলতারই প্রাধান্য রয়েছে, কৃপণতার নয়। মেহমান ও অতিথির সেবা করার প্রয়োজন হলে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন এবং দান করার প্রয়োজন হলে তাতে কার্পণ্য করবেন না। অসহায় গরীবদের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন।

তাদের প্রতি নজরদারি করবেন। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায়, জাতীয় সত্তায় এমন দান-দক্ষিণার মন-মানসিকতা নেই। ব্যক্তিবিশেষ ধনবান কেউ বিরাট দানশীল হয়েছেন বটে, তবে মুসলমানদের মধ্যে নিঃস্ব গরীবরাও দাতা ও দানশীল। এ কারণে যে, ইসলাম তাদের মেজায ও মন-মানসিকতাকে দানশীল বানিয়ে দিয়েছে। আমীর, গরীব, ধনী-গরীব সকলেই দানশীল ও দাতা। এমনকি শ্রমজীবী, পেশাজীবী যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও দানশীলতার উৎসাহ-আবেগ বিদ্যমান ছিল।

মা'বুদ জুহানী প্রসিদ্ধ একজন গায়ক ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিলেন তিনি। খলিফা মনসুরের যুগে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর একবার গযল শুনানোর বায়না চল্লিশ হাজার টাকা ছিল। দাতা ও বিত্তশালীরা তাঁকে দান করতেন। রাজকীয় কোষাগার থেকে দৈনিক দশ হাজার টাকা তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত হোন অথবা নাই হোন, তার জন্য দৈনিক দশ হাজার টাকা বেতন নির্ধারিত ছিল। এবার হিসাব করুন, মাসে কত টাকা হবে? এছাড়া তাঁর রন্ধনশালার জন্য তিনটি খাসী নির্ধারিত ছিল– যার দুটি যবেহ করা এবং একটি জীবিত। তিনটি খাসী দৈনিক তাঁকে পৌঁছে দেয়া হতো। কেন দেয়া হতো? তিনি তো ছিলেন গায়ক। অথচ অতিথিপরায়ণ ও আপ্যায়নের এমনই অবস্থা ছিল যে, দৈনিক তিন শতাধিক মেহমান তাঁর দস্তরখানায় উপস্থিত থাকতেন। আমীর-উমরাহগণ আসতেন। কেউ বা আসতেন সঙ্গীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে, কেউ তাঁর মজলিসে আসতেন চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে। আর তিনি সবারই আদর-আপ্যায়ন ও মেহমানদারী করতেন। তার পুত্র বলেন, আমার পিতা এত মাল উপার্জন করেছেন যে, আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে স্বর্ণ-চান্দি দিয়ে প্রাসাদ তৈরি করে নিতে পারতাম। কিন্তু তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন নব্বই লাখ টাকা ঋণী ছিলেন, যা আমাকে পরিশোধ করতে হয়েছে। অতিথির সেবা, অসহায়-দরিদ্র ও এতিমদের জন্য তিনি সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। সঞ্চয় করে কিছুই রাখতেন না তিনি ঘরে।

ইসলাম নামের পরশ পাথরের ছোঁয়ায় একজন গায়ক ও শ্রমজীবী মানুষের এ অবস্থা হয়েছিল। এ তো কেবলই ইসলামী শিক্ষার প্রভাব, যা দান-দক্ষিণার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

একবার বাদশাহ আলমগীর কাশ্মীর ভ্রমণে গেলেন। অগ্রগামী সেনাদল বারো মাইল আগে ছিল। তারা গিয়ে সেখানে বাদশাহের জন্য শাহী তাঁবু তৈরি করবে। বাদশাহ সেখানে দু'তিন দিন অবস্থান করবেন। অগ্রগামী সেনাদল গিয়ে তাঁবু তৈরি করল। তাঁবু প্রস্তুতকারী দলের অফিসার ইনচার্জ বা অধিনায়কের নাম ছিল

মুনইম। সে সুন্দর জায়গা দেখে বাদশাহের জন্য তাঁবু প্রস্তুত করে রাখল। বাদশাহ আলমগীর চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিবসে সেখানে পৌঁছার কথা। এরই মধ্যে সকল ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে।

এক ভিখারী জানতে পারল, এটা হচ্ছে বাদশাহর জন্য নির্মিত তাঁবু। সে খবর নিয়ে জানল ইনচার্জ অফিসারের নাম মুনইম। সেখানে সে উপস্থিত হয়ে মধুর সুরে একটি কবিতা আবৃতি করল–

منعم بدست کوہ وبیاباں غریب نیست

ہر گاہ کہ رفتم خیم زد بارگاہ ساخت-

মুনইম (দানকারী) কোন অবস্থাতেই গরীব থাকেন না। যেখানেই যান শহর স্থাপিত হয়ে যায়। তাঁবু সামিয়ানা সবকিছু তাঁর ইচ্ছামাফিক তৈরি হয়ে যায়। মুনইমকে আল্লাহ তায়ালা এত সম্পদ ও দৌলত দান করেছেন– তিনি যদি পাহাড়ে আরোহণ করতেন, তবুও গরীব থাকতেন না, জঙ্গলে থাকলেও গরীব থাকতেন না। যেখানে গমন করেন তাঁবু প্রস্তুত হয়ে যায়, দরবার তৈরি হয়ে যায়।

এমন মধুর সুরে আবৃত্তি করল, ক্যাম্পের সকলেই তার কণ্ঠস্বর শোনে মুগ্ধ হলেন। মুনইমেরও তা খুবই পছন্দ হলো। আদেশ করলেন, ভিখারীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে তিনি তিন লাখ দিরহাম দান করলেন। একজন দরিদ্র ভিখারী এককালীন তিন লাখ টাকা পেয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলায় ঐ ভিখারী এসে আবার মধুর সুরে ঐ কবিতাটি আবৃতি করলো। অফিসার পুনরায় তিন লাখ টাকা দান করলেন। তৃতীয় দিন আবার আসল। সেদিনও তিন লাখা টাকা দান করলেন। তিন দিনে সে নয় লাখ টাকা পেয়ে গেল। চতুর্থ দিন সে আর আসেনি। মুনইম বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন, আর ভাবছিলেন, যদি সে আসে তাহলে তাকে আরো দান করব। কিন্তু সে আসেনি। আদেশ করলেন একে ধরে নিয়ে এসো। আজ সে আসেনি কেন? সৈন্যরা দ্রুত দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসল। মুনইম জিজ্ঞেস করল– তুমি আসনি কেন? তুমি খুবই বোকা! আমি এখানে দশ দিন অবস্থান করব। আমি ইচ্ছা করেছিলাম, পূর্ণ দশ দিন তোমাকে প্রত্যেহ তিন লাখ টাকা করে দান করব। তুমি খুবই নির্বোধ।

ভিখারী আরয করল– হুযুর! আমি তিন দিনে নয় লাখ টাকা পেয়েছি। এত বিরাট দৌলত আমার সাত পুরুষ (বংশধর)-এর জন্য যথেষ্ট। আমি মনে করেছি

আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। আর এ ধারণাও করেছি, আপনি সেনাপতি মানুষ। আবেগের বশে দান করে দিচ্ছেন। আবেগ কেটে গেলে হয়তো এ টাকাগুলো আবার ছিনিয়ে নিয়ে নিবেন। তখন আমার নিকট হয়তো এক কপর্দকও থাকবে না। এ কারণেই আমার মধ্যে তুষ্টি এসে গেছে। তাই আমি আসিনি। আমার জন্য যেহেতু যথেষ্ট হয়ে গেছে এবং ভয়ভীতিও ছিল– হয়তো পুনরায় নিয়ে নিতে পারেন, তাই আসিনি।

অফিসার বললেন– এটা হলো তোমার ভাবনা। আর আমি কিন্তু ইচ্ছা করেছিলাম দশ দিন প্রত্যেহ তোমাকে তিন লাখ টাকা করে দান করব।

একজন অফিসার, একজন গায়ক, একজন শ্রমিক আর একজন মহিলার মন-মানসিকতা ইসলাম এমনভাবে গঠন করেছিল, দানশীলতার ফযিলত ও মর্যাদা শুনিয়ে যে, কিভাবে ব্যয় করতে হয়। অথচ তাতে কোন ধরনের জোর-জবরদস্তি, বাধ্যবাধকতা ছিল না; বরং অন্তরের আবেগ-উদ্দীপনায় মানুষ দান করত। যদি জোর করে বাধ্যতামূলক করানো হতো, তাহলে মানুষ অসন্তুষ্ট হতো। এ আইনের আনুগত্য করে নিজের মাল-সম্পদ ধ্বংস করতে কেউ রাজী হতো না। একজন পরিশ্রম করবে, আর শ্রমলব্ধ সম্পদ জোর করে অন্যকে দিয়ে দেয়া হবে– এটা পছন্দ হতো না। এ কারণেই বাধ্য না করে অন্তরে এমন আবেগ-উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নিজেই খুশিমনে সন্তুষ্টচিত্তে দান করবে। আর যে অংশ বাধ্যগত ছিল যেমন- যাকাত, সদকা, ফিতরা এবং কোরবানী– এগুলোতে পরকালের এত ফযিলত ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছে যে, এসবও মানুষের অন্তরে উৎসাহ সহকারে দান করার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইসলাম আদেশ করল– তুমি এক সপ্তমাংশ কোরবানী কর। সে বলল– না, আমি সম্পূর্ণ উট কোরবানী করব। সাত অংশই আমার পক্ষ থেকে হবে; বরং এক এক ব্যক্তি একাধিক কোরবানীও করে থাকেন, যাতে গরীবরা উপকৃত হন। এ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যাতে একজন মুসলমান ধনবান বা বিত্তবান হলে সানন্দে দান করেন।

সম্পদ বণ্টনে ইসলাম ও কমিউনিজমের পার্থক্য

ইসলাম ও কমিউনিজমে পার্থক্য হলো– কমিউনিজমেও অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা জোর-জবরদস্তিমূলক, বলপূর্বক। ফলে এতে করে ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। বিত্তবানরা বলে, যে কোন মূল্যে এই গরীব ও নিঃস্বকে ধ্বংস করতে হবে। কারণ, আমার উপার্জিত সম্পদ সে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে গরীবরা বলে– এসব পুঁজিপতিকে শেষ করতে হবে– যারা আমাদের প্রাপ্যকে করায়ত্ত করে রেখেছে। একজন অপরজনকে ধ্বংস করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যে প্রবল হবে সে অন্যকে শেষ করে দিবে। অর্থাৎ এক পক্ষ সবল হলে দুর্বল পক্ষকে শেষ করে দিবে।

বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার সমস্যা আপনাদের সামনে রয়েছে। এক জায়গায় পুঁজিবাদ, অন্য জায়গায় সমাজবাদ। একে অপরকে ধ্বংস করতে সর্বদা ব্যস্ত। উভয়ের কাছেই আণবিক অস্ত্র রয়েছে। আমেরিকার ইচ্ছা, যদি তার সুযোগ হয়, তাহলে রাশিয়াকে শেষ করে দিবে। আর রাশিয়ার ইচ্ছা হচ্ছে, তার যদি সুযোগ হয়, তাহলে পৃথিবী থেকে আমেরিকাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিবে। একের প্রতি অন্যের মনোবাঞ্ছা এমনই। আর এটাই হলো সেই জোর-জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের ফল। অথচ ইসলাম এ দু'য়ের মধ্যবর্তী বা মধ্যপন্থা। ইসলামী আইন-কানুন যদি চালু হয়ে যায়, তাহলে এ দুয়ের মাঝে সন্ধি হতে পারে এবং এমন হবে না যে, একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে যাবে।

গরীবদের প্রতি ধনীদের দয়ালু বানিয়েছে ইসলাম

ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণ মধ্যপন্থী একটি ব্যবস্থা যা– মানুষকে দান-দক্ষিণায় উদ্বুদ্ধ করে আর এত বেশি উৎসাহিত করে যে, তারা চায়– গরীব-নিঃস্বদের ঘরে মাল-সম্পদ পৌঁছে যাক। তাই বলে সমান সমান করেনি; বরং সামঞ্জস্য বিধান করেছে এভাবে যে, ধনীদের কিছুটা নিচে নামিয়ে এনেছে। তোমার কাছে যদি এক লাখ টাকা থাকে তাহলে তুমি তোমার মনের আবেগ ও সন্তুষ্টিতে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দাও। তাতে করে ধনীকে কিছুটা নিচে নামানো এবং গরীবদের উপরে উঠানো হলো। তারা যাতে একেবারে চরম নিম্ন স্তরে অবস্থান না করেন। যাতে এমনটা মনে না করেন– আমাদের জন্মই হয়েছে ধনীদের জুতা ঠিক করে দেয়ার জন্য, দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করার জন্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– যুদ্ধবন্দী হয়ে যেসব গোলাম আসত, তাদেরকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার প্রাপকদের ছিল। এটা ছিল আইন। অথচ শিক্ষা দেয়া হলো এই–

خو لكم اخوانكم

এসব গোলাম তোমাদেরই ভাই। তোমরা যা আহার কর, তা তাদেরকে দাও, যা পরিধান কর, তেমনটাই তাদের পরতে দাও।

হাদীস শরীফে আরও বলা হয়েছে– 'কারো ভাগে যদি বাঁদী এসে যায়– বাঁদীদের নাম সাধারণত খারাপ হয়ে থাকে, তুচ্ছ ও হীন শব্দে নাম রাখা হয়। এ বাঁদীর গর্ভে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে ঐ সন্তানকেও মানুষ হেয় তুচ্ছ মনে করে। বলে– এ হচ্ছে বাঁদীর সন্তান, সমাজে বসার যোগ্য সে নয়। আর ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, যে ব্যক্তি বাঁদীকে সুশিক্ষা দান করবে, তরবিয়ত শিক্ষা দেবে এবং প্রয়োজনে শায়েস্তা করে তাকে ভদ্র বানিয়ে নিজেই বিয়ে করে নিবে, কেয়ামতের দিন তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।'

কিংবা বলেছেন– 'কোন ব্যক্তি যদি গোলামকে আযাদ ও মুক্ত করে দেয়, তাহলে সে এত বেশি সওয়াব পাবে, যেন সে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর থেকে একশ' গোলামকে মুক্ত করলো এবং নবীর বংশ ও খান্দানকে মুক্ত করে দিল।' এই হলো প্রতিদান। সে সময় এর ফল দাঁড়াল এই– জিহাদে যে পরিমাণ গোলাম আসত, তার চেয়েও বেশি মুক্ত হয়ে যেত। বেশির থেকে বেশি প্রতিদানের আশায় মানুষ গোলামদের মুক্ত করে দিত। তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতো। তারা নিজেরা যে খাবার গ্রহণ করত, তা গোলামদেরকেও খেতে দিত, আহার করাত। নিজেরা যে কাপড় পরিধান করত, একই কাপড় তাদেরকেও পরতে দিত। গোলাম মালিকের প্রতি আর মালিক গোলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেত। এর মাধ্যমে চমৎকার তমদ্দুন গড়ে উঠেছিল। ইসলাম গোলামদের ব্যাপারে এ জাতীয় শিক্ষাই প্রদান করেছে।

আর বাঁদী সম্পর্কে বলেছে– যে ব্যক্তি নিজ বাঁদীকে শিক্ষা দিল এবং সুশিক্ষা দিল, তাকে আদব শিক্ষা দিল এবং তাহযীব শিক্ষা দিল, উত্তম নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র গঠন করে দিল, তারপর নিজেই বিয়ে করে নিল, তাকে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বাঁদী ছিল। তাকে আযাদ করে সমান মর্যাদা প্রদান করলেন। আর বলেন, তাকে কেয়ামতের কঠিন দিনে দ্বিগুণ প্রতিদানে ভূষিত করা হবে। এই প্রতিদান লাভের আশায় হাজার হাজার মানুষ বাঁদীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তাহযীব-তমদ্দুনের মাকাম বাড়িয়ে নিজেরা বিয়ে করে নেয়। ফলে দেখা গেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে যত মহাজ্ঞানী আলেম ও বুযুর্গ হয়েছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ক্রীতদাস ছিলেন। সকলেই জিহাদের মাধ্যমে বন্দী অবস্থায় এসেছিলেন আর তাঁদেরকে আযাদ ও মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। হযরত হাসান বসরী (রহ.) গোলাম ছিলেন। তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। আর নিজের যোগ্যতা বলে তিনি মুসলমানদের ইমাম হয়ে গিয়েছিলেন। ওলী-দরবেশদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ওলী ও শায়খ ছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব

(রহ.)কেও ক্রীতদাস হিসেবে বন্দী করে আনা হয়েছিল। তাকে আযাদ করে সুশিক্ষা দেয়া হয়েছিল। ফলে তিনি অনেক বড় ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহও ক্রীতদাসদের মধ্যে একজন ছিলেন। অথচ বিখ্যাত ইমাম ও বুযুর্গ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি। সার কথা, এর ফলে তাঁরা সকলেই বিখ্যাত আলেম, ইমাম, মুহাদ্দিস ও ওলী-দরবেশ হয়েছিলেন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি বিভাগ-উপবিভাগে মুসলমানগণ তাঁদের থেকে দীনি ও দুনিয়াবী উপকরণ লাভ করেছেন এবং এখনও করছেন। ইসলামের সেই মহান শিক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ছিল সেসব। ইসলাম বিত্তবানদেরকে গরীবদের প্রতি এতটাই দয়ালু ও মেহেরবান বানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা অসহায়দেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দান করতেন, প্রাধান্য দিতেন, নিজেদের অর্জিত মুনাফার মাধ্যমে বিত্তহীনদের উপকৃত করতেন। আসলে জীবন ও আত্মা আল্লাহ তায়ালার দান। ফলে জানের প্রতি ইবাদত ফরয করা হয়েছে। অর্থ-সম্পদও আল্লাহ তায়ালার দান। তাই আর্থিক ইবাদতও ফরয করা হয়েছে। মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তিও আল্লাহ তায়ালারই দেয়া। সুতরাং মান-সম্মানেরও ইবাদত রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তায়ালার দরবারে জান-মাল, মান-সম্মান বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করব না। কেননা সবকিছু তো তাঁরই সম্পদ, তাঁরই অধীন। তাই তাঁর নামের ওপরই সব উৎসর্গ করে দাও।

ইসলাম ব্যয়ের খাত ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে

ইসলামের কথা হচ্ছে সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় কর। কৃপণতাও করো না আবার বেহুদা খরচও করো না। আজ আবেগের বশে সবকিছু যদি ঢেলে দাও, তাহলে আগামীকাল তো তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে। মানুষের কাছে হাত পাততে হয় এমন কিছু করো না। আবার এত কৃপণতাও করো না যে, হাতগুলো মুঠিবদ্ধ হয়ে যায়।

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا -

এত বেশি প্রশস্ত করো না যে, সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে আগামীকাল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিবে; আবার এতটা সংকীর্ণও হবে না যে, হাত থেকে যেন কিছুই বের হয় না। এর মাঝে মধ্য পথ যেটা রয়েছে, সেটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। দান-দক্ষিণাও কর, সঞ্চয়ও করে রাখ। তবে ব্যয় করতে হবে সঠিক স্থানে। তাহলে সত্তারও প্রতিদান লাভ হবে। ব্যয়ে সংকোচ করো না। তবে ব্যয় করার খাত যদি মন্দ হয় তাহলে কৃপণ হয়ে যাও, হাত গুটিয়ে রাখ। এমন খাতে ব্যয় না

করাই সর্বোত্তম কাজ। এখানে দান না করাই পুণ্যের কাজ। আপনি যদি নাটক-থিয়েটারে খরচ করেন, যা নাজায়েয, তাহলে সম্পদও ব্যয় হলো, আর মুনাফা হলো গুনাহ ও পাপ। দুনিয়া শেষ হলো, আখেরাতও ধ্বংস হলো। আর যদি আপনি এতিমদের কিংবা গরীবদের দান করেন, তাহলে সম্পদ নষ্ট হয় না; বরং দরিদ্রজন আপনার ভক্ত খাদেম ও সেবক হয়ে গেল। সে আপনার কাজে ও উপকারে আসবে। ফলে আপনি যেন আপনার ভাইকে দান করলেন। আর আপনার ঘরেই টাকা থেকে গেল। অধিকন্তু পরকালও পেয়ে গেলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মতো ব্যয় করলে ইহকাল ও পরকাল– উভয়টাই পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যয় করলে দুনিয়া যেমন ধ্বংস হয়, তেমনি পরকালও ধ্বংস হয়। ভুল ও ভ্রান্ত পথে ব্যয় করলে তা ভুলই হবে। আর তার ফলাফলও ভুল হবে, হতে বাধ্য।

হারাম অবৈধ মাল হারাম খাতেই ব্যয় হয়

কার্যত দেখা যায়, অবৈধ উপায়ে যে সম্পদ উপার্জন করা হয়, তা অবৈধ খাতেই ব্যয় হয়। আর যে সম্পদ জায়েয ও বৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও বৈধ পথেই ব্যয় হয়।

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন– ব্যয়ের খাত ও ব্যবহার দেখে মালের উৎস সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাও যে, কোথা থেকে কিভাবে উপার্জন করা হয়েছিল। খারাপ ও অবৈধ পথে যখন ব্যয় হতে দেখি, তখন আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, এ মাল অবৈধ পথে উপার্জন করা হয়েছিল। এজন্যেই হারাম পথে আসা সম্পদ হারাম স্থানেই ব্যয় হচ্ছে। তখন বুঝে যাই, নিশ্চয়ই উপার্জনও কোন নাজায়েয পদ্ধতিতে হয়েছিল। ফলে হারাম পথে আসা মাল মন্দ খাতে ও মন্দ পথেই ব্যয় হলো। যদি নির্ভেজাল হালাল উপার্জন হতো, তাহলে মন্দ ও অবৈধ খাতে খরচ হতো না। হালাল উপার্জন পরিমাণে কম হলেও দেহমন টের পেয়ে যায়, আত্মা আনন্দবোধ করে। আর তাতে পরকালও ঠিক হয়ে যায়। নাজায়েয উপার্জন অনেক হলেও আত্মা শান্তি লাভ করতে পারে না। দেহও সুখ অনুভব করতে পারে না। আর এ পথে অর্জিত সম্পদ অন্যের উপকারেও আসে না। সেটা নাজায়েয পথেই চলে যায়। সুতরাং জায়েয পথে ও পন্থায় যা উপার্জন করা হয়, সেই মালই কেবল উপকারী হবে।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রথম শর্ত হালাল খাবার

ইসলামে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের প্রথম শর্ত করা হয়েছে হালাল খাওয়া বা হালাল আহার। হারাম খাবারের দ্বারা কখনো আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ হয় না; বরং এতে তার নেককাজের তাওফিক কেড়ে নেয়া হয়। দেখা গেছে, যেসব লোক জায়েয উপার্জন ও হালাল মাল ব্যবহার করে, তাদের অন্তরে নূর ও আলো সৃষ্টি হয়। তাদের মনে নেককাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অবৈধ ও নাজায়েয উপার্জনের মাধ্যমে আহারকারীর সৎকাজের তাওফিক হয় না। বরং নাফরমানী কাজ করা এবং মন্দ ও খারাপ কাজে মন উদ্বুদ্ধ হয়। এ দুয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেওবন্দের এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁকে শাহজী আবদুল্লাহ বলা হতো। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। অথচ তিনি ছিলেন সাহেবে নিসবত, যিকির ও শুগুলে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। এ-ই ছিল তাঁর কাজ। জীবিকার জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, ঘাস কেটে বিক্রি করতেন। এক বোঝা ঘাসের মূল্য ছয় পয়সা নির্ধারিত ছিল। একটি পয়সাও কম নিতেন না। আবার বেশিও নিতেন না। দেওবন্দের মানুষের মানসিকতা এমন ছিল যে, যাদের পশুর জন্য ঘাস খরিদ করার প্রয়োজন হতো, তারা একটি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর অনেক পুরুষ-মহিলা ঘাস বিক্রি করত। তাদের ঘাসের বোঝা রয়ে যেত, কেউ নিত না। সকলেরই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকত, মনে বাসনা থাকত, শাহজীর ঘাসের বোঝা ক্রয় করবে। তাতে ঘরে বরকত হবে, পরিবারেও বরকত হবে। ফলে সকলেই অপেক্ষায় কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখন দেখতেন শাহজী বোঝা নিয়ে আসছেন, তখন সকলেই তাঁর দিকে দৌড়াতেন। সবার আগে যে ব্যক্তি ঘাসের বোঝা স্পর্শ করতে পারত, তার সামনেই শাহজী বোঝা রেখে দিতেন এবং বলতেন– নিয়ে যাও। সেই পেয়ে গেল। দাম ছয় পয়সা নির্ধারিত ছিল। বর্ষা, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম– সকল ঋতু ও সকল সময়ে একই দাম। এক পয়সাও কম-বেশ হবে না। আর এ ছয় পয়সার ব্যয়ের খাত ছিল এরূপ– দু'পয়সা তৎক্ষণাৎ সদকা করে দিতেন। সে যুগের পয়সায় পাওয়া যেত তামার তৈরি কয়েকটি টুকরা, যেগুলোকে মনসুরি পয়সা বলা হতো। এক পয়সায় কয়েকটি টুকরো পাওয়া যেত। দু'পয়সায় কয়েক খণ্ড তামা পেতেন আর তা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। আর দৈনিক তার পরিবারের জন্য দু'পয়সা ব্যয় করতেন। এক পয়সা দিয়ে আটা, একটু তেল ইত্যাদি ক্রয় করে নিতেন। মোট কথা, দু'পয়সার দিয়ে তাঁর পরিবারের প্রয়োজন মিটে যেত। আর অবশিষ্ট দুটি পয়সা প্রতিদিন সঞ্চয় করে রাখতেন। বছর শেষে ছয়-সাত টাকা জমে যেত। তখন সে টাকা খরচ করে আমাদের বুযুর্গানকে দাওয়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব, হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী সাহেব, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান সদর মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব। আর হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব যখন দারুল উলুমে তাশরিফ আনতেন, তখন তাঁকেও দাওয়াত করতেন।

আমার বুযুর্গদের কাছে শুনেছি, মাওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব সাহেব বলতেন– সারা বছর আমরা অপেক্ষা করতাম শাহজীর বাড়ি থেকে কখন দাওয়াত আসবে আর তাঁর ঘরে আমরা আহার করব। তিনি আরও বলতেন– যেদিন শাহজীর ঘরে আহার করতাম, সেদিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্তরে নূর অনুভূত হতো। নামায-রোযা, তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদত করার জন্য অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যেত। তাই সারা বছর আমরা এ দাওয়াতের জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। একবার শাহজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমি পীড়িত, অসুস্থ। ফলে আসতে পারছি না। দাওয়াতের জন্য সাতটি টাকা রয়েছে। আমার পক্ষ থেকে আপনি সব বুযুর্গকে দাওয়াত করে আহার করিয়ে দিন। এ টাকা যখন মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি প্রথমে গোসল করলেন, কাপড় পরিবর্তন করলেন, জায়গা পাক-পবিত্র করলেন। আর ঐ জায়গায় বসে নিজ হাতে খানা তৈরি করলেন এবং ঐসব বুযুর্গকে দাওয়াত করলেন। হালাল আহারের প্রতিক্রিয়ায় আত্মা আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়।

হালাল উপার্জনেই রয়েছে বরকত ও নূর

বর্তমানে আমাদের ইবাদতে কোন ধরনের কৈফিয়ত নেই, সবকিছু বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের উপার্জন নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত নয়। الا ما شاء الله! আল্লাহ তায়ালার হাজার হাজার ও লাখ লাখ বান্দা রয়েছেন। তাঁরা সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। হালাল উপায়ে উপার্জন করছেন। আমাদের অনেক ভাই এমন আছেন, এসব ব্যাপারে তাদের কোন পরোয়াই নেই। জায়েয হোক কিংবা নাজায়েয, পয়সার দরকার। পয়সার জন্য জীবনকে বিপদের মুখোমুখি করে দেন। অনেকে এমনও আছেন যারা টাকার জন্য ঈমান বিক্রি করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অথচ তাদের জেনে রাখা উচিত, এ ধরনের হারাম টাকায় বরকত হয় না। অবৈধ উপার্জন নিজের

জন্যও ক্ষতিকর হয়, কোন কোন সময় পুরো পরিবার ও খান্দানকেও ধ্বংস করে দেয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

ماخالطت الزكوة مالا قط الا اهلكته

যে মালে যাকাত মিশ্রিত থাকে, তা মূলধনসহ ধ্বংস হয়ে যায়।

যাকাত মিশ্রিত থাকা দু'ধরনের হতে পারে। এক প্রকার হলো, যাকাত ফরয হয়েছে আর তা আদায় করেনি। সেক্ষেত্রে কোন না কোন দিন মূলধন ধ্বংস ও বিনাশ হবেই, হওয়া অনিবার্য। দ্বিতীয় প্রকার হলো, গরীব ও অসহায়দের মাঝে বন্টন করে দেয়ার জন্য অন্য কেউ তার হাতে যাকাত প্রদান করল। কিন্তু ভাগ বন্টন না করে নিজেই তা পকেটস্থ করে নিল। অথচ সে নিজেও যথেষ্ট সামর্থবান। নিজের মালের সঙ্গে সে যাকাতকে মিশিয়ে নিল। সে ক্ষেত্রে এ যাকাত তার সমূহ মাল-সম্পদ ও মূলধনকে ধ্বংস করে দেবে– তাতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই।

সার কথা হলো, যে মাল ও সম্পদে যাকাত মিশে যাবে, সে যাকাত ধনবানদের সম্পদসহ ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ মাল ও সম্পদই রক্ষা পাবে, যা হালাল ও জায়েয পন্থায় উপার্জন করা হয়ে থাকে। এতে বরকতও হয়, আত্মায় নূর ও জ্যোতিও সৃষ্টি হয়। অবৈধ পথে উপার্জিত মাল যতই বেশি হোক না কেন, তা কোন উপকারে আসবে না। যাকাত আদায় করা ও না করার উদাহরণ হচ্ছে এমন– যাকাত যদি আদায় না করা হয় তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এক লাখ থেকে আড়াই হাজার টাকার যাকাত ব্যয় হতো। যাকাত আদায় না করলে এক লাখ পুরোটাই থেকে যাবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার টাকা কমে যাচ্ছে। তবে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর উদাহরণ হলো এমন– ধরা যাক, এক ব্যক্তি যে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জোলাপ গ্রহণ করল এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এ দুর্বলতা তার জন্যে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। কারণ, ক্ষতিকর পয়জনসমূহ বেরিয়ে আসছে। চার দিন পরই শক্তি এসে যাবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সুপুরুষ হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বর্তমানে শরীরের অবনতি হয়েছে, তবে কার্যত শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়েছে। দু'চার দিন পরই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। আর যদি যাকাত আদায় না করে, টাকা ব্যয় না করে, তাহলে তার উদাহরণ হলো এমন– যেমন শরীর ফুলে গেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুস্থ সবল পাহলোয়ান দেখাবে। তবে প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য

ভেঙে পড়বে। তেমনিভাবে যাকাত প্রদানের ফলে বাহ্যিক চোখে অর্থের ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়, তা এমন– যেমন জোলাপের কারণে শরীরিক ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয়। এ জোলাপ গ্রহণ না করার ফলে মঙ্গলের যে উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে এমন– যেমন শরীর ফুলে গেছে। আর তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষকে মোটাতাজাই দেখাবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভেতরে ভেতরে ধ্বংস হচ্ছে। এসব দৃশ্যমান সুস্থতা ও সবলতা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেসব উপাদান দ্বারা সত্যিকার অর্থে শরীর, স্বাস্থ্য-শক্তি ও নূর সৃষ্টি হয়, তাহলো হালাল ও বৈধ উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদ। কথা হলো– ইসলাম সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের খাত এবং নিয়মনীতি বর্ণনা করে দিয়েছে, নির্ধারিত করে দিয়েছে যে, এভাবে উপার্জন কর এবং এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার চাষাবাদ, শিল্প, কারিগরি, চাকরি-বাকরি প্রভৃতি করে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ঐসব পেশা গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছে, যেগুলোর মাধ্যমে সৃষ্টি জগত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণেই চুরি-ডাকাতিকে নিষেধ করেছে। সুদ-ঘুষ, লটারী-জুয়া থেকে নিষেধ করেছে। এগুলোতেও বাহ্যিক উন্নতি দৃশ্যমান বটে; তবে প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়, লয় ও ধ্বংসই টেনে আনে। সাধারণত দেখা যায়, সুদখোরদের ধন-সম্পদ প্রাথমিক অবস্থায় দ্রুত বাড়তে থাকে। তবে পরে যখন দেউলিয়া হয়ে লাল বাতি জ্বলতে থাকে, তখন অবস্থা এত করুণ হয় যে, সে পথের ভিখারী হয়ে যায়। আমাদের সমাজে এমন হাজারো উদাহরণ রয়েছে। অনেকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারাও গেছে। কেউ বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। এ ধরনের সম্পদ দীর্ঘায়ু হওয়ার বদলে মারাত্মক বিপর্যয় ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমত, অবৈধ উপায়ে উপার্জিত এসব ধন-সম্পদ মানুষ নিজেই ভক্ষণ করে। তবে যখন দেউলিয়া হয়ে যায়– গরীবদের খুব অল্পই দেয়া হয়ে থাকে– তখন নানা উপায় ও কারণ দেখিয়ে সরকার বা সরকারি কর্মচারীরা অনেক বেশি আদায় করে নেয়। এক্ষেত্রে হাজার হাজার টাকা রাতদিন ব্যয় হচ্ছে। হয়তো কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কিংবা কেউ ডাকাতি করে। সরকারও বসে নেই। করের ওপর কর ধার্য করে চলেছে। এখন তো এ ব্যক্তি পেরেশান হচ্ছে। এত কষ্ট করে উপার্জিত অর্থ তার অথচ অনভিপ্রেত পথে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে তার দুঃখ হতে থাকে। অথচ সম্পদ যদি বৈধ ও হালাল উপায়ে উপার্জন করা হয় এবং জায়েয ও সঠিক পন্থায় তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক পরিণতি সৃষ্টি হবে না। ইসলাম উপার্জন ও ব্যয় করা– উভয়টির দিক-নির্দেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। কাউকে আইনের বলে বাধ্য করেনি। আর যেটুকু বাধ্য করা হয়েছে তা অতি সামান্য,

অতি নগণ্য। এটুকু প্রদান করা খুবই সহজ। বরং ইসলাম নৈতিকতার প্রতি বেশি জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে লাখ লাখ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। যারা আইনগতভাবে যাকাত এবং ওয়াজিব সদকাসমূহ আদায় করে এবং এসবের পরও দান করে, আনন্দ উপভোগ ও অতিথির সেবা করে– আর এসব তো মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে অন্যদের জন্য নিদর্শন হয়ে আছে।

আল্লাহর পথে ব্যয়ে উৎসাহিত করার কুরআনী পদ্ধতি

আর এমনিভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক ইবাদত সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছে। যে জায়গায় ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেছে, তা এতই সুলভ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে প্রদান করেছে যে, তা শুনে দান করার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। বলা হয়েছে–

وانفقوا مما رزقناكم -

ঐ সম্পদ থেকে ব্যয় কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।

অর্থাৎ এ সম্পদ তোমরা সৃষ্টি করনি। এ সম্পদ তো আমারই সৃষ্ট, আমারই দানকৃত। এ থেকে ব্যয় করতে তোমাদের মনে দুঃখ হয় কেন? তোমাদের প্রাণ শিউরে উঠে কেন? আল্লাহ তায়ালা যদি এভাবে বলতেন– তোমাদের উপার্জিত সম্পদ দান করে দাও! তবেই না মানুষের দুঃখ হওয়ার কথা– উপার্জন করব আমি আর দান করে দিব অন্যকে। আর এ কারণেই এমন বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে– আমি যা দান করেছিলাম, তা থেকে দান কর। এতে মানুষ বুঝবে, সম্পদ তো আমার নয়; বরং তাঁরই। তিনি চাচ্ছেন, সুতরাং আমি দিয়ে দেই। যেমন- আপনি আপনার একটি বাচ্চাকে দু'টাকা দান করলেন। তারপর বললেন– বেটা! আমাকে দু'পয়সা দিয়ে দাও! স্পষ্ট কথা, বাচ্চা যে দু'পয়সা আপনাকে দান করবে, তা সে উপার্জন করেনি; বরং পিতাই তাকে দিয়েছিল। সুতরাং পিতাকে দু'পয়সা দিয়ে দেয়া তার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। বাচ্চা মনে করবে, আমার পিতা আমার কাছে চাচ্ছেন! তার সাহস, উৎসাহ বেড়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই দানকারী। তারপর বলছেন– আমি যা দিয়েছিলাম, তা থেকে আমাকেও কিছু পরিমাণ দান কর। এক্ষেত্রে দানকারীর মনে সংকোচ আসার কথা নয়। যেহেতু তিনিই মালিক, তিনিই দান করেছেন, আবার তিনিই তা থেকে কিছু চাচ্ছেন।

তুমি যখন চাওয়ার পর দিয়ে দিলে, তখন এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি; বরং বলেছেন–

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا

এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালাকে ধার দিবে? দুনিয়াতে ঋণের ওপর সুদকে হারাম করা হয়েছে। যে পরিমাণ ধার নিবে সে পরিমাণই দিবে। ঋণদাতা যদি অতিরিক্ত গ্রহণ করে তাহলে সুদ হবে– নাজায়েয হবে।

তবে আল্লাহ তায়ালা নিজে সুদ প্রদান করেন; বরং সুদের ওপর সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে প্রদান করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাহে দশ টাকা ব্যয় করেন, তাহলে তিনি দশে সত্তর পাবেন। এখানে ঋণের ওপর সুদ প্রদান করা হয়েছে। এর কারণ হলো– মানুষের মধ্যে সুদকে এ কারণে হারাম করা হয়েছে যে, তাদের উপার্জন সীমাবদ্ধ। উপার্জন যেহেতু খুবই সামান্য– এখানে দশ টাকা ঋণের বদলে যদি আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতার জন্য তা খুবই কষ্টকর হবে। তার তো সম্পদই ছিল সীমাবদ্ধ। এখন জুলুম করে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা যদি নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা কেমন করে দিবে?

আল্লাহ তায়ালার মাল-সম্পদ সীমাহীন। তাঁর কোষাগারে কখনো ঘাটতি হয় না! তাই নিজের ক্ষেত্রে তিনি সুদকে জায়েয ও বৈধ রেখেছেন, আর মানুষের জন্য করে দিয়েছেন নাজায়েয এবং হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مثل الذين ينفقون اموا لهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماة حبة والله يضاعف لمن يشاء -

যেসব ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের উদাহরণ এমন, যেন গমের একটি দানা মাটিতে বপন করা হলো। আর তাতে গমের চারা গজাল। তা থেকে সাতটি শাখা বের হয়ে প্রসারিত হলো।

দানা বপন করেছিল একটি আর উৎপন্ন হলো সাতটি। এর মানে দাঁড়াল– আপনি আল্লাহকে একটি দানা ধার দিয়েছিলেন। বিনিময়ে সাতশ' দানা উসুল করলেন। সাতশ' গুণ সুদ আল্লাহ আপনাকে দান করলেন। সাতশ'তেই শেষ নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি দিতে চান, তাহলে বাধা প্রদানকারী কে হতে পারবে? তিনি লাখ লাখ গুণ বেশি সুদ দিয়ে দিলেও তাঁর কোষাগারে ঘাটতি হবে না, অভাব দেখা দিবে না।

হাদীস শরীফে এসেছে– যদি কোন ব্যক্তি খেজুরের একটি দানা সদকা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি এ দানাকে লালন-পালন করব এবং এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, তোমাদের কারো কাছে যদি ঘোড়ার বাচ্চা থাকে, তুমি একে দুধপান করিয়ে লালন-পালন কর, কয়েক দিন পর এ বাচ্চাটিই ঘোড়া হয়ে যাবে। সওয়ারীর উপযোগী হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি একটি খেজুর সদকা করে, আমি এ খেজুরকে লালন-পালন করে উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য করে দেই। পরকালে যখন সওয়াবের বিশাল বিশাল স্তূপ দেখবে, তখন ঐ ব্যক্তি হয়রান হয়ে যাবে– আমি এমন কি সদকা করেছিলাম, যার বিনিময়ে পাহাড়তুল্য সওয়াব ও প্রতিদান দেয়া হচ্ছে! আল্লাহ তায়ালা বলবেন– তুমি এক দানা খেজুর সদকা করেছিলে। অথচ আমি তোমার ইখলাস ও আন্তরিকতার কারণে একে লালন-পালন করে পাহাড় সমান করে দিয়েছি। এবার ভাবুন, একটি পাহাড় হওয়ার জন্য কি পরিমাণ খেজুরের দানার দরকার হতে পারে। অথচ সে মাত্র একটি দানা সদকা করেছিল। আর বিনিময়ে কোটি কোটি দানার *সমপরিমাণ* প্রতিদান পেল। আল্লাহ তায়ালার কোষাগার থেকে সুদ প্রদানে চক্রবৃদ্ধি হারে করলেও ঘাটতি দেখা দেয় না। 'দুনিয়াতে এক, পরকালে সত্তর'– প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে। অর্থাৎ এখানে দশ, ওখানে সত্তর।

ঈমান ও আত্মার সান্ত্বনা কোটি কোটি রাজ্যের চেয়েও মূল্যবান

এর মাধ্যমে ইহকাল উন্নত এবং সমৃদ্ধ হয়ে যায়। আর পরকাল তো যথাস্থানে আছেই। আসলে আল্লাহর রাস্তায় দানকারী বঞ্চিত হয় না কখনও। সাময়িকভাবে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, দান করার বিনিময়ে কিছু পায়নি; তথাপি অন্তরে যে ঈমান ও সান্ত্বনার সম্পদ লাভ করে, তার কাছে ঈমান ও হৃদয়ের সান্ত্বনা দুনিয়ার কোটি কোটি রাজ্য থেকেও শ্রেয়– যা তার হৃদয়ে দান করা হয়। একজন বুযুর্গ পথ চলছিলেন। বুযুর্গদের স্বভাবই এমন হয়ে থাকে যে, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাদের তেমন কোন মনোযোগই থাকে না। সামনে যা পেলেন তা-ই পরে ফেললেন। কখনও বা রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আবার কখনও বা পুরাতন ছেঁড়াফাড়া পোশাক। ঐ বুযুর্গ যাচ্ছিলেন পুরনো পোশাক পরিধান করে। পথিমধ্যে একটি শহর পড়ল। শহরের সকল দরজা বন্ধ। হাজার হাজার যানবাহন, গাড়ি প্রবেশের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা দরকার অথচ সব গেট বন্ধ। তিনি লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! সব দরজা বন্ধ কেন? লোকেরা বলল, এ শহরের যিনি

বাদশাহ, তার একটি বাজ হারিয়ে গেছে। বাজ হচ্ছে একটি পাখি। এর দ্বারা ছোট ছোট পাখি শিকার করা হয়। সে বাজপাখিটি হারিয়ে গেছে। এ কারণে বাদশাহ আদেশ করেছেন– শহরের সকল দরজা বন্ধ করে দাও এবং বাজপাখিটির সন্ধান করে ধরে নিয়ে এসো।

বুযুর্গ এসব কথা শুনে বললেন– এ দেখছি অনেক বড় নির্বোধ বাদশাহ! দরজা বন্ধ করা না করার সঙ্গে পাখির সম্পর্ক কি! সে তো উড়ে চলে যাবে। তার তো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার কোন দরকার নেই। বাদশাহ এত বোকা ও নির্বোধ! পাখি যদি ধরে রাখারই ইচ্ছা ছিল, তাহলে জাল দিয়ে ওপরের দিক বন্ধ করা উচিত ছিল। যে পাখি উড়ে যেতে পারে, দরজা বন্ধ করায় তাতে কোন লাভ হবে না। বুযুর্গ আরও বললেন– হে আল্লাহ! আপনার আজব কুদরত! এমন পশুমূর্খকে আপনি বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন– যার এ কথাটিও বুঝার ক্ষমতা ও বুদ্ধি নেই যে, বাজপাখি আটকে রাখতে হলে প্রয়োজন জালের, শহরের দরজাগুলো বন্ধ করার কোন দরকার ছিল না। অথচ আমার মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আপনি ভিখারী বানিয়ে রেখেছেন? জুতা নিয়ে ঘুরছি অথচ কেউ জিজ্ঞেসও করছে না। আপনার কুদরত কতই না বিস্ময়কর! আপনার নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধের বাইরে। এমন নির্বোধ-বোকাকে রাজত্ব দান করেছেন। অথচ জুতা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে।

এ বুযুর্গের অন্তরে এ কল্পনা কেবল এসেছে, অমনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইলহাম আসল– তাহলে কি তুমি এর জন্য প্রস্তুত যে, তোমার অন্তরে যা রয়েছে অর্থাৎ তোমার ঈমানের দৌলত ঐ বাদশাহকে দান করা হোক আর বাদশাহর রাজত্ব তোমাকে দান করা হোক?

ইলহাম আসার সঙ্গে সঙ্গে বুযুর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আরয করলেন– হে আল্লাহ! আমি ঈমান দিয়ে দিতে রাজী নই। আল্লাহ তায়ালা বললেন– তোমাকে এত বড় মহাদৌলত দান করেছি তবুও তুমি নিজেকে ভিখারী মনে করেছ? যাদের নিকট পার্থিব ধন-সম্পদ রয়েছে, এসব তো কালই শেষ হয়ে যাবে। আর যাদের নিকট ঈমানের দৌলত রয়েছে– এটা এমন মহান এক সম্পদ যা চিরকাল থাকবে, সঙ্গে থাকবে। সুতরাং তোমাকে চিরস্থায়ী দৌলত ও সম্পদ দান করেছি। আর তাকে দিয়েছি ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। তুমি চিরস্থায়ী ধন-সম্পদের কদর করোনি, মর্যাদা দাওনি।

অতঃপর ঐ বুযুর্গ তাওবা করলেন এবং বললেন– হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দাও। সত্যিই আমাকে তুমি অত্যন্ত বিত্তবান ও

সম্পদশালী বানিয়েছো! যার নিকট ঈমানের সম্পদ রয়েছে, তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী আর কেউ হতে পারে না। এ সম্পদ তো পরকালেও সঙ্গে থাকবে। কোন মুসলমান যদি পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে, তাহলে তার শুকর আদায় করা উচিত এ কারণে যে, ঈমানের দৌলত ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আমাকে পার্থিব সম্পদও দান করেছেন।

পার্থিব সম্পদ লাভ হয় খেদমতের বিনিময়ে অধিকার হিসেবে নয়

আমি বলতে চাই, দুনিয়াতে যেসব সম্পদ রয়েছে, সেসবের অধিকারী মুসলমানগণ একেবারেই নন। এসব সম্পদ কেবলই কাফের-মুশরেকদের প্রাপ্য, তাদের অধিকার। কারণ আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। সবকিছু তাদেরকে দুনিয়াতে দেয়া হয়। এটা তো বড় অন্যায় কথা হবে, একজন মুসলমান বলবে– আমাকে আখেরাতও দান করা হোক, আবার দুনিয়াও। অথচ অসহায় কাফের কিছুই পাবে না! অপরকে বঞ্চিত করা, তার অধিকার হরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। মুসলমানরা যেসব ধন-সম্পদ লাভ করে, তা খেদমত ও সেবার প্রতিদান হিসেবে লাভ করে। মুসলমান যদি জেহাদ করে, তাহলে রাজত্ব লাভ করবে। চেষ্টা পরিশ্রম করলে ধন-সম্পদ লাভ করবে। মোদ্দা কথা, মুসলমানগণ পার্থিব যে ধন-সম্পদ লাভ করে, তা সবই খেদমতের প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হয়। তাদের প্রাপ্য এসব নয়। আর কাফেরদেরকে খেদমতের বিনিময়ে পার্থিব ধন-সম্পদ দেয়া হয় না। এটা তাদের প্রাপ্য। তাদের অধিকার। এ কারণে যে, এরপর তাদের জন্য আর কিছুই নেই। এটা তো খুবই জুলুমের কথা হবে যে, আপনি কামনা করবেন– তার ইহকালীন ধন-সম্পদও আমার হয়ে যাক।

তাছাড়া এটাও আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী যে, মুসলমানগণ যদি খেদমত করে, তাহলে তাদেরকেও পার্থিব ধন-দৌলত দান করেন। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই ধন-সম্পদ নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো পরকাল। আর মুসলমানদের জন্য পার্থিব ধন-সম্পদও পরকালের সুখ লাভের উপলক্ষ মাত্র।

একটি বিশেষ ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইলার ঘটনাকালে (একমাত্র স্ত্রী হতে দূরে সরে থাকার সংকল্প) তাঁর আজয়াযে মুতাহহারা খাদ্য-বস্ত্র বাড়িয়ে দেয়ার দাবি

করেছিলেন আর তাঁকে ঘেরাও করে বসেছিলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন ব্যথিত হলো। তিনি তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওপরের একটি কামরায় নির্জনে চলে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর নূরানী চেহারা মুবারকে খুশি-আনন্দের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি। আমার পরিবারবর্গ আমার নিকট মাল-সম্পদ চাইবে! ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপরে গিয়ে একা নির্জনে বসে থাকলেন। হযরাতে সাহাবায়ে কেরামও সকলে পেরেশান ছিলেন। ফারুকে আযম হযরত উমর (রা.) ওপরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। ওপরে ছোট একটি কামরা ছিল। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে ছিলেন যে, একখানা চাটাই বিছানো ছিল। এ কামরার সর্বমোট সামান ছিল এই– একখানা চাটাই যার ওপর তিনি শয়ন করতেন। চামড়ার একখানা ছোট পাত্র– এর মধ্যে সামান্য যব ছিল। মোট কথা সব মিলিয়ে এ-ই ছিল সামান। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর আগমনে উঠে বসলেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোমর মুবারকের আশপাশে চাটাইয়ের দাগ লেগে গিয়েছিল। অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! কায়সার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাট)– তারা বাদশাহ। তাদের রয়েছে মসনদ, নরম মোলায়েম বিছানা। তারা অবস্থান করছে রাজ-প্রাসাদে। আর আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল। অথচ আপনার অবস্থা এমনই করুণ যে, শরীর মুবারকে চাটাইয়ের দাগ ও চিহ্ন লেগে গেছে! বিছানোর জন্য একটি বিছানাও জুটছে না! ফারুকে আযম হযরত উমর (রা.)-এর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

او فى هذا انت يا ابن الخطاب

হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও আশ্চর্যান্বিত হয়ে রয়েছ?

او لئك قوم عجلت لهم طيبا تهم فى الحيواة الدنيا -

তুমি কায়সার-কিসরার নামোল্লেখ করেছ, অথচ তাদের জন্য পরকালে কিছুই রাখা হয়নি!

কিন্তু তোমার অন্তরে ইল্‌ম, ঈমান এবং দীনের অমূল্য সম্পদ রয়েছে। তারপরও তোমার অন্তরে লোভ-লালসা দেখা দিল– ঐসব জাতির প্রতি যাদের জন্য পরকালে কিছুই নেই?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ জাতীয় লোভ ও লালসা ঠিক নয়; বরং শুকর আদায় করা কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যদি পার্থিব সম্পদ দান করেন, তাহলে শুকর আদায় করবে। যদি দান নাও করেন তবুও দরিদ্র নয়, সে সম্পদশালী। মহামূল্যবান সম্পদ ও দৌলত লাভ করেছে।

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক কেবলই দাসত্বের

এ জন্যেই বলছি, জান-প্রাণও যেহেতু দানকৃত, রূহও তাঁরই দানকৃত, মাল সম্পদও তাঁরই দেয়া। এ সকল জিনিস কেবল দানই করেননি; বরং তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এসবের প্রকৃত মালিকও বটে তিনি। তিনিই যেহেতু সৃষ্টি করেছেন, তাই এসব জিনিস তাঁর নির্দেশানুযায়ীই উৎসর্গ করতে হবে, বিলিয়ে দিতে হবে, আর ব্যয় করতে হবে অকাতরে মুক্ত হস্তে। তিনিই যেহেতু সত্যিকার মালিক। তিনি যদি এমন আদেশ করেন– সর্বস্ব বিলিয়ে দাও। তাহলে বিলিয়ে দেয়াই উচিত। তিনি যদি আদেশ করেন– প্রাণ কুরবান করে দাও, তাহলে কুরবান করে দেয়াই উচিত। যদি বলেন– সাবধান! প্রাণ কুরবান করো না, তাহলে থেমে যাওয়া উচিত। আসলে এরই নাম ইবাদত। একমাত্র আনুগত্য করবে, যা আদেশ করা হয়, সে অনুযায়ী কাজ কর। আর এটাই হলো ইবাদত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা এটাই মনে করি যে, নামায, রোযা, যাকাত আর হজ পালন করাই বুঝি ইবাদত। আসলে এসব মূল ইবাদত নয়। এসব হলো আংশিক বা খণ্ডিত ইবাদত। ইবাদতের নমুনা মাত্র। ইবাদত হলো বিনাবাক্যে নির্দেশ মেনে নেয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুগত্য প্রকাশ করা। আল্লাহ তায়ালা যদি বলেন– নামায পড়, তাহলে নামায পড়াই ইবাদত হবে। আর যদি বলেন– পড়ো না, তখন নামায ত্যাগ করাই ইবাদত বলে গণ্য হবে। এরপরও যদি কেউ নামায পড়ে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। মুয়ায্যিন পাঁচ ওয়াক্ত ঘোষণা করে– 'নামায পড়ো!' নামায পড়া ইবাদত। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া হবে। তিনটি সময়ে নামায পড়া হারাম– যখন সূর্য উদয় হয়, অস্ত যায় আর দুপুরবেলা সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে। এ তিন সময়ে নামায পড়া হারাম। যদি কেউ পড়ে তাহলে কবুল করা হবে না। ফলে বুঝা গেল, নামায পড়া এবং নামায না পড়া কোনটাই ইবাদত নয়; বরং আদেশ মেনে নেয়াই হলো ইবাদত। যখন বলা হয়, তখন পড়ো; আর যখন নিষেধ করা হয়, তখন বিরত থাক। আর এটাই হলো ইবাদত এবং বান্দার কাজও তাই।

পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। কেউ যদি রোযা না রাখে তাহলে শক্ত গুনাহগার হবে। কিন্তু ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদের দিন রোযা রাখলে গুনাহ হবে। ফলে বুঝা গেল, রোযা রাখা বা না রাখাটা ইবাদত নয়। বরং নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে ইবাদত। আত্মহত্যা করা হারাম। নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়ার অধিকার কারো নেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি আদেশ করেন– জেহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে যাও, তাহলে সেটা হয়ে গেল মহা-ইবাদত। সুতরাং বুঝা গেল, জীবন রক্ষা করা বা বিসর্জন দেয়া কোনটাই ইবাদত নয়; বরং আদেশ পালন করাই হচ্ছে ইবাদত। যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন জান দিয়ে দাও, তখন তা ইবাদত; আর যখন বলেন, কখনো জান দিও না, তখন না দেয়া এবং হেফাযত করাটাই ইবাদত। এ অবস্থা মাল ও সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি বলেন, সাবধান! এ খাতে ব্যয় করো না, এটা খুবই মন্দ খাত, অত্যন্ত খারাপ খাত, তখন কৃপণ হয়ে যাওয়া, মাল সংরক্ষণ করাটাই ইবাদত। আর যদি বলেন, ব্যয় করো, তাহলে ব্যয় করাটাই ইবাদত। মানে দাঁড়াচ্ছে এই– মানুষ তার জানপ্রাণ, মাল-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, শক্তি-সামর্থ সর্বক্ষেত্রেই বান্দা। আর বান্দা তো একথা জানে যে, তার কর্তব্য হলো মালিক যা বলবেন, তা পালন করা। নিজের ইচ্ছা মতো বা আপন মর্জি মোতাবেক কিছুই করবে না। জনৈক ব্যক্তি এক গোলামকে জিজ্ঞেস করল– তুমি কি খাবে? সে বলল– মালিক যা খাওয়ান। কি পরিধান করবে? যা মালিক পরিধান করতে দিবেন। কি কাজ করবে? মালিক যে কাজ করাবেন। সে বলল– তোমার কি কোন মর্জি বা পছন্দ আছে? সে উত্তর দিল– আমার যদি কোন ইচ্ছা ও মর্জিই থাকত তাহলে আমি গোলাম হবো কেন? মালিকই তো হয়ে যেতাম। আমার গোলাম হওয়ার অর্থই হচ্ছে– আমার মর্জি, আমার ইচ্ছা, আমার কামনা-বাসনা সবই গোলাম। আর গোলাম হওয়ার অর্থ এটাই। এসব জিনিস যদি আমার ইচ্ছাধীন হতো, তাহলে আমি মনিবই হতাম, গোলাম হতাম না। একজন মানুষ অপর মানুষের গোলাম হয়ে যায়, অথচ তাকে সে সৃষ্টি করেনি, খাদ্যদ্রব্যও দান করেনি। সামান্য একটা সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হলো, সে তাকে কিনে এনেছে। ফলে সে গোলাম হয়ে গেছে। তার অবস্থা এখন এমন– মনিবের মর্জির বাইরে তার নিজের কোন ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা কিছুই নেই। অথচ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি সৃষ্টি করেছেন, জান দিয়েছেন, রূপ দিয়েছেন, প্রতিটি জিনিসের মালিক তিনি। তাঁর বন্দেগী করার আদেশও তিনি করেছেন, তবুও বন্দেগীর পরিপন্থী কাজ করছে সে। এক্ষেত্রে তো অবস্থা এমন হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের মর্জি, ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই আল্লাহর

গোলাম হয়ে থাকবে। অথচ মানুষ মনিব সাজতে চায়। যদি শরীয়তের কোন নির্দেশ আসে, তাহলে সে সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলে– এমন না হওয়া উচিত, মায়াযাল্লাহ! যেন আল্লাহ তায়ালা তার! আর সে হলো বরণীয় মতবূ। আল্লাহ ও রাসূলকে সে তার মর্জি মতে চালাতে চায়। এর চেয়ে বড় গোস্তাখী আর কি হতে পারে? বান্দা তো এজন্য এসেছে যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্জির ওপর জীবন যাপন করবে। এমনটা ছিল না যে, নিজের মর্জি মতো আল্লাহ ও রাসূলকে চালানোর চেষ্টা করবে। দীনের ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করে। বলে– এভাবে নয়, ঐভাবে হওয়া উচিত। যেন সে নিজেই সর্বেসর্বা। শরীয়ত তার পরামর্শ ও প্রস্তাবে তৈরি হবে, গঠিত হবে। এর অর্থ তো এমন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যখন দীন নাযিল করছিলেন, তখন আমাদের নিয়ে পরামর্শ করা উচিত ছিল– কি আদেশ করবেন, কি না করবেন। এটা কত বড় গোস্তাখী ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা! আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কেবল *বন্দেগীর সম্পর্ক* থাকবে। বান্দা তার নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা সব নিয়ে গোলাম হয়ে থাকবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)কে বলা হয়েছিল–

اذ قال له ربه اسلم

যখন, আল্লাহ বললেন– হে ইবরাহীম! মুসলমান হয়ে যাও।

এর অর্থ এটা ছিল না যে, তখন পর্যন্ত তিনি মুসলমান ছিলেন না, এখন হতে যাচ্ছেন। বরং ইসলামের অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ হে ইবরাহীম! নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ কর। তোমার মধ্যে আমি আমার ইচ্ছানুসারে কাজকর্ম করব। তোমার বলার কিছু থাকবে না। মৃতদেহ গোসল দানকারীর হাতে থাকে। কোন প্রকার শক্তি বা ইচ্ছা মৃতদেহের থাকে না। লাশকে যে দিক ইচ্ছা সেদিক ঘুরাচ্ছে। গোসল দানকারীকে মৃতদেহ এ কথা বলে না যে, আমাকে এ দিকে ঘুরাচ্ছ কেন? এভাবে মানুষ শরীয়তের হাতে মৃতদেহের ন্যায় হয়ে যাবে। শরীয়ত যে দিকে যেভাবে ঘুরাবে বিনা বাক্যব্যয়ে সে মোতাবেক আমল করে যাবে।

কোন লোক যদি সরকারী চাকরি গ্রহণ করে তাহলে সরকারি নির্দেশ অমান্য করার বা কোন কিছু বলার শক্তি তার থাকে না। সে সুযোগ তাকে দেয়া হয় না। কেউ যদি সামান্যতম অবাধ্যতা করে, তাহলে সরকার তাকে কাজে বাধ্য করার অধিকার রাখে, ক্ষমতা রাখে। সরকারি অর্ডার এমনই হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তায়ালার অর্ডার যখন আসে, তখন সেখানে মতামত ব্যক্ত করা হবে যে, এমন

নির্দেশ দেয়া হলো কেন? এমনটা করা হলো না কেন? এসবই ভুল ও ভ্রান্ত পথ যা করা কখনোই উচিত নয়। সার কথা, জান-প্রাণ, মাল-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু সবই আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও মাখলুকের কাজ হলো মালিক ও স্রষ্টার সামনে মাথা নত করে দেয়া। অর্থাৎ বিনা শর্তে আনুগত্য ও মাথা নত করার নামই হচ্ছে ইবাদত। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আমি জিন এবং মানব জাতিকে শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

দুনিয়াতে খোদায়ী দাবি করার জন্যে সৃষ্টি করিনি; বরং বন্দেগী ও দাসত্ব করার জন্যে প্রেরণ করেছি। আল্লাহর কাজের জন্য আল্লাহই রয়েছেন। আমাদেরকে কেবল দাসত্ব ও বন্দেগী করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আর বন্দেগীর অর্থ হলো, বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর অনুগত্য করা। আমাদের সাহারানপুর জেলার নিকটবর্তী জেলা হচ্ছে পাঞ্জাবের আমবালা। সে জেলায় আবদুল্লাহপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সে গ্রামে তাওয়াক্কুল শাহ সাহেব নামে একজন শীর্ষস্থানীয় আরেফ ও কামেল ওলী ছিলেন। সাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন তিনি। যমুনা নদীর পাড়ে এক গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। একবার বর্ষাকালে যমুনা নদীতে বন্যা দেখা দিল। বন্যা এত মারাত্মক রূপ ধারণ করলো যে, গ্রাম রক্ষার জন্য যে বাঁধ ছিল, তাও হুমকির সম্মুখীন হলো। আর হাত খানেক পানি বেড়ে গেলেই সম্পূর্ণ গ্রাম পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সে গ্রামে শাহ দৌলা সাহেব নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাওয়াক্কুল শাহ সাহেবের মুরীদ ছিলেন। মানুষ যখন দেখল পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং গ্রাম রক্ষাকারী বাঁধ যদি ভেঙে যায় তাহলে গ্রামবাসীর রক্ষা নেই, মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিবে, তখন সকলে সমবেত হয়ে দৌলা শাহ সাহেবের নিকট গেল এবং আরয করল– হুযুর দোয়া করুন! যমুনা নদীর পানি বেড়ে যাচ্ছে– এমন যেন না হয় যে, সম্পূর্ণ গ্রাম পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়! সামান্য একটি প্রাচীর রয়েছে। এর ফলে পানি প্রবেশ আটকে আছে।

শাহ সাহেব বললেন– আচ্ছা, পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে?

লোকজন বলল– হ্যাঁ হযরত!

: তাহলে আমার সঙ্গে কুড়াল হাতে নিয়ে সবাই চল।

কুড়াল আনা হলো। শাহ দৌলা কুড়াল হাতে নিলেন এবং সবার আগে আগে চলতে লাগলেন। তাঁর পেছনে গ্রামবাসী সবাই। যে বাঁধ দাঁড়নো ছিল, যার মাধ্যমে গ্রাম রক্ষা পাচ্ছিল, শাহ দৌলা ঐ প্রাচীর ভাঙতে শুরু করলেন। ফলে পানিও ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করল। গ্রামবাসী তো অবাক! বলতে লাগল, হযরত! এ কি করলেন? এই প্রাচীরের মাধ্যমে গ্রাম রক্ষা পাচ্ছে। আর প্রাচীর ভেঙে দিলে তো আমরা পানিতে ডুবে মরব।

তিনি বললেন– যে দিকে মাওলা, সে দিকেই শাহ দৌলা। নির্বোধের দল! তোমরা আমাকে এজন্য এনেছিলে যে, আমি আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা করব? তিনি চাচ্ছেন গ্রাম ডুবে যাক। তাই আমিও চাচ্ছি গ্রাম ডুবে যাক। আমি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মোকাবেলা করতে আসিনি। আমি আল্লাহর আনুগত্য করতে এসেছি। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এ গ্রাম ডুবে যাক। তাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াই উচিত।

জনৈক বুযুর্গকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল– আপনার অবস্থা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি জিজ্ঞেস করছ, যার মর্জির ওপর উভয় জগতের সকল কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে! সে তখন বলল– তা হলে আপনি ঐ স্তর ও মর্যাদায় রয়েছেন? তিনি বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঐ স্তরেই রয়েছি। সে বলল, এটা কেমন করে হতে পারে? বললেন– এভাবে হতে পারে যে, উভয় জগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার মর্জির মতো চলছে। আর আমি আমার মর্জিকে আল্লাহর মর্জির ওপর ফানা ও বিলীন করে দিয়েছি। ফলে আল্লাহর মর্জি যা, আমার মর্জিও তাই। সুতরাং বিশ্বের যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার কোনটাই আমার মর্জির বিরুদ্ধে হচ্ছে না। কেউ যদি জন্মগ্রহণ করে, আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ! তার জন্মগ্রহণ করাই উচিত ছিল। আর কেউ যদি মারা যায় তবুও আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ! তার মারা যাওয়াই উচিত ছিল। আমি কে যে, আল্লাহর মোকাবেলা করব! তিনি মৃত্যু দান করবেন আর আমি বলব, মৃত্যুর আগমন উচিত হয়নি। মানুষ এসেছে বন্দেগী ও অনুগত্যের জন্যে। আর বন্দেগীর অর্থ হলো যা আল্লাহর মর্জি, তা আমারও মর্জি। আল্লাহর মর্জিই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রকৃত বান্দা হলো, যে নিজের মর্জি আল্লাহর মর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছে। একথাই বলা হয়েছে–

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

এখানে কেবলমাত্র জান-প্রাণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে মাল-সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করলাম। এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন ধন-সম্পদ দান

করেছেন তখন ধন-সম্পদের হক ও বিধি-বিধান জানাটাও কর্তব্য। ধন-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে, গরীব-দুঃখীদের অবস্থা, তাদের হক ও অধিকার জেনে নেয়াও কর্তব্য। গরীব-দুঃখীরাও আমাদের ভাই। তারা ভিন্ন কেউ নয়। অনেক মুসলমান গরীব-দুঃখী রয়েছে। সকলের অবস্থা সমান নয়। তাই তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য।

সম্মিলিতভাবে গরীবদের সেবা করা উচিত

এটাও এক ধরনের সহায়তা যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি দান-দিক্ষণা করলেন। আপনি একটা ইবাদত ও সওয়াবের কাজ করলেন। নিশ্চয়ই যে কোন গরীবকে আপনি দান করেন, তা ইবাদত হলো। যাকাত দিন, সদকা দিন– সবই ভাল। তবে সম্মিলিতভাবে যদি দান করেন, ফান্ড গঠন করেন, যেখানে লাখ লাখ টাকা জমা থাকবে। অনেক অনুন্নত দরিদ্রের জন্য ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা হবে। অনেক ভিখারী থাকে, যাদের খানাপিনার কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগানো যায়, কারবারে লাগিয়ে দেয়া যায়। তখন নিজের কাজ চালিয়ে নিয়ে সে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। ভারতে এমন অনেক গ্রাম রয়েছে, যেখানে তারা ফান্ড গঠন করেছে এবং এ ফান্ড থেকে গরীবদের ঋণ দেয়া হচ্ছে। আগের দিনে মানুষের লাখ লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। সবই সুদের মধ্যে গেছে। তাই মুসলমানের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিলেন, তারা ফান্ড গঠন করতেন এবং সুদমুক্ত ঋণ দিতেন। তাতে কিছু জামানত ও দলিলপত্র করার দরকার হয়। এই শুভ ফলশ্রুতিতে শত-সহস্র মানুষ স্বনির্ভর হয়ে গেছে। শত অভাব ও অনটনে যারা জীবনযাপন করতো, তাদের অনেকেরই দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়ে গেছে।

যাকাত ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা হয়। এটা করা অবশ্য জরুরী ফরয ও ইবাদত বটে। এতে সওয়াব ও প্রতিদান দেয়া হবে। তবে সম্মিলিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে ফান্ড গঠন করে যদি দেয়া হয় আর উদ্দেশ্য থাকে যে, আমরা আমাদের গরীব-দরিদ্র ভাইদের গরীব থাকতে দেবো না। আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য দিব, তাদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করব, টাকা-পয়সা ও অর্থের সংস্থান করব। গরীবদের অবস্থার পূর্ণ খবরাখবর রাখব– তাহলে অনেক বেশি ফল পাওয়া যাবে। একজন একজন করে যদি করা হয়, তাহলে এক ব্যক্তিরই কাজ হবে। আর দলগত ও সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ব্যাপক হারে মানুষ উপকৃত হবে, উন্নত হবে; সহায়তা বৃদ্ধি হবে। জাতীয় পর্যায়ে যদি দরিদ্রদের সেবা করা হয়,

তাহলে কাজও যেমন বেশি হবে, তেমনি শিক্ষাদীক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ও বাস্তব ফল প্রকাশ পাবে।

বিত্তবান ও আমীরদের উপর গরীব-অসহায়দের অনেক হক রয়েছে। গরীব-দরিদ্রগণ আমাদেরই ভাই। তারা ভিন্ন কেউ নয়। বিত্তবানরা যেমন ভাই, তেমনি তারাও ভাই। এটা বিত্তবানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, যাকাত, সদকা দিয়ে আপন ভাইদের খোঁজখবর নিবে। সেটা ব্যক্তিগতভাবেও এবং সম্মিলিত বা জাতীয় পর্যায়েও। এটাও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত হবে এবং এর প্রতিদান জাতীয় পর্যায়ে লাভ হবে। এর ফলে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসবে, কল্যাণ ও মঙ্গল হবে। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি, তারা বন্দেগী ও দাসত্ব করবে। [যারিয়াত : ৫৬]

ما اريد منهم من رزق وما اريدان يطعمون

রুজি– আমি এ ইচ্ছা করিনি যে, তোমাদের নিকট রুজি ও আহার্য কামনা করব। [যারিয়াত : ৫৭]

ان الله هوا هوالرزاق ذرالقوة المتين -

তাদের রিযিকের দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করলাম, তোমরা চিন্তা করো না। [যারিয়াত : ৫৮]

মহান আল্লাহ তায়ালা একটি কাজ আমাদের দায়িত্বে দিয়েছেন, আর একটি দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি রুজি ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো ইবাদত ও বন্দেগী করা। আমরা যে পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী করব, তাঁর পক্ষ থেকে রুজি আসবে। আর রুজির অর্থ কেবল খাদ্য ও বস্ত্র নয়; বরং ভাত-কাপড়, খাদ্যবস্ত্র, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা– সবই এই রুজির অন্তর্ভুক্ত। আমি রুজি দিব, তোমরা ইবাদত কর। অথচ বর্তমানে মুসলমানগণ যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সে দাবি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। যদি জীবিকার ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপ করে বলে যে, সাহেব! রুজি কমিয়ে দেয়ার জায়গায় শুধু আমি ছিলাম! অথচ কাফেররা কোথায় চলে গেছে? আমার উপর কেবল যত

সব আপদ-বিপদ আসে! মনে হয় যেন আল্লাহ তায়ালা রুজিদানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না (মায়াযাল্লাহ)। আর আপনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, 'আমি ইবাদত করব'– তা কি আপনি পূর্ণভাবে করছেন? নিজের অবস্থা দেখছেন না, অথচ অভিযোগ করছেন আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে! সুতরাং নিজের দায়িত্ব আদায় করুন এবং পালন করে যান। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর ফযল ও করমে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাও তিনি পূর্ণ করবেন। তুমি যদি পূর্ণভাবে কাজ না করো তাহলে তাঁর পক্ষ থেকেও বরকত কমে যাবে। তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে কর্তব্য আদায় করতে পারলে ঐদিক থেকেও পূর্ণভাবে রুজি দেয়া হবে। এ জন্যেই বলেছেন–

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

রুজির চিন্তা করো না, সেটা আমি দেব। নিজের কাজের চিন্তা করো যা তোমাদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো ইবাদত ও বন্দেগী করা।

ভূমিকা ছাড়াই এ কয়েকটি কথা আমি আরয করলাম। অবশ্য এতে জ্ঞানগর্ভ কোন ভূমিকার প্রয়োজনও ছিল না। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং আপনাদেরকে ইবাদত ও বন্দেগী করার, তাঁর সামনে মাথা নত করা এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم - وارنا منا سكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم - وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

বয়ান : ৯

পবিত্র খুতবা

হিরমান ও খুসরান উভয়ের দিকে দুনিয়া দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। আত্মা শুধু ইলম থেকেই বঞ্চিত হয়নি; বরং ইলমের নামে কৃত্রিম দর্শন ও ইজমকে নিজেদের অন্তরে ভর্তি করে ফেলেছে, যা ইলমের নামে মূর্খতা। যার মাধ্যমে মানুষ মূর্খও থাকে না, আলেমও হয় না; বরং দ্বিগুণ মূর্খতার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে বর্তমানকালের মানুষ তার মাটির তৈরি দেহরাজ্য ও তার কর্মচারীবৃন্দকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান হতে মুক্ত করে বিধানহীনভাবে পরিচালনা করছে। ইলমের নেয়ামতকে মূর্খতার মাধ্যমে পরিবর্তন করে জীবন যাপন করছে এবং এর দ্বারা নিঃসন্দেহে নিজেকে জাহান্নামের উপযোগী করছে

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد

মুহতারাম!

বিশাল এ শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব আদায় করা আমার মত একজন জ্ঞানহীন, শিক্ষানবিশের কাজ নয়; আর তা উচিতও নয়। ফলে সভাপতির আসনে উপবেশন করা আমার জন্য যেমন বেয়াদবীর শামিল, লজ্জাষ্কর ব্যাপার, তেমনি আমাকে হয়রানিও পেয়ে বসেছে। আমার বুযুর্গদের প্রচেষ্টাকে কোন্ ভাষায় আমি ব্যক্ত করব? বসে বসে কেবল ভাবছি, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব নাকি শুকরিয়া জানাব? তবু الامر فوق الادب (নির্দেশ আদবের উর্ধ্বে) অনুযায়ী যেহেতু আমি বুযুর্গানের নির্দেশ পালন করছি, আর আমাকে যেখানে বসানো হয়েছে, আমিও সেখানে বসে পড়েছি– সুতরাং শুকরিয়া আদায় না করে কোন উপায় নেই, গত্যন্তরও নেই। তবে এর মাধ্যমে এই বাস্তব সত্যও প্রকাশিত হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সভাপতিত্ব ঐ সকল বুযুর্গের জন্যই প্রযোজ্য, যাঁরা অনুপযুক্তদের মধ্যেও সভাপতির পদ বণ্টন করে দিতে পারেন। আমি তো কেবল তাঁদের একজন নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তি হিসেবে এখানে উপস্থিত থাকব। আর তাঁদের নির্দেশ পালনই কেবল আমাকে লজ্জার অনুভূতি থেকে রক্ষা করতে পারে, এর প্রতিকারও হতে পারে– এ আসনে বসে আমি যে লজ্জা অনুভব করছি তার। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইলম ও আমলে অগ্রসর বুযুর্গগণের মহৎ উদ্দেশ্যের অনুসরণ-অনুকরণ করার তাওফিক দান করুন।

তাঁদের ফয়েয ও বরকত দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন রাখুন। তাঁদের জন্য আমার পক্ষ থেকে এ দোয়াই কেবল নিবেদিত–

شعر: منت مہ کہ خدمت سلطاں ہمکنی

منت شناس ازو کہ بہ خدمت گذاشت

তোমরা দয়া ও ইহসান মনে করো না যে, তুমি তাঁর খেদমত ও সেবা করেছ; বরং তোমার ওপর তাঁর দয়া ও মেহেরবানী যে, তোমাকে তাঁর খেদমতের জন্য রেখেছেন, খেদমতের সুযোগ দান করেছেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

যেহেতু মহতি এ সম্মেলন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান সম্পর্কীয় একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সুতরাং এ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণের আলোচ্যসূচীও আপনা থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়– যা প্রকৃতপক্ষে এ সম্মেলন শিক্ষালয়েরও আলোচ্যসূচী বা বিষয়বস্তু। আর তা হচ্ছে ইলম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা। সুতরাং আমিও এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকেই নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কথা পেশ করার দুঃসাহস করেছি–

'দীনি ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক আমার এ সুদীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণের সারাংশ দুটি শব্দে বলতে হলে বলা যায়– মানব জীবনে দীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কার্যক্রম এবং এ ইলম ও আমলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনই প্রকৃত জীবন, উন্নত ও পছন্দনীয় জীবন। যে জীবন-ব্যবস্থার প্রচার-প্রসার এ সংকটপূর্ণ সময়ে, এ অন্ধকার যুগে জানমালসহ সকল উপায়-উপকরণ কুরবান করে হলেও করে যাওয়া বা করতে থাকা খুবই দরকারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীনি ইলম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

দীনি শিক্ষার হাকীকত এবং সাহিত্য কি, দীনি শিক্ষার প্রাথমিক উপকরণ, বিশেষ নিদর্শন ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কি? দীনি শিক্ষা বলার কারণে দুনিয়াবী শিক্ষা বলে যে জিনিসটি অনুভূত হচ্ছে, ঐ শিক্ষারই বা সাহিত্য কি? তাছাড়া দুনিয়াবী (পার্থিব জ্ঞান) ইলম ও পরকালীন ইলমের ফলাফল ও পরিণামের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য কি? এসব প্রশ্ন প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত। দীনি শিক্ষা শব্দ শুনে আপনাদের মনে এ জাতীয় প্রশ্নের উদয় হতে পারে। আমার এ লেখায় এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জবাবগুলো বোধগম্য করার চেষ্টা করায় বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। প্রথমত এ কারণে যে, এ আলোচ্য বিষয় স্বভাবতই দীর্ঘ। দ্বিতীয় কারণ হলো, এ কয়েকটি কথা এমন এক ব্যক্তির কলম দিয়ে বের হচ্ছে যিনি শিক্ষানবিশ, তাও আবার একটি বিরাট শিক্ষাগারের। তাছাড়া এক মহাশিক্ষা সম্মেলনে– উপলক্ষণীয় আর শিক্ষানবিশদের জন্য এ জাতীয় একটা সুযোগে– এ আলোচ্য বিষয়ই প্রিয়; বরং প্রিয়তম হয়ে থাকার কথা। সুতরাং পছন্দনীয় ও প্রিয় বিষয়ে ইচ্ছাকৃতও কিছুটা দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে থাকে।

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

কাহিনী সুনির্দিষ্ট ছিল, তাই অত্যন্ত সুদীর্ঘভাবে বর্ণনা করলাম।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার জন্যে আমার বুযুর্গানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। একই সাথে আমি চেষ্টা করব দীর্ঘসূত্রিতা কিছুটা হলেও হ্রাস করার জন্য। আর এসব নির্ভেজাল ও বাস্তব নীতিগুলোকে মৌলিকভাবে পেশ করার চেষ্টা করব। নিত্য-নতুন ও দৈনন্দিন ঘটনাবলী সব শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং এ বিষয়ে আপনারা আমার চেয়েও অধিক জ্ঞান রাখেন। সুতরাং আমার আরযকৃত মৌলিক নীতিগুলোকে ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিষয়সমূহ ও ঘটনাবলীর সত্যাসত্য এবং তা বাস্তব নীতিভিত্তিক কি না, যাচাই করে নেবেন। এসব মৌলিক নীতি পবিত্র কুরআনের আলোকে সংগৃহীত হয়েছে। এই নীতিগুলো দুনিয়ায় চলমান ঘটনাবলীর সত্যাসত্য ও ভালমন্দ যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি, একক দাঁড়িপাল্লা।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

> আমি আমার রাসূলগণকে মুজেযা (অলৌকিক শক্তি) দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা বা সত্যের মাপকাঠি, যাতে মানুষ ন্যায় ও ইনসাফের ওপর অটল ও সুদৃঢ় থাকে। [হাদীদ : ২৫]

সুতরাং এসব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত নির্দেশাবলী অটল ও অলঙ্ঘনীয় হবে– যেগুলোর অনুসরণ ও অনুকরণে যে কোন মুত্তাকী-পরহেযগারের কোন ধরনের আপত্তি থাকতে পারে না; বরং না থাকাই উচিত।

১. মানুষ : বহুমুখী এক বাস্তব সত্তার সৃষ্টি

সুধীমণ্ডলী!

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সুনিপুণ ও সুদৃঢ় শিল্প কৌশলে মানুষকে বহুমুখী বাস্তব গুণাবলীর কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভেতরে বিভিন্নমুখী প্রতিভা এবং গুণাবলী সন্নিবেশ ও পুঞ্জীভূত করে রেখে দিয়েছেন এবং জাহেরী বা বাহ্যিক আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন সুশোভিত শোভাময়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। অতঃপর প্রতিটি অঙ্গকে তার অবস্থার উপযোগী দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে। চোখকে দৃষ্টিশক্তি দান করা হয়েছে, যেন দেখতে পারে। কান দান করেছেন, যাতে শ্রবণ করতে পারে। ঘ্রাণ নিতে ও শুঁকে দেখতে নাক দিয়েছেন। জিহ্বা দিয়েছেন স্বাদ গ্রহণ করতে। কোনো কিছু যাতে ধরতে পারে সেজন্য হাত দিয়েছেন। পা দিয়েছেন তা দিয়ে চলাচল করতে। শরীরের ওপর মোলায়েম চামড়া দান করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে স্পর্শ অনুভব করতে পারে। মুখ দিয়েছেন পানাহার করতে, কথাবার্তা বলতে। বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে চিন্তা-ভাবনা করতে দান করেছেন মস্তিষ্ক। এক কথায়, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর তার উপযোগী দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যাতে তা তারা আদায় করতে থাকে। আর এর মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে।

মানবীয় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য এতই সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার অভিজ্ঞতার আলোকে তা স্পষ্টভাবে দেখতে, বুঝতে ও অনুভব করতে সক্ষম। এগুলো শরীয়ত সমর্থিতও। আর এগুলোকে মেনে নেয়া ঈমানী দায়িত্বও বটে। মহান স্রষ্টা নিজেই যখন অঙ্গগুলোর জন্য এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর বলেও দিয়েছেন– এ কারণেই পবিত্র কুরআন কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের কাল্পনিক উপাস্য (মূর্তি)সমূহের

অসহায় অনুভূতিহীন হওয়াকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাদের তৈরি অঙ্গ দ্বারা তারা ঐ কাজও করতে পারে না, যা আল্লাহ তায়ালা এ অঙ্গগুলোর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলে এসব অনুভূতিহীন অপদার্থের দল কেমন করে আল্লা জাল্লা শানুহুরও মাবুদ হবে! হতে পারবে? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

ان الذين قدتعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين – الهم ارجل يمثون مها ام لهم ايد يبطثون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها –

যে সকল মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করে ঐসব দেবদেবী ও মূর্তিকে ডাকে, তারাও ইবাদতকারীদের ন্যায় সৃষ্টি (স্রষ্টা নয়)। কাজেই তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া উচিত। তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলে? তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরতে পারে? তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখতে পারে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? তাদের যখন এ সব কিছুই নেই, তারা সৃষ্টির দায়িত্বই পালন করতে সক্ষম নয়। তাহলে কেমন করে তারা স্রষ্টা হবে এবং স্রষ্টার দায়িত্ব পালন করবে? সুতরাং এদেরকে কোনভাবেই ডাকা যায় না, ডাকা উচিত নয়।

উপর্যুক্ত আয়াতে যেমন অনেক ইলম জ্ঞানের কথা রয়েছে তেমনি এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানবীয় অঙ্গগুলোকে তাদের উপযোগী কিছু দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য জন্মগতভাবে অর্পণ করা হয়েছে। যেমন- পায়ের জন্য হাঁটাচলা, হাতের জন্য ধারণ করা, চোখের জন্য দেখা, কানের জন্য শোনা। আর এসব অঙ্গের প্রাণশক্তির চাহিদাও হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশিত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলবে।

২. অঙ্গসমূহের দায়িত্ব এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিধান

প্রতিটি অঙ্গ দ্বারা যদি ঠিক সে কাজই নেয়া হয়, যে কাজের জন্য এদের সৃষ্টি– তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হতে থাকবে এবং এ দুনিয়া ন্যায়নীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর একেই বলা হয় 'ইহসান'। আর যদি কাজে না লাগিয়ে

কোন অঙ্গকে অবশ-অকর্মণ্য করে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে বোকামী, হীনমন্যতা ও নীচতা। আর এর নাম হলো হিরমান (বঞ্চিত)। আবার কোন অঙ্গকে যদি তার সীমার বাইরে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা হবে জুলুম অন্যায় ও অত্যাচার। একেই বলা হয় 'খুসরান'। আর এ দুয়ের একত্রীকরণ হলো 'তাআদ্দী'– সীমালঙ্ঘন করা। এরই নাম হলো কুফরান বা অকৃতজ্ঞতা।

মহান আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত ধ্বংস করা, ত্যাগ বা বর্জন করা কিংবা তা থেকে উপকৃত না হয়ে অনুপকারী করে রেখে দেয়াকে বলা হয় 'হিরমান'। আবার অপাত্রে ব্যবহার করা, সঠিক স্থান ত্যাগ করে ভুল ও ভ্রান্তকে গ্রহণ করা– তাহলে একে বলা হয় 'খুসরান'। পবিত্র কুরআন 'নেয়ামতকে পরিবর্তন করে নেয়া'-এর উল্লেখ করে কুরআনের নেয়ামত দ্বারা তা বর্ণনা করেছে এবং নিম্নোক্ত ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ✡ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ✡

আপনি কি এদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং ইহসানের বিনিময়ে নাশুকরী ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং নিজ জাতি ও সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দ্বারে উপনীত করেছে; আর তা হলো জাহান্নাম, যা অত্যন্ত খারাপ ও মন্দ বাসস্থান। [ইবরাহীম : ২৮-২৯]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

এরপর হচ্ছে স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক কথা। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্বের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। নইলে উদ্দেশ্যহীন আমল অর্থহীন হয়ে থাকে। তাই এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্বের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে হক ও সত্যের অনুসন্ধান করা এবং তা অনুসরণ করে চলা। আর এ চলার জন্য নির্ধারিত রীতিনীতি ও কর্মসূচীই হচ্ছে শরীয়ত। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি তাদের প্রাকৃতিক দায়িত্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে তৎপর ও কর্মব্যস্ত থাকে, তাহলে এতেই রয়েছে তাদের শান্তি, ইহকালীন মুক্তি। আর তারা যদি তাদের প্রাকৃতিক দায়িত্বকে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও প্রেমপ্রীতির পরিবর্তে তাঁর

বিরুদ্ধাচরণ, শত্রুতা ও বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ করে, তাহলে তার প্রাকৃতিক দায়-দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সত্ত্বেও এসব তাদের জন্য মারাত্মক প্রাণ-সংহারক হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু সত্য সঠিক কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাদের সামনে নেই। ফলে এ অঙ্গগুলোই কেয়ামতের ময়দানে তার নফসের সপক্ষে কোন সাক্ষ্য পেশ করার পরিবর্তে নফসের বিরুদ্ধে সাক্ষী ও প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে এবং শাস্তির সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। মানবদেহের অঙ্গগুলোর উদ্দেশ্য পরিবর্তন অথবা উদ্দেশ্য-বিরোধী কাজকর্মের কারণে ঐ অঙ্গগুলোই নফসের বিরুদ্ধে সাক্ষী বনে যাবে এবং শাস্তি বিধানের সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে বলে পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

এবং তাদেরকে ঐ দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন যেদিন আল্লাহর দুশমনদের (কাফেরদের)-কে দোযখের দিকে একত্রে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে হিসাবের মাঠে সমবেত করা হবে এবং আটকে রাখা হবে, যেন অন্যরাও এসে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে যাবে। তখন কান এবং শরীরের চামড়া তাদের বিপক্ষে তাদের আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করবে– তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করলে কেন? তখন অঙ্গগুলো উত্তর দিবে– আমাদেরকে ঐ আল্লাহই বাকশক্তি দান করেছেন, যে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। আর ঐ আল্লাহই সর্বপ্রথম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর পুনরায় তাঁর নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
[হা-মীম আস্-সাজ্‌দা : ১৯-২১]

সার কথা হলো, এ আয়াত দ্বারা মানব জগতের ন্যায়নীতি, আদল ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দু'টি মৌলিক নীতি সুস্পষ্ট হয়েছে। এক. এ অঙ্গগুলো তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদন করবে। কর্মহীন বেকার হয়ে থাকবে না। কেননা তা হলো 'হিরমান' (বঞ্চনা)। দুই. সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য– অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনুগত ও বাধ্য থেকে কর্ম সম্পাদন করবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিরোধী কাজে যেন আত্মনিয়োগ না করে। কারণ সেটা হলো খুরান।

দেহের বাদশাহ আত্মার আমল

আসল কথা হলো, যখন শরীর নামক রাজ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এক-একটি শুদ্ধ-সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন এটা তো অসম্ভব হবে যে, আত্মা– যা সম্পূর্ণ দেহ রাজ্যের বাদশাহ ও প্রশাসক– তার কাজকর্মের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে না। বিশেষত এ রাজার সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন একটিও যেখানে নিরর্থক অকর্মণ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে তৈরি করা হয়নি, সেখানে অঙ্গগুলোর রাজা ও প্রশাসককে নিরর্থক বানানো হবে কেন? একে কিভাবে দায়-দায়িত্বহীন, কর্তব্যমুক্ত ও সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন তৈরি করে অপদার্থ বলে গ্রহণ ও গণ্য করা হবে? বরং তার দায়িত্ব হবে এমনই, রাজা-বাদশাহদের যেমনটা হয়ে থাকে।

সার কথা, বাদশাহর কাজ মজদুরী করা নয়, শ্রমিকের কাজ করা নয়; বরং প্রজাসাধারণের ও রাজকর্মচারীদের কার্যক্রমের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা, সবসময় তাদের খোঁজ-খবর রাখা এবং ঐ সকল খবরের আলোকে রাজ্যের জন্য কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকা, যেন তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে থাকে এবং সততার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করতে থাকে। এতে যেন কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়। কাজেই আত্মার সর্বপ্রধান কাজ হলো, নিজ রাজ্যসমূহের বিষয়ে অবহিত থাকা বা খবর রাখা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যেসব কাজকর্ম, কথাবার্তা শরীর নামক রাজ্যের জন্য উপকারী হয়, তা সরবরাহ করতে থাকা। আর যেসব কাজকর্ম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে, সেগুলোকে প্রতিহত করতে থাকা, যাতে দেহরাজ্যটি অভ্যন্তরীণভাবে ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় পতিত না হয় এবং তার লক্ষ্যস্থলে পরিণত না হয়। তাহলে সংক্ষেপে আত্মার উপকারিতা দাঁড়াচ্ছে এই– সে যেন ভেতর ও বাইরের নিজের নিকটবর্তী ও

দূরবর্তী সবখানে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে থাকে এবং ঐ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ রাজ্যকে পরিচালনা করে থাকে। যদি সে তার এ দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করতে পারে, তাহলে শুধু তার (আত্মার) নিজের নয়; বরং দেহ-রাজ্যের সবখানে 'সালাহ'– কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করবে। তা না হলে আত্মা নিজেও নষ্ট ও ধ্বংস হবে এবং তার সম্পূর্ণ রাজ্যও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ان فى الجسد مضغة اذا صلحت اصلح الجسد كله واذ افسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب–

মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। যখন ঐ পিণ্ড সঠিক ও সুস্থ থাকে, তখন সম্পূর্ণ দেহই সঠিক ও সুস্থ থাকে। আর যখন এ পিণ্ডটি ফাসেদ ও নষ্ট হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ দেহ নষ্ট হয়ে যায়। সতর্ক থেকো যে, এটাই হলো কল্‌ব, এটাই হলো আত্মা।

৩. কলবের ইলমের উসিলা হলো গবেষণা ও অনুধ্যান

যেমন ধরা যাক, আমাদের দুটো কান আছে। কানের কাজ শোনা। তবুও শোনার জন্য মনোযোগী হতে হবে। মনোযোগী না হলে কান তার শোনার দায়িত্ব আদায় করতে পারবে না। তেমনি চোখের কাজ দেখা। দেখার ব্যাপারেও মনোযোগ দিতে হবে। অবশ্যই চোখের মণি এদিক সেদিক ঘুরাতে হবে, যেন সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখতে পারে। মনোযোগী না হলে চোখ তার দেখার দায়িত্ব আদায় করতে পারবে না। কল্‌ব হচ্ছে ইল্‌ম হাসিল করার জন্য। তাই ইল্‌মের প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। এ মনোযোগ– যার অপর নাম হলো চিন্তাশক্তি বা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা। এটা ছাড়া সে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা আলমে খাল্‌ক বা সৃষ্টজগত এবং আলমে আমর বা নির্দেশ জগত-এর প্রতি নিজ চিন্তা ও গবেষণা শক্তিকে পরিচালিত করতে সক্ষম না হবে। তাকে চিন্তা ও গবেষণার দায়িত্ব আদায় করতে হবে অবশ্যই। তারপরই কেবল আত্মা জাহেরী ও বাতেনী, বাহ্যিক ও আত্মিক জ্ঞান অর্জন করে দেহরাজ্যকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবে। এ কারণেই

পবিত্র কুরআনে উভয় জগৎ 'আলমে খালক' ও 'আলমে আমর'-এর দিকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেছে। আলমে খালক বা সৃষ্টজগতে নফস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

তোমার ঘাত ও সত্তায় আমার কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে, তুমি কি দেখতে পাও না? [যারিয়াত : ২১]

আলমে খালক-এর (নফসের) বাইরের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اولم تيفكروافى خلق السموت والارض

তারা কি আসমান-জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?

আর আলমে আমর সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি কুরআন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হতো, তাহলে এতে অনেক অনেক পরস্পর বিরোধ ও পার্থক্য বিদ্যমান দেখতে পেত। [নিসা : ৮২]

তাহলে এ কথাও ঠিত যে, প্রতিটি চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই কল্‌ব ইলম হাসিল করবে আর ঐ ইলমই সত্য সঠিক হবে– সেটা জরুরী নয়। যেমন- কোন কোন সময় মনোযোগ দেয়া সত্ত্বেও শোনা যায় না। চাঁদ দেখার জন্য চোখ ঘুরাতে থাকে অথচ দেখতে সক্ষম হয় না। আবার আকাশে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়। হঠাৎ কোন কথা কানে এসে যায় এবং কান তা শুনে নেয়। আসলে এভাবে আত্মার জন্য মনোযোগ, চিন্তা ও গবেষণা করা শর্ত, জ্ঞান লাভ হোক বা নাই হোক। সময়বিশেষে এমনও হতে পারে যে, সাধারণ মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে কল্‌বে ইলম ও জ্ঞান ঢেলে দেয়া হবে এবং বিনাশ্রমে ইলম লাভ হয়ে যাবে। তবে স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, মনোযোগ, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমেই ইলমের সুমিষ্ট ফল লাভ হয়, যা ইলম অর্জনের সর্বপ্রথম ও প্রধান শর্ত।

৪. শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গই সংবেদনশীল

তবে এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের রাজা অর্থাৎ কল্‌ব-এর আলেম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, দেহরাজ্যে অন্য কোন অঙ্গই আলেম বা জ্ঞানী নয়; বরং الناس على دين ملوكهم 'মানুষ তার বাদশাহর অনুসারী হয়ে থাকে'– এর স্বাভাবিক নিয়মনীতি অনুযায়ী এ দেহরাজ্যের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি অঙ্গ ইলম ও জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ।

শরীর নামক রাজ্যের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও অনুভূতির ভাণ্ডার স্তরে স্তরে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে। চোখ দেখবে– এর অর্থ হলো, চোখ আকৃতিগুলো জেনে নিবে। কান শ্রবণ করবে– এর অর্থ এছাড়া আর কি হবে যে, কান আওয়াজ ও স্বর জেনে নিবে। জবান বা মুখ স্বাদ গ্রহণ করবে– এর মানে হলো– স্বাদ জেনে নিবে। নাক শুঁকবে– এর অর্থ হলো, সে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ জেনে নিবে। হাত, পা, শরীরের চামড়া স্পর্শ করবে– এর অর্থ হলো, তারা স্পর্শ করে নরম-শক্ত, ঠাণ্ডা-গরম জেনে নিবে। উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দেহ নামক রাজ্যের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে নিজেদের মধ্যে ইলম ও জ্ঞানার্জনের বিভিন্নমুখী শক্তির যোগ্যতা ও প্রতিভা সংগোপনে রেখে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্জিত জ্ঞানকে সরবরাহ করতে সর্বদা ব্যস্ত রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়, মানুষ– পূর্ণাঙ্গ মানুষ ইলম-এর বিভিন্নমুখী শক্তিতে পরিপূর্ণ। এর ভেতরে বাইরে অনুভূতিশীল আর তাদের রাজ্য (আত্মা) ইলম ও জ্ঞানের উৎস বা উৎপত্তিস্থল। তবে একথা সম্পূর্ণ আলাদা যে, এদের মধ্যে কারো ইলম মৌলিক, কারো আংশিক। কিন্তু তাদের সবার মধ্যে কোন না কোনভাবে জ্ঞান ও অনুভূতি রয়েছে। কোন অঙ্গের জ্ঞান ও অনুভূতিকেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

শারীরিক অঙ্গসমূহের অনুভূতির তিনটি শক্তি

শারীরিক অঙ্গসমূহের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির আলোকে এ কথা বলা যায় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির তিনটি শক্তি রয়েছে। যে শক্তিগুলো অঙ্গগুলোর মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত ও বিভক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো– হিস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি– যা বিভিন্ন আকারে শরীরের সীমার মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের রঙ, রূপ অনুভব করতে থাকে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি– মস্তিষ্কের ভেতর যা বিস্তৃত রয়েছে। জ্ঞান-প্রসূত বিষয়গুলোকে একটি বিশেষ অনুভূতির মাধ্যমে আহরণ করে যথাস্থানে ব্যয় করে। আর তৃতীয়টি হলো– কুওয়াতে বিজ্‌দান বা অনুভূতিশক্তি। এর স্থান কল্‌বের মধ্যে, তবে জড়জগতের বাইরেও প্রবেশাধিকার রয়েছে। সেখান থেকেও ইলম বা জ্ঞান নিয়ে আসতে সক্ষম যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিবেক-বুদ্ধিকে বোবা হয়ে থাকতে হয়।

উল্লিখিত প্রথম শক্তিটির (হিস ও আকল) ময়দানে আমল বা কর্মক্ষেত্র হলো জড়জগত বা দৃশ্যমান জগত, যেখানে হিস ও আকল জ্ঞানের কোষাগার বা ভাণ্ডার পেয়ে যায়। হিস (অনুভূতি) আংশিক বিষয়াদি এবং আকল (বিবেক-বুদ্ধি) মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞানার্জন করে থাকে। আর শেষোক্ত শক্তিটি অর্থাৎ সঠিক অনুভূতি-এর কর্মস্থল হলো অদৃশ্য জগত বা আলমে গায়েব। সেখান থেকে এ শক্তির প্রতি ইলম বর্ষণ হতে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিদর্শনাবলী অবতরণ করতে থাকে। এসব জ্ঞান আদর্শিক হয় এবং তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যম। জ্ঞান যদি আংশিক হয়, তাহলে তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যায়। আর যদি মৌলিক জ্ঞান হয়, তাহলে এ জ্ঞানের আকৃতি প্রকৃতি বিবেকের পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর এসবই হচ্ছে গায়েবী ও বিজদানী, অদৃশ্য জগতের এবং অনুভূতিগ্রাহ্য। কলবের সর্বত্র সকল কোণায় ইলম বিস্তৃত ও বিরাজমান রয়েছে। ইলম-এর কারণে কল্‌ব সবসময় তৎপর, আবাদ ও উৎফুল্ল থাকে। আর এসবের উৎস হচ্ছে অদৃশ্য জগত। সেখান থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তরে প্রবেশ করে। কোন অদৃশ্য সত্তা সংবাদ দিয়ে যায়। কখনও বা ইলহামের মাধ্যমে কল্‌বের উপর উদিত হয়। আর কল্‌ব হঠাৎ এগুলোকে অনুভব করতে শুরু করে। আবার কোন কোন সময় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব ইলম কল্‌বের মধ্যে আপনা আপনিই পয়দা হয়। আত্মা এ জাতীয় ইল্‌মের কেন্দ্র হয়ে যায়। কোন সময় প্রশিক্ষণ ও তরবিয়তপ্রাপ্ত বিবেক-বুদ্ধির আলোকে এসব ইলমের বিভিন্ন ধরন বা প্রকার প্রকাশ লাভ করে। যার প্রকাশকে ইজতিহাদ ও গবেষণার ফল বলা হয়। আবার কোন কোন সময় বাহ্যিক বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা দ্বারাও প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন- সাধারণ জ্ঞানমূলক সূক্ষ্ম কথাবার্তা। তবে সর্বাবস্থায় এসব ইলমকে ইলমে বিজদানী (অনুভূতি জ্ঞান) বলা হবে। এসব জ্ঞানের সম্পর্ক ইন্দ্রিয় বা সাধারণ ও স্বভাবজাত বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে সরাসরি নয়।

কুরআন থেকে অনুভূতির মাধ্যমসমূহ নিরূপণ

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির এসব মৌলিক ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার নানামুখী নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ঐ সকল মাধ্যম তথা শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে এসব মাধ্যমই আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলী থেকে কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে ইলমের পরিধি বিস্তৃত হয়। যেমন- মানুষ হতে মানুষের জোড়া বেরিয়ে আসা এবং তাদের মধ্যে বিস্ময়কর প্রেমপ্রীতি, মহব্বত-ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিক ও আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শনকে বুঝে নেয়ার মাধ্যমে। 'ফিকর' বা 'চিন্তা-ভাবনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। [নাহল : ১১]

কিংবা ধরুন, আকাশ-পাতাল, আসমান-জমিনের সৃষ্টি, মানব জাতির ভাষার বিভিন্নতা, রঙ-রূপের পার্থক্যের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা, এগুলোতে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কুদরত ও শক্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মাধ্যম 'ইলম'কে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে বিজ্ঞজনদের জন্য।
[রূম : ২২]

অথবা দিন ও রাতে মানুষের নিদ্রা ও জাগরণের পরিবর্তন, নিত্যদিন প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নিজের রিযিক রুটি বা খাবার সংগ্রহ করার মাঝে যেসব নিদর্শন গোপন রয়েছে সেসব গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য শ্রবণশক্তিকে মাধ্যম বলা হয়েছে।

এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তাদের জন্য–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

যারা কথা শুনে মান্য করে অথবা বজ্র, বৃষ্টি, বিদ্যুতের চমকানোর মাধ্যমে অন্তরে সৃষ্ট ভয়ভীতি, আশা-নিরাশা; তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ– আর এর ফলে

মৃতভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করে দেয়ার মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করাকে বিবেক-বুদ্ধির কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্য। [নাহ্‌ল : ১২]

তাদের পূর্ববর্তী যুগের আর উম্মতদের ধ্বংসলীলা– অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও দুর্দিন এসে যাওয়ার পর তারা কোথাও কোন আশ্রয়, কোন সাহায্য পায়নি। তাদের ভয়াবহ ও মর্মান্তিক অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করাকে কল্‌ব ও আত্মার কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

এ হলো চিন্তা-ভাবনা করার স্থান, ঐ ব্যক্তির জন্য যার অন্তরে আত্মা রয়েছে অথবা কান ও শ্রবণশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে এবং তার অন্তরাত্মা হাজির ও সঙ্গে রয়েছে। [কাফ : ৩৭]

সার কথা হলো, চিন্তা-গবেষণা, ইলম ও জ্ঞান, শ্রবণশক্তি, বিবেক-বুদ্ধি বিজদান ও অনুভূতি সকল উপকরণ গণনা করে বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে গোপন রহস্য ও সুপ্তজ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। এসবই হচ্ছে আমার আগের আলোচনার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মোট কথা, মানুষের মধ্যে ইলম বা জ্ঞান প্রবেশ করার সাধারণত তিনটি পথ বা শক্তি রয়েছে। হিস (ইন্দ্রিয়ানুভূতি), আকল (বিবেক-বুদ্ধি) ও বিজদান (অনুভূতি)। যেসব শক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভব করার মাধ্যমে দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজ করেছে সেগুলো তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই ঐ সকল অঙ্গকেই আলেম (জ্ঞানী) ও মুদরিক (আহরণকারী) বলা হবে এবং তাদের ওপরই অর্জিত ইলমের সত্যাসত্য বা ভুল-শুদ্ধ নির্ভর করবে। অবলোকন ও দর্শনকারী চোখকেই বলা হবে, যদিও সে গোপনীয়ভাবে দেখার দায়িত্ব পালন করছে। কওতে বসিরা বা দৃষ্টিশক্তি। আর কানকেই বলা হবে শ্রবণকারী। অথচ 'শ্রবণশক্তি' হচ্ছে প্রকৃত শ্রবণকারী প্রভৃতি।

অনুভূতিশীল অঙ্গগুলোর পার্থক্যের স্তর

ইলমের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়ে বিচার করলে এই অঙ্গসমূহের ইলম সমান নয়; বরং ব্যবধান ও স্তরবিন্যাস রয়েছে। কোন অঙ্গের ইলম অনেক বিস্তৃত আবার কোন অঙ্গের ইলম সংকুচিত, কোন অঙ্গের ইলম গভীর, আবার কোন অঙ্গের অন্তঃসারশূন্য। আর এসবের মাপকাঠি হচ্ছে– যে অঙ্গ তার ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বস্তুর প্রকৃতি হাকীকত ও মূল তথ্যের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়, সে অঙ্গের ইলমকে কামিল, পূর্ণাঙ্গ এবং গভীর বলা হবে। মূলত এ ইলমই সত্যিকারের ইলম বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যে অঙ্গের অনুভব জ্ঞান লাভ কেবলমাত্র বাহ্যিক রীতিগত প্রচলন ও অস্থায়ী বস্তু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার কারণে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায় না, সে ক্ষেত্রে এ অঙ্গের ইলমকে ত্রুটিপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য এবং বাহ্যিক বলে আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোন বস্তুর এ সকল অস্থায়ী বিশেষত্বগুলো প্রকৃত বস্তু যত বেশি নিকটবর্তী হবে, সে অনুপাতে তার অর্জিত ইলমও সত্য, সঠিক এবং হাকীকতের সঙ্গে নিকটবর্তী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। আর এ অনুপাতেই এ অঙ্গের মূল্য ও মর্যাদা অন্য অঙ্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অপরদিকে এ সকল অস্থায়ী ক্ষণিকের ইলম প্রকৃত ইলম থেকে যত বেশি পরিমাণ দূরের হবে সে অনুযায়ী তার ইলমকে ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করা হবে।

বাহ্যিক অন্তঃসারশূন্য এ ইলম এবং বাস্তবভিত্তিক গভীর ইলম ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ ইলম– এ দু'টি শিরোনামকে সামনে রেখে তা অনুধাবন করা উচিত। আকৃতি যেমন প্রকাশ্য বস্তু, যা সকলের চোখের সামনে একটি হাকীকত তেমনি অপরটি বাতেনী ও গোপন বস্তু, যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয় না। আপনাদের সকলেরই জানা যে, হাকীকত (বাস্তবতা), সুরত (আকার-আকৃতি) হতে উত্তম হয়ে থাকে। আকার-আকৃতির অস্তিত্বের উৎসমূল হলো ঐ হাকীকত। সুতরাং এই ফলাফল বের করে নেয়া খুবই সহজ যে, ইলমে হাকীকত, ইলমে আরয়াহ ও ইলমে বাতেন (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) এবং এর মাধ্যমে সম্পর্কিত ইলমই সর্বোত্তম ইলম হবে। আর শরীর বা আকার-আকৃতি সম্পর্কিত ইলম তথা রঙ, ঘ্রাণ প্রভৃতির মাধ্যমে অর্জিত এ জাতীয় ইলম স্বাভাবিকভাবেই সর্বনিম্ন ইলম হবে। সে মোতাবেক জ্ঞান অর্জনকারী অঙ্গগুলোর মধ্যে উত্তম ও অনুত্তম হবে এবং উঁচু-নিচু হবে।

তাছাড়া এ কথাটিও স্মরণ রাখা দরকার যে, আকার-আকৃতি ও বাহ্যিক রূপ, গঠন প্রভৃতি সীমাবদ্ধ জিনিস এবং অনেক বিধান দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। বরং আকার-আকৃতি অর্থই হলো শৃংখলাবদ্ধ। এ কারণে প্রতিটি আকৃতি তার সীমার ভেতর থেকে অন্য আকৃতি থেকে আলাদা হয়ে যায়, পরিচিত হয়ে যায়। ফলে ঐ পরিবেষ্টন ও পরিধির মধ্যে থেকেই এসব আকার-আকৃতি ও গঠনের জ্ঞান লাভও নানা শর্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এসব পরিবেষ্টনকে যদি ভেঙ্গে দেয়া হয়, তাহলে ইলম ও জ্ঞানার্জনই অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরে অন্য সময় এসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে।

সুতরাং অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে মৌলিক এ দাবি মেনে নেয়া যায় যে, যে অঙ্গের জ্ঞানার্জনে পারিপার্শ্বিক শর্ত-শরায়ত বৃদ্ধি পাবে সে অনুযায়ী এ অঙ্গের ইলম গতানুগতিক আংশিক এবং সীমাবদ্ধ হতে থাকবে। আর এর ফলাফল ও উপকারিতাও খুবই নগণ্য ও সীমাবদ্ধ হবে এবং এ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গ হতে তুলনামূলক অল্প মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী হবে। অপরদিকে যে অঙ্গ যত বেশি পরিমাণ গতানুগতিক শর্ত-শরায়ত হতে মুক্ত ও স্বাধীন হবে, সে পরিমাণ তার ইলম ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত হতে থাকবে এবং সে অনুযায়ী এ অঙ্গটি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল বলে বিবেচিত হবে।

৫. অনুভূতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞানের পারস্পরিক পার্থক্য

উল্লিখিত মাপকাঠিকে সামনে রেখে আমরা যখন মানুষের দেহ ও কালবুদ বা দেহরাজ্যের ওপর গবেষণা করি, তখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, ইলম ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সব অঙ্গ সমপর্যায়ের নয়। কোন অঙ্গের অনুভূতিশক্তি প্রখর, আবার কোন অঙ্গের মন্থর ও অপর্যাপ্ত। কারও ইলম উচ্চাঙ্গের, কারও নিম্নমানের। কারও ইলম ব্যাপক ও বিস্তৃত, আবার কারও ইলম সংকীর্ণ। প্রথমত অনুভূতি সম্পন্ন বস্তুনিচয়কে দেখা যাক। এগুলোর মধ্যেও এ ব্যবধান প্রকটভাবে রয়েছে। অর্থাৎ ব্যবধান যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। যেমন- স্পর্শ করে অনুভব করা শক্তিকে قوت لامسه (স্পর্শশক্তি) বলা হয়। এ শক্তিটি হচ্ছে সবচে' অপ্রখর ও মন্থর। যে শক্তির ইলম অনেক শর্তের বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত, অনেক নীতি দ্বারা শৃঙ্খলিত সেগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো এই– এ শক্তি যে জিনিসকে অনুভব করবে তার শরীর ও দেহ থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক বা রূহানী যেন না হয়। রূহানী ইলম এ শক্তির শক্তি-বহির্ভূত ব্যাপার। দ্বিতীয় কারণ হলো– এ শক্তি ঐ দেহকে দূর থেকে বুঝতে ও অনুভব করতে সক্ষম হবে না,

যে পর্যন্ত ঐ দেহটি এসে তার সঙ্গে লেগে না যায় এবং এ শক্তি ঐ দেহকে স্পর্শ না করে। অর্থাৎ এ শক্তির জন্য তার জানা বস্তুটি নিকটবর্তী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং মিলিত হয়ে যাওয়াও জরুরী। তারপর পরম ও চরম মিল হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সংঘাত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ শক্তি কোন জিনিসের ব্যক্তিসত্তার পৃথক পরিচয় লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র জাতিগত বা শ্রেণীগত পার্থক্যটুকু বুঝতে সক্ষম হয়। তাও আবার অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্তভাবে। অর্থাৎ কোন জিনিস স্পর্শ করলে ঐ জিনিসটি শক্ত কি নরম, গরম কি ঠাণ্ডা তা অনুভব করা যায়। সবচে' বড় কথা, এটাও অনুভব করা যায় যে, জিনিসটি কাঠ, পাথর, লোহা অথবা মাটি কি না। অর্থাৎ বড়জোর এ জিনিসের প্রকারটা জানা যাবে। তবে তার ব্যক্তিত্বের আলাদা ও পূর্ণ পরিচয়দানকারী ইলম লাভ হবে না। আলাদাভাবে ঐ জিনিস কি ও কে– তা জানা যাবে না। অর্থাৎ কোন বিশেষ ধরনের একটি জিনিসকে তার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে অস্পষ্টতামুক্ত কোন ইলম লাভ করতে পারে না। অথচ একটি জিনিসের দেহ ও শরীরই হলো স্পষ্টতম ও প্রকাশ্যতম বস্তু যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা থাকে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সুস্পষ্ট, বিশাল শরীরকেও এ শক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, এর গলায় গলায় না মিলে, এ জিনিসকে বা তার বিশেষত্ব ও গুণাগুণকে অনুভব করতে পারে না। তাই এ শক্তির চেয়ে অবিবেচক আর কোন শক্তি হতে পারে না।

অতএব ইলমের ঐ হাকীকত যাকে 'বস্তুসমূহের পৃথকীকরণ' বলা হয়– এ শক্তি তার অংশ হতে সামান্যতম অংশই পেয়েছে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ শক্তিটি মানবীয় অনুভূতিশীল শক্তিসমূহের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নমানের ও হীনতম শক্তি যার অর্জিত ইলমকে নামেমাত্র ইলম বলা যেতে পারে– তা না হলে তা জাহেল ও মূর্খতারই অধিক নিকটবর্তী। এর ফলে বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 'স্পর্শশক্তি' দ্বারা কোন জিনিসকে স্পর্শ করে অনুভব করে নেয়া কোন বিশেষ কামাল বা গুণ নয়। একজন চরম মেধাহীন ব্যক্তিও এ শক্তি দ্বারা মোট জিনিসের জ্ঞান লাভ করতে পারে, অনুভব করতে পারে। যার মধ্যে এ যোগ্যতাও নেই যে, স্পর্শ করেও কোন জিনিসকে জানতে ও বুঝতে পারে না, তাহলে এরচে' বড় নির্বোধ, বোকা ও মূর্খ আর কে হতে পারে? তাকে প্রাণী না বলে বরং জড় পদার্থ বলাই অধিক শ্রেয় এবং তা তার জন্য মুনাসিব ও ইনসাফপূর্ণই হবে। যেমন পবিত্র কুরআন। কুরআন-বিদ্বেষী কাফেরদের অবস্থা এবং পবিত্র কুরআনের সঙ্গে তাদের দুশমনী, বিদ্বেষ প্রকাশ করে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হিংসুক কাফেররা

এত মেধাহীন, অপদার্থ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন যে, তারা যদি আল্লাহ তায়ালার কিতাবকে দেখতেও পায় এবং নিজ হাতে স্পর্শও করে, তবুও তারা এ কিতাবকে অস্বীকারই করে যাবে।

সার কথা হলো; কোন জিনিসের প্রকাশ ও স্পষ্টতার জন্য এর চেয়েও বেশি উত্তম কোন পথ নেই, থাকতে পারে না যে, ঐ জিনিসকে দেখে নেয়া হলো, স্পর্শ করা হলো, তারপরও ঐ জিনিসটি কি, তা বুঝতে পারল না, মাথায় ঢুকলো না। এমনটা হলে এদেরকে প্রাণীই বলা যাবে না, মানুষ বলে আখ্যা দেয়া তো দূরের কথা।

মহান আল্লাহ তায়ালাই ইরশাদ করেন–

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞

আমি যদি কাগজে লিপিবদ্ধ করে কোন কিতাব আপনার নিকট পাঠিয়ে দেই, অতঃপর এ কাফের-মুশরিকরা এ কিতাবকে তাদের হাত দ্বারা স্পর্শও করে, তবুও এ কাফেররা এ কথাই বলতে থাকবে, এ কিতাব কিছুই না, এতো হলো প্রকাশ্য যাদু। [আনআম : ৭]

পবিত্র কুরআন অবতরণ সম্পর্কীয় এ আয়াত ও বর্ণনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন শরীফের দৃষ্টিতে স্পর্শশক্তি হলো নিকৃষ্টতম শক্তি, যার অনুভূতি খুবই নিম্নমানের। যে শক্তি কেবলমাত্র শরীরের জাত ও প্রকার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গভীরতা ও উচ্চতা ছাড়া অন্য কিছুই অনুভব করতে পারে না। আর যে পরিমাণ জানতে সক্ষম হয়, তাও আবার অনেক অস্পষ্টতা থেকে যায়। অন্য সব বস্তু থেকে বিশেষ কোন প্রভেদ ও পার্থক্য হয় না যে, সকল প্রকার ব্যক্তিসত্তা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। সুতরাং এ শক্তির অর্জিত ইলমকে ইলম বলা, জ্ঞানহীনতা ও ইলম-শূন্য হওয়ারই পরিচায়ক। এ শক্তির মাধ্যমে অস্পষ্ট জ্ঞানার্জনকারীকে আলেম ও জ্ঞানী বলা যায় না এবং জ্ঞানীদের কাতারে শামিল করা যাবে না।

৬. আস্বাদন শক্তি

দ্বিতীয় হলো আস্বাদন শক্তি– যার স্থান ও মহল হলো জিহ্বা। জিহ্বা টক-মিষ্টি সম্পর্কে জানতে পারে, যা একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি বা গুণবিশেষ। তবে এ শক্তিও ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের স্বাদ অনুভব করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাদযুক্ত জিনিসটিকে জিহ্বার সঙ্গে মিলিয়ে না দেয়া হয়। এখানেও পূর্ণ মিলন, একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া শর্ত। যেমনটা ছিল স্পর্শ-শক্তিতে। এ শক্তিও তার অনুভূত বস্তুর সঙ্গে মিলিত না হয়ে 'স্বাদ' অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাছাড়া যে পরিমাণ অনুভব করে, তাও আবার ঐ জিনিসের স্থায়ী গুণাগুণ মাত্র। অর্থাৎ টক, মিষ্টি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। জিনিসটির হাকীকত বা সে সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। এ কারণে এ শক্তিকেও স্পর্শশক্তি থেকে উন্নত মনে না করে বরং ঐ শক্তিরই একটি অংশ বলা যায় বা বলা উচিত। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, ছোঁয়া-ছুঁয়ি ও 'স্পর্শবোধ' শক্তি যখন হাত-পা ও চামড়ার মাধ্যমে কাজ করে, তখন জিনিসের গরম, ঠাণ্ডা, শক্ত, নরম এসব অনুভব করতে পারে। আর যখন জিহ্বার মাধ্যমে কাজ করে তখন মজা ও স্বাদের অনুভবও করতে পারে; বরং এর মধ্যে কামশক্তিরও কিছু দখল রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে স্পর্শবোধেরই অন্তর্ভুক্ত। নিজের অনুভূতি জিনিসের সঙ্গে মিলিত না হয়ে 'স্বাদ' অনুভব করতে পারে না। এ স্পর্শ-বোধশক্তি যখন কামবোধক অঙ্গের ওপর প্রকাশ পায়, তখন কাম-শাহওয়াত জাতীয় স্বাদ অনুভব করে। স্পর্শবোধক শক্তির সব ধরনের মধ্যে কথাটি সকলের মধ্যে রয়েছে যে, কোন শরীর ও দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার পর শরীরে শরীরে লেগে যাওয়ার পরই কেবল তা অনুভব করতে পারে। এটা ছাড়া ঐ বস্তুর শারীরিক গুণাগুণ ও বিশেষত্ব কিছুই অনুভব ও অনুধাবন করতে পারে না। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা হলো স্থানের, শক্তির নয়। অর্থাৎ যে স্থান দ্বারা স্পর্শ করবে, সে স্থানের অনুভূতি, গুণাগুণ ও বিশেষত্ব অনুযায়ী অনুভব করবে। কোথাও শক্ত, কোথাও নরম, কোথাও স্বাদ আবার কোথাও কাম-উদ্দীপক স্বাদ প্রভৃতি। তবে এদের মধ্যে এমনও কিছু রয়েছে যা শরীরের জাহের বা বাইরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু আবার এমনও রয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক বাতেনের সঙ্গে। আবার এমনও কিছু আছে যেগুলো শরীরের ভেতর ও বাতেন অতিক্রম করে নফসের মধ্যে ঢুকে যায়। এগুলোর মধ্যেও আবার স্তরভেদ রয়েছে। কোনটি নিম্নমানের। যেমন- নরম, শক্ত। এগুলোর সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে। আবার কোনটি এর চেয়ে উন্নত। যেমন- আস্বাদ, মজা বা লয্যত। এগুলো মোটামুটি

শরীরের ভেতরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমনও কিছুসংখ্যক আছে যেগুলো আরো উন্নত, কাম জাতীয় ও 'যৌনক্ষুধা নিবারণকারী আস্বাদ।' এগুলো শরীরের গভীরে নফসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ একটি কাইফিয়ত, অবস্থা ও অনুভূতি।

এতসব পার্থক্য ও প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত। অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়া বা স্পর্শ করা হতে হবে। সুতরাং এসব শক্তি ও অনুভূতিকে স্পর্শবোধ শক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। যে শক্তিসমূহের কোন জিনিসের হাকীকত ও মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যেই পবিত্র কুরআনে ধরা-ছোঁয়া, স্পর্শ করাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছে। কোথায়ও 'আস্বাদ গ্রহণ' দ্বারা বর্ণনা করেছে। এতে অনুমিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় ও স্পর্শবোধশক্তি প্রকৃতপক্ষে 'আস্বাদ গ্রহণ'-শক্তিরই একটি ধরন। উপর্যুক্ত বর্ণনা মোতাবেক কেয়ামতের দিন যখন জাহান্নামের আগুন শরীরকে স্পর্শ করবে, তখনই আগুনের কষ্ট অনুভব হবে। এই স্পর্শ করাকে পবিত্র কুরআন 'আস্বাদ গ্রহণ' করা বলে ব্যক্ত করেছে। যেমন- এক জায়গায় বলা হয়েছে–

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

সাকার (জাহান্নাম)-এর স্পর্শ করার আস্বাদ গ্রহণ করো।
[কামার : ৪৮]

এর ফলে স্পর্শ বোধশক্তি ও আস্বাদ গ্রহণ শক্তি, একে অন্যের নিকটবর্তী বা কাছের আত্মীয় বলে বুঝা যায়। যেমন- 'মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা স্পর্শ করে।' যে মৃত্যু স্পর্শ করার কারণে আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে পরজগতে উড়ে যায়, এ মৃত্যুর স্পর্শ করাকেও পবিত্র কুরআন 'আস্বাদ গ্রহণ করা' দ্বারা বর্ণনা করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে।
[আম্বিয়া : ৩৫]

জিনিসটি ছিল স্পর্শ করার, যার সম্পর্ক ছিল 'স্পর্শবোধ'-শক্তির সঙ্গে। অথচ তা ব্যক্ত করা হয়েছে 'আস্বাদ গ্রহণ' দ্বারা। অথবা যেমন পবিত্র কুরআন একটি জনপদের অকৃতজ্ঞতার ওপর– যাদেরকে সবদিক থেকে প্রচুর পরিমাণে

খাদ্যসামগ্রী দেয়া হচ্ছিল– তাদের ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بماكانوا يصنعون -

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষুধার জ্বালা এবং ভয়-ভীতির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। এ ছিল তাদের কৃতকর্মের ফল।

সার কথা হলো, আযাব বা শাস্তি শরীরকে স্পর্শ করে। তাই একে পোশাক 'আচ্ছাদন'ও বলা হয়েছে। যেমন পোশাক শরীরকে বেষ্টন করে রাখে, তৎক্ষণাৎ একে খুলে ফেলা যায় না, তেমনিভাবে আল্লাহর আযাবও ঐ জনপদের অধিবাসীদেরকে বেষ্টন করেছিল যে, তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একে খুলে ফেলতে পারবে না এবং এর দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তিও পাবে না, রক্ষাও পাবে না। অথচ এ শাস্তি, কষ্ট ও দুর্ভোগকে পবিত্র কুরআন 'আস্বাদ গ্রহণ' দ্বারা ব্যক্ত করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা ঐ জনপদকে ক্ষুধা ও ভয়ভীতির শাস্তি আর আযাবের পোশাক পরিধানের আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। এ বর্ণনার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পোশাক পরিধান করার অর্থ হচ্ছে শরীরের সঙ্গে স্পর্শ না করা কিন্তু ফলাফল ও পরিণাম হিসেবে আস্বাদ গ্রহণের কাছাকাছি। আর এ কারণেই আস্বাদ গ্রহণ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখন পবিত্র কুরআনের আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্পর্শ বোধশক্তি ও আস্বাদ গ্রহণ-শক্তি, আলাদা আলাদা শক্তি নয়; বরং এ স্পর্শ বোধশক্তিরই একটা প্রকার মাত্র। তবে একথাটি ভিন্ন যে, আস্বাদ গ্রহণশক্তি ও স্পর্শবোধশক্তি উন্নত প্রকার বা একটি ফর্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন স্পর্শ বোধশক্তি এবং স্পর্শ করার ওপরই তার ইলম ও জ্ঞানার্জন নির্ভরশীল, এ কারণে এ শক্তিকে স্পর্শ বোধশক্তি থেকে আলাদা করা যায় না। স্পর্শশক্তির ওপর যা কিছু বর্তাবে, এ শক্তির ওপরও তা-ই বর্তাবে। স্পর্শশক্তি যেমন কোন বস্তুর হাকীকত উদঘাটন করতে অক্ষম, শুধুমাত্র কিছু শারীরিক অবস্থাবলীকে অনুভব করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, ঠিক তেমনিভাবে 'আস্বাদ গ্রহণশক্তি'ও তা জিহ্বার মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক কিংবা যৌনাঙ্গ দ্বারা আস্বাদ লাভ করা হোক তা শারীরিক অবস্থাদি পর্যন্তই। এরচে' বেশি অগ্রসর হতে পারে না। তাই 'আস্বাদ গ্রহণ শক্তি'র মাধ্যমে অর্জিত ইলমও নিম্নমানের বলে প্রমাণিত। এটাকে ইলমের

সূচিতে উচ্চস্থান দেয়া যায় না এবং এর আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে উলামায়ে কেরামের দলে গণ্য করা যায় না। মোট কথা, এটা বিশেষ কোন ইলমই নয়।

৭. কুওতে শাম্মা বা ঘ্রাণশক্তি

এবার ঘ্রাণ গ্রহণ শক্তি। ঘ্রাণ গ্রহণ শক্তি তার কাজকর্মে নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দুটি শক্তি হতে উন্নত। এটি ধরা-ছোঁয়া ও স্পর্শ করার মুখাপেক্ষী নয়; বরং শরীরের সঙ্গে মিলিত না হয়ে, স্পর্শ না করে দূর থেকে দুর্গন্ধ কিংবা সুগন্ধ অনুভব করে নিতে পারে। এ কারণে এ শক্তিকে স্পর্শ-শক্তির মত অন্তঃসারশূন্য, মেধাহীন ও দুর্বল বলা যাবে না; বরং এ শক্তিকে প্রখর মেধাসম্পন্ন শক্তি বলা যায়। এ শক্তির সুগন্ধ, দুর্গন্ধ শোঁকার জন্য এর মুখাপেক্ষী নয় যে, নাকের সঙ্গে স্পর্শ করতে হবে। আর তবেই ঘ্রাণ অনুভূত হবে; বরং এটি দূর থেকে ঘ্রাণ অনুভব করে নিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পর্শ বোধশক্তি থেকে অনেক দূরে, অনেক উর্ধ্বেও নয়। কারণ, এখানে ঘ্রাণযুক্ত জিনিস নাকে স্পর্শ করাতে হয়। যদিও এটি বাতাসের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

যদি সুগন্ধি ফুলকে এক জায়গায় রেখে দেয়া হয়, তাহলে সমগ্র ঘর সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যাবে, সুবাসিত হয়ে যাবে এবং প্রতিটি নাক এ ঘ্রাণ দূর থেকে শুঁকতে পারবে। কোন কোন গাছের সুগন্ধি ফুলের ঘ্রাণ বিশ-পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও অনুভব করা যায়, যদিও বৃক্ষটি নাকের নিকটবর্তী নয়। আর এটা মূলত বাতাসের কারসাজি। তাই বলে এর মাধ্যমে শুঁকার ও ঘ্রাণ গ্রহণশক্তির কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা সূক্ষ্মতা প্রমাণিত হয় না। বরং বাতাসের সূক্ষ্মতা প্রমাণিত হয়। কারণ, নাকের শক্তি ঐ পর্যন্ত যাচ্ছে না; বরং বাতাস ফুলের সুবাসকে নাক পর্যন্ত নিয়ে আসছে এবং তারপরই নাক তা শুঁকতে পারছে। অর্থাৎ বাতাস নাকের নিকট উড়িয়ে নিয়ে আসছে এবং নাকে সেটা স্পর্শ করছে। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, আস্বাদযুক্ত জিনিসকে জিহ্বার সঙ্গে মিলাতে হবে। আর সুঘ্রাণের ক্ষেত্রে ঘ্রাণযুক্ত জিনিসকে নাকের সঙ্গে মিলাতে হবে না; বরং সুগন্ধি তার কেন্দ্র ও স্থান অর্থাৎ ফুল থেকে আলাদা হয়ে বাতাসের সাহায্যে উড়ে এসে নাক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে নাক তখনই অনুভব করবে, যখন নাকের সঙ্গে মিলিত হবে। দেখা গেল, স্পর্শবোধ শক্তিগুলোতে শরীর নিজে এসে ঐ শক্তির সঙ্গে মিলিত হয় আর তখনই তা অনুভূত হয়। আর ঘ্রাণ গ্রহণ শক্তিতে দেহ ছাড়াই দেহের গুণাগুণ সুগন্ধ-দুর্গন্ধ বাতাসের সাহায্যে নাকে এসে লেগে যায়। আর তখনই নাক তা অনুভব করতে পারে। তবে এখানে স্পর্শ করা শর্ত। তা না হলে শুঁকার শক্তি

অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকবে। সে হিসেবে শুঁকার শক্তিও পূর্বোক্ত শক্তি দুটি থেকে বিশেষ উন্নত নয়। পার্থক্য যেটুকু তা কেবল অনুভূত বস্তুর মধ্যে। একটি গাঢ়, অন্যটি সূক্ষ্ম। অনুভূতিশক্তি উভয়টিই এক ধরনের। তাছাড়া স্পর্শ করা অবস্থায় গ্রহণ করাও প্রায় একই ধরনের। অর্থাৎ বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারে না। শুধুমাত্র অস্থায়ী গুণাগুণই জানতে পারে। সার কথা হলো, শুঁকার শক্তি কিছুটা উন্নত হলেও মৌলিক ক্ষেত্রে অনুভূতির শর্তাবলীও প্রায় একই রকম, বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

তাছাড়া এসব শক্তি কেবল শরীর ও দেহের মধ্যে কাজ করতে পারে। রূহ ও আত্মার ওপর কিছুই করতে পারে না। যেহেতু রূহকে স্পর্শ করা যায় না, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। স্পর্শ করা ও মিলিত হওয়ার শর্ত সব শক্তিতেই রয়েছে। অনুভূত জিনিসটি এসে যখন ঐ শক্তিগুলোর সঙ্গে মিলিত হবে, তখনই কেবল অনুভব করতে পারবে, তা না হলে পারবে না। এছাড়া শারীরিক বিষয়াদি ছাড়া অন্য কোন কিছু অনুভব করতে পারবে না। মৌলিক বস্তু ও সত্তা পর্যন্ত এসবের কোনটাই পৌঁছতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, শুঁকার শক্তিও খুব একটা উন্নত নয়।

৮. শুঁকা ও ঘ্রাণশক্তির আংশিক ইলমের কুরআনী প্রমাণ

পবিত্র কুরআন শরীফেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল শুঁকে নেয়া বা ঘ্রাণ গ্রহণ করে নেয়াকে কোন বিশেষ ধরনের ইলম ও জ্ঞান বলা যায় না। যেমন- হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘ্রাণ শুঁকেছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা পবিত্র কুরআন শরীফেও রয়েছে। এর মাধ্যমেই এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ মিলে। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

انى لاجد ريح يو سف لو لا ان تفندون

আমি (ইয়াকুব আ.) ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তোমরা যদি আমার কথা অবিশ্বাস না কর (বৃদ্ধের প্রলাপ মনে না কর)।

এ আয়াতে 'রীহে ইউসুফ' বলা হয়েছে– কেবলমাত্র রীহ বা সুগন্ধি; ঘ্রাণ বলা হয়নি। হযরত ইয়াকুব (আ.) এ কথা বলেননি, আমি একটি সুগন্ধি বা ঘ্রাণ পাচ্ছি। জানি না এ সুগন্ধি কিসের? বরং তিনি বলেছেন– আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এতে ঐ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘ্রাণ ও সুগন্ধি।

যা হলো প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি বিশেষের বাস্তব ইলম। এ কারণে তাঁর অন্তরে সংশয় দেখা দিয়েছে– হয়তো আমার কথাকে অবিশ্বাস করা হবে, অস্বীকার করা হবে এবং সেটা হবে একটি বাস্তব ইলমের ব্যাপারে অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস। আর যদি অনির্দিষ্ট কোন ঘ্রাণ ও সুগন্ধি শুঁকার কথা হতো, তাহলে তা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা হতে পারে– এমন চিন্তার কোন প্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না। কারণ, যে কোন ধরনের ঘ্রাণ নাকে পৌঁছে গেলে এতে ঘ্রাণ গ্রহণকারীরও সন্দেহ হতে পারে যে, এ ঘ্রাণ কিসের? তাই অন্যরা যদিও অবিশ্বাস করে, তাহলে এতে ঘ্রাণ গ্রহণকারীর চিন্তা-ভাবনা করার কোন দরকার নেই। কারণ, তিনি নিজেও কোন বিশেষ নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে বলছেন না। অবিশ্বাস করার চিন্তা তখনই হয়, যখন নাকে নির্দিষ্ট কোন বস্তুর ঘ্রাণ এসে পৌঁছে, যে ঘ্রাণটি অমুক বস্তুর অন্য কারও নয়। তখন এ ইলম হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রহণযোগ্য, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই বা থাকে না।

কাজেই এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নির্দিষ্ট ঘ্রাণ ও সুগন্ধি, যেখানে ঘ্রাণযুক্ত সুগন্ধি ব্যক্তি বা বস্তু নির্দিষ্ট, তা হলো ইলম। একে অস্বীকার করা যায় না। তাহলে এ কথার ফল দাঁড়াচ্ছে– এই ঘ্রাণ যদি অনির্দিষ্ট হয়, ঘ্রাণযুক্ত ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য কোন ইলমই নয়। আর নাকের ইলম ঘ্রাণ শোঁকা পর্যন্তই। নাক ঘ্রাণযুক্ত বস্তুকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। এ কাজ ও দায়িত্ব নাকের নয়। এটা হচ্ছে 'যিহন' বা মেধাশক্তির কাজ। তাহলে কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নাকের ইলম যা দ্বারা কেবলমাত্র ঘ্রাণ অনুভূত হয়, ঘ্রাণযুক্ত বস্তু নির্দিষ্ট হয় না, তা গ্রহণযোগ্য কোন ইলম নয়। কারণ, নাককে তৈরি করা হয়েছে কেবলমাত্র ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য, ঘ্রাণযুক্ত বস্তুকে চিহ্নিত করতে নয়।

স্পর্শ ও আস্বাদনশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তির ইলম যথেষ্ট নয়

আসলে স্পর্শ করা এবং আস্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এমন কোন গ্রহণযোগ্য ইলম হাসিল হয় না বলে পবিত্র কুরআন দ্বারা যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তাতে বুঝা গেল, সুদূরপ্রসারী কোন ফলাফল লাভ হতে পারে না; বরং এগুলো দ্বারা আংশিক শাখা জাতীয় ইলম হাসিল হয়। তেমনি শুঁকার মাধ্যমে অর্জিত ইলম এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে কোন ইলম ও জ্ঞান এক নয়, যার ওপর দীন ও দুনিয়ার কোন সুদূরপ্রসারী ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে। বরং এর দ্বারা আংশিক ইলম লাভ হয়। এর মাধ্যমে কোন জিনিসের প্রকৃত অবস্থা ও

হাকীকত স্পষ্ট হয় না এবং জিনিসটিও অন্য থেকে আলাদা হয় না। ফলে নাক সর্বাবস্থায় আংশিক ইলম ও জ্ঞান লাভের পর্যায়ে পড়ে। হাত-পা ও মুখের ওপর এর কোন মৌলিক বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং এর ফলাফলও আংশিক হবে; যা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এবার স্পর্শ যখন কর, স্বাদ গ্রহণ, ঘ্রাণ শুঁকা অর্থাৎ–

قوت لا مسه قوت ذئقه قوت شامه

অন্য শব্দে হাত, পা, জবান ও নাকের মাধ্যমে অর্জিত ইলমও গ্রহণযোগ্য থাকল না; বরং এমন আংশিক বলে প্রমাণিত হলো যার দ্বারা মানবকুলের জন্য কোন ধরনের সুদূরপ্রসারী কল্যাণও সাধিত হবে না, সুফল লাভ হবে না।

যথেষ্ট ইলম একমাত্র নাক, কান ও আত্মার

এখন অনুভূতিশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে তিনটি মৌলিক অঙ্গ অবশিষ্ট থেকে গেল, যেগুলো দ্বারা অর্জিত ইলমকে উপরোল্লিখিত অঙ্গগুলোর তুলনায় গ্রহণযোগ্য বলা যাবে। চোখ, কান ও আত্মা। অর্থাৎ দেখে শুনে ও বুঝে যে ইলম লাভ হয় এ ইলমকে ইলম বলে গণ্য করা যায় এবং এগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনাও করা যায়। এগুলোর উপর ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলও লাভ হয়। সুতরাং চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এ তিনটি অঙ্গ এবং এদের জ্ঞানলাভের শক্তি প্রকৃতই এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ধারক ও বাহক যেগুলোর মাধ্যমে অর্জিত ইলম দ্বারা অনেক বিশেষত্ব ও পৃথক মর্যাদা রয়েছে। যাকে প্রকৃত ইলম বলা হয়। যেগুলোর ফলাফলও মানব জাতির জন্য সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। বরং আমার ধারণা, দেহ ও শরীর রাজ্যের স্থায়িত্ব, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের সঙ্গে এ তিনটি অঙ্গের অর্জিত ইলমের ওপর সীমিত রয়েছে। ইহ-পরকালীন জবাবদিহি, ধরপাকড়, দায়-দায়িত্ব, অনুধাবন এর উপরই বর্তাবে। এ কারণেই পবিত্র কুরআন যেখানেই মানুষের জবাবদিহি ও ধরপাকড়ের কথা বর্ণনা করেছে সেখানেই বিশেষভাবে এ তিনটি অঙ্গ ও শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চোখ, কান ও কল্‌ব-এর দান

এক জায়গায়, যেখানে মানব জাতিকে জ্ঞানদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে– সেখানে এই তিনটি শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য শক্তি কেবল এ তিনটিই; যা দিয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়।

চোখ, কান ও কল্‌ব-এর সুন্দর বর্ণনা

মায়ের পেটে থাকাকালীন মানুষের মধ্যে এ তিনটি শক্তি দান করাকে বিশেষ দান ও ইহসান বলে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

তারপর আমি (দেহকে) ঠিকঠাক করে দিলাম এবং এর মধ্যে আমার রূহ (প্রাণ) ঢেলে দিলাম এবং তোমাদের জন্য শ্রবণ করা, দর্শন করা, অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দান করলাম অথচ তোমরা শুকর আদায় কর খুবই কম। [সাজ্‌দা : ৯]

এরপর মায়ের গর্ভ থেকে প্রসবকালীন অবস্থা বর্ণনাকালেও মানুষের এ তিনটি শক্তিকে বিশেষ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভূমিষ্ঠ করেছেন মাতৃগর্ভ হতে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন কান, চোখ এবং কল্‌ব– যেন তোমরা তাঁর শুকর কর। [নাহ্‌ল : ৭৮]

চোখ কান ও কলব মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী

এরপর মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার জন্য এ তিন শক্তিকেই দায়ী করা হয়েছে। পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে নিজ প্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রক (হাকিম) বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে বিপথগামী হতে দিয়েছে জেনে বুঝে এবং মোহর মেরে দিয়েছেন তার অন্তর ও কানের ওপর আর ঢেলে দিয়েছেন তার চোখের ওপর কালো পর্দা। [জাসিয়া : ২৩]

তিন অঙ্গকে জবাবদিহি করতে হবে

অতঃপর মানুষের বিপথগামী হওয়া এবং পথভ্রষ্টতার জন্য ঐ অঙ্গ তিনটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে এবং দায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অজানা কথার পেছনে ঘুরো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং আত্মা এসবকে এ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, দায়ী থাকতে হবে। [বনি ইসরাইল : ৩৬]

অঙ্গ তিনটির অপব্যবহারই জাহান্নামের কারণ

যখন মানুষ তার মূর্খতা ও অবাধ্যতার কারণে অনবরত পাপকর্ম করে ইহজগতে পশুর ন্যায় হয়ে যায়, আর এর ফলে পরকালে ভীষণ আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এসবের সমূহ দায়-দায়িত্ব ঐ অঙ্গ তিনটির ওপরই বর্তাবে। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের তিন শক্তি ও মাধ্যমকেই দায়ী করা হবে। বলা হবে, তোমাদেরকে যখন

গ্রহণযোগ্য তিনটি ইলম দান করা হয়েছিল এবং এ ইলম দ্বারা তোমরা পরিণাম ফল জানতে ও বুঝতে পেরেছিলে, তাহলে এগুলোকে সত্যের অন্বেষণে কেন ব্যবহার করলে না? কেন এসব অপকর্মে লিপ্ত হলে? এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জীবনের উন্নতি ও ধ্বংস অধিকতর নির্ভর করে এ তিন শক্তির ওপরই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি বহুসংখ্যক জিন ও ইনসানকে– তাদের আত্মা (বোধশক্তি) রয়েছে, কিন্তু তারা বুঝে না। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে কিন্তু তারা শুনে না। তারা যেন চতুষ্পদ জন্তু; বরং এদের চেয়েও অধিক ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। আর এসব মানুষই প্রকৃত গাফেল। [আরাফ : ১৭৯]

অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে–

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ

আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তঃকরণের ওপর, তাদের কানের ওপর এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে কঠিন পর্দা আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। [বাকারা : ৭]

তিন অঙ্গের অর্জিত ইলমের ওপর দুনিয়া ও আখেরাত নির্ভরশীল

সার কথা, উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, ঐ অঙ্গ তিনটি অর্থাৎ চোখ, কান এবং আত্মার ইলম ও জ্ঞানই প্রকৃত মৌলিক ইলম। আর এর

ওপরই অধিকাংশ ইহ-পরকালীন কল্যাণ লাভ হবে। এ ইলম তিনটি যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে সঠিক আমল ও পরকালে সুখ-শান্তি কোনভাবেই লাভ হবে না, পাওয়া যাবে না। আর যদি ইলম সহীহ ও সঠিক হয়, সত্য-সঠিক কাজকর্ম প্রকাশে সমর্থ হয়, তাহলে এগুলোর মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে, কল্যাণকর ও আরামদায়ক হবে।

মনে রাখা দরকার, এখানে হাত, পা ও নাক অর্থাৎ লামিসা, যাইকা ও শাম্মার উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়ে যায়, এগুলোর মাধ্যমে অর্জিত ইলম গ্রহণযোগ্য ও মৌলিক কোন ইলম নয়, যা ইহ-পরকালের ধ্বংস ও উন্নতির কারণ হতে পারে; বরং এ অঙ্গ তিনটির অর্জিত ইলম পূর্বোক্ত তিন ধরনের ইলমের অধীন, ঐ ইলম দ্বারা প্রভাবান্বিত। সুতরাং প্রকৃত ইলম ঐ তিনটিই অবশিষ্ট থাকে, যা চোখ দ্বারা, কান দ্বারা অর্জিত হয় এবং কলব (আত্মা) হতে উদয় হয়।

৯. অধিক শর্তারোপ ইলমের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক

উল্লিখিত অঙ্গ তিনটির ইলমীশক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ মাপকাঠিতে অর্থাৎ যে ইলমের জন্য অধিক শর্ত থাকে, সে ইলম ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় না। আর যেখানে শর্ত অল্প থাকে, সেখানে ইলমের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে থাকে।

চোখের ইলমী চৌহদ্দি সবচে' সংকীর্ণ

উল্লিখিত ইলম তিনটির মধ্যে প্রার্থক্য ও শ্রেণীভেদ রয়েছে, যা পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। যেমন- চোখের জ্ঞান অর্জন ও ইলম হাসিল করার মধ্যে অনেক শর্ত রয়েছে। কানের ক্ষেত্রে এসব শর্ত কম। তাই চোখের জ্ঞান অর্জনের পরিধি খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। চোখ শুধুমাত্র জড় পদার্থকে দেখতে সক্ষম হয়, রূহানী ও আধ্যাত্মিক জিনিস দেখতে পারে না। অথচ রূহ তার অতি নিকটবর্তীই থাকে। এর দ্বারা বুঝা গেলো মা'নী ও সূক্ষ্ম জিনিসের সঙ্গে চোখের কোন সম্পর্ক নেই। যদি মানব আকৃতি সম্পর্কে চোখকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তা বলে দেবে। অথচ যদি মানুষের হাকীকত, উপকারিতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে অপারগ হবে, কিছুই বলতে পারবে না।

তাছাড়া যুগ ও কাল হিসেবে জড় পদার্থকেও অতীত ও ভবিষ্যতে দেখতে পারবে না। যেসব জিনিস অতীত হয়ে গেছে অথবা পরবর্তীতে আসছে, চোখ এসব দেখতে পারে না। এক্ষেত্রে সে অক্ষম। এ জাতীয় জিনিসের দেহ, আকার-আকৃতি ও অবয়ব সম্পর্কেও কোন কিছু বলতে পারে না। চোখের কর্মক্ষেত্র হলো কেবলমাত্র বর্তমানকাল। চোখ বর্তমানে অবস্থিত জিনিসের ওপরই কেবল দৃষ্টিপাত করবে। অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে অপরাগ। তাছাড়া বর্তমানে অবস্থানরত বস্তুগুলোর ক্ষেত্রেও শর্ত অনুধাবন করতে অপারগ হবে। তারপর সামনে হওয়া– এতেও শর্ত হলো চোখ ও বস্তুর মধ্যে মাঝারি ধরনের দূরত্ব থাকতে হবে। চোখ অনেক দূরে হলে হবে না, আবার অতি নিকটেও হবে না। অনেক দূরে হলে চোখ দেখতে পারবে না, অকর্মণ্য হয়ে থাকবে। আর যদি খুব নিকটবর্তী হয়, চোখের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়, তাহলেও চোখ দেখতে পারবে না। এক্ষেত্রেও সে অপারগ ও অসমর্থ হবে।

তাছাড়া উপযোগী দূরত্বে অবস্থানরত বস্তুকে দেখার ক্ষেত্রে এ শর্তও রয়েছে যে, উভয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধক কোন কিছু যেন না থাকে। কোন পর্দা ও বাধা যেন না থাকে। সামান্যতম বাধা বা পর্দাও যদি মাঝখানে এসে যায়, তাহলে চোখ অক্ষম হয়ে পড়বে। আর প্রতিবন্ধক, বাধা-বিপত্তিহীন অবস্থায়ও চোখের দেখার জন্য শর্ত হলো, ঐ বস্তুটি স্থির থাকতে হবে। বস্তুটি যদি চলমান থাকে, নড়াচড়া করতে থাকে, তাহলে চোখও দৃষ্টিশক্তি স্থির করতে পারবে না, দেখতে পারবে না। তবে জোর করে যদি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে দেখাটা ভুল হবে। প্রকৃত জিনিস দেখতে পারবে না। কি হতে কি দেখে ফেলবে। যেমন- ঘূর্ণায়মান অবস্থায় যদি গোল চরকা দেখা হয়, তাহলে তার মাঝের কেন্দ্রবিন্দু, কড়াগুলো সবই অদৃশ্য হয়ে যাবে। রেখাটির মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো অদৃশ্য হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বস্তু মনে হবে, যা তার প্রকৃত বাস্তব রূপ ও আকৃতি নয়।

মোদ্দা কথা হলো, চোখের কর্ম সম্পাদনের জন্য দু'একটি নয়, শর্ত রয়েছে অনেক। যে শর্তগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চোখ তার কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হয়। শর্ত হলো– বস্তুটির আকার-আকৃতি থাকতে হবে, সামনে থাকতে হবে, বর্তমানকালে হবে, নিকটবর্তী হবে, বাধা-বিপত্তি ও মাঝখানে কোন পর্দা অন্তরায় হবে না, ধীর-স্থির-অনড় থাকবে প্রভৃতি। এসব শর্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দেখা ও জ্ঞান অর্জন হবে না। এ কারণেই চোখের জ্ঞান অর্জনের পরিধি ও চৌহদ্দি খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এতসবের পরও যে জ্ঞান লাভ হবে, তা হবে অগভীর। রঙ-রূপ, আকৃতি-প্রকৃতি ও কারুকার্য ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পারবে না। অধিকন্তু কোন দেহকে যদি অপারেশন করে তার কলিজা বের করে ফেলা হয়,

হৃদপিণ্ড বের করা হয়, তবুও চোখ বাহ্যিক রঙ, রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ তার অভ্যন্তরীণ কোন রহস্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারবে না। সে শক্তি তার মধ্যে বিদ্যমান নেই।

বিবেকপূজারীদের চোখের ওপর ভ্রান্ত নির্ভরশীলতা

দেখা যাচ্ছে, দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে অর্জিত ইলম প্রকৃত হওয়া সত্ত্বেও তা অগভীর ও অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। তবুও এর ওপরই বর্তমান দুনিয়ায় সীমাহীন গর্ব, গরিমা ও অহংকার করা হচ্ছে এবং চোখের মাধ্যমে দেখা ইলম ও জ্ঞানকেই সবচে' মৌলিক বলে প্রচার করা হচ্ছে; বিশ্বাস ও একীনের ভিত্তি বলা হচ্ছে। অথচ কোন বস্তু সম্পর্কীয় ইলম, যা দ্বারা বস্তু সম্পর্কে অটল বিশ্বাস ও মনের প্রশান্তি লাভ হয়; তাহলো ঐ বস্তুর হাকীকত ও মৌলিক প্রকৃতির অবলোকন; আকার-আকৃতি, রঙ-রূপ ও কারুকার্যের অবলোকন নয়। চোখের দেখার কোন সম্পর্ক বস্তুর মৌলিক প্রকৃতি ও হাকীকতের সঙ্গে নেই যা কোন বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস ও প্রশান্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে। সুতরাং চোখের মাধ্যমে অর্জিত ইলমকে প্রকৃত ইলম বলা যায় না। অথচ তা সত্ত্বেও প্রত্যেক যুগের নাস্তিকরা চক্ষুষ্মান বস্তুনিচয়কেই তাদের বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি সাব্যস্ত করে রেখেছে। বিদেহী বিষয়াদিতেও চক্ষুষ্মান হওয়ার এবং চর্ম-চোখের মাধ্যমে অবলোকন করার দাবি করে বসে আছে। অধিকন্তু লতীফ ও খবীর (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) সর্বজ্ঞাত আল্লাহ তায়ালাকেও চর্ম-চোখের মাধ্যমে দেখতে চেয়েছে। আর তা না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বসে আছে। ইহুদীগণ বলেছিল–

لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً

হে মুসা (আ.)! আমরা আপনার ওপর ঈমান আনব না যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালাকে আমাদের চর্মচক্ষে চাক্ষুষ না দেখব। [বাকারা : ৫৫]

আর মুশরিকরা বলেছিল–

أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا

> হে নবী! আমরা আপনার ওপর ঈমান আনয়ন করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্বয়ং আল্লাহ অথবা ফেরেশতাদের চোখের সমানে না নিয়ে আসবেন। [বনি ইসরাইল : ৯২]

অথচ এ সকল বিবেকের পূজারী এ সহজ কথাটি অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারেনি যে, চোখকে সূক্ষ্ম ও দেহহীন বিষয়াদি দেখা ও উপলব্ধি করার জন্য বানানো হয়নি। যেমন কানকে আকার-আকৃতি দেখার জন্য এবং নাককে আওয়াজ বা শব্দ শোনার জন্য বানানো হয়নি। এ কারণেই কান দ্বারা যেমন বিভিন্ন দৃশ্য দেখা এবং নাক দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি শোনার দাবি করা বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; তেমনি চোখ দ্বারা ইলম ও জ্ঞান, স্বভাব-চরিত্র, রূহ ও আত্মা এবং আল্লাহ তায়ালাকে অবলোকন করার দাবি করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ দাবি; বক্রবুদ্ধি ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। দেখার সম্পর্ক হলো কেবলমাত্র কারুকার্য, বিভিন্ন চিত্র ও দেহের সঙ্গে; কোন বস্তুর মৌলিক সত্তা, তার হাকীকত ও মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কারুকাজ ও চিত্রাবলীর ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হয় না। বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হয় বস্তুর সত্তা ও মৌলিক প্রকৃতির ওপর। সুতরাং জ্ঞান অর্জনে উল্লিখিত মাধ্যমে অঙ্গ তিনটির মধ্যে চোখের ইলমই অতি সামান্য এবং অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত হলো। অথচ বর্তমান দুনিয়ায় চোখের মাধ্যমে অর্জিত ইলমকে সবার উপরে স্থান দেয়া হচ্ছে। একে সর্বোচ্চ জ্ঞান বলে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। তবে একথা উল্লেখ্য যে, এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

কান ও কলবের জ্ঞানের চৌহদ্দি চোখের তুলনায় বেশি

আগেই বলেছি, কান ও কল্‌বের জ্ঞানের পরিধি চোখের তুলনায় অনেক বিস্তৃত, অনেক বাস্তবভিত্তিক। এ দুটি শক্তি স্থূলদেহের পরিবর্তে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, যা চোখের শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। কান ও আত্মার ক্ষেত্রে স্থান ও কালের কোন শর্ত নেই। কান শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের কথাবার্তাই শুনে না; বরং অতীত-ভবিষ্যতের ঘটনাবলীও অনুভব করতে পারে। এতে সময় ও কাল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া কানের শোনার জন্য ধ্বনিদাতা বা আওয়াজকারীকে সামনে এসে আওয়াজ করতে হবে, তাহলে কান শুনবে, নইলে শুনবে না– এমন শর্তও নেই। বরং ডান-বাম, সামন-পেছন যে দিক থেকেই আওয়াজ আসুক, কান তা শুনতে সক্ষম এবং আত্মা এর দ্বারা একটা কিছু বুঝে নিতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এমন শর্তও

নেই যে, আওয়াজ প্রদানকারী কানের নিকটবর্তী হয়ে বা কানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আওয়াজ করলে কান শুনতে পারবে, নইলে শুনতে না; বরং অনেক অনেক মাইল দূরের আওয়াজও কান শুনতে পারে। কানের ভেতর প্রবেশ করতে পারে এবং কান তা অনুভবও করতে পারে।

এমনকি কান ও আত্মার জন্য এটাও জরুরী নয় যে, মাঝখানের কোন বাধা বা পর্দা থাকবে না, যা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। বাধাহীনভাবে আওয়াজ আসতে হবে, নইলে হবে না। বরং দেয়ালের অন্তরালে রুদ্ধদ্বার কক্ষে যে আওয়াজ করা হয়, কান তৎক্ষণাৎ তা শুনতে সক্ষম হয় এবং বুঝেও নিতে পারে। তাছাড়া কান শুধুমাত্র উপস্থিত বিষয়ই অনুভব করে না; বরং শরীরের গোপন এবং লুকায়িত বিষয় ও ঘটনাবলীও আওয়াজের মাধ্যমে কানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং কান ও আত্মা শ্রবণশক্তি এবং বোধশক্তি দ্বারা অর্জিত ইলম আর চোখের দ্বারা অর্জিত ইলম থেকে নিঃসন্দেহে ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর বলে প্রমাণিত হলো। চোখের তুলনায় এগুলোতে অর্ধেক শর্তও অবশিষ্ট নেই।

কান ও কলবের অতীত ঘটনাবলী অনুধাবনের দলীল

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন জায়গায় পর্দার অন্তরালের, অতীতের গহ্বরে বিলীন ঘটনাবলীর আলোচনা করেছে, যাতে মানুষ সেগুলো জেনে সংশোধিত হয়, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। কুরআনে উল্লিখিত সেসব স্থানে চোখের কথা উল্লেখ করা হয়নি। চোখ যেহেতু এ ময়দানের বাসিন্দা নয়; বরং কান এবং কল্‌ব– শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'টিই এ ময়দানে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

এরা দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণ করেনি– তাদের থাকবে অন্তরাত্মা যা দ্বারা সব কিছু বুঝবে, আর থাকবে কান, যা দ্বারা শ্রবণ করবে। [হজ : ৪৬]

কারণ, হাজার হাজার বছর আগের ঘটনাবলী এবং দুষ্টদের মারাত্মক পরিণাম দেখা চোখের পক্ষে সম্ভব নয়; বরং কান সত্য সঠিক খবরের মাধ্যমে তা শুনতে পারবে, আর আত্মা তা অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে, সাবধান ও সতর্ক হতে পারবে। তাই যে সকল মানুষ ন্যায় ও সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তিকে কাজে লাগায়নি, কানকে সে কাজে নিয়োজিত করেনি, অন্তরকে সে কাজে ব্যবহার করেনি, পবিত্র কুরআন এদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে তুলনা করে তাদের ঐ দু'টি অঙ্গ কান ও আত্মা নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছে। এ দু'টির অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ার কারণে মানব সত্তা, মানবতা ও মানবীয় গুণাবলী থেকে বের হয়ে জীবজন্তুর কাতারে শামিল হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

আপনি কি ধারণা করেছেন যে, তাদের মধ্যে কারা অধিকাংশ মানুষ শুনে এবং বুঝে? এরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং এদের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট, গোমরাহ। [ফুরকান : ৪৪]

এমনিভাবে উপদেশ গ্রহণ ও সতর্কতা, সাবধানতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কান ও আত্মাকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, সুদূর অতীতের ঘটনাবলী কান দ্বারা শোনে, অন্তর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা বোধশক্তি ও আত্মারই কাজ, চোখের কাজ নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُواْ فِى الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۞

এদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের দেহের শক্তি এদের তুলনায় অনেক জবরদস্ত ছিল। অতঃপর তারা দেশে দেশে ঘুরতে লাগল যে– পালিয়ে যাওয়ার কোথাও কোন স্থান আছে কি? এ হলো চিন্তা করার স্থান ঐ ব্যক্তির জন্য, যার অন্তরে আত্মা (বোধশক্তি) রয়েছে

অথবা কান লাগিয়ে শুনেছে (অন্তর ও মনোযোগের সঙ্গে)।
[কাফ : ৩৬-৩৭]

এ জন্যেই কেয়ামতের কঠিন দিনে কাফেররা তাদের দুনিয়াতে থাকাকালীন এ দুই শক্তিকে কাজে না লাগানোর কারণে দুঃখ ও আক্ষেপ করবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

আর (কাফেররা) তারা বলবে– আমরা যদি শুনতাম, যদি আমরা বুঝতাম, তাহলে আজ দোযখবাসী হতাম না।
[মুল্‌ক : ১০]

কানের বোধশক্তির সীমা কল্‌বের তুলনায় সংকীর্ণ

তবে চিন্তা করে যদি দেখা হয়, তাহলে কানের জ্ঞান-পরিধি এতটা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও– যা এ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে– তা অনেক শর্ত দ্বারা শৃঙ্খলিত। অর্থাৎ কানও অনেক নিয়ম-নীতির অধীন ও মুখাপেক্ষী। অন্তত এ শর্ত তো লেগেই আছে যে, কান জড়দেহের বাইরে পা রাখতে সক্ষম নয় এবং জড়দেহের মধ্যেও কেবল আওয়াজ ও সুরধ্বনি পর্যন্ত তার শ্রবণশক্তি কাজ করতে পারে। সেটাও আবার এই শর্তে যে, আওয়াজ যেন খুব দূরের না হয়। তবে এ কথা ভিন্ন থেকে যাবে যে, বাইরের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক দূরের আওয়াজ কানকে শুনিয়ে দিল– আসলে এটা কিন্তু কানের নিজ শক্তির দ্বারা হচ্ছে না; বরং এ হলো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে। কান সর্বাবস্থায় অসহায় পরমুখাপেক্ষী থেকে যাবে। উপর্যুক্ত শর্তাবলী এবং যন্ত্রপাতির সর্বাধিক সাহায্য-সহায়তা সত্ত্বেও কান শুধুমাত্র জড় পদার্থের আওয়াজই শুনতে পারে, রূহানী বা গায়েবী (অদৃশ্য) জগতের আওয়াজ শ্রবণ করা কানের শক্তি-বহির্ভূত ব্যাপার। তাছাড়া জড় জাতীয় স্বর ও আওয়াজই কান শুনতে পারে, আওয়াজকারীকে আলাদা করে চিহ্নিত করা কানের কাজ নয়। কানের এ যোগ্যতাও নেই। অর্থাৎ না শোনে অনুভব করা, অনুধাবন করা ও পরিচয় লাভ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা কানের নেই। ফলে কানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানও কোন শীর্ষস্থানীয় জ্ঞান নয়। সুতরাং এসব অঙ্গের মধ্যে কানকেও বিশেষ কোন স্থান ও মর্যাদার আসন দান করা যায় না।

অনুভব-ক্ষমতা কল্‌বেরই বিশেষত্ব

সার কথা হলো, মানুষের ইলমের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞান হলো এ পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান। যে জ্ঞানের মাধ্যমে অনুভূতির যোগ্য আংশিক বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য, আকার-আকৃতি ও সাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করা যায়। যেগুলো দ্বারা দুনিয়ার বিভিন্ন ধরনের বস্তু ও জিনিস তৈরি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, বিস্তৃতি রয়েছে। এ কারণে পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভকৃত জ্ঞান মৌলিক ও অভ্যন্তরীণভাবে যদিও গ্রহণযোগ্য নয়– কারণ, পঞ্চইন্দ্রিয়কে বাতেনী ও দেহহীন বিষয়াদি অনুভব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি– কিন্তু বাহ্যিকভাবে বিশেষ এক স্তর পর্যন্ত এগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে যেগুলোর শ্রেণী বিন্যাসসহ বিস্তারিত আলোচনা ইতোমধ্যে আপনাদের সামনে এসে গেছে।

গভীরভাবে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও অনুভবযোগ্য জিনিসগুলোকে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলোই অনুধাবন করে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অনুভূতি কল্‌ব ও হৃদয়ের। কেননা, চোখ, কান ও নাকের কাজ অনুভব করা নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে চোখ দেখে। তবে প্রকৃতপক্ষে চোখ দেখে না, দেখে আত্মা ও হৃদয়। এ অবস্থা শ্রবণ করা, আস্বাদ গ্রহণ করা, শোঁকা এবং স্পর্শ করার বেলায়ও। অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কান, নাক, জবান, হাত, পা অনুভব করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকল অনুভূতি কল্‌ব ও আত্মার, ইন্দ্রিয়ের নয়। কাজেই মানব জগতে প্রকৃত অনুভূতিশীল বস্তু, প্রকৃত আলেম ও জ্ঞানী হলো কল্‌ব ও আত্মা। আর এসব অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় নিজ নিজ অনুভূতিতে আত্মার কর্মচারী, সাহায্যকারী এবং খাদেমও বটে। আত্মা বাহ্যিক জ্ঞান আহরণের জন্য তার এসব কর্মচারী এবং এসব গুপ্তচরকে জড়জগতে ছেড়ে দিয়েছে, যাতে এগুলো বিভিন্ন ধরনের মাহসুস (অনুভূত) জিনিসকে নিয়ে এসে আত্মার সামনে পেশ করে। আর আত্মা ঐ ইলমের আলোকে দেহরাজ্যের জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে থাকবে। এ কারণে ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে অনুভূত বস্তুরাজি সম্পর্কে কোন ধরনের অনুভূতি থাকে না। চোখ চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না। কান চিন্তা-ফিকির করে শ্রবণ করে না। এদের মধ্যে এ যোগ্যতাও নেই; আর এজন্য এদের সৃষ্টিও করা হয়নি। এরা কেবলমাত্র দেখতে ও শুনতে পারে। তাদের অনুভূত বস্তুকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসহ অনুধাবন করা এক গোশ্‌তপিণ্ডেরই কাজ, যাকে বলা হয় কল্‌ব। কল্‌বই অনুভব করে এবং তার গৃহীত পলিসি ও কর্মনীতি

মোতাবেক সকল বাহ্যিক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় শ্রমিক ও কর্মচারীর মতো বাহ্যিক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভব করা ইন্দ্রিয়ের কাজ। আর প্রকৃতপক্ষে অনুভব ও অনুধাবন করা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড বা কল্‌বের কাজ।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি কার্যত হৃদয়ানুভূতির ফসল

গভীর মনোযোগের সঙ্গে যদি চিন্তা ও গবেষণা করা হয় তাহলে বুঝা যাবে, প্রকৃতপক্ষে এসব ইন্দ্রিয় অনুভব করতে পারছে না; বরং যা হচ্ছে তাও একমাত্র হৃৎপিণ্ড বা কল্‌বের তাওয়াজ্জুহের ওপর নির্ভরশীল। হৃৎপিণ্ডের তাওয়াজ্জুহ ছাড়া এসব ইন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করা থেকে সম্পূর্ণ বেকার ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকে। বাজারের হাঙ্গামা, শোরগোল, চিৎকার, গান-বাজনা প্রভৃতি নানা ধরনের আওয়াজ ও ধ্বনি কানের মধ্যে প্রবেশ করে, কানের পর্দায় আঘাত করে। যদি মন ও হৃদয়ের মনোযোগ সেদিকে না থাকে, আত্মা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাহলে সুদৃশ্য সিনারী, দালান-কোঠা ও প্রাসাদের কারুকার্য, রঙ-রূপ, দালানের আকাশচুম্বি উচ্চতা কিছুই চোখে ধরা পড়ে না। মনের ধ্যান ও মনোযোগ যদি অন্যদিকে থাকে তাহলে শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, একের পর এক প্রহার ও আঘাত শরীরের ওপর পড়তে থাকে তবুও মন ও আত্মার ধ্যান যদি এদিকে না থাকে, তাহলে মানুষ এসব আঘাতের সামান্যতম কষ্টও অনুভব করতে পারে না। যদি বাতাসের মধ্যে হাজার ধরনের সুগন্ধি ছড়িয়ে থাকে আর মন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তাহলে নাকের মধ্যে সুগন্ধি পৌঁছলেও তা অনুভূত হবে না। অন্য কোন প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, রকমারী সুস্বাদু খাবার যদি চিন্তায় নিমজ্জিত ব্যক্তিকে দেয়া হয়, তাহলে আহার করবে ঠিকই, কিন্তু কোন একটি খাবারের স্বাদও তার জিহ্বায় ধরা পড়বে না। তার পেট যদি নাক পর্যন্তও ভর্তি করে ফেলে, তবুও সে স্বাদ অনুভব করতে পারবে না। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্রবণ করা, অবলোকন করা, স্পর্শ করা, শুঁকা এবং স্বাদ গ্রহণ করা কান, নাক, চোখ, হাত এবং জিহ্বার নয়; বরং এসবই আত্মা বা হৃৎপিণ্ডের কাজ। এসব অনুভূতি যদি এ ইন্দ্রিয়গুলোর নিজস্ব হতো, তাহলে চোখ, কান ও নাকে অনুভূত বস্তুগুলোর আকার-আকৃতি এদের রক্ত-মাংসে মিশে যেত। অথচ এ জিনিসগুলো সংরক্ষণ করার পরিবর্তে এর দায়িত্বও আত্মাকে দেয়া হয়েছে। আত্মা এ দায়িত্ব আদায় করে এবং সবকিছু সংরক্ষণ করে। এ কারণেই চোখ, নাক ও কান যদি বন্ধও হয়ে যায়, তবুও এসব অনুভূত

জিনিসের সম্পূর্ণ আকার-আকৃতি, আওয়াজ ও স্বরধ্বনি, স্বাদ সবসময় হৃদয়াভ্যন্তরে হাজির পাবেন। অথচ এসব ইন্দ্রিয়ে তা পাবেন না। আত্মা যখনই ইচ্ছা করবে চোখ, কান ও নাক ছাড়াই এসব অবস্থাকে হাজির করে দেখতে, শুনতে ও আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। নাক, কান ও চোখ কখনো দেখতে, শুনতে ও স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না, যেহেতু এসব তাদের মধ্যে সংরক্ষিত নেই।

অনেকে বলে থাকে– আমি অমুক দিন এত সুস্বাদু খাবার খেয়েছিলাম যে, আজ পর্যন্ত এর স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ স্বাদ তার জিহবা ও মুখে নেই। যদি এমনটাই হতো তাহলে পরবর্তী নতুন খাবারের স্বাদ আগের স্বাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন স্বাদই তখন নির্ভেজাল থাকতো না। সব ধরনের খাবারের স্বাদ মিলিত হয়ে যাওয়ার ফলে স্বাদই শেষ হয়ে যেত। ফলে দেখা যাচ্ছে, এসব স্বাদ হৃদয়ের কোষাগারে সংরক্ষিত থাকে। আত্মা ও হৃদয় যখন ইচ্ছা করে, অতীতের স্বাদগুলো নিজ কল্পনায় নিয়ে এসে এর মাধ্যমে ভোগ-আনন্দ লাভ করে।

এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব গুণ নয়; বরং এ গুণ হলো হৃৎপিণ্ড বা আত্মার। তাই হৃৎপিণ্ডই সব সংরক্ষণ করে রাখে। মোট কথা, মানবদেহে প্রকৃত অনুভূতিশীল জ্ঞানী অঙ্গ হলো শুধুমাত্র আত্মা বা হৃৎপিণ্ড। আর অন্যান্য অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলো কেবল তার যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রর মতো কাজ সম্পাদন করাই কেবল তাদের দায়িত্ব।

ধরুন, কোন ব্যক্তি যদি চশমা লাগিয়ে দেখে, তখন কি বলা হবে যে, জ্ঞান অর্জনের শক্তি চশমায় রয়েছে এবং দেখা ও অবলোকন করাও চোখের কাজ নয় বরং চশমার কাজ হবে? সকলেরই জানা যে, দেখার কাজ চোখই করবে, চশমা নয়। চশমার মধ্যে দৃষ্টিশক্তি মোটেই নেই। তাহলে চোখ থেকে খুলে ফেললেও চশমা বিভিন্ন বস্তু দেখতে পারত। কিংবা মনে করুন, কোন ব্যক্তি তার কানে শ্রবণ-যন্ত্র লাগিয়ে শুনছে। তখন এ শোনার কাজটা কি যন্ত্রের হবে? কখনো নয়, বরং কানের হবে। তা না হলে কান থেকে আলাদা করার পরও ঐ যন্ত্র শুনতে পারত। এদিকে চোখ থেকে চশমা পৃথক করে দিলেও চোখ দেখতে পারবে– যদি চোখ রোগাক্রান্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত না হয়। কান থেকে যন্ত্র খুলে দেয়ার পরও কান শুনতে পারবে যদি ব্যাধিগ্রস্ত না হয়। কারণ, শ্রবণশক্তি এবং দেখার শক্তি কান ও চোখের মধ্যে রয়েছে; যন্ত্রের মধ্যে নয়। ঠিক তেমনিভাবে চোখ হলো হৃদয়ের চশমা আর কান হৃদয়ের শ্রবণ যন্ত্র। প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি চোখ

ও কানের নয় বরং হৃদয়ের। তাই চোখ হৃদয় থেকে আলাদা হয়ে দেখতে পারে না। তবে হৃদয়াত্মা চোখ ছাড়াও দেখতে পারে। কারণ, মূল শক্তি যন্ত্রের মুখাপেক্ষী হয় না; বরং যন্ত্র মূল শক্তির মুখাপেক্ষী হয়। তবে শর্ত হলো মূল শক্তি সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত থাকতে হবে। যেন ত্রুটিযুক্ত এবং দুর্বল না হয়।

সার কথা হলো– চোখ ও কান যেহেতু হৃদয়ের যন্ত্রবিশেষ, আর হৃদয় হলো মূল শক্তিধর, সুতরাং শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি হৃদয়েরই হবে, চোখ ও কানের নয়।

অন্তর ঘুমের সময় যেমন তেমনি মৃত্যুর পরও অনুভূতিশীল থাকে

অন্তর যেমন নিদ্রাকালীন অনুভূতিশীল থাকে; তেমনি মৃত্যুর পরও থাকবে। এ কারণে যে, মানুষ নিদ্রাকালে– যা মৃত্যুরই ছোট বোন– ঐসব দেখে ও শুনে যা জাগ্রত অবস্থায় দেখে এবং শুনে। অথচ সে সময় চোখ-কান নিদ্রায় বিভোর হয়ে অকর্মণ্য হয়ে যায়। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দৃষ্টিশক্তি রয়েছে অন্তরে, চোখে নয়। তাই যদি সামান্য অগ্রসর হয়ে আমি এ কথা বলে দেই, বরং আকীদা ও বিশ্বাস রাখি যে, প্রকৃত মৃত্যুর পরও যখন চোখ-কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে, এসবের চিহ্নও থাকবে না, তবুও মানুষ তার হৃদয়যন্ত্রের মাধ্যমে সব কিছু দেখতে ও শুনতে পারবে। যা (এক সময়) চোখ ও কান দ্বারা দেখত, শুনত এবং আলমে বরযখের বিস্ময়কর অবস্থা তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির কাছে প্রকাশ হতে থাকবে। যেগুলো দীন ও শরীয়তের বাহক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বরযখ সম্পর্কেও কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় থাকা বা বিস্ময়াবিভূত হয়ে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নিদ্রা হলো একটি অস্থায়ী ও সাময়িক মৃত্যু– যে মৃত্যুতে শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে আত্মা সজাগ থাকে। আত্মা যদি সজাগ না-ই থাকে তাহলে স্বপ্নযোগে এতসব বিস্ময়কর অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় কেমন করে? আর মৃত্যু হলো প্রকৃত মৃত্যু। এতে আত্মা শরীরকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে চলে যায়। আর শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো হয়ে যায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত; মিশে যায় মাটির সঙ্গে। তবুও আত্মা সজাগ ও কর্মঠ থাকে এবং সবকিছু দেখতে ও শুনতে থাকে– যা কিছু আলমে বরযখে তার সামনে আসে। সুতরাং আত্মা যেমন স্বপ্নযোগে চোখ ও কান ছাড়াই সবকিছু দেখে ও শুনে থাকে তেমনি 'আলমে

বরযখে'ও বাহ্যিক চোখ-কান ছাড়াই সবকিছু দেখবে ও শুনবে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইন্দ্রিয়গুলো নিজেরাই অনুভূতিশীল বা অনুভূতির প্রাণ-কেন্দ্র নয় এবং এ দায়িত্ব নিজেরা আদায় করতে পারে না; বরং এসব কাজ ও দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে আত্মাই একা সম্পাদন করে। নিদ্রাজনিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর বাহ্যিক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়বিহীন হয়েও একইভাবে অনুভূতিশীল থাকে, দায়িত্ব সম্পাদন করে ও করতে থাকে।

সার কথা, এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অনুভূতি আত্মা ও হৃদয়েরই গুণ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের নয়। বরং তাদের নিজেদের অনুভূতিও তাদের মধ্যে নেই। হৃদয়ের অনুভূতিকে কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধির মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়।

অনুভূতির মাধ্যমে আত্মা প্রভাবিত হয়, অঙ্গ-ইন্দ্রিয় নয়

আরেকটু এগিয়ে বললে এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব অনুভূত জিনিস দ্বারা ভাল-মন্দ যে কোন অবস্থা হওয়া এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আর তা সুখকর হোক বা কষ্টদায়ক হোক– এগুলো অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। আর অঙ্গগুলোর মধ্যে এ যোগ্যতাই নেই; বরং এককভাবে আত্মাই কাজ করে থাকে। কোন বেদনাদায়ক কথা যদি কান শোনে, তাহলে আত্মাই ব্যথিত ও মর্মাহত হয়, কান নয়। আর যদি কোন সুন্দর সুসজ্জিত দৃশ্য চোখের সামনে এসে যায়, তাহলে এর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করবে আত্মা, চোখ নয়। এতে স্পষ্ট হয়ে যায়, এ অঙ্গগুলো অনুভূত জিনিসের ভাল-মন্দ সবই একত্রে সংগৃহীত করার অধিকারী মাত্র। তাও আবার হৃদয়ের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ অনুভূত জিনিসের গুণাগুণ ও বিশেষত্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা। এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এদের কাজ ও দায়িত্ব নয়। এ কারণে আত্মা শুধুমাত্র জিনিসগুলোর এককভাবে অনুভবকারীই নয়; বরং এসব জিনিসের স্বভাবজাত গুণাগুণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা আত্মাই এককভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। এসব অঙ্গ কোনভাবেই আত্মার সঙ্গে অংশীদার হতে পারে না। যেহেতু এগুলো যন্ত্র ও হাতিয়ারস্বরূপ, এর বেশি কিছু নয়। এতে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আত্মা তার শোনা ও দেখার কাজে এসব অঙ্গের মুখাপেক্ষী নয়। প্রভাবান্বিত হওয়া এবং স্বাদ ও সুখ-দুঃখ অনুভব করতেও এদের মুখাপেক্ষী নয়। আর এ হচ্ছে আত্মার প্রকৃত আলেম ও জ্ঞানী, অনুভূতিশীল হওয়া এবং হাল ও অবস্থার ধারক-বাহক হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অনুভূতি শক্তি দ্বারা অনুভূত জিনিসের আবিষ্কারকও আত্মা

এখানেই শেষ নয় যে, আত্মা শুধুমাত্র অনুভূত জিনিসের মধ্যে ঐসব জিনিসকেই অনুভব করতে সক্ষম হয় যা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- চোখ, নাক প্রভৃতি শুধুমাত্র ঐ সকল জিনিসকেই অনুভব করতে পারে, যা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। তা আকার-আকৃতি হোক অথবা আওয়াজ ও সুগন্ধি হোক। অথচ আত্মা তার অনুভূতিতে এসবের মুখাপেক্ষী নয় যে, কেবল ঐ সকল জিনিসই অনুভব করতে সক্ষম যা পূর্ব হতে বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে; বরং আপন কল্পনাশক্তি দ্বারা অবিদ্যমান অস্তিত্বহীন জিনিসকেও নিজ অন্তরে উপস্থিত করে অনুভব করতে পারে। সুতরাং আত্মা কেবল অনুভূত জিনিসকেই অনুভব করে না; বরং এক পর্যায়ে আবিষ্কারও করে। যখন ইচ্ছা করে তখন কল্পনার জগতে শহর-বন্দর, বাগান-উদ্যান তৈরি করে নেয় এবং তাতে ভ্রমণ করতে থাকে। আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। আর এক্ষেত্রে কান, নাক ও চোখের কোন খবরই থাকে না। তাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই।

সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলোর বিপরীতে কলবের মর্যাদা

আত্মা যে কেবলমাত্র অনুভূতি লাভ করে তাই নয়; বরং সে কোন অঙ্গের মুখাপেক্ষীও নয়। এমনকি আত্মা আগে থেকে অনুভূত জিনিসের বাস্তবে বিদ্যমান হওয়ারও মুখাপেক্ষী নয়। এর দ্বারা আত্মার জ্ঞানজনিত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং ঐসব অঙ্গের অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে এবং প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অনুভূতি ও অনুধাবন আত্মারই কাজ। আর অনুভূত জিনিসের আবিষ্কার ও রূপদানও আত্মারই কাজ, অন্য কারও নয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কোথাও আত্মা ঐ অঙ্গগুলোর মাধ্যমে অনুভব করে, আবার কোথাও এসবের মাধ্যম ছাড়াই অনুভব করতে পারে। আবার কখনও নিজের মধ্যে কাল্পনিক বস্তু তৈরি করে অনুভব করতে থাকে। প্রথম প্রকার আত্মার ইলম মা'লুম (জাত বস্তু)-এর অধীন হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারে মা'লুম ইলমের তাবে ও অধীন হয় এবং প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে আকার-আকৃতি এসে তা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আত্মা তা দেখতে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারে ইলম আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। আকার-আকৃতি সবই তৈরি হয় অন্তরে, অনুভূতও হয় অন্তরে।

মোট কথা, বাইরের অনুভূত বস্তু হোক অথবা হৃদয়াভ্যন্তরের ইলম ও জ্ঞানের ইমাম বা নেতা– সর্বাবস্থায় আত্মাই হয়ে থাকে। তার অনুভূতির ভালমন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধের ওপরই দেহরাজ্যের ভাল-মন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ভর করে। এমতাবস্থায় অনুভূতিতে যদি ভুল-ভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহলে তাতে অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সরাসরি দায়ী হবে না, ত্রুটিকারী হবে না। অনুভূতিতে যেহেতু আত্মাই মূল ছিল। এ কারণেই পবিত্র কুরআন এসব অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত ইলম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মাকেই মূল বলে সাব্যস্ত করেছে। আর ঐসব মানুষ যারা সত্য দর্শন হতে চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং সত্য অনুকরণের শক্তিকে অন্য কাজে ব্যয় করে আর কখনো উপদেশ গ্রহণ করে না, সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদেরকে চোখের অন্ধ, বুদ্ধির অন্ধ বলেনি; বরং হৃদয় ও আত্মার অন্ধ বলেছে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ ✡

এসব মানুষ কি ভূপৃষ্ঠ ভ্রমণ করে না, তাহলে (চোখে দেখে) তাদের আত্মা সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো অথবা কান দ্বারা কোন সত্য কথা শুনে নিত। প্রকৃত কথা হলো এই– তাদের চোখ অন্ধ নয়; বরং বক্ষাভ্যন্তরে তাদের হৃদয়াত্মার চোখই অন্ধ। [হজ : ৪৬]

সার কথা, পবিত্র কুরআনের আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অনুভূতিশীল ইন্দ্রিয়গুলো তাদের অনুভূতিতে মূল নয়; বরং আত্মাই হলো মূল। ইন্দ্রিয়গুলোর অর্জিত ইলম ও জ্ঞান প্রকৃত ও মৌলিক কোন জ্ঞানও নয়। তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যও নয়। তার চোখ, কান ও মস্তিষ্কের অর্জিত ইলম কিছুটা গ্রহণযোগ্য ও মৌলিক ফলাফলের ধারক-বাহক যদি হয়ও, তবুও এগুলোর মধ্যে সবল-দুর্বল হিসেবে স্তরভেদ থাকার কারণে পরিণামে সব ইলম আত্মারই থেকে যায়। যার ওপর মানব-রাজ্যের কল্যাণ ও মঙ্গল, আদল ও ইনসাফ নির্ভরশীল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

وفى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب -

মানবদেহে একটি গোশ্‌তপিণ্ড রয়েছে। যখন এটি টুকরা সুস্থ ও সঠিক থাকে, তখন সম্পূর্ণ শরীর সুস্থ ও সঠিক থাকে। আর যখন এ গোশ্‌তপিণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ দেহ নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান থেকো! এ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

ইন্দ্রিয়ের ইলমের মতো মস্তিষ্কের ইলমও আত্মারই দান

মানবিক ইলম ও জ্ঞান শুধুমাত্র পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আরেকটি সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ ইলম রয়েছে, যা বাতেনীভাবে ইলম নামে আখ্যায়িত ও ভূষিত হওয়ার যোগ্য এবং মূল্য ও মর্যাদা হিসেবে পঞ্চইন্দ্রিয়ের ইলম থেকে উচ্চস্থানীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ। এ ইলম হলো মস্তিষ্কপ্রসূত। যখন চোখ, কান ও নাক অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন শুধুমাত্র মস্তিষ্ক ও তার প্রাথমিক শক্তি কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া মস্তিষ্কপ্রসূত ইলম ইন্দ্রিয়সমূহের আংশিক ইলম থেকে বিস্তৃত, ব্যাপক ও গভীর হয়ে থাকে। যে ইলম জিনিসের আকার-আকৃতি অতিক্রম করে তাদের মৌলিক প্রকৃতি ও ভিত্তিমূলের সন্ধান দিতে পারে এবং এমন এক বিশেষ মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করে, যা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলো জিনিসের আকার-আকৃতি ও আওয়াজ প্রভৃতি ঠিক ঠিক অনুভব করে দেয় সত্য কিন্তু নিজে অনুভব করতে সক্ষম হয় না। অথচ মস্তিষ্ক তার বিশেষ অনুভূতি-শক্তির কারণে তার অনুভূতিতে নিজেও অনুভূতিশীল যে, অনুভূত জিনিসগুলো কি এবং কেন? আর এদের মধ্যে কি কি মূলনীতি, মৌলিক পদার্থ গোপন রয়েছে, যার মাধ্যমে অনুভূত জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করছে। ফলে মস্তিষ্ক কেবল আকার-আকৃতি পর্যন্তই নয়; বরং এদের অর্থ উদ্দেশ্য এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী যথাযথভাবে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়। যার মাধ্যমে যেহেনের মেধা অনুভূত জিনিসের আকার-আকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, প্রকৃতি ও গুণাবলী এ দুটোরই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায়। আর এটা হলো অনুভূতির প্রাথমিক স্তর, যা মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে। পবিত্র কুরআন অনুভূতি শক্তিকে ফিকহ নামে আখ্যায়িত করেছে– যার মানে হলো অর্থ এবং ভাব অনুধাবন করা।

অনুধ্যান ও অনুধাবন কার্যত আত্মারই গুণ

চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে, পঞ্চইন্দ্রিয়ের ইলমের মতো অনুধ্যান, অনুধাবন ও দূরদর্শিতা কার্যত আত্মা ও হৃদয় থেকেই উদিত হয় এবং হৃদয়ের পর্দায় মস্তিষ্কের সাহায্যে প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং কাফেরদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি যা কান ও চোখের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে ফলহীন নিরর্থক বলেছেন এবং তাদের অন্তরাত্মাকে অনুধাবন ও দূরদর্শিতা-শূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে মস্তিষ্কের ব্যাপারে একথা বলেননি। আর অন্তরে যদি বুদ্ধি না থাকে, তাহলে বাহ্যিক আকৃতিকেই দেখে থাকে। ভেতরের রহস্য তাদের হৃদয়-আত্মায় প্রবেশ করে না। তাদের দেখাশোনা সবই নিষ্ফল। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

لهم قلوب لا يفقهون بها

তাদের আত্মা ও হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না।

এখানে অস্বীকারকারীদের (কাফের) দেখাশোনাকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা এ আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের বুদ্ধিহীনতার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হৃদয়ের প্রকৃত কাজ ও গুণ শুধুমাত্র শোনা ও দেখা নয়; বরং অনুধাবন করাও তার কাজ। যার উপাধি হলো ফিকহ– যা আত্মারই একটি বিশেষ গুণ। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বভাবজাত দায়িত্ব ও কর্তব্যের মতো আত্মার মধ্যেও সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

আত্মারই বিশেষ গুণ হচ্ছে অনুধাবন করা

প্রকৃতপক্ষে স্বভাবজাত অনুভূতি ও অনুধাবন-এর ঊর্ধ্বে আরও একটি বিশেষ গুণ ও অবস্থা রয়েছে, যে গুণে অন্য কোন অঙ্গ কোনভাবেই তার সঙ্গী ও শরীক হতে পারে না। আর এ গুণটি হলো– আত্মা যেমন অনুভূত জিনিসের আকৃতি-প্রকৃতি, তার অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী হুবহু প্রতিফলিত করে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তেমনি অনুধাবনকৃত বিষয়াদিতে কারিগরি ও পরিবর্তন করে– এদের চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং কথা থেকে কথার জন্মদান করার পর এক ইলম হতে একাধিক ইলমের দ্বার নিজের জন্য উন্মোচিত করে নেয়। অর্থাৎ যে অনুভব আংশিক বিষয়ের মূলে পৌঁছেই সামনে অগ্রসর হয় এবং এর মূল কারণ ও প্রকৃতি উদ্ভাবন করে মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে ফেলে, যার মাধ্যমে হাজারো

আংশিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়, সেটাই হলো অনুভব ও অনুধাবনের ঊর্ধ্বের বস্তু। পবিত্র কুরআন হৃদয়ের এ বিশেষ গুণের নামকরণ করেছে আকল (বিবেক-বুদ্ধি) বলে। আর এর অর্থ স্বভাবজাত বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নয়; বরং প্রকৃত বুদ্ধি– যা বস্তুরাজির মৌলিক প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় এবং বস্তুবিশেষের আংশিক অবস্থা দেখে তার অর্থ ও মৌলিক প্রকৃতি, হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর তা নিঃসন্দেহে কেবল আত্মারই বিশেষত্ব। পবিত্র কুরআন এ গুণকেও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? তাদের অন্তরাত্মা হাজির থাকত, যা দ্বারা তারা অনুধাবন করবে ও বুঝবে।

এ আয়াতের মর্ম হলো এই– এসব অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে থাকবে। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক হাল-অবস্থা দেখে থাকবে, যেগুলোর আকার-আকৃতি, ভেতরের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ তাদের অন্তরে প্রবেশ করে থাকবে এবং তারা বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করে থাকবে। এত কিছুর পরও যখন তারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়নি, তাদের দৃষ্টি বিস্ময়কর জিনিসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ করেনি, নিজের প্রভুর সঠিক পরিচয় লাভ করে তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য করেনি; তাদের অন্তরে প্রভুর যিকির ও আবেগ-উৎসাহ সৃষ্টি হয়নি– তাহলে এমতাবস্থায় তাদের ভ্রমণ অনুধাবন ও অনুভূতি নিরর্থক ও নিষ্ফল হলো, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

আত্মার অনুভূতির দু'টি দিক

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পবিত্র কুরআন আত্মার অনুভূতির দু'টি শ্রেণী উল্লেখ করেছে। এক. বোধশক্তি– এটা হলো এমন একটি শক্তি যা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বিষয়কে তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ অর্থ ও গুণাগুণসহ হুবহু মনের পর্দায় প্রতিফলিত করে নেয়। দুই. বিবেক-বিবেচনা শক্তি– এ শক্তি দ্বারা অনুধাবনকৃত বিষয়াদিতে প্রভাবশালী কর্তার ন্যায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এদেরকে সামনে অগ্রসর করে নিয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তৃত, অস্পষ্টকে সুস্পষ্ট, গোপন বিষয়কে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট

করে দিয়ে এক মণ পরিমাণ ইল্মকে হাজার মণে পরিণত করে দেয়। তারপর এর মধ্যে থেকে মূল কারণ বের করে আংশিক বিষয়কে মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেয়, যার দ্বারা ইলম ও জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে যায়। সুতরাং আত্মার সর্বোত্তম বিশেষ শক্তি ও গুণ হলো বিবেক-শক্তি এবং বুদ্ধিশক্তি। যে শক্তি তার জন্মগত, স্বভাবজাত ও মৌলিক প্রকৃতি হিসেবে মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর শেষ পর্যায়ে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু আত্মাই মস্তিষ্কসহ সকল অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের ওপর এককভাবে ক্ষমতাবান কর্তা, আর তারই ইঙ্গিতে মস্তিষ্কসহ সকল অঙ্গ পরিচালিত হয়ে থাকে।

নবীন-প্রবীণ চিন্তাবিদদের চিন্তার প্রান্তসীমা

সাধারণত চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণ বিবেক-বুদ্ধিরই পূজারী হয়ে থাকেন। তাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা বিবেক-বুদ্ধির ওপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে। আগের দিনের দার্শনিকগণ আকল ও বুদ্ধিকে আসন দান করেছেন। তাদের ধারণা অনুযায়ী গ্রহ, নক্ষত্র ও নভোমণ্ডল আকল-এর দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর মধ্যে সবচে' বড় সৃষ্টিকারী আকলকে 'আকল-আউয়াল' বলা হয়ে থাকে। আর বর্তমান যুগের দার্শনিকগণ– যাদের দর্শনে বিজ্ঞানের প্রলেপও রয়েছে– তারাও একে পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ্ বলেন না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যারা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকারও করেন না। তারা (আকলকে) জগতের পরিচালক শক্তি বলে বিশ্বাস করেন। দুনিয়ার দৈনন্দিন পরিবর্তন অধিকাংশই আকল-এর কারণে হয়ে থাকে। তাছাড়া তারা সৃষ্টিজগতকে অতিক্রম করে আল্লাহর ওহীর ওপর আকলকে কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং দীনি ও শরঈ বিষয়াদিতেও তাদের অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আকলকে পরিচালকের মর্যাদা দেয়। তারা মনে করে– আকল ও বুদ্ধির গলদেশে যা ঢুকে যাবে তাই হবে গ্রহণযোগ্য; এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণয়োগ্য হবে না। অথচ এটা যে তাদের বোকামি ও ভুল ধারণা, এ সত্যটাও তারা বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না।

আকল সম্পর্কে বুযুর্গদের দৃষ্টিভঙ্গি

এ জাতীয় বাজে কথা ও বক্তব্য থেকে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারী বুযুর্গগণ সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছেন। তাঁরা একথা স্বীকার করেন না যে, আকল একটি অত্যন্ত সম্মানিত অনুভূতি-যন্ত্র এবং এর দ্বারা অনেক মারাত্মক, ঝামেলাপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ইলমী বিষয়াদির সুরাহা হতে পারে। আকল এমন নাজুক এবং দার্শনিক স্তর ও বিষয়ে কর্ম সম্পাদন করে থাকে যেখানে কোন ইন্দ্রিয় পৌঁছতে ও প্রবেশ করতে পারে না। এজন্যে দীন ও দুনিয়া উভয় স্থানে আকল-এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে শর্ত হলো, আকলকে তার সীমার মধ্যে রাখতে হবে। শরীয়তও আকল-এর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বকে ইহ-পরকালীন উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য স্বীকার করেছে। আকল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীস এবং মুসলিম দার্শনিক জ্ঞানীদের অনেক জ্ঞানগর্ভ উক্তি রয়েছে।

আকল-এর প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা

তবে আকল (বুদ্ধির)-এর কর্ম সম্পাদনের আকার-প্রকার ও ধরন দেখে বিচার করলে একে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না। তাছাড়া আকল তার অনুধাবন ও অনুভূতিতেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়– যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম তাকে সাহায্য-সহায়তা না করে। অর্থাৎ ইলমের সাহায্য ছাড়া আকল তার অনুভব ও অনুভূতির দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এ কারণেই আকল তার অনুভূতিতেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; হুজ্জত ও প্রমাণ হওয়ার মধ্যেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অধিকন্তু এক পর্যায়ে পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি থেকেও আকল-এর অনুভূতি দ্বিতীয় স্তরের অধিকারী হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো– এই পঞ্চইন্দ্রিয় তাদের অনুভূতি লাভের শুধুমাত্র অনুভূত বস্তুরই অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকার মুখাপেক্ষী ছিল। কোন জিনিস যখনই অস্তিত্বশীল হবে এবং তার উপযোগী কোন এক ইন্দ্রিয়ের যথাযথ আয়ত্বে এসে যাবে, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়টি অনুভব করে ফেলবে। অর্থাৎ চোখের উপযোগী হলে তার আকার-আকৃতি অনুভব হয়ে যাবে। কানের উপযোগী হলে স্বরধ্বনি অনুভূত হবে। নাকের উপযোগী হলে এর সুগন্ধ-দুর্গন্ধ অনুভব হয়ে যাবে।

সার কথা হলো, ইন্দ্রিয়সমূহ অনুভব করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বস্তুর অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী ছিল। অস্তিত্বহীন জিনিসকে অনুভব করতে সক্ষম ছিল না। অথচ

আকল-এর অনুভব করার জন্য শুধুমাত্র জিনিসের অস্তিত্ববান ও বিদ্যমান হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অস্তিত্ববান বস্তুর ইলম যেহেন বা মস্তিষ্কে না এসে পৌঁছাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই বুঝবে না। কারণ, আকল মালুমাত (অস্তিত্বহীন অনুভব জিনিস) ও মানসুসাতেই (অস্তিত্বশীল অনুভূত বস্তু) তার কর্মকাণ্ড ও কর্মক্ষমতা দেখাতে এবং প্রকাশ করতে পারে। অজানা জিনিস সম্পর্কে কিছুই করতে পারে না। এমনকি কোন অজানা জিনিসকে যদি জানতে চায়, তাহলে জানা জিনিসগুলোর সাহায্যে জানতে পারে। অজানা বস্তুর ক্ষেত্রে জানতে পারে না। এর কারণ হলো– আকল-এর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা, যা যেহেনী এবং মেধা সম্পর্কিত কাজ; আর তা যেহেন-এর মধ্যেই করা যায়।

খোলাসা কথা হলো, যেহেন ও মেধার ক্ষুদ্রতম পাত্রে বিশাল আকৃতির দেহগুলো তাদের জড়বাদী দৈর্ঘ্য-প্রস্থসহ সংকুলান হতে পারে না। বরং ঐ দেহাকৃতিগুলোর শুধুমাত্র জ্ঞানজনিত আকৃতিগুলো আসতে পারে, যেগুলো জড়জাতীয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-শূন্য; আর তখনই কেবল চিন্তা ও গবেষণাশক্তি কাজ করতে পারে। তাছাড়া মেধাশক্তিতে প্রতিফলিত আকার-আকৃতিগুলোর নামই তো ইলম। যেগুলো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আগমন করে এবং মেধাপটে অংকিত হয়ে যায়। বস্তুরাজির এ আকৃতিকে মেধাপটে নিয়ে আসার নাম অনুভব করা ও অনুধাবন করা। আকল এসব অনুধাবনকৃত কিংবা জেনে নেয়া জিনিসের মেধাপটে অংকিত ফটোগুলো সাজিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। এর ফলস্বরূপ কিছু নতুন জিনিস জেনে নিতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে। সেটা এভাবে হতে পারে যে, আংশিক বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে মৌলিক নীতি তৈরি করে নিবে এবং এর মাধ্যমে নতুন কিছু আংশিক বিষয়াদি জেনে নিবে। অথবা কোন মৌলিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি আংশিক বিষয়কে অন্য আরেকটি আংশিক বিষয়ের ওপর কিয়াস (অনুমান) করে। একটি হুকুম অন্যটির ওপর পৌঁছে দিবে। এভাবে এ জাতীয় আরও কয়েকটি আংশিক বিষয় একত্রিত হয়ে তার নতুন ইলমের পরিধি বৃদ্ধি করবে। অথবা এ আংশিক ইলম থেকে সুক্ষ্মতম ইলমে লতীফা পয়দা করে গভীর ইলম-এর সীমাকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করে দিবে। তবে আকল-এর এসব ইলমী ও জ্ঞানবিষয়ক কাজ যেহেন-এর মধ্যেই হয়ে থাকে। যেহেনের মধ্যে দেহাকৃতি প্রবেশ করে না, ইলমী আকার-আকৃতিই কেবল প্রবেশ করতে পারে। চিন্তাশক্তি এদের মধ্যেই যেহেন-এর ভেতর কাজ করতে থাকে– যা দ্বারা নতুন নতুন জিনিস জানা হয়ে যায়।

আকল পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয় এবং অনুধাবনও পূর্ণাঙ্গ নয়

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আকল অস্তিত্বমান শরীরে সে পর্যন্ত কোন কাজ করতে পারে না, যে পর্যন্ত দেহাকৃতির ইলমী ফটো গ্রহণ করার মাধ্যমে যেহেন ও মেধার কোষাগারে পৌঁছতে দেখা না যায়। আর দেহের নমুনা যেহেনে পৌঁছে দেয়া পঞ্চইন্দ্রিয়ের কাজ। অতএব আকল তার অনুভূতি লাভে ও কর্ম সম্পদনে পঞ্চইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে পঞ্চইন্দ্রিয় তাদের অনুভূতি লাভে আকল-এর মুখাপেক্ষী নয়। জীবজন্তুও আকার-আকৃতি ও আওয়াজ বুঝে নিতে সক্ষম। অথচ আকল-বুদ্ধি বলতে এদের মধ্যে কিছুই নেই। তাছাড়া মানুষও যখন আকার-আকৃতি, দৃশ্য, আওয়াজ প্রভৃতি চোখ, কানের মাধ্যমে অনুভব ও অনুধাবন করে, তখন কোনরূপ বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে করে না; বরং অনুভূতিহীন অবস্থায় এবং চোখ যদি কোন দৃশ্যের ওপর নিপতিত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে তাৎক্ষণিকভাবে তা অনুভব করে ফেলে। এ অনুভূতিতে চোখের জন্য কোন প্রকার জ্ঞানপ্রসূত দলিল-প্রমাণের দরকার হয় না।

অতএব, আকল-এ অর্জিত ইলম যত বড় ও সম্মানিতই হোক না কেন, তা নির্ভর করে ইন্দ্রিয় ও তাদের অনুভূত জিনিসের ওপর। আর ইন্দ্রিয়ের ইলম যত অল্পমূল্য ও অল্প মর্যাদাপূর্ণই হোক না কেন, তা আকল ও আকলী যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়, মুখাপেক্ষীও নয়। তাহলে ফল দাঁড়াচ্ছে এই– আকলই তার দায়িত্ব সম্পাদনে ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী। ইন্দ্রিয়গুলো তাদের দায়িত্ব আদায়ে আকল-এর মুখাপেক্ষী নয়। আকল-এর মধ্যে দু'টি দুর্বলতার ব্যাপারে নির্ভরশীলতা রয়েছে। এক. বস্তুরাজির বাস্তবে বিদ্যমান থাকা– যেহেতু অস্তিত্বহীন আকল কোন কাজই করতে পারে না। এখানে আকল বেকার, অকর্মণ্য। দুই. বস্তুগুলো যেহেন ও মেধাপটে থাকতে হবে। অর্থাৎ অজানা জিনিসের ক্ষেত্রেও আকল অচল ও বেকার। সুতরাং একথা বলা যায় যে, আকল যেমন অনুধাবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তেমনি হুজ্জত ও প্রমাণের ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে ইন্দ্রিয়ের অর্জিত ইলম আকল-এর অর্জিত ইলমের তুলনায় সংকীর্ণ প্রমাণিত হলো। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া আকল কাজ করার কোন সুযোগ কর্মক্ষেত্রে লাভ করতে পারে না। এ কারণেই উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী যার জ্ঞান লাভ অধিক শর্তে পরিবেষ্টিত তার ইলমের পরিধিও সংকীর্ণ। সুতরাং আকল-এর জ্ঞান-পরিধি খুব একটা প্রশস্ত ও বিস্তৃত প্রমাণিত হলো না। তাই তাহযীব, তমদ্দুন ও সামাজিকতা সম্পর্কে বিশেষত দীন ও ধর্ম সম্পর্কে আকলকে একচ্ছত্র

নেতার মর্যাদায় সমাসীনকারীগণ নিতান্ত দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যা মোটেই স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এরপর আকল-এর ঘোড়া দৌড়িয়ে দার্শনিকগণ যতটা সামনে অগ্রসর হতে পেরেছেন, তা সবই কেবলমাত্র জড় জাতীয় বস্তু, যা পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সীমা ও চৌহদ্দির ভেতর এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ দুনিয়াতে অন্যান্য অনেক বড় বড় বস্তু রয়ে গেছে, যেখানে আকল তার ডানা প্রসারিত করতে পারে না। দৃশ্যমান নক্ষত্ররাজির বাইরেও অনেক জগত রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এ কথাটি অনুধাবন ও লক্ষ্য রাখার যোগ্য যে, আকল যাই হোক না কেন, সেটা আল্লাহ তায়ালার সিফত ও গুণ নয়; বরং মানুষের একটি স্বভাবজাত ও জন্মগত গুণ। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষের জন্মের সময় জন্মলাভ করে এবং মৃত্যুকালে মৃত্যুর সঙ্গে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যায়। আর আকল আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি বলে শরীয়তও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اول ما خلق الله العقل

সর্বপ্রথম মাখলুক যা আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন (মানুষের স্বভাবজাত শক্তিগুলোর মধ্যে), তা হলো আকল।

এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায়, আকল সৃষ্টি বস্তু। আর আকল যখন মাখলুক (সৃষ্টি) বলে প্রমাণিত হলো তখন মাহদুদ (সীমাবদ্ধ)ও বটে। কারণ, সৃষ্টি হওয়ার মানেই হলো সীমিত হওয়া। তাছাড়া তা অস্থায়ীও বটে। কারণ, মাখলুক বলা হয় ঐ জিনিসকে যার অস্তিত্ব তার নিজস্ব নয়, অন্যের দানকৃত, অস্থায়ী, তাছাড়া দুর্বলও। কেননা প্রতিটি মাখলুক তার খালেক বা স্রষ্টার সামনে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায়। সুতরাং আকল-এর ইলম এভাবে এতটা শক্তিশালী হতে পারে না যেভাবে দার্শনিকগণ শক্তিশালী মনে করছেন ও বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই মৌলিক নীতির মাধ্যমে অর্জিত আকলের ইলম যন্নী বা সন্দেযুক্ত হয়ে থাকে, সন্দেহমুক্ত হতে পারে না– যার মাধ্যমে বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জড় পদার্থের ক্ষেত্রেই যখন আকলের এ অবস্থা, তখন একে দীন ও ধর্ম সম্পর্কে কিভাবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে– যে দীনের ভিত্তিই হলো একীনের ওপর, সব ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে?

ইলম মানুষের নয়, আল্লাহর সিফত

এবার ইলমের দিকে লক্ষ্য করুন– ইলম মানুষের সিফত নয়। কারণ, মানব সত্তার কোন ইলম নেই। মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে কেবলমাত্র ইলমের যোগ্যতা রয়েছে, ইলম নেই। মানুষ যখন দুনিয়াতে আগমন করে, তখন ইলম হতে অন্ধ ও ইলমশূন্য থাকে। যেমন- পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ করেছেন, তখন তোমাদের মধ্যে কোন ইলম ও জ্ঞান ছিল না। [নাহ্‌ল : ৭৮]

আবার দুনিয়া থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখনও ইলমশূন্য অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করে। যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

অতঃপর (মৃত্যুকালে) ফিরিয়ে দেয়া হয় অসহায় নিকৃষ্ট জীবনের দিকে যে, অনেক কিছু জানার পরও এমন ইলমশূন্য হয়ে পড়বে– এখন কোন জিনিসের ইলম তার নিকট নেই। [হজ : ৫]

সুতরাং মানুষের প্রথম ও শেষ অবস্থায় ইলম না থাকা এবং আসা-যাওয়ার মাঝখানে কিছুদিন এমন ইলম হওয়া যে, আসলো; তারপর আবার চলে গেল– একথাই প্রমাণ করে যে, ইলম মানুষের সত্তাগত কোন গুণ নয়, যেমনিভাবে আকল তাদের সৃষ্টিগত ছিল। বরং ইলম হলো আল্লাহ তায়ালার যাতী সিফত বা নিজস্ব গুণ– যার ছায়া মানুষের ওপর পতিত হয় সাময়িকভাবে এবং মানুষকে আলেম ও জ্ঞানী বলা হয়। যেমন- পবিত্র কুরআন আল্লাহ তায়ালাকেই সত্তাগত আলেম বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তায়ালার ইলম আযলী ও আবদী। তাঁর ইলমের কোন শুরু নেই, শেষও নেই। আরম্ভও হয়নি, শেষও হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

هو العليم الخبير

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী।

وهو عليم بذات الصدور - يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم - ولا يحيطون به علما - الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير

আল্লাহই জানেন, তাদের সামনের ও পেছনের সকল কথা, 'আর মানুষ তাদের ইলম দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তারা কি জানবে না, তাদেরকে কে পয়দা করেছে? তিনিই লতীফ ও খবীর।'

মাখলুক গায়ের মাখলুকের কর্তা হতে পারে না

আকল মাখলুক ও সৃষ্টি হয়ে মানুষের সিফত ও গুণ হওয়া এবং ইলমের গায়ের মাখলুক হয়ে আল্লাহ তায়ালার সিফত ও গুণ হওয়া– এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের মধ্যে ইলম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসতে পারে, নিজের মধ্য থেকে হতে পারে না। এর নিশ্চিত ফল দাঁড়াল এই– যখন খালেকের পক্ষ হতে কোন ইলম এসে যাবে, তখন আকল-এর ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করার কোন সুযোগ ও অধিকার থাকবে না। আর আকলকে আল্লাহর ইলমের সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো, এটা তো হতেই পারে না, কস্মিমকালেও না। অথবা আকলকে ইলমের ওপর কর্তা বলে মেনে নেয়া, তা-ও হয় না। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে এই– স্রষ্টার ওপর সৃষ্টি এবং খালেকের ওপর মাখলুক কর্তা হয়ে গেল। ধনীর ওপর দরিদ্র হাকিম হয়ে গেল। সবল শক্তিশালীর ওপর অসহায় দুর্বলের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়ে গেল। এ কথাটি কেবল আকলের পরিপন্থীই নয়; বরং বোকামী ও মূর্খতাও বটে– যা একজন আরেফ (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) উম্মত অন্তত বরদাশত করবে না। আল্লাহ তায়ালার ইলমের প্রতি যাদের পরিপূর্ণ ঈমান রয়েছে, যদি এমন কোন বোকা ও মূর্খ উম্মত তা মেনে নেয়, মেনে নিক। এখন আকলের কাজ ও দায়িত্ব এতটুকু রয়ে গেল, আল্লাহর কালাম, আল্লাহর ইলম এসে যাওয়ার পর একে বুঝে নিবে, মেনে নিবে এবং এরই মধ্যে থেকে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে এতে নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারকে উন্মোচিত করে নিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকে স্রষ্টার ওপর কর্তৃত্ব দানকারীদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে, সাবধান ও সতর্ক হবে।

আত্মা আকলের উৎসস্থল

পবিত্র কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আকল হলো আত্মার অনুভূতি লাভের যন্ত্র– যেমন পঞ্চইন্দ্রিয় আত্মার জন্য অনুভূতি লাভের যন্ত্র– তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আকলের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা সব কিছু সুস্থ আত্মারই কাজ। ফলে এ কথাও প্রমাণ হয়ে যায়, আকলের উৎপত্তিস্থলও আত্মাই। যেমন- ইন্দ্রিয়সমূহের ইলমের উৎপত্তিস্থলও আত্মাই ছিল। তাই বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন আত্মারই ইলম– যদিও মানুষ বলে থাকে, অনুভূতি শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি মস্তিষ্কে রয়েছে, আত্মায় নয়। অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে এমনটাই পরিদৃষ্ট হয়। বরং মানুষের বিরাট একদল এ বিশ্বাসই করে যে, ইন্দ্রিয় ও আকলের অনুভূতি শক্তির কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক। একথা পবিত্র কুরআনের বর্ণনার প্রতিকূল নয়, পরিপন্থী নয়। হতে পারে, অনুভূতি ও আকলের শক্তি মস্তিষ্কে রয়েছে। তবে মস্তিষ্কের লাগাম রয়েছে আত্মার হাতে এবং আত্মার ইশারা-ইঙ্গিতেই সে তৎপর হয়ে উঠে, পরিচালিত হয়। তাহলে এ শক্তিগুলোকে মস্তিষ্কপ্রসূত বলে স্বীকার করে নিয়ে এদেরকে আত্মার ক্ষমতাধীন বলে মেনে নেয়া যায়। যেমন- আমরা দেখছি, অন্তরাত্মা যদি স্থির, শান্ত থাকে, তাহলেই কেবল মস্তিষ্কের শক্তি কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হয়। যদি আত্মার পেরেশানী ও অস্থিরতা থাকে অথবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে আকল-বুদ্ধি কোন কিছুই চিন্তা ও গবেষণা করতে পারে না, কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, মস্তিষ্ক, বিবেক ও বুদ্ধি অন্তরাত্মারই অধীন। যখন অন্তর একাগ্রতার সঙ্গে ইশারা করে, তখন আকল, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক সবই আত্মার আদেশ পালনার্থে গবেষণা কাজে লেগে যায়। আর যদি আত্মার ইশারা-ইঙ্গিত না থাকে তাহলে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকে।

বস্তুসমূহের মৌলিক প্রকৃতি পর্যন্ত আকলও পৌঁছতে পারে না

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত ইলম সর্বতোভাবে বস্তুসমূহের হাকীকত ও মৌলিক প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কারণ, বিবেক-বুদ্ধির অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের অনুভূত জিনিসের অধীন। আর অনুভূত বস্তুসমূহ তাদের সত্তাগত বাহ্যিক জিনিস এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এদের বাহ্যিক আকার-আকৃতিই ইলম ও জ্ঞানে আসে, হাকীকত ও

মৌলিক প্রকৃতি পর্যন্ত আকলও পৌঁছতে পারে না। যদিও আকলের ইলম মৌলিক হওয়ার কারণে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাতেনী বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও অবস্থাদৃষ্টে বাহ্যিক ইলমই বলা হবে– যার মূল বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণেই বর্তমান যুগের দার্শনিকগণ বিবেক-বুদ্ধির সর্বময় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দান করেও আজ পর্যন্ত কোন বিষয়ের হাকীকত বা মূলে পৌঁছতে পারেননি। হযরত এলাহাবাদী (রহ.) বলেছেন–

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور کو سلجھا رہا ہے سمرا ملتا نہیں

দার্শনিকদের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে আল্লাহ তায়ালার সন্ধান মিলে না। ডোর (রশি) ঠিক করলেও তারা রশির মাথা (প্রান্ত) পায়নি।

সুতরাং আত্মার সমগ্র ইলম যা পঞ্চইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আত্মায় কেন্দ্রীভূত হয়, তা প্রকৃত অবস্থা ও হাকীকত প্রকাশ করতে পারে না। তাই এসব বুদ্ধিপ্রসূত ইলমকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ইলম বলা যায় না। এ ইলমের হাকীকত বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য করা, আলাদা করা, পৃথক পৃথক করে দেয়া।

অতএব আত্মা ও ইন্দ্রিয় বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে যেসব বস্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে– এসবই জড় জগতের কথাবার্তা। এজন্য জড়জগত সম্পর্কিত আত্মার ইলম বা জ্ঞানও জড় পদার্থ নামেই বিবেচিত হবে। এসব ইন্দ্রিয়ানুভূত হোক বা বিবেকানুভূত– মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ফলে আত্মার এই পরোক্ষ ইলম তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হোক বা বুদ্ধির মাধ্যমে, তা বাহ্যিক ইলম ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়জাতীয় বস্তু বা বাহ্যিক পদার্থ জাতীয়– এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় বুদ্ধির সকল কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতার চৌহদ্দি। আর তা এসব জড়পদার্থ নিয়েই। এ কারণেই বিবেকের জ্ঞানজনিত বিষয়কেও জড়পদার্থ বলা হবে। অর্থাৎ যাহেরী ইলম বলা হবে, বাতেনী ইলম বলা হবে না। এ কারণে এসব ইলম হয়ত ব্যাপকভাবে উপকারী হবে না– যাতে উভয় জগতের সমূহ ফলাফলের মৌলিক ভিত্তি বলে দাঁড় করানো যায়; আর এ দ্বারা সকল গায়েবী ও অদৃশ্য জগতের বিষয় প্রকাশ লাভ করবে। এ কারণে ইন্দ্রিয়সমূহকে যেমন প্রকৃত অর্থে আলেম ও অনুভূতিশীল বলা যাবে না, তেমনিভাবে মস্তিষ্ক এবং এর মধ্যে থাকা বিবেক-বুদ্ধিকেও আলেম ও

অনুভূতিশীল বলা হবে না। বিশেষত যখন মস্তিষ্ক বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করতে অক্ষম।

প্রকৃত ইলম ও অনুভূতি শুধুই আত্মার বিশেষত্ব

তাহলে সর্বশেষ ঐ ইলমই থাকল যা সরাসরি আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত। যার মধ্যে কোন গোপন অথবা প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই; বরং আত্মাই তার মধ্যস্থিত শক্তি দ্বারা একে অনুভব করে যে, জগৎ ও ইন্দ্রিয় বিবেক-বুদ্ধির নাগালের বাইরে! সুতরাং বুদ্ধির ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কোন কাজে আসে না।

অতএব, স্থূলদৃষ্টিতেও যদি দেখা যায় তাহলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, আত্মার মাধ্যমবিহীন প্রত্যক্ষ ইলম, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলম আর অনুভূতি হতে অধিক সৃষ্ট এবং অনেক গভীর– যার কার্যক্রম, নিপুণতা এবং অনুভূতির স্পষ্টতা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। আত্মার ইলম ও অনুভূতিতে ঐসব শর্ত-শরায়ত নেই, যেগুলো ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কপ্রসূত ইলমে রয়েছে। তেমনি আত্মার জ্ঞান আহরণ ও বিতরণেও ঐ সকল পরমুখাপেক্ষিতা ও পাবন্দী নেই, যা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অর্জিত ইলমে রয়েছে; বরং আত্মা অঙ্গরাজ হওয়ার কারণে তার এ মাকসুদ (বিশেষ) ইলম ও ইলমের রাজা হবে। তাই উল্লিখিত নীতি অনুসারে যে অঙ্গের জ্ঞানার্জনে অধিক শর্ত থাকবে না, সে অঙ্গের অর্জিত ইলমই ব্যাপক, বিস্তৃত এবং পূর্ণ পরিচয় বহনকারী হবে।

আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, আত্মার ইলম ও জ্ঞান সকল প্রকার পারিপার্শ্বিক শর্ত হতে মুক্ত, আযাদ। যেসব শর্ত-শরায়ত দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রয়েছে। আত্মার ইলমে না আছে কাল ও সময়ের শর্ত, না আছে স্থানের শর্ত, আর না আছে শরীরের শর্ত, না রূহের শর্ত; বরং আত্মারই ইলম জ্ঞানের ঝরনা সব দিকে প্রবহমান থাকে। আত্মা যদি কোন জিনিসকে অনুভব করতে চায়, তাহলে ঐ জিনিস আকার-আকৃতি, তার মৌলিক প্রকৃতি, তার হাকীকত এবং হাকীকত হতে তার অস্তিত্ব লাভ পর্যন্ত সব কিছুর হাকীকত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করে। ফলে প্রতীয়মান হয়, মানব-রাজ্যে প্রকৃত আলেম ও অনুভূতিশীল শুধুমাত্র আত্মা, অন্য কিছু নয়।

ইন্দ্রিয় ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞানের সীমা সুন্দর উপাদান তৈরি : উন্নত স্বভাবের মানব গঠন নয়

অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, বাহ্যিক এসব ইলম ও জ্ঞান তা ইন্দ্রিয়ানুভূত হোক বা বিবেক অর্জিত, এর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, নানা আকার-আকৃতির জন্ম দিতে পারে। দেহ দেহের আর পদার্থ পদার্থেরই জন্ম দিতে সক্ষম। কোন মৌলিক প্রকৃতি ও হাকীকতের জন্ম দিতে পারে না। পদার্থ-পদার্থের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যকে উজাড় করে দিতে পারে; রূহ ও রূহানিয়ত, আত্মা ও আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করতে পারে না। মা'কুল (জ্ঞানজনিত বিষয়)-মা'কুলাতকেই স্বচ্ছ ও প্রকাশ করতে পারে, বিজদান (অনুভূতি)-এর অন্তর্নিহিত রহস্যাবলীকে উন্মোচন করতে পারে না। এজন্য প্রত্যক্ষ দর্শন, অভিজ্ঞতা ও নীতিশাস্ত্রের আলোকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলা যায়, পঞ্চইন্দ্রিয়ে বাহ্যিক ইলম যা বিজ্ঞানের কাঁধে সওয়ার হয়ে এসেছে এর সঙ্গে মস্তিষ্কপ্রসূত ও বিবেকের সৃষ্ট জ্ঞান যা দর্শনশাস্ত্রের কাঁধে সওয়ার হয়ে এসেছে– নিঃসন্দেহে এসবের মাধ্যমে চাকচিক্যময়, চোখ ঝলসানো জীবনোপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে উন্নত ও উৎকর্ষসাধিত স্বভাব-চরিত্রের কোন মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে না, সৃষ্টি করতে পারছে না, আর তা পারবেও না। কারণ, ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলম সৃষ্টিই করা হয়েছে বাহ্যিক চাকচিক্য ও চোখ ঝলসানোর জন্য, হাকীকত ও মৌলিক প্রকৃতির জন্য নয়। এসব ইলম দ্বারা বাস্তবতার প্রকাশ, চরিত্র গঠন ও নৈতিক উন্নতি ও উৎকর্ষতা আশা করা যায় না; বরং এমনটা আশা করা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজেরই নামান্তর।

তাছাড়া এসব আকলী ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞান তৈরিই করা হয়েছে তমদ্দুন ও সভ্যতার গোড়া পত্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য, আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের হাকীকত, সন্দেহমুক্ত ইলমকে মনের পর্দায় অঙ্কিত ও চিত্রায়িত করার জন্য নয়। এসব ইলম ও জ্ঞান দ্বারা অদৃশ্য ও মৌলিক বিষয়াদি প্রকাশ করা এমনই হবে– যেমন পিপীলিকার দ্বারা পর্বত বহন করে নেয়ার আশা করা।

এ জাতীয় অন্তঃসারশূন্য ইলম দ্বারা যখন সবসময় বিভিন্ন বস্তু, তার নতুন নতুন ডিজাইন, আকৃতি-প্রকৃতি, এদের রূপ-সৌন্দর্য এবং শরীরের উপভোগযোগ্য ও পছন্দনীয় জিনিস চোখের সামনে আসতে থাকবে, তখন অন্তরাত্মারও এসব চাকচিক্যের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আকার-আকৃতি ও রূপ-লাবণ্য, সুমধুর মন মাতানো সুমিষ্ট সুর-লহরী, রঙ-রূপ, কারুকার্যমণ্ডিত রঙ-বেরঙের সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য এবং আয়েশ-আরামের প্রতি মনের ঝোঁক– এসবের প্রতি

অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এতে সাদাসিধে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন, অল্পে তুষ্টি, মিতব্যয়িতা ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের আবেগ-উৎসাহ অন্তরে সৃষ্টি করবে না।

পঞ্চইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক ইলম মস্তিষ্কের প্রশিক্ষণবিহীন বিবেক-বুদ্ধির ললাটে যখন চড়ে বসে এবং বিবেক-বুদ্ধি এসব ইন্দ্রিয়ানুভূত জিনিসগুলোর ওপর প্রামাণিকতার রঙ-রূপ ও সিলমোহর মেরে দিতে থাকে, তখন নানা ধরনের দর্শন, ইজম এবং ফর্মুলা প্রভৃতি যেমন- কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম ইত্যাদি পৃথিবীবাসীর মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। যার ফলে এ নুমায়েশী প্রদর্শনীমূলক অন্তঃসারশূন্য তমদ্দুন ও সভ্যতা পুঁথিগত দিক দিয়ে যুক্তিপূর্ণ দর্শন বলে প্রতিভাত হয় বটে তবে প্রকৃতপক্ষে এসবের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কোন চিহ্নই নেই। এ কারণেই জড়বাদী দর্শন সাময়িকভাবে কিছুটা শক্তিশালী হয়ে যায়। কারণ, এসব জড় পদার্থ জাতীয় দ্রব্যসামগ্রীকে একজন দার্শনিক ব্যক্তি তার শিল্প ও কারিগরি হিসেবে প্রস্তুত করতে থাকে। তাই এ কাজকে বড়জোর একজন দার্শনিক ব্যক্তির শিল্পবিশেষ বলা যেতে পারে। আর এসব সামগ্রী যখন একজন দার্শনিক তার রঙ-রূপ দিয়ে তৈরি করে, তখন তাকে ডক্টর উপাধি দিয়ে ভূষিত করা হয়। আর তখন ঐ ব্যক্তি শ্রমিক ও কারিগরের স্তর ও শ্রেণী থেকে বের হয়ে দার্শনিকদের সম্মানজনক কাতারে সগর্বে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন এর দ্বারাই প্রামাণিকভাবে অন্তঃসারশূন্য একটি সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে– যাতে রয়েছে প্রতারণা, বানাওটি, লোক দেখানো মানসিকতা। অর্থাৎ 'গম' দেখিয়ে 'যব' দান করার কুমতলব ও প্রবঞ্চণা কার্যকর থাকবে। যার জীবন-মরণ, বসবাস, আহার্য-পানীয়, জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ সব কিছুতেই থাকবে লোক দেখানো মিথ্যা ও প্রতারণা। আর এসব অন্তঃসারশূন্য জড়বাদী ইলমের কারণে পুরো জীবনই জড়বাদী হয়ে পড়বে। সে জীবন ও সে সমাজে থাকবে না চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ এবং উন্নত উৎসাহ-উদ্দীপনা, সততা, ইখলাস ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবেদনা সহমর্মিতা এবং মানবতাবোধ। আর বাস্তবতার অনুকূল উৎসাহ-উদ্দীপনা জন্মলাভ ও উন্নতি করতে পারবে না। এর বদৌলতে সমাজে আন্তরিকতা, মমত্ববোধ, প্রীতিপূর্ণ সাহায্য-সহায়তার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা তাহযিব-তমদ্দুন ও উন্নত সভ্যতার মূল চাবিকাঠি।

জড়বাদী জ্ঞানের অশুভ পরিণতি

এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট কথা যে, যখন জড়বাদী ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৈরি দ্রব্যসামগ্রী ভেতরগত মহৎ গুণাবলী শূন্য হবে– যেসব গুণাবলী অর্জনের লক্ষ্যে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি, তখন এগুলো হবে প্রাণহীন মরদেহের ন্যায়। আর একথা সকলেরই জানা যে, প্রাণহীন মৃতদেহের পরিণতি ফুলে-ফেঁপে, পচে জড় পরিবেশকে বিষাক্ত করা, দুর্গন্ধময় করা এবং রোগ-জীবাণু ছড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়, হতে পারে না। এর মাধ্যমে মানব সমাজের স্বাস্থ্যহানি, অনেক প্রকার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ পরিবেশে অন্য সবই 'হয়তো' হতে পারে, তবে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, হতে পারে না।

সুতরাং আমরা প্রতিদিন দেখছি যে, বর্তমান বিশ্বের চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় দৃশ্যাবলী, সাজ-সরঞ্জাম এবং নতুন নতুন মডেল ও ডিজাইনে তৈরি সুখ সামগ্রীর প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুখ-সামগ্রীর অভাব নেই অথচ সুখ নামের পায়রাটি মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে। সুখ-শান্তি লাভের আশায় হাজার ধরনের সুদৃশ্য দ্রব্যসামগ্রী, জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ নতুন নতুন ডিজাইনে অহরহ বিপুল পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, তৈরি রয়েছে; অথচ সুখ-শান্তিই গায়েব, নাগালের বাইরে। বরং স্বচ্ছলতার বদলে অস্বচ্ছলতা, শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় অশান্তি, হানাহানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি চালু রয়েছে। সুখ-শান্তির পরিবর্তে সবসময় সবখানে দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানী, মজবুতভাবে আসন পেতে বসে আছে। এর একমাত্র কারণ হলো– আত্মার প্রকৃত শান্তি ও সান্ত্বনা সততা, উন্নত স্বভাব-চরিত্র ও নৈতিক উৎকর্ষতা ছাড়া অন্য কিছুতে নেই। বাহ্যিক ঠাঁটবাঁট, চমক-ধমক এবং দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যে সুখ-শান্তি নেই, সুখ-শান্তি আসতে পারে না।

ফলে এ যুগের মানুষ আকার-আকৃতিতে নিঃসন্দেহে মানুষ এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় মানুষ কিন্তু চরিত্র, নৈতিকতার নিরিখে বিচার করলে বিষধর সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-ভাল্লুক থেকেও নিকৃষ্ট। এ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

سيخرج اقوام حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون بقول
خيرالبرية يقرء ون القران لا يجاوز تراقيهم – السنتهم احلى
من السكر وقلوبهم الذبائب –

শীঘ্রই এমন কিছু সম্প্রদায়ের অবির্ভাব ঘটবে, যাদের বয়স হবে অল্প, স্থূল ও বিকৃতবুদ্ধি, কথাবার্তা বলবে ন্যায়-নীতির আলোকে, মুখে উচ্চারণ করবে পবিত্র কুরআনের নাম, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তাদের ভাষা আরবদের ন্যায় সাবলীল, সুমধুর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে, কিন্তু তাদের অন্তরাত্মা হবে বাঘের ন্যায় হিংস্র-দয়ামায়াহীন।

তাছাড়া হযরত আবু দারদা (রা.) দামেশকের জামে মসজিদে উন্নত পোশাক পরিহিত মানুষ দেখে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে যেমন বলেছিলেন–

كان الناس ورقا لا شرك فيه فصاروا شوكا لاورق فيه -

মানুষ (সাহাবায়ে কেরাম), তরতাজা শ্যামল পাতার ন্যায় ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কোন ধরনের কাঁটা ছিল না, কিন্তু এখন এমন কাঁটার ন্যায় হয়ে গেছেন, যার মধ্যে কোন পাতা নেই।

এজন্যই এ যুগের দেহপূজারী মানব সমাজ হতে মানবতা কোন প্রকার সুখ-শান্তি লাভ করতে পারছে না। অন্য সব জীবজন্তু এবং প্রাণীজগতও পাচ্ছে না। দুনিয়ার কোন বস্তুই শান্তি পাচ্ছে না। ইবাদ ও বিলাদ– মানুষ এবং মানুষের আবাসভূমি সবই ধ্বংসোন্মুখ। দেশ দেশের জন্য, শহর শহরের জন্য, নদ-নদীর জন্য, মহাশূন্য মহাশূন্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও আপদ-বিপদের কেন্দ্রীয় রূপ ধারণ করেছে। যার বাস্তব চিত্র পবিত্র কুরআন মানব সমাজের সামনে তুলে ধরেছে এভাবে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

জলে এবং স্থলে মানুষের (অসৎ পাপ) কার্যকলাপের কারণে আপদ-বিপদ ও ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছুসংখ্যক (মন্দ) আমল (পাপকর্ম)-এর আস্বাদ গ্রহণ করাতে পারেন। যেন তারা (পাপকর্ম হতে) বিরত থাকে, ফিরে আসে। [রূম : ৪১]

এ সকল ধ্বংসাত্মক কাজের ভিত্তি হলো ঐসব জড়বাদী ইলম ও জ্ঞানের তৈরি সাজানো, সামাজিক ও তমদ্দুনিক প্রাণহীন সব কাঠামো, যা নৈতিক ও চারিত্রিক

মূল্যবোধ হতে শূন্য। আর এসবের আবিষ্কারক ও সৃষ্টিকারীগণ এবং অন্তঃসারশূন্য এসব ইলমের ধারক ও বাহকগণ, আখলাক ও কামালত, নৈতিকতা ও পূর্ণতার উৎসমূল আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্কহীন, আল্লাহর স্মরণ ও ইয়াদে সম্পূর্ণ গাফেল উদাসীন; অথচ আল্লাহ তায়ালার যিকির ও স্মরণই হলো উন্নত চরিত্র, মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি, চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআন ইলম ও জ্ঞানের এসব তথাকথিত দাবিদারদের গোমর ফাঁক করেছে, মুখোশ উন্মোচিত করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে–

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا ۞ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۞

তাদের প্রতি আপনি ভ্রূক্ষেপও করবেন না, যারা আমার যিকির ও স্মরণে উদাসীন ও বিমুখ হয়ে গেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ব্যতীত অন্য কিছু নয়; এ-ই হলো তাদের ইলম ও জ্ঞানের প্রান্তসীমা। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু সর্বাধিক খোঁজ-খবর রাখেন ঐ সকল লোকের, যারা বিপথগামী হয়েছে এবং সর্বাধিক জানেন এদের অবস্থাকে, যারা সত্য সঠিক পথের পথিক, সত্য পথের অনুসারী। [নাজম : ২৯-৩০]

তাছাড়া পবিত্র কুরআন এসব দেহের শোভাবর্ধনকারী এবং বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্যের পূজারী ইলমকে 'ইলমে যাহের' বলে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করেছে যে, এ জাতীয় বাহ্যিক স্থূল ইলমে কোনরূপ হাকীকত ও বাস্তবতা নেই– যার মাধ্যমে এ প্রাণহীন ইলমে প্রাণের সঞ্চার হবে। এ কারণে এসব স্থূল ও বাহ্যিক ইলম তা বিজ্ঞানই হোক, গণিতশাস্ত্র হোক, ভূমি জরিপ সম্পর্কিত হোক কিংবা দর্শন হোক– তা যখন নৈতিক মূল্যবোধ হতে শূন্য এবং চরিত্র গঠনে দেউলিয়া হবে তখন এসব ইলমের পরিণামও হবে গাফলত, উদাসীনতা, অলসতা ও আল্লাহবিমুখতা।

يعلمون ظاهرا من الحيواة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون -

তারা ওপরে ওপরে পার্থিব জীবনকেই ভালভাবে জানে এবং

পরকাল হতে তারা বিমুখ; পরকাল সম্পর্কে কোন খবরই তারা রাখে না।

আত্মার জ্ঞানার্জন ও অনুভূতির দু'টি দিক

অতএব এ নীতির ভিত্তিতে হাকীকতবিহীন যে স্থূল দেহাকৃতি রয়েছে তা প্রাণহীন মরদেহেরই নামান্তর। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবাত্মাকে যেমন ইলমের দিক দান করেছেন– ঐ ইলম যা ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আত্মায় প্রবেশ লাভ করে এবং এর মাধ্যমে জড়বাদী জীবনের মন-মাতানো চিত্রাঙ্কন এবং চোখজুড়ানো তাহযিব ও সভ্যতার নয়ন ধাঁধানো আকার-আকৃতি, ডিজাইন তৈরি হতে থাকে; যে ইলম দ্বারা চোখের জন্য শোভাময় সুন্দর দৃশ্য, কানের জন্য সুমধুর সুরলহরী, নাকের জন্য পাক-পবিত্র ঘ্রাণ, জিহ্বার জন্য সুস্বাদু উপাদেয় আহারসামগ্রী, হাত-পায়ের জন্য নরম মোলায়েম দেহ, স্পর্শ করার জন্য নরম তুলতুলে বস্তু সামগ্রী, মাটির শরীরের জন্য আরামদায়ক বিল্ডিং– এ ইলম লাভ হয়, মানব প্রবৃত্তির জন্য এসব ইলম ও অনুভূতির মাধ্যমে– তা হলে প্রবৃত্তির শান্তি ও সান্ত্বনা, কামনা ও বাসনা পূরণ করার দ্রব্যসামগ্রী সহজলভ্য হয়ে যাবে। তেমনিভাবে মানবাত্মাকে আল্লাহ তায়ালা অন্য আরেকটি দিক দান করেছেন– যার বদৌলতে ইন্দ্রিয় ও বিবেকের মাধ্যম ছাড়াই দেখতে, শুনতে, শুঁকতে, স্বাদ গ্রহণ করতে, স্পর্শ করতে এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ আত্মার জন্য কিছু গায়েবী উপকরণ রেখে দিয়েছেন, যা সবসময় সরবরাহ হতে থাকে।

অন্য কথায় এভাবে বলা যায়– আশ্চর্যজনক এ কেন্দ্র 'মানবাত্মায়' যদি নিম্নমুখী একটি পথ খোলা থাকে, যে পথের মাধ্যমে মানবাত্মা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে জড়জগতকে অবলোকন করতে থাকে, দেহরাজ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার আসবাব প্রস্তুত করতে পারে। তেমনি দ্বিতীয় পথ ঊর্ধ্বমুখী করে খুলে রেখেছেন, যার মাধ্যমে গায়েবী ও সদৃশ্যজগতকে দেখতে পারে। যে জগতে আল্লাহ তায়ালার ইলম ও জ্ঞান, তাঁর আখলাক, রূহানী লয্যত ও স্বাদ, আধ্যাত্মিক মাকামাত (স্তরসমূহ); যেমন মহব্বত, হামদরদী, তাকওয়া ও আল্লাহভীতি, ইত্তায়াত, বন্দেগী, আল্লাহর মারেফাত ও পরিচিতি প্রভৃতি লাভ হয়। আত্মা এসব বাতেনী ইলম হতে বিবেক ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলহামের মাধ্যমে নিজের চরিত্র ও নৈতিকতাকে উন্নত ও উৎকর্ষিত করতে পারে। এ গুণাবলীর মাধ্যমে ইহজগতে সুখ-শান্তির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং বিশ্ববাসীও নিরাপদ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

আত্মার দৈহিক ও আত্মিক অনুভূতিতে মিল আছে

যাহেরী ইলমের মাধ্যম যদি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে যাহেরী ইলম আত্মায় প্রবেশ করে এবং ঐ ইলমের আলোকে দেহরাজ্যের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে, সেখানে বাতেনী ইলমের মাধ্যমও রেখেছেন– ওহী ও ইলহামের (আল্লাহর সংকেত)– যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইলম ও জ্ঞান আত্মার দৃশ্যপটে প্রকাশ লাভ করে। ঐ জগতের দর্শন, শ্রবণ, শোঁকা, স্বাদ গ্রহণ করা প্রভৃতি আত্মার অভ্যন্তরীণ চোখ, কান ও নাকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর আত্মিক দেখাশোনার মাধ্যমে দেহ-প্রাণে শক্তি লাভ হয় এবং আত্মাজগতের মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ দর্শন) ও সিমা (শ্রবণ) দ্বারা রূহ সজীব হয়, ঈমান ও মারেফত সবল ও শক্তিশালী হয়। এখানে আকার-আকৃতির প্রদর্শনী হয়। আর ওখানে প্রদর্শনী হয় সুন্দর স্বভাব, উন্নত চরিত্র ও উৎকর্ষিত নৈতিকতার।

শারীরিক জিহ্বা যদি খাবারের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে– যা হচ্ছে দেহের পদার্থ জাতীয় খাদ্য– তাহলে এখানে জান ও প্রাণের জিহ্বা ঈমান ও মা'রেফতের স্বাদ গ্রহণ করে, যা আত্মার আত্মিক খাবার। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ذاق طعم الا يمان من رضى بالله ربا وبمحمد نبيا وبالا سلام دينا -

ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছে: আর ইসলামকে ধর্ম ও জীবন বিধানরূপে সন্তুষ্টচিত্তে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে।

এই শারীরিক জড় পদার্থ জাতীয় জিহ্বা যদি মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ করে, তাহলে আত্মা ও হৃদয়ের জিহ্বাও ঈমান ও মা'রেফতের মিষ্টি অনুভব করে। এ ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

من سره ان يجد حلاوة الايمان فليلبس الصوف تذ للا لربه عزوجل -

যে লোক ঈমান ও মা'রেফতের মিষ্টি স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী, সে যেন নিজের প্রভুর সামনে নিজের হীনতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাধারণ ও মোটা কাপড় পরিধান করে।

শারীরিক পাকস্থলী যদি সুস্বাদু খাবারের দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহলে রূহানী বা আধ্যাত্মিক পাকস্থলী অদৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম আহারের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। যেমন- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারবিহীন একাধারে রোযা রেখে বলেছিলেন–

ايكم مثلى يطعمنى ربى ويسقينى

তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমাকে আমার পরওয়ারদিগার আহারও করান, পানও করান।

কপালের ওপর বিদ্যমান চোখ যদি দুনিয়ার সুদর্শন সুশোভিত দৃশ্যাবলী অবলোকন করে, তাহলে অন্তরাত্মার চোখও অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা ফেরেশতাদের সুন্দর সুশোভিত চেহারা দর্শন করে এবং ঊর্ধ্বজগতের বিস্ময়কর অবস্থা এবং দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে পারবে। যেমন- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামাযে জান্নাত ও জাহান্নামকে চর্মচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তাঁর মূল আকার-আকৃতিতেও অবলোকন করেছিলেন। মে'রাজের রাতে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে পৌঁছে স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালার জামাল অবলোকন করেছিলেন।

যদি মাথায় থাকা কান জড় জাতীয় আওয়াজ ও স্বরধ্বনিকে শুনতে পারে তাহলে অন্তরের কানও ঐ অদৃশ্য জগতের আওয়াজ ও সুমধুর স্বরধ্বনি শ্রবণ করতে থাকে। যেমন- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের কথাবার্তা শুনতেন কিংবা রমযান মাসে যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে পবিত্র কুরআনের দাওরা করতেন, কোন কোন সময় দরজা খোলার আওয়াজও শুনতে পেতেন।

মুখের উপরে থাকা নাক যদি বাতাসের মাধ্যমে পবিত্র ঘ্রাণ ও সুগন্ধি শুঁকতে পারে, তাহলে অন্তরাত্মার নাকও আত্মাজগতের সুঘ্রাণ শুঁকে অনুভব করতে পারে। যেমন- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে মিথ্যার দুর্গন্ধ ও সত্যের সুগন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতাগণ দূরে চলে যান। যেমন- মৃত্যুর পর মু'মিনের আত্মা হতে মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণ বের হওয়া এবং ফেরেশতাদের শুঁকা ও ঘ্রাণ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে এবং মু'মিনের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফেরেশতাগণ তাঁর হাত-পা শুঁকে দেখেন– এদের মধ্যে ঈমানের ঘ্রাণ কি পরিমাণ রয়েছে, প্রভৃতি।

সার কথা হলো– দেখা, শোঁকা, স্বাদ গ্রহণ এবং স্পর্শ করা এখানেও রয়েছে, ওখানেও রয়েছে। ওখানে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আর এখানে বাতেনী অনুভূতির মাধ্যমে। ওখানে মাদ্দিয়াত ও পদার্থের সাহায্যে আর এখানে রূহানিয়াতের সাহায্যে। ওখানে হৃদয়ের নিম্ন দরজা দিয়ে, আর এখানে আত্মার ঊর্ধ্ব দরজা দিয়ে, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও সম্মান দৃষ্টিগোচর হয়। ওখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর এখানে ইলহাম, ওখানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিশক্তি কার্যকর রয়েছে, আর এখানে কার্যকর রয়েছে আত্মিক শক্তি। ওখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের কার্যকারিতা রয়েছে, আর এখানে আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও ওহীর কর্মতৎপরতা চালু রয়েছে।

ইলম ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিজ্ঞান ও দর্শন বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেসব জিনিস অনুভূত হয়, এগুলোকে 'অনুভূতি' বলা হবে, ইলম বলা যাবে না। আর এখানে যেসব গায়েবী খবর লাভ হবে, সেসবকে 'ইলম' বলা হবে, হিস (অনুভূতি) বলা হবে না। যেহেতু ইলম বলা হয় গোপন ও চোখের আড়ালের কোন জিনিসকে জেনে নেয়া। এসব গায়েবী ও গোপন জিনিস শারীরিক হোক কিংবা আত্মিক বিষয়– ইলমী জুযিয়াত আংশিক বিষয় হোক অথবা মৌলিক নীতিই হোক– এগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয় না। এ কারণে যখনই ইলম হবে, গোপন অদৃশ্য বস্তুরই হবে। হিস (অনুভব) যখনই হবে, পদার্থের হবে। তা আকার-আকৃতির হোক, আওয়াজের হোক অথবা ঘ্রাণের হোক। তবে কখনো হিস্‌কে ইলম এবং ইলমকে হিস্ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

সার কথা, গায়েবী এবং অদৃশ্য বিষয় জেনে নেয়াকেই ইলম বলা হয়, যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। এ ইলম যা প্রকৃতই ইলম। তা সন্দেহাতীতভাবে ও সঠিকভাবে দৃঢ়তার সাথে নিষ্পাপ নবী (আ.)গণের ওপর অবতীর্ণ হয় এবং তার অংশও ছায়া হিসেবে তাঁদের অনুসারী খাদেম- আওলিয়া কেরাম ও উলামা-হযরাতের ওপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলম এবং ইলহামী ইলমের উৎস

সার কথা হচ্ছে, এসব জাহেরী ইলম পদার্থের যাত ও সিফাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। পদার্থ নিজেই যাহেরী (বাহ্যিক) জিনিস। সুতরাং এ সম্পর্কিত ইলমও যাহেরী ইলম হবে। আর ইলহামী ইলম আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ-ই হলো প্রকৃত গায়েব বা অদৃশও। এ ইলমও গায়েবের ইলম হবে। এখন যদি ইলমের মূল্য ও মর্যাদা মা'লুমের (জ্ঞাত বস্তু) মূল্য ও মর্যাদা অনুযায়ী হয়, তাহলে যেমন আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের মূল্য ও মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, সবার শীর্ষে, তেমনি এ সম্পর্কিত ইলমও সকল ইলমের উর্ধ্বে ও শীর্ষে হবে; সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর যেভাবে পদার্থের মাধ্যমে পদার্থের যাত ও সিফাত, প্রকৃতি ও গুণাগুণ প্রকাশ পায়, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের ইলমে আল্লাহরই গুণাবলী, কামালাত ও পূর্ণতা প্রকাশিত হবে। এ গায়েবী ইলমের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার পরিচয় ও মা'রেফত লাভ হয়– যা সকল ধরনের কামাল ও বরকতের উৎস এবং সকল নেকী ও খায়ের-এর উৎপত্তিস্থল। মানুষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আজীবন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এদিকে ধাবিত হতে থাকে, সচেষ্ট থাকে; আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতে অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রবেশ করতে থাকে। তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও কামালাতের রহস্যাবলী উন্মোচিত হয়ে ইলমে একীন (সুদৃঢ় ও অটল বিশ্বাস) হাসিল হতে থাকে।

মহান আল্লাহ এক ও একক। আলেম ও খবীর, হাকীম ও করীম, রউফ ও রাহীম, মুহসিন ও মুনঈম, রাজ্জাক ও ফাত্তা, হাদী ও মুয়াল্লিম, পথ প্রদর্শক ও শিক্ষাদানকারী। তাহলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সিফাতের প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ দান-দক্ষিণা, লজ্জা, পবিত্রতা, অভিমান, আদল ও ইনসাফ, ন্যায়নীতি, নিঃস্বদের সাহায্য, দরিদ্রদের অভাব মোচন, নির্যাতিত-মজলুমদের সাহায্য-সহানুভূতি, ইয়াতীম ও বিধবাদের সেবা, প্রবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্বলদের সাহায্য এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি– সাধারণের কল্যাণ কামনার উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এর ফলে জগতে শান্তি, দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা, পরিবারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, অন্তরে আনন্দ, কাজ-কারবারে আনন্দ-উল্লাসের পরিবেশ ও কার্যকলাপ সর্বত্র বিরাজমান থাকে, দৃশ্যমান হয়। এতে অন্ধকারাচ্ছন্ন এ দুনিয়া জান্নাত সদৃশ হয়ে যায়, স্বর্গ-তুল্য হয়ে যায়। জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো প্রলম্বিত হয়। তখন মানুষ ফেরেশতা হয়ে দুনিয়ার পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে। তাদের ওপর সর্বক্ষণ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ

হতে থাকে এবং ঐ সব মানুষও তখন বঞ্চিত হয় না, যারা তাদের সংকীর্ণতার কারণে এসব কল্যাণকর জিনিসকেও মন্দ ও খারাপ মনে করে থাকে। যেমন–

ادیم زمیں سفرہ عام ادست

بریں خوان یغما چہ دشمن چہ دوست

ভূপৃষ্ঠ হলো তার বিশালাকার দস্তরখানা। এখানে দোস্ত-দুশমন, শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ নেই।

বস্তুগত ও ইলহামী ইলমের আলাদা কাজ এবং ফলাফল

তাছাড়া কেবলমাত্র মানব জাতি নয়; বরং জীবজন্তুও সুখী হয়ে যায় এবং এ সুখের কারণে হাক্কানী ও রব্বানীদের ভক্তি ও ভালোবাসায় আসক্ত হয়ে তাঁদের জন্য দোয়া করতে লেগে যায়। পিপীলিকা তাদের গর্তে, মাছ নদী-নালা ও সাগরে, পাখিকুল তাদের বাসায় থেকেও এ জাতীয় মানুষের দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতাদের মত পবিত্র মাখলুক তাদের পায়ের নিচে ডানা বিছিয়ে দিতে থাকেন। এর মূল্য ও ভিত্তি হলো– এ প্রকৃত ইলমের প্রথম প্রতিক্রিয়া মানুষের স্বভাব-চরিত্রে প্রকাশ পায় ঠিক এভাবে, যেমন পদার্থ পূজারীগণ দিনরাত পদার্থ ও তার গুণাগুণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকেন। সবসময় তাদের সংস্পর্শে থাকার কারণে জড়বাদী আবেগ-উদ্দীপনা তাদের স্বভাব-চরিত্রে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর ফলে নফসে আম্মারা শক্তিশালী হতে থাকে এবং মাদ্দি শক্তির অহংকার, জীবনোপকরণের প্রাচুর্যের গর্বে পরিণাম হতে বেখবর ও বিমুখ হয়ে পড়ে আর প্রবৃত্তির পূজা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনার পূজা, অন্যকে তুচ্ছ ও হীন মনে করা, মুনাফিকের আচার-আচরণ, জুলুম-অত্যাচার, কঠোর হৃদয়, রুক্ষ স্বভাব, লজ্জাহীনতা, দুনিয়ার মোহ, অবৈধ আইনের চুরি ও ডাকাতি এবং নিজের তুচ্ছ ও হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হাজারো মানুষের গলায় ছুরি চালানো এবং তাদের মাল-সম্পদ, মান-সম্মান নিয়ে খেলা করতে আনন্দ অনুভব করে। ফলে দুনিয়াতে শান্তি, নিরাপত্তার দারুণ অভাব, পরস্পরে আস্থাহীনতা, নৈরাশ্য ও স্বজনপ্রীতির পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, যার কারণে না মানুষ শান্তি পায়, না জনবসতি, শহর-বন্দর শান্তিতে থাকে।

আর এভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাত, কামালাত ও মা'রেফত নিয়ে দিনরাত সর্বদা চিন্তা-গবেষণা করতে থাকলে, এসব কামালতের প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তরে হতে থাকে এবং নফসও এর মাধ্যমে মুতমাঈন (শান্তিময়) হয়ে যায় এবং এতে আল্লাহ তায়ালার আখলাক ও চরিত্র, দয়া ও ভালোবাসা, অপরকে অগ্রাধিকার দান, অমুখাপেক্ষিতা, সৃষ্টির সেবা, দুর্বলের সাহায্য, পরকালের মহব্বত প্রভৃতি আখলাক ও চরিত্র, আমল ও কাজকর্ম প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। অতঃপর এ গায়েবী ইলমে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের ইলম; এর বাইরেও ইলমের এক বিরাট অংশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার কানুন ও বিধি-বিধানের ইলম– যে ইলম দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মর্জি ও নারাজী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং উল্লিখিত আখলাক ও গুণাবলীকে আমলে ও কাজে বাস্তবায়িত করার পথ ও পন্থা সামনে এসে যায়। হালাল-হারাম. জায়েয ও নাজায়েয, বৈধ ও অবৈধের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আল্লাহ এবং তাঁর সকল মাখলুকের হক ও অধিকার পূরণ করার নিয়ম-নীতি প্রকাশ পায় এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান আদর্শও এতে প্রকাশিত হয়। এর ফলে মানুষের উভয় জগত তথা দুনিয়া ও আখেরাত সৌভাগ্যের এবং আখেরাতের মুক্তি ও নাজাতের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

রব্বানী ইলমের সঙ্গে নফসের ইলমও জরুরী

এ উচ্চ ইলমের পরিপূরক অন্য একটি ইলম রয়েছে, যে ইলম ছাড়া মানুষ এ উচ্চাঙ্গের ইলম থেকে উপকৃত হতে পারে না। আর এ ইলম হলো তার নফস ও প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান এবং এ ইলম দ্বারা নফসের মৌলিক প্রকৃতি, তার স্বভাবজাত অভ্যাসের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হবে। কারণ, নফসের উত্থান-পতনের ইলম হয়ে যাওয়ার পর এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নফসই সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, পাপ-পঙ্কিলতা ও দুষ্টামির উৎস, কেন্দ্রস্থল। মন্দ ও গর্হিত কাজ নফস থেকেই উদিত হয় এবং সৎস্বভাব ও উন্নত চরিত্রকে উলট-পালট ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পবিত্র কুরআন এ সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে যে, মানুষের নফসে সত্তাগত কোন কামাল ও গুণ নেই, কোন হুনর নেই। আর কামাল ও হুনর-এর দু'টি ভিত্তিই রয়েছে ইলম ও আখলাকে, জ্ঞান ও চরিত্রে। পবিত্র কুরআনের আলোকে আপনি অবহিত হয়েছেন যে, না নফসের শুরুতে ইলম রয়েছে, না শেষ সীমায় রয়েছে। আর মধ্যবর্তী সময়ে যা আছে, তাও অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী। এ-ই হলো প্রমাণ যে, জন্মগতভাবে মানুষের মধ্যে কোন

ইলমী কামাল বা জ্ঞানজনিত পূর্ণতা নেই। তাছাড়া চারিত্রিক পূর্ণতা যার মাধ্যমে পবিত্র আমল, খবর ও বরকতময় চালচলন ও নকল হরকত প্রকাশ পায়– তাও নফসের মধ্যে নেই; বরং রয়েছে কেবল ফেতনা-ফাসাদের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ এবং মন্দ ও গর্হিত কাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা। ফেরেশতাগণ যখন মানুষকে পৃথিবীর খেলাফত দান সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরয করেছিলেন–

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

আপনি কি দুনিয়ার বুকে এদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছেন যারা ফাসাদ করবে, রক্তপাত করবে? [বাকারা : ৩০]

এদিকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্র বাক্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে–

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى

নিঃসন্দেহে নফস মন্দ ও গর্হিত কাজের আদেশ করে থাকে– তবে যার প্রতি আমার রব আমার প্রভু দয়া করেছেন (সেই রক্ষা পায়)। [ইউসুফ : ৫৩]

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, মানুষ যেমন মাতৃগর্ভ হতে ইলম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় না, তেমনি কোন প্রকার চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীরও পূর্ণতা নিয়ে আসে না। যদি নিয়ে আসত, তাহলে তালীম ও তরবিয়তের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতো না। আর স্পষ্ট কথা হচ্ছে নফসের আবেগ-উদ্দীপনা, জাহালত ও মূর্খতা, অসৎ চরিত্র ও অসভ্যতাসহ যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন ফেতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কী হতে পারে! এদিকে ইলম, আমল ও আখলাকের সকল কামালাত ও পূর্ণতার উৎস হলো আল্লাহ তায়ালার বরকতময় যাত। যার ফলে দুনিয়ায় আমল ও শান্তি, ঈমান ও দিয়ানত বিস্তার লাভ করে এবং দুনিয়া আমল, শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং দরকার ছিল– যেখানে মানুষের প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের, সেখানে নিজ নফস ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থাকা দরকার। তাহলে নফস তার প্রকৃতিগত শর ও ফাসাদ আল্লাহর ইলমের বরকতে দমিয়ে রাখতে সমর্থ হবে। এভাবে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী তার ক্ষতি ও মন্দ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সে নিজেও নিরাপদ সীমানার মধ্যে ঢুকে যাবে।

ইলমের মৌলিক প্রকার দুটি : ইলমে নফস ও ইলমে রব

এ কারণেই স্বাভাবিকভাবে দুটি মৌলিক ইলমী বুনিয়াদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যা মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য জরুরী। এক. ইলমে নফ্স ও দুই. ইলমে রব। অতঃপর এ দুটি ইলম নিজেদের বিশেষত্ব, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হিসেবেও অত্যন্ত জরুরী এবং স্বভাবজাতও বটে। কারণ, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রথম ঐ জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, শিখে নেয়, যা তার নিকটেই রয়েছে। অতঃপর দূর-দূরান্তের জিনিস শেখে।

পরিষ্কার কথা হলো– মানুষের নফস ও প্রবৃত্তিই তার সর্বাধিক নিটবর্তী। এতটা নিকটবর্তী অন্য কোন জিনিস হতে পারে না। আর এতটা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তার নিজের নফস সম্পর্কে ইলম না রাখে, তাহলে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জাহেল-মূর্খ আর কে হতে পারে? আর এরচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হলেন রাব্বুল আলামীন। স্বয়ং মানুষের নফস ও প্রাণ তার এত নিকটবর্তী নয়। এত অধিক নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন মানুষ তার প্রভু সম্পর্কে সঠিক ইলম ও জ্ঞান না রাখে, তাহলে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক জাহেল ও মূর্খ আর কে হতে পারে?

তাই দূর ও নিকটবর্তী হিসেবে এ দুটি ইলম মানুষের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে এবং ওয়াজিব হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন এ ইলমদ্বয়ের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ ۞

আমি দেখিয়ে দেব তাদেরকে আমার নিদর্শন পৃথিবীর সর্বত্র এবং স্বয়ং তাদের জান ও প্রাণের মধ্যে, শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এ-ই ঠিক। তোমার প্রভু কি যথেষ্ট নন, তিনি সকল জিনিসের ওপর সাক্ষী, উপস্থিত, এসব মানুষ ধোঁকায় রয়েছে আল্লাহর মুলাকাত ও সাক্ষাৎ

সম্পর্কে; শুনে রাখ, আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। [হা-মীম আস্-সাজ্‌দা : ৫৩-৫৪]

স্পষ্ট কথা হলো, এসব নিদর্শন প্রদর্শন করাই হলো ইলম। আর ঐ ইলম নফসের বাইরেও হবে, ভেতরও হবে। এর মাধ্যমে ইলমে নফস ও ইলমে আফাক অর্জন করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অতঃপর এ ইলমের ওপর 'তাবাইউনে হক'কে বর্ণনা করা হয়েছে, তাবাইউন-এর অর্থ হলো, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া। সুতরাং দিল বা অন্তরে 'হক'-এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই হলো ইলম, যার দ্বারা ইশারা হলো 'ইলমে রব'-এর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'ইলমে নফস' অথবা নফসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের যে নিদর্শন দেখানো হবে, এগুলোই হবে 'হক'-এর জন্য ভূমিকাস্বরূপ। তাহলে এর ফল দাঁড়াচ্ছে– নফসের মা'রেফত ও পরিচয় লাভের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মা'রেফত এবং পরিচয় লাভের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে। যেমন- মুসলমান আরেফগণ সুন্দর ভাষায় নিম্নোক্ত দার্শনিক বাক্যের মাধ্যমে একথা অধিক স্পষ্ট করে দিয়েছেন–

من عرف نفسه فقد عرف ربه

যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে, নিজের পরিচয় লাভ করতে পেরেছে, নিঃসন্দেহে সে তার রবের পরিচয়ও লাভ করতে পেরেছে।

ইলমে রব-এর আমলী ব্যাখ্যা ফিক্‌হ এবং ইলমে নফ্‌স-এর তাসাওউফ

ইলমে 'হক' এবং এ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের জন্য ইলমে ফিকহ রয়েছে– ইলমে মুকাল্লাফদের প্রতি (আল্লাহর নির্দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যারা) বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধকে কুরআন ও সুন্নত থেকে একত্রিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ইলমে নফ্‌স বা নফসের জন্মগত ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার জন্য রয়েছে ইলমে তাসাওউফ। ইলমে নফ্‌সের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি, তার অসৎ চরিত্রের নীতিসমূহ এবং অসৎ চরিত্রকে সৎ চরিত্রে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নেয়ার পথ ও পদ্ধতি কুরআন-হাদীসের আলোকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। ফলে যে পর্যন্ত নিজের নফসের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ইলম না হবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতি থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন হবে।

অতএব ইলমে-রব যেমন জরুরী, তেমনি ইলমে নফসও শিখে নেয়া দরকারী। তাহলে একদিকে যেমন নফসের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুষ্টুমির তালিকা চোখের সামনে এসে যাবে, অন্যদিকে কামালত ও পূর্ণতা, নেকী ও কল্যাণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এভাবে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী ফেতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা পাবে।

উল্লিখিত দুটি ইলম– যার মাধ্যমে মানুষ দায়িত্বশীল হতে পারে, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে নিজের প্রকৃত দায়-দায়িত্ব ভুলে না যায়। পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী এবং এর আনন্দ উপভোগকে ধ্বংসাত্মক বিশ্বাস করে, তার প্রতিটি আমলে, প্রতিটি কাজে আখেরাতকে সামনে রাখে এবং আখেরাতকেই নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করে চলতে থাকে। এভাবে তা'জিমে হক ও খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা)কে নিজের নফসের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে অপবিত্র মাটিকে পবিত্র মণি-মানিক্যে পরিণত করে নেয়। নেক আমল প্রথম প্রথম কষ্ট ও ধৈর্যের সঙ্গে করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা কষ্টহীন হয়ে পড়ে, স্বভাবগত হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তা বিনা কষ্টে হতে থাকে। যে আমলের বরকতে মাখলুক ও তার নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হয়। খালেক ও স্রষ্টার রেযা ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। এভাবে উভয় জগতে তাঁর পরিণাম খায়ের ও কল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়।

নবীগণ ইলমে-রব পৌঁছানোর জন্যই আবির্ভূত হন

আর এটাই হচ্ছে আত্মার মাধ্যমবিহীন 'প্রত্যক্ষ ইলম'– যা পৌঁছে দেয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ নন; বরং আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। এ ইলমকে গায়বের নিম্নদেশ হতে বাহ্যিক জগতে নিয়ে আসার জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং ঐ ইলমের আমলী ও বাস্তব রূপ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.), তাঁদের মজলিস ও নির্ভীক খাদেমগণ আইম্মায়ে কেরাম, উলামায়ে রব্বানী আর ওলী-দরবেশগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সেই ইলম– যার সম্পর্ক পদার্থ ও তার আকার-আকৃতির সঙ্গে নয়; বরং সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বরকতময় যাত ও সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর ইন্দ্রিয়ানুভূত ও বিবেকপ্রসূত ইলমের প্রান্তসীমা যখন আত্মা ও হৃদয়– যে ইলম ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি, বিভিন্ন ইজম তথা কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম এবং যান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ দুনিয়াতে বিভিন্ন জিনিস প্রকাশ

করতে থাকে তখন আধ্যাত্মিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও শরঈ ইলমের প্রান্তসীমা আত্মা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় হতে পারে না। অতএব, এ ইলম সর্বপ্রথম আত্মার ইলমই হবে– যা ইন্দ্রিয় ও বিবেকের মাধ্যম ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে লাভ হতে থাকে।

দুনিয়াতে প্রচলিত ইলমের মাধ্যমে যদি দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ লাভ করে– যার মাধ্যমে মানুষ পদার্থের গভীরে পৌঁছে, পদার্থের মধ্যেই হারিয়ে যায়; তাহলে আল্লাহ তায়ালার এ ইলমে দীনি হেকমত ও ফিকহী রাস্তা এবং আল্লাহর নিকট পৌঁছার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এর মাধ্যমে মানুষ সত্যের গভীরে পৌঁছে আল্লাহতে ফানা ও বিলীন হয়ে যায়– যা হলো স্থায়ী জীবন লাভ। ওখানে যদি যান্ত্রিক কাজকর্ম, বিভিন্ন মডেলের দ্রব্যসামগ্রী বের হয়ে আসে, তাহলে এখানে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পায়। সত্য সঠিক 'আকাঈদ ও বিশ্বাস, নেক এবং সালেহ আমলের বদৌলতে মানুষ কোন উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই প্রত্যক্ষভাবে বড় বড় গায়েবী জাহানে অদৃশ্য জগত– শুধু চন্দ্র নয়, সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে পৌঁছে যায়। আর যেভাবে দর্শনশাস্ত্রের তৈরি বিভিন্ন ইজমের দ্বারা দুনিয়াতে সবসময় ফেতনা-ফাসাদ, হাঙ্গামা, চরিত্রহীনতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং মানুষ মানবতাকে বর্জন করে পশুর স্তরে পৌঁছে যায় তেমনিভাবে এসব আল্লাহ ও ফিকহী রাহের ইলম ও আমল দ্বারা দুনিয়াতে সবসময় আমান ও সালামতি, শান্তি ও নিরাপত্তা, নৈতিক উৎকর্ষতা, চারিত্রিক উন্নতি, পাক-পবিত্র ধ্যান-ধারণা, নেক আমলের নমুনা ও আদর্শ সর্বদা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর মানুষ মানবতার ঊর্ধ্বে আরোহণ করে ফেরেশতাদের জগতে পৌঁছে যায়, শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। আর ভাগ্যবান নেক আত্মাগুলো এখনও ঐ স্থানে পৌঁছে। জড়বাদী দর্শনের মাধ্যমে সবসময় ফেরাউন ও হামান পয়দা হয়েছে। আর এসব আধ্যাত্মিক দর্শনের মাধ্যমে সিদ্দীক ও ফারুক (রা.) সৃষ্টি হয়েছেন।

পার্থিব ইলমের মত রব্বানী ইলমের স্থানও আত্মা

পবিত্র কুরআন পার্থিব ও দর্শনশাস্ত্রকে যেমন আত্মার ইলম বলে আখ্যায়িত করেছে, তেমনি একথাও বলেছে যে, এসব ইলম বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ হয়– যা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ইলমের স্থান ও পাত্র ঐ আত্মাকেই বর্ণনা করেছে, যে আত্মা এ দেহরাজ্যে প্রকৃত আলেম ও অনুভূতিশীল। আর ঐ আত্মাই জড় জাতীয় শরীরে লতিফায়ে রব্বানী, যে শক্তি ঐসব ইলমকে নিজের ভেতর আকর্ষণ করে নেয়। আত্মার

প্রকৃত খাদ্য ঐ সকল ইলম ও মা'রেফত। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۞

আর এ হলো কুরআন মাজীদ যা পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে বিশ্বস্ত ফেরেশতার মাধ্যমে, আপনার আত্মার ওপর, যেন আপনি সতর্ককারী হতে পারেন স্পষ্ট আরবী ভাষায়। [শু'আরা : ১৯২-১৯৫]

অতএব, ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলমের উৎস যেমন হচ্ছে পদার্থ ও আকার-আকৃতি– এ কারণে যে, এ ইলমের মাধ্যমে পদার্থ ও আকার-আকৃতি উপকৃত ও শক্তিশালী হয়। পানাহার করার কারণে এবং আয়েশ-আরামে বসবাস করার কারণে শরীর ও শারীরিক শক্তিই বৃদ্ধি পায় এবং এ শক্তির বদৌলতে পরবর্তীতে আরও বেশি পরিমাণ বিভিন্ন ডিজাইন ও বিভিন্ন মডেলের আরামদায়ক জীবনসামগ্রী তৈরি হতে থাকে এবং সামগ্রীর প্রাচুর্য দেখা দেয়, ঠিক একইভাবে প্রকৃত ও গায়েবী ইলমের উৎস ও উৎপত্তিস্থল হলো আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাত। এ জন্যই এ ইলম দ্বারা রূহানিয়াত ও মানব প্রকৃতি শক্তিশালী হয়। যেহেতু এ ইলমের উৎসই হলো আল্লাহ তায়ালার হাকীকত ও লতীফা; তাই এ ইলমের উলামা দ্বারা বাহ্যিক আকার-আকৃতি বা ডিজাইনের পরিবর্তন, প্রকৃতি ও স্বভাব-চরিত্র গঠনের নতুন নতুন ডিজাইন ও চিত্র সামনে আসে এবং সারে সারে আধ্যাত্মিকতার দিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হতে থাকে। আর যদি এ প্রকৃতির ইলম, তার নৈতিক গুণাবলী, বাহ্যিক প্রাণহীন এ ইলমের এবং এর আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়, যেভাবে আত্মা মিশে আছে, তাহলে বর্তমান তাহযিব ও তমদ্দুন নির্জন থাকতে পারে না; বরং সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে পড়বে। আর এর দ্বারা বিশ্বপ্রাণও দীর্ঘায়ু লাভ করবে; তাবাহী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে, অশান্তি, পেরেশানী ও নিরাপত্তার অভাব দূর হবে। যেমন খোলাফায়ে রাশিদীন এবং আদেল বাদশাহগণ পৃথিবীর চিত্রকে ধ্বংস না করে চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিকশক্তি দ্বারা সজীব করে দিয়েছিলেন। দুনিয়ার পাখায় দীনি জীবনীশক্তি দান করে দুনিয়াকে সজীব করে দিয়েছিলেন।

রব্বানী ও হিস্‌সী ইলমের উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য

এই ইলমে ইলাহীর রহস্য ও প্রথম বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ তায়ালার খাওফ ও খাহেশিয়াত, আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভীতি। যে ভীতির স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া হলো নাফরমানী, অবাধ্যতা এবং আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ হতে বিরত রাখা এবং গুনাহ ও পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করে চলা। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই আলেমে-দীন বলে গণ্য হবেন, যার মধ্যে ইলমের এ সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। যেমন- এর বিপরীত ইন্দ্রিয়ানুভূত ও দর্শন জাতীয় ইলমের বিশেষত্ব হলো, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিজের শারীরিক আয়েশ-আরাম, আনন্দ উপভোগ নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার ভয়।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ফরমাঁবরদারি করার পরিবর্তে নফসের ফরমাঁবরদারি ও আনুগত্য করবে। যার স্বভাবিক ফল হবে, পাপাচার বৃদ্ধি, অন্যের হক নষ্ট করা এবং দুষ্টুমি ও বিদ্রোহ। এর ফলে দুনিয়াতে ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। এ জন্যই জড়বাদী আলেম ঐ ব্যক্তিকেই গণ্য করা হবে যে সবচে' বেশি স্বাধীন, নীতিহীন ও ভয়ভীতিশূন্য হবে এবং মানসিকভাবে হবে পরাধীন। হালাল ও হারামের ভেদাভেদ করবে না। নিজের ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। জনৈক আরব কবি কত চমৎকার কথাই না বলেছেন–

رضيعا لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان

ইলম ও আল্লাহভীতি একই স্তনের দুধপানকারী দুটি জিনিস; একটি থেকে অন্যটি আলাদা হতে পারে না। যেখানে ইলম থাকবে, সেখানে খাওযুল্লাহ বা আল্লাহভীতি অবশ্যই থাকবে।

আর এর জন্যে সঠিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। একই দেশের অধিবাসী মাল (জীবনোপকরণ) ও দুষ্টুমি, একে অন্য থেকে আলাদা হতে পারে না। পার্থিব উপকরণ হাতে এসে যাওয়ার পর দুষ্টুমি, নীতিহীনতা ও বিদ্রোহের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, সঠিক তরবিয়ত যদি না হয়।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ইলমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে খওফ ও খাহেশিয়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ইরশাদ করেছে–

انما يخشى الله من عباده العلماء

আল্লাহকে প্রকৃতপক্ষে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি যারা আলেম-উলামা।

এরপর রব্বানী আলেমদের তুলনা আমাদের সঙ্গে করে পবিত্র কুরআন তাদের স্তর বিন্যাস ও মর্যাদার বিভিন্নতা বর্ণনা করেছে এভাবে–

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلْبَابِ

যে সকল মানুষ আল্লাহকে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে জানে, তারা কি সমান হবে ঐ সকল মানুষের, যারা জাহেল, মূর্খ? নিশ্চয়ই উপদেশ গ্রহণ ও অনুসরণ করা ঐ সকল মানুষের কাজ যারা বিবেকবান, বুদ্ধিমান। [যুমার : ৯]

এরপর এ ইলমের ধারক ও বাহকগণের নিত্যদিন বেড়ে যাওয়া মর্যাদা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ

আর যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক মর্যাদা। [মুজাদালা : ১১]

ইলমে নাফে বা উপকারী ইলম-এর হাকীকত

উচ্চ মর্যাদাশীল ইলম সেটাই, যার উপাধি হচ্ছে ইলমে নাফে বা উপকারী ইলম। এ ইলমের উপকারিতা থেকে কোন কিছু বাদ যায় না। নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সকল ইলম– তা ইন্দ্রিয়ানুভূত ইলমই হোক কিংবা দর্শন জাতীয়– কোনটাই উপকারশূন্য নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতির উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে এসব ইলমের বদৌলতে যখন জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ লাভ হয়। বসবাসের জন্য বাসভবন নির্মাণ, বাসনপত্র, গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার সামগ্রী, উন্নত যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ– এ সবকিছু ইলমের বদৌলতেই অর্জন হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে খুবই উপকারী। তবে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসবের উপকার ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়; বরং একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এ উপকারিতা কবরের সীমা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। আপনি বিমানে চড়ে সুদূর লন্ডন, আমেরিকা কয়েক মিনিটে পৌঁছে যেতে পারেন। তবে আরশ-কুরসী,

জান্নাত পর্যন্ত এসব যানবাহন আপনাকে পৌঁছাতে পারবে না। আপনি ঐ সকল ইলমের মাধ্যমে সৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইহজগতে উদরপূর্তি করতে পারেন। তাই বলে কবরে যাওয়ার পর উদরপূর্তির জন্য এসব সামগ্রী কোন কাজেই আসবে না। এর কোন কার্যকারিতাই থাকবে না। আপনি নরম মোলায়েম তুলতুলে জাজিম এবং বালিশ দ্বারা দুনিয়ার জীবনে শরীরকে আরাম দিতে পারেন। কিন্তু কবরে-হাশরে এসব জাজিম ও বালিশ মূল্যহীন। এ সবের মাধ্যমে কোন উপকারই হাসিল হবে না। সুতরাং এসব উপকরণের উপকারিতা মৃত্যুর আগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

অথচ ইলমে শরীয়ত বা শরীয়তের ইলম কোন উপকরণ তৈরির জন্য নয়; বরং মানুষ তৈরির জন্য এসেছে। আর উন্নত মানবতার ধারক এই মানুষের আবাস কেবল দুনিয়াতেই নয়; বরং আলমে বরযখ এবং আলমে হাশরও তার আবাসস্থল। সুতরাং এ ইলমের তৈরি মানবীয় গুণাগুণে পরিপূর্ণ মানুষ। তার আয়েশ-আরাম, সুখ-শান্তি, নিরাপত্তার উপকরণ স্বয়ং তার মধ্যেই রেখে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতেও এ ইলম দ্বারা শান্তি লাভ হতে পারে, আবার পরকালেও। কারণ, তার সুখ-শান্তি জড় পদার্থের অধীন নয়; বরং ঐ ইলমের বদৌলতে তার হৃদয়ের এমন গভীরে থাকে, যে প্রশান্তিকে বিশ্বের কোন কিছু মিটিয়ে দিতে পারে না। কাজেই ব্যাপক উপকারী শুধুমাত্র ঐ ইলমই হতে পারে, যে ইলম মানুষের মধ্যে অমুখাপেক্ষিতা ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সুখ-শান্তি তার মধ্যে তৈরি করে দেয়। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত কোথায়ও তার সুখ-শান্তি শেষ হয়ে যায় না বা ঘাটতি হয় না। ফলে, যখনই ইলমে নাফে শর্তহীনভাবে বলা হবে, তখন এর মাধ্যমে ইলমে শরীয়ত এবং ইলমে তরীকতও উদ্দেশ্য হবে– যা ব্যাপক অর্থে সকল দিক দিয়ে উপকারী। আর এ ইলমে-হাকীকী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি অন্যান্য পার্থিব ইলমকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে ফেলা হয় তাহলে কেবল এটুকুই হবে না যে, এ ইলম অপবিত্র জীবন ও অপরিচ্ছন্ন জিন্দেগীর কারণ হবে; বরং সামাজিক কাঠামোকেও ঐ প্রাণহীন মৃতদেহের ন্যায় করে দিবে, যার মাধ্যমে দুর্গন্ধ ও রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে। আর দুর্গন্ধের কারণে মন-মস্তিষ্ক ধ্বংস হতে থাকবে। তবুও এসব ইলম আত্মার প্রকৃত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- দেখা ও শোনা চোখ ও কানের দায়িত্ব। আর আত্মা যখনই ইলমের ঐ দায়িত্ব আদায় করবে, যা আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং ঐ ইলম দ্বারা তার দেহরাজ্যকে পরিচালনা করবে তখনই মানব-জগতে ঐ আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে– যা ক্ষতিকর বঞ্চনা থেকে পাক-পবিত্র হবে এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হবে, মানুষকে রক্ষা করতে

সমর্থ হবে। আর যদি আত্মাকে তার প্রকৃত ইলম থেকে সরিয়ে বাহ্যিক ইলম ও জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ লাগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সেটাই হবে ঐ মহাক্ষতি, যার আলোচনা আপনারা প্রথমভাগে পাঠ করেছেন। কিন্তু যদি আত্মাকে এসব থেকে অকর্মণ্য করে মূর্খতার গভীরে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেটা হবে ঐ হীনমন্যতা ও বঞ্চনা– যার আলোচনা ইতোপূর্বে আপনাদের সামনে করা হয়েছে।

এরপর ইলমকে আত্মার প্রকৃত ও সন্দেহমুক্ত ইলম বলা হবে, যাতে কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবকাশ না থাকে। কারণ, পঞ্চইন্দ্রিয় কিংবা বিবেক-বুদ্ধি যেসব জ্ঞান এই পৃথিবীকে মন্থন করে আহরণ করে, তাতে দ্বিধা-সংশয়, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার সংমিশ্রণ থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে মূর্খতারই অন্তর্ভুক্ত, মূর্খতার শ্রেণী বিশেষ। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেহেতু মূর্খতার মিশ্রণ থাকে, ফলে এমন সন্দেহমুক্ত নির্ভেজাল ইলম হয় না, যা দ্বিধা-সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা নাযিলকৃত ইলম যা মানবত্মায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যম ছাড়াই অবতীর্ণ হয় তা প্রকৃতির উৎস হতে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিত হয়ে থাকে। ফলে এতে কোন সন্দেহ-সংশয় এবং অনিশ্চয়তার সংমিশ্রণ থাকে না। তাই এ ইলমে বিশ্বাস ও প্রশান্তি লাভ হয়। এর মাধ্যমে মানুষের প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর দ্বারা প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

সার কথা হলো, উন্নত চরিত্র এবং নৈতিকতা হলো ইলমে ইলাহীর বিশেষত্ব ও প্রতিফল। আর নৈতিক-অধঃপতন, চারিত্রিক দৈন্য এবং ঐ সকল আকার-আকৃতি ও দর্শনীয় ডিজাইনের বিশেষত্ব বা প্রতিফল হচ্ছে পার্থিব ইলমের ফল। তাই এ দুই ইলম নিজেদের প্রকৃতি ও গুণাগুণের দিক দিয়ে যদিও সম্পূর্ণ আলাদা নয়; কিন্তু যদি ঐ সকল বাহ্যিক ইলমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঐ প্রকৃত ইলমকে স্থির করে সামনে অগ্রসর করা যায় আর ঐ সকল প্রদর্শিত চিত্রগুলোকে প্রকৃত ইলমের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার এসব সুন্দর সুন্দর জিনিসও আখেরাতের উপকারে কাজে আসতে পারে।

পার্থিব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ পরিবর্তন দরকার

বর্তমান দুনিয়ায় নৈতিক মূল্যবোধ যদি সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে থাকে, তাহলে তা কেবল এজন্যই হয়েছে যে, ঐ ইলম যার অপর নাম ইলমে ইলাহী– সে ইলমকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে; অথচ নৈতিক মূল্যবোধের উৎসই হচ্ছে সে ইলম। বর্তমান

দুনিয়ায় মহামারী আকারে চরিত্রহীনতা বিস্তার লাভ করেছে। এর কারণ হলো, এসব প্রচলিত বাহ্যিক ইলমকে জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মূখ্য উদ্দেশ্য মনে করে উন্নত ও প্রসারিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যে ইলমে জাহেরী ও লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নেই। আর তাতে অন্য কিছুর সংকুলানও হতে পারে না।

বর্তমান দুনিয়ায় কলেজ-ইউনিভার্সিটির আধিক্য রয়েছে, যেগুলোতে এসব জড়বাদী স্বার্থ উদ্ধার ও উপভোগের জন্য হালাল ও হারাম, বৈধ ও অবৈধ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার মানসিকতা শেখানো হয়। আল্লাহ মনোনীত আখলাক, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে পেছনে ফেলে দেয়ার পথ ও পন্থা শেখানো হচ্ছে। ফলে মানুষ পশুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মানবতার পোশাক খুলে ফেলাকে সর্বোত্তম উন্নতি ও সমৃদ্ধি মনে করা হচ্ছে। অথচ এরপরও এসব শিক্ষিতের মধ্যে কিছু সংখ্যক দীনদার ও চরিত্রবান ব্যক্তির দেখা মিলে। আর তা হচ্ছে তাদের জন্মগত ও স্বভাবগত মানসিকতা, অথবা পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব কিংবা দীনদার পিতামাতার তরবিয়তের প্রতিফল– ঐ বস্তুগত শিক্ষার ফল নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা বিরোধিতা করছি না; বরং এসবের ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী পরিবেশ ও জড়বাদী স্বভাব-চরিত্রের বিরোধিতা করছি। কারণ, এ জাতীয় ধর্মহীনতা, চরিত্রহীনতা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বই-পুস্তকের কারণে নয়; বরং শিক্ষা প্রদানকারী ধর্মহীন শিক্ষকদের তরবিয়তের কারণেই হয়। তাছাড়া এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সম্পূর্ণ সমাজই নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে দীনি মাদরাসাসমূহে দর্শন, প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে অথচ এসব শিক্ষা ছেলেদের স্বভাব-চরিত্র ও মন-মানসিকতায় কোন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। এর একমাত্র কারণ হলো, শিক্ষা দানকারীগণের হৃদয়ে দিয়ানত ও আমানত পূর্ণমাত্রায় রয়েছে এবং নেক ও পবিত্র পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যই বলছি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিকর নয়; বরং ক্ষতিকর হলো এর পরিবেশ। যদি এসব বিদ্যাপীঠে পদার্থপূজার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্যের পরিবেশ, এসব কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যায়, জড়বাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিকতার প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে যায়, তাহলে এই জড়বাদী শিক্ষাও একটি নেক ও পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতে পারে। সুতরাং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল করে দেয়ার দরকার নেই; বরং এসবের রীতিনীতি ও পরিবেশ পরিবর্তন করে দেয়া প্রয়োজন।

দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

তাই বলে এসব করার শক্তি ও সামর্থ যদি না হয়, তাহলে এর বাইরে অন্য কোন উপায় হতে পারে না যে, আলাদাভাবে সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার অনুগত একটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করবে– যে পরিবেশ আল্লাহর ইলম ও জ্ঞানের শিক্ষা এবং সে মোতাবেক তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে। আর দেশে বেশি করে এমন দীনি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করে দেয়া যেগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম দ্বারা অন্য পরিবেশের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে পড়তে পারে। এসব দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐ সকল লোককে ভর্তি করার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে যারা দর্শন ও বিজ্ঞান পড়ে ঐ সকল রোগীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন, যাদের জীবনের সংশোধনের আর কোন আশা নেই। তবে তারা নিজেদের চিকিৎসা ও সংশোধনের প্রত্যাশী। কারণ, বর্তমান পদার্থ-পূজারী যুগের সমাজে যদি চারিত্রিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করতে হয়, তমদ্দুন সভ্যতার শবদেহকে নৈতিকতার প্রাণ দিয়ে সজীব করতে হয়, তাহলে শুধু ঐ ইলম দ্বারাই সম্ভব, যা পবিত্র কোন মাধ্যম ছাড়া আলমে গায়ব থেকে আত্মার মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়। যে ইলমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলা– দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করা নয়। এ কারণে যে, একদিকে যেমন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে জীবন কাঠামো তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, অন্যদিকে পবিত্র দীনের প্রাচীন ইলম দ্বারা ঐসব প্রাণহীন কাঠামোতে রূহ ও আত্মার সঞ্চার করা দরকার। তা না হলে এসব প্রাণহীন সভ্যতার কাঠামোগুলো একদিন না একদিন পৃথিবী নামক বাগানকে ধ্বংস করে দিবেই। আর তখন ঐ মৃত কাঠামোগুলোতে প্রাণ সঞ্চারের যোগ্যতাও থাকবে না। এ কারণে আজ যদি পঞ্চইন্দ্রিয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এবং বিবেকপ্রসূত দর্শন ও সমাজবিদ্যার প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি এসব মারেফতী ইলমের প্রয়োজন আত্মার রয়েছে। এ ইলমকে আল্লাহ তায়ালা রূহ নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং বিশ্বের প্রাণ বলেছেন। ইরশাদ করা হয়েছে–

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَـٰبُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবে আমি প্রেরণ করেছি আপনার নিকট একজন ফেরেশতা নিজের আদেশে, আপনি জানতেন না কিতাব কি,

ঈমান কি? কিন্তু আমি এ আলোকে রেখেছি। এর মাধ্যমে হেদায়েত করি, যাকে ইচ্ছা করি আমার বান্দাদের মধ্যে হতে। আর নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহ) সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার সবকিছু যা আকাশসমূহে এবং ভূপৃষ্ঠে রয়েছে, সব কাজকর্মই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে থাকে। [শুরা : ৫২-৫৩]

ব্যাধিগ্রস্ত বর্তমান বিশ্বের একমাত্র চিকিৎসা

আসল কথা হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র রোগই হচ্ছে এটা। এর প্রাণহীন তাহযীব ও তমদ্দুনে নৈতিকতার শক্তি বিদ্যমান নেই। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাপকতর ব্যাধি। দুনিয়াতে সবকিছু বিদ্যমান থাকার পরও যে জিনিসটি বিশ্ববাসী পায়নি, তা হলো আত্মার সুখ, আত্মার প্রশান্তি। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হতে পারে এটাই যে, এ সমাজকে প্রশান্তির উৎসস্থল ইলমে দীনের প্রফুল্লতা ও নৈতিকতার জ্ঞান অথবা সংক্ষেপে 'ধর্মীয় শিক্ষায়' শিক্ষিত করা হোক এবং দীন ও মাযহাবের তৈরি ইলম ও আখলাকের দ্বারা একে প্রশিক্ষণ দেয়া হোক– যার নির্ভরযোগ্য উৎস আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নত ছাড়া আর কিছু নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন–

لا يصلح اخر هذه الا مة الابم صلح به اولها -

এই উম্মতের শেষ অংশের সংশোধন ঐ জিনিসের মাধ্যমেই হতে পারে, যে জিনিস দ্বারা প্রথম অংশের সংশোধন হয়েছিল।

আর এ সংশোধনের মাধ্যম হলো আল্লাহ তায়ালার রূহ কুরআন মজীদ-এর শিক্ষা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যা হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে সুবিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

একটি ভুলের অবসান

আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করা এবং এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের

আত্মার সঙ্গে দেহ জড়ানো থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক গুণাবলী অর্জনের সঙ্গে দৈহিক প্রয়োজনাদিও পূরণ করতে হবে। এ থেকে কেউ বেনিয়ায হতে পারবে না। বসবাস, পানাহার যাতায়াত প্রভৃতির উপায়-উপকরণ, তেজারত, ব্যবসা, কৃষিকাজ, শিল্প, কারিগরী ইত্যাদির উপায়-উপকরণকেই বিজ্ঞান বলা হয়। এ কারণে যে পর্যন্ত শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হবে, সে পর্যন্ত এসব উপকরণ-উপাদান এবং এসবের শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারবে না; সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকতে পারবে না। আত্মার সঙ্গে যখন দেহ জড়ানো রয়েছে, সুতরাং দেহের প্রয়োজনও মেটাতে হবে। তবে অবশ্যই এমন একদিন আসবে যেদিন শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন মানুষের মাঝে যে বস্তুটি অবশিষ্ট থাকবে, তা কেবল আত্মাই হবে। তাই আত্মার প্রয়োজন মেটানো শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি দরকারী। বিশেষত দেহ ও দৈহিক জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, আর রূহ ও রূহানী জীবন চিরস্থায়ী, তাই দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম জ্ঞান-বিজ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী হবে, এদের উপকারিতাও ক্ষণস্থায়ী হবে। আর যুক্তিসঙ্গত কথা হলো, ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজন মেটানো হয় শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ, অতিরিক্ত নয়। ক্ষণস্থায়ী জিনিসের প্রতি চিরস্থায়ী জিনিসের মত ব্যস্ততা, একাগ্রতা ও মনোযোগ দেয়া হয় না। ফলে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনও করা যাবে না, আবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যও মনে করে শুধু এর উন্নতিকল্পে জীবনকে অতিবাহিত করাও যাবে না। সুতরাং নীতিগত ও মৌলিক কথা হলো এই– এসবকে প্রয়োজনানুসারে অবশিষ্ট রেখে এর মাধ্যমে জীবনোপকরণ তৈরি করা হোক। তবে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য দীনকে অগ্রাধিকার দেয়া হোক, যে দীন মানুষকে মানবতা শিক্ষা দেয়। যে ইলম অর্জনের একমাত্র পথই হচ্ছে দীনি ও শরঈ শিক্ষা লাভ করা।

উন্নতির জন্য ইলমেদীন আর প্রয়োজনের জন্য পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান

উল্লিখিত দর্শনের স্বাভাবিক ফল দাঁড়াবে এই– ইলমে-দীন থাকবে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করার জন্য, আর দুনিয়ার ইলম থাকবে সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর এর বাস্তব চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ঘোষণায়–

اعمل للدنيا بقدار بقا نك فيهاد عمال للاخرة بقدار بقائك فيها -

দুনিয়ার জন্য এই পরিমাণ আমল কর, যে পরিমাণ দুনিয়াতে তোমাকে অবস্থান করতে হবে, আর আখেরাতের জন্য ঐ পরিমাণ আমল কর, যে পরিমাণ আখেরাতে তোমাকে অবস্থান করতে হবে।

এর জন্য সবচে' বেশি প্রয়োজন, মুসলমানগণ ইলমে-দীনকে মৌলিক মর্যাদা ও অগ্রাধিকার দান করে এগিয়ে যাবেন এবং নিজেদের পরবর্তী বংশধরগণকে দীন ও ইলমে-দীনের উন্নতিকল্পে প্রস্তুত করে দিবেন। তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্বের মধ্যে সবচে' বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন তালিমে দীনের ব্যাপারে। ইরশাদ করেছেন–

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَـٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের রাসূল প্রেরণ করেছি– তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতগুলো পাঠ করেন, পাক-পবিত্র করেন, তোমাদেরকে শিখিয়ে দেন, তোমাদেরকে কিতাব এবং এর রহস্যাবলী শিখিয়ে দেন, তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয়, যা তোমরা জানতে না। [বাকারা : ১৫১]

রাসূল (সা.)-এর আগমনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য

তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁকে প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য 'দীনি শিক্ষা প্রদান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন–

انما بعثت معلما

আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

আগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

আর এ তালীমের স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া হলো আমলের সংশোধন– যে আমলের সংশোধন ও পবিত্রতা অর্জন ছাড়া ইলমও উপকারী হতে পারে না; বরং হিতে বিপরীত হয়ে জান-প্রাণের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলা হয়েছে 'তিনি উত্তম আদর্শ'। যাঁকে পবিত্র কুরআন 'তালিমে হিকমত' দ্বারা ব্যক্ত করেছে। আর তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো তাকমীলে আখলাক বা চরিত্রের পূর্ণতা সাধন। এ কারণে যে, চরিত্রহীনতার সঙ্গে নেক আমল করার কোন উপায় নেই, হতে পারে না। পবিত্র কুরআন এ বাস্তব কথাকে 'তাযাকয়া' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

بعثت لا تمم مكارم الاخلاق

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি মহৎ স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করতে পারি।

এ কথা বলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খুলুকে আযামী'-এর ঐ মহাআদর্শ দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন, যার ফলে দুনিয়া তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্যই শুধু ইলমের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়। তবে ভক্তি সহকারে মাথা নত হয় আখলাক ও আমলের সামনেই। অতএব, চরিত্র হলো বীজতুল্য এবং এ থেকে উৎপন্ন বৃক্ষরাজি হলো নেক আমল তথা আমলে সালেহ।

আগমনের তৃতীয় উদ্দেশ্য

তাছাড়া কোন বীজ ও গাছ থেকে যদি ফল-ফুল না হয়, তাহলে সেটাকে জ্বালিয়ে দেয়াই সঠিক মনে করা হয়। এ কারণেই দীনি জিন্দেগীর তৃতীয় মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে 'তরবিয়ত আখলাক'– যার মাধ্যমে আমল-বৃক্ষের ডালপালায় আমল-ফল আসতে থাকে। মানুষ উন্নত চরিত্র অর্জন ব্যতীত প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। হযরত ইমাম মালেক (রহ.) যেমন বলতেন– 'পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ কি পাওয়া যাবে যে তার কথা ও বর্ণনাকে প্রাঞ্জল, সাবলীল ও

হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করতে না চায়। অথচ যার আমল তার কথা মোতাবেক হয় সে-ই প্রকৃত ও সঠিক ব্যক্তি, অথবা শুধু কথাবার্তা বলা দ্বারা জোরপূর্বক নিজের নফসকেই অযথা ধ্বংস করা হয়, এতে কোন লাভ হয় না। হযরত আলী (রা.) বলেন–

هتف العلم بالعمل فان اجاب والا ارتحل -

ইলম আমলকে আহ্বান করে, আমার সঙ্গে চল। যদি আমল তা গ্রহণ করে অর্থাৎ সঙ্গী হয় তাহলে ইলম আমলরূপী বাহনে আরোহণ করে তার আমল (আমলকারী)কে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আর আমল যদি ইলমের সঙ্গী না হয়, তাহলে ইলম চলে যায়, অবস্থান করে না (থেকে যায় শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গভঙ্গি)।

ইলম ও আমলের মধ্যে সম্পর্ক

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, যে পর্যন্ত মানব জীবন ইলম আমল ও আখলাকের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন না করবে, যাতে মানুষ এর সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে– সে পর্যন্ত তার জীবন আদর্শ জীবন হতে পারে না। মানুষ তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে তার কাছে নিজেকে অর্পণ করবে না। তার কথা ও কাজ অনুযায়ী তাদের জীবন গঠন করবে না। তাই পবিত্র কুরআন তালিমে কিতাবের সঙ্গে সঙ্গে তাযকিয়ায়ে আখলাক বা 'আত্মশুদ্ধি' এবং তালিমে হিকমতকে– যার অপর নাম 'চরিত্র গঠন ও সংশোধন'কে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়রূপে নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিজ রাসূলের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সকল উম্মতই তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব, তালিম, তরবিয়ত এখন উম্মতের ওপরই ন্যস্ত। উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে এ দায়িত্ব পালন না করবে, সে সময় পর্যন্ত সঠিক অর্থে উম্মত নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ যে কাজের জন্য সমগ্র উম্মত কুরআন ও সুন্নতের আলোকে আদিষ্ট রয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের এসব স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পর যার সমর্থন করছে বিবেক-বুদ্ধি ও ফিৎরাত (স্বভাব-প্রকৃতি), সে ক্ষেত্রে এ উম্মত আর কোন্ দলিল-প্রমাণের অপেক্ষা করছে? আর কি প্রমাণ চায় তারা? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَـئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ

এরা কি ঐ পথই দেখে যে, তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসবে মেঘমালার মধ্যে হতে অথবা ফেরেশতাদের মাধ্যমে? বিষয় ফয়সালা হয়ে গেছে, আর সবকিছুই আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। [বাকারা : ২১০]

মুসলমানের জীবনের মৌলিক তিনটি বিভাগ

সার কথা হলো, একজন মুসলমানের দীনি জিন্দেগীর তিনটি মৌলিক শাখা রয়েছে– ১. ইলম, ২. আখলাক ও ৩. আমল। ইলম যদি না থাকে, তাহলে পথই পাওয়া যাবে না, পথ চলা সহজ হবে না। আখলাক যদি না থাকে, তাহলে আমলের জন্য শক্তি পাওয়া যাবে না– মানুষ যাতে সৎপথে দ্রুত এগুতে পারে। আর যদি আমল না থাকে, কর্মস্পৃহা না থাকে, তাহলে অকর্মণ্য জাতির কোন ভবিষ্যৎ থাকে না। সম্মানজনক জীবন যাপন তারা করতে পারে না।

জাতি ধ্বংসের তিন কারণ

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্বভাবিকভাবে জাতিসমূহের অধঃপতন এবং ধ্বংসেরও তিনটি মৌলিক কারণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। যে কারণে একটি জাতি অধঃপতনের চরমে পৌঁছে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণ হারায়, নিঃশেষ হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে জাহালত ও মূর্খতা– যে কারণে পথই দেখা যায় না। দ্বিতীয় চরিত্রহীনতা। তখন সভ্যতা ও ভদ্রতা মানুষের হাতছাড়া হয়ে যায়। মানুষ হয়ে যায় পশুতুল্য। আর তৃতীয়টি আমলহীনতা– অকর্মণ্যতা, নিচতা, হীনতা ও পরাধীনতাই হয়ে থাকে। দুনিয়ার যে জাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, উল্লিখিত তিনটি মৌলিক ব্যাধির কারণেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

জাতীয় সমৃদ্ধির তিনটি উপায়

এজন্যেই এর বিপরীতে উল্লিখিত তিনটি মূলনীতিই সবসময় জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক. ইলমে নাফে– যার মাধ্যমে উভয়

জগতের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভের পথ পরিদৃষ্ট। দুই. সৎ ও মহৎ চরিত্র– যার দ্বারা ঐ পথে চলার শক্তি লাভ হবে এবং তিন. নেক আমল– যার মাধ্যমে জিন্দেগীর উন্নতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান লাভ করা সম্ভব হবে। সুতরাং মুসলমানদের চিন্তা করা দরকার, বর্তমানে ঐ তিনটি মূলনীতির প্রেক্ষিতে কোন স্তরে তারা অবস্থান করছে। ঐ জাতি– যাদের পূর্বসুরীদেরকে ফারুকী খেলাফতকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি সে পর্যন্ত দেয়া হতো না, যে পর্যন্ত ব্যবসায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের সকল মাসয়ালা আয়ত্ত করতে না পারত। সে সময় ইবাদত ও মুয়ামালাত-এর অবস্থান ছিল অনেক উপরে।

মুসলিম জাতি এবং বর্তমান সময়

আজ মুসলিম জাতি মূর্খতা তথা নাদানীর খপ্পরে পড়ে নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিচয় হারিয়ে ফেলতে বসেছে। অঞ্চলের পর অঞ্চল, মহল্লার পর মহল্লা রয়েছে, যেখানটাতে হাজার হাজার, লাখ লাখ মুসলমানের আবাদী আছে অথচ কোন আলেমে-দীনের ছায়াও সেসব এলাকায় দেখা যায় না। ফলে জায়গায় জায়গায় বিদাত, বাজে কাজকর্ম, রুসুম-রেওয়াজের মধ্যে মুসলমানগণ আটকা পড়ে আছেন আর সেসবকে দীন মনে করে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে চলেছেন। অথচ তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোন ধর্মীয় অনুভূতিই নেই। দুনিয়ার তাহযীব ও তমদ্দুন সম্পর্কেও তাদের ধারণা নেই। শিল্প-কারিগরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুভূতি থেকেও তারা রিক্ত-শূন্য। কারণ, এসব বিষয়ই ইলমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইলমই যখন শূন্যের কোঠায়, তখন এসব মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কোথায়? ভিত্তিই যখন নেই, তখন প্রশ্নই উঠে না ইমারত নির্মাণ হওয়ার। ভিত্তি ছাড়া দালান নির্মাণ সম্ভব নয়।

জাতিসমূহের ধ্বংসের স্বভাবজাত নীতি

আমলী জীবন তথা কর্মজীবনে সাধারণত গর্হিত কাজকর্ম এবং অশ্লীলতা মানুষের মনে বাসা বেঁধে নিয়েছে। আমলের স্বরচিত আকার-আকৃতি প্রিয় হয়ে গেছে আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণ অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেছে।

মূর্খতার ভয়ানক ব্যাধি এমন সীমায় পৌঁছে গেছে যে, যেহেন ও মেধার স্বাদ

গ্রহণশক্তি বিকৃত হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তেতো জিনিস মিষ্টি এবং মিষ্টি জিনিস তেতো বলে অনুভূত হচ্ছে। এর ফলে অনবরত মন্দ আমল করায় যখন অসৎ বা মন্দ কাজকর্ম অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন স্বভাবগত সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ ও মন্দকাজে বাধা দান বন্ধ হয়ে যায়। যখন খারাপ ও মন্দ কাজেরই উপদেশ প্রদান করা হতে থাকে এবং ভাল ও সৎকাজ থেকে বাধা প্রদান করা হয় তখন এর স্বাভাবিক পরিণতি এটাই হয় যে, ভাল কাজ মন্দ আর মন্দ কাজ ভাল বলে পরিদৃষ্ট হতে থাকে (আল্লাহ রক্ষা করুন)। ফলে বোধশক্তি ও মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরও ঐ পুরনো জাতি হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয় বটে তবে প্রকৃতপক্ষে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত আর থাকে না; বরং অন্য জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এমন দৃশ্যই আমাদের চোখের সামনে আজ দৃশ্যমান।

শুরুতেই আমি আরয করেছি যে, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ওপর যেসব ইলমী ও আমলী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, এর সঙ্গে আত্মার ওপরও যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা হলো ইলমে নাফে (উপকারী ইলম), উত্তম চরিত্র এবং সৎ চিন্তা-ভাবনা। এসব দায়-দায়িত্ব যদি পুরোপুরিভাবে বর্জন করা হয়, তাহলে তা হবে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করার শামিল। কৃত্রিম দায়-দায়িত্ব নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়া– এতে করে মূল দায়িত্ব পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর এটা হবে ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ।

এখন লক্ষ করলে দেখা যাবে, হিরমান ও খুসরান উভয়ের দিকে দুনিয়া দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। আত্মা শুধু ইলম থেকেই বঞ্চিত হয়নি; বরং ইলমের নামে কৃত্রিম দর্শন ও ইজমকে নিজেদের অন্তরে ভর্তি করে ফেলেছে, যা ইলমের নামে মূর্খতা। যার মাধ্যমে মানুষ মূর্খও থাকে না, আলেমও হয় না; বরং দ্বিগুণ মূর্খতার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে বর্তমানকালের মানুষ তার মাটির তৈরি দেহরাজ্য ও তার কর্মচারীবৃন্দকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান হতে মুক্ত করে বিধানহীনভাবে পরিচালনা করছে। ইলমের নেয়ামতকে মূর্খতার মাধ্যমে পরিবর্তন করে জীবন যাপন করছে এবং এর দ্বারা নিঃসন্দেহে নিজেকে জাহান্নামের উপযোগী করছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۞

আপনি এদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহর নেয়ামতের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং নিক্ষেপ করেছে

নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের ঘরে, যা হলো দোযখ– এতে তারা প্রবেশ করবে, আর তা হলো খুবই মন্দ আবাস্থল। [ইবরাহীম : ২৮-২৯]

বর্তমান বাস্তবতার আলোকে দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা যেমন অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, তেমনি ঐসব সম্মানিত ব্যক্তির সাহায্য ও সহায়তা করা, তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগে নাস্তিকতার যুগে তাঁরা দীনি মাদরাসার মাধ্যমে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। সুতরাং তাঁরাই শ্রদ্ধাভাজন এবং সম্মানিত।

বর্তমান সময়ে যতই প্রতিকূল পরিবেশ হোক না কেন– বুযুর্গানের উত্তরসুরীগণ দৃঢ় সংকল্প ও বুকে যথেষ্ট সাহস নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁরা সাহস হারাননি, নিরুৎসাহ হননি। ফলে আশা করা যায়, বর্তমান বুযুর্গানে-দীন এমনিভাবে ইসলামী ইলম, শিল্পকলা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে যথাযথ সংরক্ষণ করে যাবেন, যেভাবে তাঁদের পূর্বসুরী বুযুর্গগণ করে গেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উলুমে নববী দ্বারা যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

ما نصیحت بجائے خود کردیم روزگارے دریں بسر بردیم
گر نیاید بگوش رخبت کس بر رسولاں بلاغ باشد وبس

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত